শ্রীমতী অশ্রু কোলে

রাজনারায়ণ বসু
জীবন ও
সাহিত্য



রাজনারায়ণ বসু · জীবন ও সাহিত্য

শ্রীমতী অশ্রু কোলে

পরিবেশক

জিজ্ঞাসা

কলিকাতা

প্রকাশ দোল-পূর্ণিমা
১৩ চৈত্র ১৩৮১ : ২৭ মার্চ ১৯৭৫

RAJNARAYAN BASU · JIVAN O SAHITYA
by Srimati Ashru Kolay

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৭ সালের ডি. ফিল.
উপাধির মনোনীত গবেষণাপত্র

প্রচ্ছদলিপি শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মূল্য তিরিশ টাকা

উৎসর্গ

বাবার

স্মৃতির উদ্দেশে

সময়ে সাহায্যের জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি, নববিধান লাইব্রেরি, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি মন্দির (বোড়াল) ও রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার (মেদিনীপুর), বিশ্বভারতী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি (শান্তিনিকেতন) প্রভৃতি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীনির্মল চক্রবর্তী ও শ্রীমান বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পুস্তক প্রকাশে শ্রীগোবিন্দ কুমারের আনুকূল্যের কথা চিরদিন মনে থাকবে।

বন্ধুকৃত্য করেছেন শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমার শুভকামনা জানাই। গ্রন্থটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর অকুণ্ঠ শ্রম ও নিষ্ঠা আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই গ্রন্থ মুদ্রণের প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরিবেশনার ভার নেওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞাসা প্রকাশনের শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন।

গ্রন্থটি প্রণয়নের দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হল ; সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। গ্রন্থশেষে 'রাজনারায়ণ বসু -রচিত গ্রন্থ' তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আশা করি পাঠকবর্গ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সুচিন্তিত ও মূল্যবান একটি ভূমিকা লিখে পাঠিয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। তাঁর আশীর্বাণী আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

দোল-পূর্ণিমা ১৩৮১

অশ্রু কোলে

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

রাজনারায়ণ বসু • জীবন ও সাহিত্য

রামমোহন ও নন্দকিশোর

নগর কলকাতা। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতীচ্যের নবাগত ভাবধারার মধ্যে কলকাতার নাগরিকরা এখনো সম্পূর্ণভাবে ডুবে যেতে পারে নি। কারণ এ-যুগে তখনো চলেছে ভারতচন্দ্রীয় যুগের অনুবর্তন— নবাবী আমলের বিলাস-ব্যসন, আর স্থূল আমোদ-প্রমোদে সমাজমনে সর্বত্র নিম্নরুচি ও বিকৃতির ছাপ। কবিগান, হাফ্-আখ্ড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি আদিরসাত্মক সংগীতাদি দ্বারা তারা চিত্তবিনোদন করছে। জনজীবন একালে সব দিক থেকেই বদ্ধ জলাশয়ের মতো স্থাণু অচল হয়ে পড়েছে। উপার্জনক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা ও স্বাধীন প্রচেষ্টার অভাব এবং সৃষ্টিক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির অভাব জনমানসকে নির্বীর্য ও অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছিল। দেশের প্রাণ থেকে জীবনীশক্তি একেবারে বিলুপ্ত। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমাজজীবনে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মানসিক স্বাস্থ্যের অপচয়। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনায় তার একাধিক চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে জাতির জীবন শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে ছিল অনেক দূরে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অসাম্য, সামাজিক দুর্নীতি নিয়ে যে অষ্টাদশ শতকের যবনিকা পতন হয়েছিল এই শতক তারই জের টেনে চলেছিল। শিক্ষা বলতে কলকাতা ও তার আশেপাশে সংস্কৃতের পাশাপাশি ছিল আরবী-ফারসীর চর্চা। এগুলির পঠন-পাঠন হত টোল-চতুষ্পাঠীতে, মক্তব-মাদ্রাসায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই যে, দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগ্রহাতিশয্যে এবং অর্থানুকূল্যে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল এবং কার্যপ্রণালীও নির্বাহ হত এঁদেরই সহযোগিতায়।[১]

এই ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দেই কলকাতায় রাজা রামমোহন রায় একটি প্রচণ্ড শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি

---

১. দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০), ৩য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৬।

মনোনিবেশ করলেন নানাবিধ সংস্কার-কর্মে। নগর কলকাতায় এসে তিনি মিশনারিদের কার্যকল্প দেখে বিস্মিত এবং হিন্দুদের বলবীর্যহীন তামসিকতা লক্ষ করে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সংস্কারে ব্রতী হলেন রামমোহন। তিনি বুঝলেন যে মিশনারিদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা প্রয়োজন এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিজাতীয় ধর্মের প্রতি আসক্তি দূর করা ততোধিক বিধেয়। তদপেক্ষা অধিক গুরুতর কর্তব্য বাঙালী জাতির ধর্মীয় ভ্রান্তি দূর করা। তাই রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের পুনরুদ্ধার করে তার মর্মকথা জাতিকে অধিগত করাবার চেষ্টা করলেন। রামমোহন সম্ভবত কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে চেয়েছিলেন। তাই আরো পরে (১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ) মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফের ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলনকে তিনি এদেশের পক্ষে শুভ মনে করেই বাধা দেন নি। বরং তিনি এই শিক্ষা প্রচলনের সপক্ষেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ-কথা সত্য যে খ্রীস্টধর্ম প্রচলনের উদ্দেশ্যেই মিশনারিরা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রথমিক যুগে কেরী প্রমুখ মিশনারিদের স্বধর্ম প্রসারের প্রয়োজনের সঙ্গে সমাজ-কল্যাণের মহা আদর্শও ছিল। বাস্তবিক তখন দেশের নিম্নশ্রেণী জাতির মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণ বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পাতায় এর একাধিক সাক্ষ্য আছে।[১] ১৮১৫ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রামমোহন বেদান্ত-উপনিষদাদির ভাষ্য প্রকাশ করলেন আপনার উপলব্ধিজাত সত্যের ভিত্তিতে। দেশীয় পণ্ডিতবর্গ (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি) তাঁর এই শাস্ত্রপ্রতিপালন এক কথায় স্বীকার করেন নি। ফলে রামমোহনের সঙ্গে লেখনীমারফত তাঁদের বাদানুবাদ চলে দীর্ঘদিন।

এইরূপ তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ নিয়ে কলকাতা শহরে প্রবল আন্দোলন চলেছিল ১৮১৭ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গেও রামমোহনের তুমুল বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয়। স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ না করেও কেবলমাত্র ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসেই বাংলাদেশের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য ভাবধারায়

---

১. দ্রষ্টব্য : J. C. Marshman, *The History of Serampore Mission*, (Vol. 1), pp. 126-127.

উদ্‌বুদ্ধ হন। কিন্তু অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা ভারতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাই হিন্দুধর্মের বিপক্ষে বিদেশীয়দের আক্রমণের প্রতিবাদে সকলেই ছিলেন আগ্রহান্বিত। রামমোহন এঁদের পথপ্রদর্শক। ১৮২০ থেকে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা শহর এই আন্দোলনেও মুখর ছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী সমাজে শিক্ষা ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি বিষয়ে যে নানা সংস্কার ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা চলেছিল তার সব-কিছুর সঙ্গে রামমোহনের সূত্রে রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোরেরও সংযোগ ছিল। তিনি ছিলেন রামমোহনের প্রিয় এবং তাঁর একান্ত সচিব (Private Secretary)।—এই সম্বন্ধীয় তথ্য তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি রামমোহনের শিষ্য ও সহধর্মিবৃন্দের নাম বাঙালী সমাজে চিরস্মরণীয়। রামমোহনের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় এঁদের জীবন ও কর্মধারার স্ফুরণ হলেও প্রত্যেকেই উনিশ শতকীয় সমাজের উপযোগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সংগঠনশীল পুরুষ।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় রামমোহন হলেন বহু-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ—"a man of multiple personalities।" নব্যভারতের জাতীয় জীবনের অগণিত কর্মসূত্রগুলি যখন অন্বেষণ করি তখন প্রত্যেকটি সূত্রের সঙ্গে জড়িত দেখি তাঁর ব্যক্তিত্বের এক-একটি দিক। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পত্তন, ধর্মমতে যুক্তিবাদের অবতারণা, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রী-স্বাধীনতার সূত্রপাত, স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রেরণা দেশ ও জাতি সংগঠনে নিয়োজিত হয়েছিল। চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ একবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন: "…রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা— আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"[১] বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি আধুনিককালে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে রামমোহনের মনীষা ও

---

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, (বিশ্বভারতী) ১৯৫৮, পৃ. ৪০০-৪০৪। অপিচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', ১৩৬৬।

সাধনার ভিত্তিতে। তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ, কিন্তু তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল সমগ্র ভারত। এ কথা সর্বৈব সত্য যে, অখণ্ড ভারতবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত মনেরই বৈশিষ্ট্য।

ধর্মের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম অখণ্ড ভারতের কল্পনা করেছিলেন রামমোহন। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোকে আলোকপ্রাপ্ত উনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রথম ভারতীয় পুরুষ তিনি। যুগের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন অন্তর দিয়ে। এই প্রয়োজনেই তাঁর চিন্তার স্ফুরণ ও কর্মোদ্দীপনা জেগেছিল।

রামমোহনের বুদ্ধি ছিল প্রখর, মনীষা ছিল প্রতিভাদীপ্ত, মনের প্রসারতা ছিল অসীম। প্রথম জীবনে সুফী ধর্মের প্রভাবে তাঁর একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ জন্মে। তারপর মধ্যযুগের সাধক দাদূ কবির ও নানকের ধর্ম ও দর্শনচিন্তা তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিকে করেছিল উদার ও স্বচ্ছ। রামমোহনের ধর্মে হিন্দুতন্ত্রের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তিব্বতীয় ভাষা ও ধর্মভাবের প্রেরণা তাঁর ধর্মচিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছিল। হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ক্রমসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। পিতৃ ও মাতৃগৃহপরিবেশে দেখেছেন শিব ও বিষ্ণুর আরাধনা। পাশ্চাত্য ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিদর্শন তাঁর মনের প্রসারতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছিল ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

আধুনিক ভারতের রূপনির্মাতা রামমোহনকে আমরা জানি প্রধানত ধর্মসংস্কারকরূপে। তাঁর এই সংস্কার-আন্দোলনের ছিল দুটি দিক। একটি হল খ্রীস্টান ত্রিত্ববাদ ও হিন্দুপৌত্তলিক ধর্মাচার উচ্ছেদ, অপরটি হল অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা।

হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর অনাস্থা ও একেশ্বরবাদের ধারণা জন্মেছিল কৈশোরে ইস্‌লামীয় শাস্ত্রাদি পাঠকালে। রামমোহনের এই মত পরিবর্তনের পরিচয় রয়েছে তুহ্‌ফাত্‌-উল-মওয়াহিদ্দীন (*A Gift to Deists*) নামক পুস্তিকায়। এই পুস্তিকাটির ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় রাজনারায়ণ একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে, রামমোহনের ধর্মজীবনের সূচনা এখানে, এর পরে তাঁর সে জীবনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের পরিচয় আছে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে। অতঃপর খ্রীস্টান ত্রিত্ববাদীদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্ক করে

উক্ত ধর্মের মূল নীতিগুলিকে (একেশ্বরবাদ ও জনকল্যাণ) ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন রামমোহন। তিনি দেখালেন এক পরমেশ্বরকে কেন্দ্র করে সকল ধর্মের মূল কথা একই। তাঁর ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা অসাধারণ কৃতিত্বের দাবি রাখে সন্দেহ নেই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—সকলেই তাঁদের ধর্মের আদর্শ এই বিশ্বকালীন একেশ্বরবাদে (Unitarianism) খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে 'ভারতপথিক' অভিধা দিয়ে মন্তব্য করেছেন : "তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সভায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"[১] এই ঐক্যতত্ত্বেই রামমোহন হিন্দুদের কাছে হয়েছিলেন হিন্দু, মুসলমানদের কাছে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের কাছে খ্রীস্টান।

রামমোহনের সুগভীর মনীষাপ্রসূত ফল এই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (Comparative religion) অর্থাৎ হিন্দু একেশ্বরবাদ (Hindu Unitarianism)। উক্ত ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মিলনস্থানরূপে রামমোহন-কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল ব্রহ্মসভা (১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে)। ব্রহ্মসভার আরাধ্য দেবতা এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান। এই আরাধ্য দেবতার স্থান যাতে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা কলুষিত না হয়, ট্রাস্টডীডে সেই কথাই বলা হয়েছে।

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction, as shall behave and conduct themselves in as orderly, sober, religious and devout manner."[২]

এই ব্রহ্মসভা তথা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়েছে এই ট্রাস্টডীড্ পত্রে : "Strengthening the bonds of Union between men of all religious persuasions and creeds।"

রামমোহন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ দেখতেন না। তিনি বলতেন, ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি কি তবে শয়তানের? তাঁর

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্রপূজা', ১৩৬৫, পৃ. ৭২। অপিচ দ্রষ্টব্য 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', ১৩৬৬।

২. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', পৃ. ৩১০

সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ মনীষার ক্ষেত্রে ছিল একে অন্যের পরিপূরক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের প্রভাবে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বৈরাচারের। স্বৈরতন্ত্রের (Despotism) মধ্যে জাতিকে সায়েস্তা করে রাখার দুটি অস্ত্রের কথা বলেছেন—"by the beyonet or by religious delusion"—রামমোহন এ কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন বলেই হিন্দুসমাজের সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়তার আদর্শ স্থাপনে রামমোহনই অগ্রদূত। বলতে পারি রামমোহনের স্বদেশচিন্তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে 'আত্মীয়-সভা'র মধ্যে। তিনি যে-উদ্দেশ্যেই স্থাপন করুন এই সভা যে হিন্দুজাতির নিমিত্ত সর্বপ্রথম একটি মিলনক্ষেত্র সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্‌স্ কর্তৃক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে কেবলমাত্র বিদেশীয়দেরই অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। দেশীয় ব্যক্তিদের এই অভাবের প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বোধকরি সেই কারণেই 'আত্মীয়-সভা'র সূচনা। সভার নামকরণের মধ্যে রামমোহনের গভীর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। সভায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিরা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই তাঁর আপনজন, আত্মীয়, তাই 'আত্মীয়-সভা'র নামাঙ্কিত সভা সার্থকনামা।

রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই উনিশ শতকের প্রারম্ভকালে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে স্বদেশ-চিন্তা জাগ্রত হয়। তদানীন্তনকালে তরুণ, শিক্ষিত বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামমুখর স্বদেশে দাঁড়িয়ে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজনীতির সঙ্গে রাজনীতির পাঠও গ্রহণ করেছিলেন রামমোহনের কাছে।

রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি, তাঁর জাতীয়তাবোধ, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, উচ্চ ও সার্বভৌম। তিনি একদিকে যেমন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (Comparative Theology) জন্মদাতা,[১] অপর দিকে

১. মনিয়ের উইলিয়মস্ এক সময় রামমোহন প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা-জাগরণের প্রথম উদ্যোগী পুরুষ।

মানবপ্রেমের ভিত্তিতেই নিহিত ছিল ব্যক্তি রামমোহনের ভগবৎপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম। বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন পৌত্তলিকতার বিবিধ কুফল বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছেন যে, দেশবাসীদের দুঃখে সমবেদনাই তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থসকল প্রকাশে ও ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হবার কারণ। রামমোহন-চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণগুলি ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন: "ফলতঃ এইরূপ সমস্ত কার্য্য জীবনের পুষ্প-স্বরূপ, আমরা জীবন-পথে এই সকল পুষ্প যত ছড়াইতে ছড়াইতে যাইব ততই সুখলাভ করিব।"[১] ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম তিনি মেনে চলতেন, যার ফলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দ্বিজত্বের চিহ্ন উপবীত তাঁর গলায় ছিল। এ ছিল তাঁর লৌকিক সংস্কারের দিক। রামমোহনের চরিত্রে রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার অপূর্ব সামঞ্জস্য-বিধান ঘটেছিল।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের আরম্ভকালেই এই অসাধারণ মননশীল, উৎসাহী, কর্মী পুরুষের কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ভারতের রূপ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর বহু বিচিত্র কর্মের এক-একটি ধারা এ শতকের এক-একজন মনীষী উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে, সে ধারাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে গেছেন। রামমোহনের পরে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপনির্মাতা তাঁরাই। রামমোহনের ভক্তিভাব পরিস্ফুটনে দেবেন্দ্রনাথ, আদর্শ সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্র সংগঠনে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনের উত্তরাধিকারী অক্ষয়কুমার দত্ত, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যবিধানে কেশবচন্দ্র সেন, সর্বশেষে ধর্মের ভিত্তিতে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের নব্য ভারতের অন্যতম পথিকৃৎ।[২]

---

১. দ্রষ্টব্য: রাজনারায়ণ বসু, "রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র ১৮০২ শক, পৃ. ৯৬

২. রামমোহনের বহুমুখী কর্মচেষ্টার বিবরণ নানা গ্রন্থে আলোচিত এবং পাঠকসমাজে তা সুপরিচিত। বিস্তৃত আলোচনা এখানে বাহুল্য।

আমাদের আলোচ্য পুরুষ রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু। নন্দকিশোরের ব্যক্তিত্ব আলোচনায় রামমোহনের কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। সেই কারণে রামমোহনের জীবন ও চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য নন্দকিশোর-চরিত্রের উৎকর্ষ ও বিকাশের পটভূমিকারূপে উল্লিখিত হল।

নন্দকিশোর বসু বোধকরি তাঁর স্বল্পায়ুর জন্য গুরুর আদর্শায়িত কোনো পথে গভীর ছাপ রেখে যেতে পারেন নি। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সন্তান। রামমোহনের অন্যান্য শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ প্রায় সকলেই সমাজের প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে নন্দকিশোর এঁদের সমগোত্রীয় না হয়েও, রামমোহনের সাহচর্য লাভ থেকে বঞ্চিত হন নি কোনোদিন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্য নন্দকিশোরকে মুগ্ধ করেছিল প্রবলভাবে। তার পরিচয় রয়েছে রাজনারায়ণের "রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" নামক প্রবন্ধে। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাসংযোগে অপূর্ব জীবনচরিত্রের রূপায়ণ উক্ত রচনায়। তাঁর সঙ্গে স্বল্পকালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নন্দকিশোর যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রাজনারায়ণ সেই ঘটনাই পরিবেশন করেছেন সাধারণের কাছে। নন্দকিশোর আজীবন রামমোহনের গুণগুলি স্মরণে রেখেছিলেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন ও কর্মপন্থা পর্যালোচনা করলে রামমোহনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগের কথা জানা যাবে। তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছে এবং সমগ্র জীবনের দিক্ নির্ণীত হয়েছে একাধারে গুরু রামমোহনের আদর্শে ও পিতা রামসুন্দরের চরিত্র-প্রভাবে।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' পিতা ও পিতামহের কথাও বলেছেন। কিভাবে রামসুন্দরের পুত্র নন্দকিশোর, তৎপুত্র রাজনারায়ণ বসু উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষদের গুণগুলি পেয়েছিলেন, 'আত্মচরিতে' তার চমৎকার অনুলেখন পাওয়া যায়। রামসুন্দর বসুরা ছিলেন দুই ভাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামপ্রসাদ বসু ঢাকার কাস্টমের দেওয়ান ছিলেন। কাজেই কার্যানুরোধে তাঁকে প্রবাসেই থাকতে হত। আর রামসুন্দর বসু স্বগ্রাম বোড়ালে বাস করে গৃহকর্ম দেখাশুনা করতেন। তখনকার কালে এইরূপ নিয়মই ছিল।

রামসুন্দর বসু ছিলেন গ্রামের আদর্শ পুরুষ। তাঁর পরোপকারিতা, সেবাপরায়ণতা, দয়াদাক্ষিণ্য ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। তাঁর পরোপকারের মধ্যে আত্মপর ভেদ ছিল না, স্বজন-পরিজন-নির্বিশেষে তিনি উপকার করতে ভালোবাসতেন। দেশের সেবায় ও রোগীর সেবায় তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পেত। মহৎ ছিলেন বলেই তিনি কিছু খেয়ালী ও আত্মভোলা ছিলেন। খেয়ালের বশে তিনি পাগল পুষতেন। রাজনারায়ণ তাঁর 'আত্মচরিতে' পিতামহচরিতের একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই সরল, সাদাসিধে গ্রামের মানুষটির সন্তান নন্দকিশোর বসু। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত যোগ্য সন্তান্। দয়া, প্রেম, সেবাপরায়ণতা, পরোপকারিতা, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি পিতার সব গুণগুলি নিয়েই নন্দকিশোর ছিলেন প্রকৃত মানুষ, যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি দেশ ও জাতির নবজাগরণের ক্রমবিকাশের সূত্রপাত দেখে যেতে পেরেছিলেন। রামসুন্দর বসুর দুই পুত্রের মধ্যে নন্দকিশোর জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ হরিহর বসু।

নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে। তখন দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন বালকমাত্র, আর কিশোর রাধাকান্ত দেব ক্যানিংহাম সাহেবের 'ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি' থেকে ইংরেজীর প্রথম পাঠ শেষ করে রীতিমত সংস্কৃত চর্চা করছেন। ইতিমধ্যে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেরির প্রচেষ্টায় বিদেশাগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখানোর জন্য বাংলা পঠন-পাঠন ও পণ্ডিত-মুনশীদের দ্বারা বাংলা পুস্তক রচনা চলছে। বস্তুত জাতির জীবনে এক বিশেষ দিকের সূচনা হয় এই সময় থেকে।

নন্দকিশোর যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা ছিল এক বিরাট অনিশ্চয়তার যুগ। ইংরেজ শাসন তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেইসময় বড়লাট ছিলেন লর্ড ওয়েলেস্লি। ইংরেজসরকার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত, দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচারী। হোলকার, নিজাম, টিপুসুলতান স্বচ্ছন্দ মনে ইংরেজ শাসন মেনে নেয় নি। দেশে তাই বিলাতী শাসন ও শিক্ষার বনিয়াদ ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি। এমন যুগে জন্ম পরিগ্রহ করেও প্রগতিবাদী হওয়া খুবই বিস্ময়কর। রামমোহনের সংস্পর্শে নন্দকিশোর যুগধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে স্বতন্ত্র পথের পথিক হয়েছিলেন।

নন্দকিশোরের বাল্য-শিক্ষার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি। শুধু এটুকু জানা যায় যে, হেদুয়ার কাছে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের[১] তিনি ছাত্র ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গেই নূতন যুগের বাণী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই শিক্ষা নিয়েই তিনি প্রবেশ করেন কর্মজীবনে।

নন্দকিশোর ইংরেজি ভালেই জানতেন। পিতার ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ এক সময় চাকরির অনুসন্ধান করতে করতে শেষ পর্যন্ত ক্যামেরন (Hon'ble C. H. Cameron)[২] সাহেবের কাছ থেকে হ্যালিডে (Halliday)[৩] সাহেবের নামে একটি অনুরোধ পত্র লিখিয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এই হ্যালিডে সাহেব রাজনারায়ণ বসুর পিতৃপরিচয় জেনে প্রশ্ন করেছিলেন, "That Nanda Kishore who used to write English so well?" তখনকার ইংরেজ মহলে তাঁর এই ভাষাশিল্পে দক্ষতার কথা প্রচলিত ছিল।

নন্দকিশোর রামমোহন রায়ের ইংরেজি স্কুলের ছাত্র ও তাঁর ধর্মব্রতে দীক্ষিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে যেমন তিনি পারদর্শী ছিলেন, তেমনি

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল *The Modern Review* পত্রিকার (Sept, 1951) "Three Pioneer Free Institutions in Calcutta" প্রবন্ধে রামমোহনের 'অ্যাংলো-হিন্দু' স্কুলের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

রামমোহন রায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সমসময়ে কলিকাতার শুঁড়িপাড়ায় একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। মাণিকতলার বাগানবাড়িতে তিনি এর একটি ইংরেজি শ্রেণী খুলেছিলেন। সুবিখ্যাত তারাচাঁদ চক্রবর্তী এখানে ইংরেজি শিক্ষা করেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন গৃহ নির্মাণ হলে স্কুলটি সেখানে উঠে যায়। এই সময় থেকে এটি 'অ্যাংলো-হিন্দু' স্কুল নামে অভিহিত হতে থাকে। বিদ্যালয়ের ব্যয় অধিকাংশই রামমোহন রায় বহন করতেন; দ্বারকানাথ প্রমুখ তাঁর বন্ধুগণেরও দান ছিল। স্যাণ্ডফোর্ট আর্নট, সিনক্লেয়ার, টার্নবুল নামক সে-যুগের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতীগণ এখানে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম ছিলেন এখানকার 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক।

এই 'অ্যাংলো-হিন্দু' স্কুলই পরে পূর্ণ মিত্রের স্কুল নামে পরিচিত হয়।

২. তদানীন্তন সুপ্রীম কাউন্সিলের লেজিসলেটার।

৩. তখনকার বাংলা সেক্রেটারি। পরে বাংলাদেশের লেফটেনান্ট গবর্নরের কাজ করেন।

আরবী, ফারসী ভাষাতেও তাঁর বিলক্ষণ দখল ছিল। সেকালে রামমোহনের সংস্পর্শে এবং বন্ধু আমীর আলী ও মুন্সী উজীর আলীর[১] দৌলতে আরবী ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালির কাছে তখনো আরবী-ফারসীর প্রয়োজনীয়তা কমে নি।

নন্দকিশোর অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি রামমোহন রায়ের সেক্রেটারির পদে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ইংরেজি সংবাদপত্র 'বেঙ্গল হরকরা'-র অফিসে যোগ দেন। তাঁর কর্মজীবন স্থিতিশীল ছিল না। তবে যে কর্মই তিনি গ্রহণ করেছেন, সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সুনাম ছিল অক্ষুণ্ণ। 'হরকরা'[২] অফিসেও তিনি বেশিদিন কাজ করেন নি। অতঃপর প্রবেশ করেন গাজিপুর 'অহিফেন এজেন্সি অফিসে'। জন ট্রটেন সাহেব ছিলেন তখন ওখানকার অহিফেন এজেন্ট। নন্দকিশোরের বয়স তখন মাত্র একুশ বছর। গাজিপুরে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয়। ফলে স্বল্পকাল মধ্যে তিনি এ কর্মও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নন্দকিশোর সেখান থেকে পুনরায় এলেন বাংলা দেশে। এখানে বিভিন্ন অফিসে কাজ করে তিনি ট্রেজারিতে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর এখানকার কর্মও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 'স্পেশাল কমিশন অফিসে' অতঃপর হেড কেরানী-পদ গ্রহণ করেন তিনি। দেবোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য খাস কমিশন গভর্নমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হত। এই খাস কমিশনের পদটি এখনকার রেজিস্ট্রারের পদের তুল্য। জীবনের দীর্ঘকাল— মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নন্দকিশোর উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

নন্দকিশোরের কর্মজীবন ছিল গৌরবময়। এ সম্ভব হয়েছিল তাঁর চরিত্র ও প্রকৃতির গুণে। তাঁর কর্মনৈপুণ্য ও বিদ্যাবত্তার তুলনা ছিল না। নন্দ-

---

১. উজীর আলি কানপুর-নিবাসী মুন্সী। ইনি নন্দকিশোরকে পারসী ভাষায় অনুবাদ-কর্মে সাহায্য করতেন।

২. তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা ছিল 'হরকরা'। 'বেঙ্গল হরকরা'র প্রথম প্রকাশকাল ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ. প্রকাশক ও সম্পাদক চার্লস ম্যাকলিন। 'হরকরা'র নাম পরিবর্তন হয় কয়েকবার। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থসংকটে অনেক এজেন্সি হাউস ক্ষতিগ্রস্ত (কোনো কোনোটি বিলুপ্ত) হলে ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানির কাগজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' দ্বারকানাথ কিনে নেন এবং 'বেঙ্গল বরকরা'র সঙ্গে তাকে যুক্ত করেন (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে)। 'বেঙ্গল হরকরা' 'বেঙ্গল ক্রনিক্‌ল'-এর সঙ্গে একত্র হয়ে 'বেঙ্গল হরকরা অ্যাণ্ড ডেইলি নিউজ'-এর (প্রকাশকাল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) সূচনা।

কিশোরের এই অসামান্য চরিত্রমাধুর্যের কথা স্মরণ করে পুত্র রাজনারায়ণ (আত্মচরিতে) লিখেছেন: "স্মিথ সাহেব আমার পিতা-ঠাকুরকে বড় ভালবাসিতেন।...তিনি স্পেশাল কমিশনার মূর সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।"

অতি অল্প বয়সেই নন্দকিশোর সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেন। মাতা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু পরে লিখেছেন যে, পিতার বিবাহকালে দেখা গেল পাত্রী অত্যন্ত কুরূপা। অথচ পাত্রপক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছিল একটি সুন্দরী পাত্রী। ব্যাপারটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়। পাত্রীর পিতা কন্যা বদল করেছিলেন। হয়তো নন্দকিশোরের জীবনে এর ফল হত বিষময়, কিন্তু গুরু রামমোহনের সদুপদেশে তিনি পরে পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। "বৃক্ষের বাহ্য আকৃতি দ্বারা সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যের বিষয় স্থির করা উচিত হয় না, যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে সেইই সুন্দর বৃক্ষ। যদি এই স্ত্রীর গর্ভে তোমার উত্তম সন্তান জন্মে তাহা হইলে জানিবে যে এই কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।"[১]—প্রিয় শিষ্য নন্দকিশোরকে সেদিন রামমোহন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

রামমোহনের ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন সফল হয়েছিল। নন্দকিশোরের স্ত্রী রাজনারায়ণের মতো পুত্ররত্নের জননী হয়েছিলেন। রাজনারায়ণের মতো স্বদেশপ্রেমিক, ব্রাহ্মধর্মের নিষ্ঠাবান প্রচারক উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিরল। নন্দকিশোর পুত্র রাজনারায়ণের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ দেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু বালক রাজনারায়ণের জীবনে সম্ভাবনার বীজটি তিনি বোধকরি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই কালেই লক্ষ্য করেছিলেন। নন্দকিশোরের মনোভাব তাঁর কয়েকটি কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে। নিজে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' ব্রতে দীক্ষিত হওয়ার পর সব সময়েই গভীরভাবে কামনা করতেন, "যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয় বড় ভাল হয়।"[২] মৃত্যুর পূর্বে শোকাতুরা পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে নন্দকিশোর এক সময় বলেছিলেন:

---

১. রাজনারায়ণ বসু, "রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র ১৮০২ শক, পৃ. ৯৭

২. দ্রষ্টব্য: চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, "ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র ১৮৫০ শক।

'কৃতবিদ্য পুত্র রাজনারায়ণ রহিল।' রাজনারায়ণের মতো আদর্শ পুত্রের উপরই পিতৃকুল ভরসা স্থাপন করতে পারেন। পিতা নন্দকিশোরেরও সুদৃঢ় আস্থা ছিল পুত্র রাজনারায়ণের উপর। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন বসুও তৎকালীন বাঙালি সমাজের সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্র মদনমোহন বসুর নামও উচ্চার্য। নন্দকিশোরের তৃতীয় পুত্রের নাম অভয়চরণ বসু।

নন্দকিশোরের ধর্মবোধ এবং চরিত্রনীতি রামমোহন-প্রভাবিত। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে আজীবন রামমোহনের ধর্মীয় আদর্শের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। রাজনারায়ণ তাঁর 'আত্মচরিতে' পিতার সম্বন্ধে বলেছেন: "তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন যে, 'নন্দকিশোর রামমোহনের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।'[১] ধর্মসূত্রে মহর্ষির সঙ্গেও নন্দকিশোরের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন যখন রংপুরের কর্ম পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন নন্দকিশোর বারো বছরের কিশোর মাত্র। তারপর স্কুলের পাঠ শেষ হলে রামমোহনের অধীনে কর্মগ্রহণ করে কেবলমাত্র তিনি যে তাঁর অধীনস্থ হয়েছিলেন তা নয়, তিনি সর্বতোভাবে রামমোহনের পথ ও পন্থায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চরিত্রে ও কর্মে তাঁকে যেমন দেখেছেন নন্দকিশোর নিজেকে সেইভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রামমোহনের জীবন ও কর্ম তাঁর কাছে ছিল আদর্শ ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ। নন্দকিশোর বয়সে নবীন ছিলেন বলে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সমস্ত কর্মে সাহায্য করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর সমস্ত কর্মের সকল বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে তিনি নিয়মিত পরিচিত হতেন। তাঁর 'আত্মীয়-সভায়'[২]

---

১. Satyendranath Tagore & Indira Debi, *The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore*, 1914, p. 105.

২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of the Brahmo Samaj*, Vol. 1, 2nd. Edn. 1919.

এই প্রসঙ্গে 'আত্মীয়-সভা'র এক অধিবেশনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে যে, উক্ত সভাতে কী কী বিষয়ের আলোচনা হত এবং নন্দকিশোর বসু কী ধরনের আলোচনায়

যোগদান ও 'হরকরা' অফিসের আলোচনায় অংশ গ্রহণের দ্বারা সেই কথাই প্রমাণিত হয়।

নন্দকিশোরের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল গভীর। আরবী, পারসী ভাষায় তাঁর দখল থাকাতে সুফী দার্শনিকতত্ত্ব অনুশীলন করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল। রামমোহনের মতো তিনি হাফেজ, জেলালুদ্দীন, রুমি প্রভৃতি মরমীয়া, সাধক ও কবিদের কবিতা পাঠ করতে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই মরমীয়াবাদের মর্মও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্তর দিয়ে। রামমোহন বেদান্ত ব্যাখ্যার জন্য গ্রহণ করেছিলেন শঙ্করভাষ্য। নন্দকিশোরও ধর্মমত

সঙ্গে পরিচিত হতেন। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল *Calcutta Journal*-এ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে তারিখে।

"At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse ef the several casts with each other and of the restrictions on diet, etc. was freely discussed, and generally admitted the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy— the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands were condemned,— as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters."

এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সংবাদটিও প্রণিধানযোগ্য: "The meetings were not quite public and were attended chiefly by Ram Mohun's personal friends. Among these may be mentioned Dwarkanath Tagore, Brojamohun Mazumdar, Haladar Bose, Nanda Kishore Bose and Rajnarain Sen.— *Indian Mirror* of July. 1, 1865, from a brief sketch by Keshub Chandra Sen, entitled 'Brahmo Samaj', or Theism in India.

কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথের জীবনী গ্রন্থে বলেছেন: "'হরকরা' আপিসে ছিল এক বিরাট গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারে দ্বারকানাথ মাঝে মাঝ তাঁর বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স্‌ এবং রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিলিত হতেন।" —কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর,' দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ -অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৪৬

নন্দকিশোরের প্রসঙ্গ এখানে উল্লিখিত না হলেও, আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, 'হরকরা' অফিসের উক্ত গ্রন্থাগারে রামমোহনের একান্ত অনুরাগী শিষ্য নন্দকিশোরও উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনাদি শ্রবণ করতেন: এবং কোনো-না-কোনো কর্মে যোগদান করেও বা থাকবেন। 'হরকরা' অফিসে চাকরি করতেন বলে নন্দকিশোরের পক্ষে এঁদের সঙ্গে এখানে মিলিত হওয়ার সুযোগও ছিল।

স্থাপনে বেদান্তসূত্র ও উপনিষদাদির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় মতবাদগঠনে সুফীধর্মের প্রভাব প্রথমেই স্বীকার করতে হয়। শঙ্কর-ভাষ্য পাঠে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, জগৎ স্বপ্নবৎ, নির্বাণ মুক্তি— এই মতে আস্থাশীল ছিলেন তিনি। কিন্তু শঙ্কর যেমন পারমার্থিক দিক থেকে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করে ব্যাবহারিক দিকে— দ্বৈতবাদের সমর্থন করেছেন, নন্দকিশোর অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেও ধর্মমতে শেষ পর্যন্ত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছেন। এক ব্রহ্ম সর্ববস্তুতে বিদ্যমান এবং সর্ব-বস্তুর সত্তা ব্রহ্মসত্তায় বিধৃত— এই ছিল তাঁর দার্শনিক অভিমত। এইভাবে ধর্মীয় মতবাদ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর উপলব্ধ সত্যের যে পরিচয় পাই, তা হল বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী এক। জগতের নিয়ন্তা একমাত্র পরম ব্রহ্ম সত্য, তিনি নিরাকার। মানুষের প্রতি প্রেম, দয়া-দাক্ষিণ্যই প্রকৃত ধর্ম। নন্দকিশোরের ধর্মীয় আদর্শ ছিল এমনই উদার ও বিস্তৃত। শাস্ত্রজ্ঞানকে তিনি চিত্তবৃত্তির উৎক্ষেপ, জগৎ ও জীবনের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করতেন না। তাই নিরন্তর তাঁর চেষ্টা ছিল অন্তরের সঙ্গে বাহ্যিক ধর্মের মিলন ঘটানোর, আত্মিক জগতের সঙ্গে ব্যাবহারিক জগতের সামঞ্জস্যবিধান করা। এই ছিল তাঁর বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ। মানবতার মহৎ প্রেরণার ভিত্তিতে তা সুগঠিত হয়েছিল। এই আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে রাজনারায়ণের কথায়: "আনন্দবাবু[১] নিজের ধর্মমত Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিতেন আর ভাবে গদগদ হইতেন।"[২]— এই সত্যোপলব্ধি রামমোহন থেকে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যেও অনুক্রমিত হয়েছিল। হিন্দু, সাকারবাদী বহুদেবতা-উপাসক নন্দকিশোর শেষ পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মবাদে গভীর অনুরাগবশত রামমোহন-প্রবর্তিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম (হিন্দু একেশ্বরবাদ) গ্রহণে মনস্থির করেন। রাজনারায়ণ পিতার ধর্মমত প্রসঙ্গে লিখেছেন (আত্মচরিতে):

---

১. রাজনারায়ণ তাঁর 'গ্রাম্য-উপাখ্যান' পুস্তকে পিতার নাম নন্দকিশোরের স্থলে করেছেন আনন্দকিশোর। তিনি তাঁর নিজের নামও পরিবর্তন করে রামনারায়ণ করেছেন। এর অন্য কোনো কারণ নেই। জীবনকথা বা স্মৃতিকথা রচনায় এটি সাহিত্যিকের এক বিশেষ রীতি বা টেকনিক।

২. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ৬৯

"ইনি বেদান্তধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন।—রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যেরা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন।"

রামমোহনের একান্ত অভিপ্রায় ছিল যে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রচার আত্মীয়-সভার মাধ্যমে হোক। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সভার পূর্ব-নির্ধারিত কাজে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং তাঁর আদর্শেরও বিচ্যুতি ঘটে।[১] শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্ম ক্রমে পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

১৭৬৫ শকাব্দের (১৮৪৩ খ্রী) ৭ই পৌষ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রথম গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আরো ২১ জন। এর এক বছর পরে ১৭৬৬ শকাব্দে (১৮৪৪ খ্রী) নন্দকিশোর বসু উক্ত ধর্মব্রতে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয় দলের অন্যতম হলেন নন্দকিশোর।[২] তাঁর দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে

---

১. দ্রষ্টব্য: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ. ১৫-১৬

২. নন্দকিশোর বসুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সংবাদ তৎকালীন আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৬৯ শক (১৮৪৭ খ্রী), ১ম ভাগের একটি সংবাদ এই মর্মে উল্লেখযোগ্য। নন্দকিশোর প্রতিজ্ঞাপত্রে যে স্বাক্ষর করেছিলেন, তা থেকে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞায় "আমি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম" —এই বাক্য ছিল।

রাজনারায়ণ 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ' সম্বন্ধে কোনো-এক সাহেবকে একবার একটি পত্র লিখেছিলেন ইংরেজিতে। তারই বাংলা মর্মানুবাদ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত' নাম দিয়ে 'দাসী' পত্রিকায় (নভেম্বর, ১৮৯৫ খ্রী) প্রকাশিত হয়। উক্ত রচনাতে মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "চন্দ্রশেখর দেব এবং আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের আদিম শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন।"

"ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা" প্রবন্ধে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "মহর্ষি ১৭৬৫ শকের ৭ই মাঘ বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু যিনি রাজা রামমোহনের জনৈক প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র ১৮০০ শকাব্দ।

এই মর্মে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাব্দ) প্রকাশিত আর-একটি সংবাদ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "সায়াহ্নকালে আত্মীয় সভাতে বেদ পাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত কিন্তু বেদ ব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ

দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" উক্ত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে (১২ চৈত্র ১৭৬৬ শকাব্দ) নন্দকিশোর বসুও প্রতিজ্ঞাপত্রে[১] নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মতগুলি হল এই— চতুর্থ প্রতিজ্ঞার শেষে লিখেছিলেন, 'কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশ বার জপ না করিতে পারি, জপ যে বক্রী থাকিবে, তাহা সম্পূর্ণ করিব।' আবার দশম প্রতিজ্ঞার পরে লিখেছিলেন, 'এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিব।'[২] নন্দকিশোরের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে এখানে।

নন্দকিশোর প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু, চিরাচরিত পৌত্তলিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে বর্জন করতে পারলেন না। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ধর্মের আত্মিক ও ব্যাবহারিক দিকের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন তিনি। পৌত্তলিকতার নিয়মানুযায়ী পূজা-আহ্নিকের সময়ে কোষাকুষি নিতেন, আবার নাম-জপের মালাও তাঁর ছিল। "…একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির বাটীতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন।"[৩] সাকার ও নিরাকারদের মধ্যে এই যে সমন্বয় প্রচেষ্টা —এই প্রচেষ্টাগুণ নন্দকিশোরের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল রামমোহনের সমন্বয়বাদের আদর্শানুসারেই। তাই "…প্রাথমিক ব্রাহ্মরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"[৪] প্রাথমিক ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে তদুপরি পিতা নন্দকিশোর প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের এই অভিমত অবশ্যস্বীকার্য। নন্দকিশোর মনে করতেন যে, ধর্মমতে

করিতেন ও গোবিন্দমালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু, এবং মদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা রূপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন।"

১. দ্রষ্টব্য: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (১৩৬৮) পরিশিষ্ট, পৃ. ৩২৪

২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা প্রবর্ত্তন", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ ১৮৩৭ শক, পৃ. ১৬৬

৩. রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', (১৯৬১), পৃ. ৬

৪. তদেব

যে যাই হোক-না-কেন, লৌকিকাচার সব সময় অতি অবশ্যই পালন করা উচিত; এবং তাঁর এই আদর্শই ছিল— লৌকিকাচার 'মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ'। বলা বাহুল্য যে, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসও লৌকিকাচার পালন করা ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতেন। যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ লালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় সেই সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করা, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এই নিয়মই চলে আসছে। নন্দকিশোরের মনের দ্বৈতভাবের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের অপৌত্তলিক অথচ হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

এই ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ ও নন্দকিশোরের প্রতি হিন্দু সমাজ একসময় বাক্যবাণও নিক্ষেপ করেছিল। সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজ তাঁদের প্রতি 'স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক' শব্দ পর্যন্ত প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি।[১] কিন্তু তবুও এঁরা সমাজের ভয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যান নি। নন্দকিশোর একান্তভাবে ছিলেন সমাজানুগত ব্যক্তি, বিপ্লবাত্মক মনোভাব তাঁর ছিল না। বাংলাদেশে নবজাগরণ যুগের সর্বপ্রকার বিদ্রোহাত্মক ঘটনার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, প্রাচীনপন্থীর সঙ্গে নবীনপন্থীর মসীযুদ্ধ, ডিরোজিওর ছাত্রদের প্রগতিবাদী মনোভাবের সঙ্গে বিদ্রোহ ভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি নিজ জীবনেও ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন একাধিকবার। ইংরেজী ভাষায় নিপুণতার জন্য তিনি ইংরেজদের সমাদর লাভ করেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক উগ্রতা তাঁর জীবনে কখনো কোনো বিষয়ে দেখা যায় নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে শিক্ষার পরিবেশ ও রামমোহনের প্রভাব— উভয় বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। রামমোহন বাইবেল পড়েও খ্রীস্টান হন নি, কোরান পড়েও তিনি 'একেশ্বরবাদী' হিন্দুই ছিলেন।

স্বধর্ম পরিত্যাগ করে নূতন একটি ধর্ম গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রাথমিক অবস্থায় নবধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাই সংশয় ও দ্বিধা স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রয়েছে এর একাধিক নজীর। নন্দকিশোর ধর্মবিশ্বাসে অত্যন্ত অকপট ছিলেন। রামমোহনের

১. দ্রষ্টব্য : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আশ্বিন ১৭৬৯ শকাব্দ, পৃ. ৮৯-৯০

শিষ্যবর্গের[১] অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, আবার অনেকে প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করলেও কার্যত বিরুদ্ধতা করতেন। রাজা রামমোহনের একদা অন্তরঙ্গ জয়কৃষ্ণ সিংহ প্রচার করেছিলেন যে, আত্মীয় সভায় গোহত্যা হয়। আত্মীয় সভার অন্যতম নির্বাহক বৈকুণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপনে হরিমোহন ঠাকুরের বৈষ্ণবসভায় যোগ দিতেন। নন্দকিশোর এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কখনো এমন কপটাচার করেন নি। বিদ্যাবাগীশ তবু সমাজ-ভয়ে সহমরণ-প্রথা রহিতের বিরোধী আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন।[২] নন্দকিশোর কিন্তু নির্ভীকভাবেই ধর্মনিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন।

সংসারজীবনে নন্দকিশোরের সততা ন্যায়পরায়ণতা ও মহত্ত্বের তুলনা ছিল না। "পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন।"— রাজনারায়ণ পিতার স্মৃতি স্মরণ করে যে মন্তব্যটি করেছেন, তার দ্বারা তাঁর চরিত্রে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত হয়। সেই আলোকে যে মানুষটি উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, দেখা যায় তিনি জীবনব্যাপী সমগ্র বিষয়েই মেকীর অনাদর করে গেছেন। রাজনারায়ণ তাঁর জীবনের মাত্র উনিশ বছর পিতার সংস্পর্শে ছিলেন। এই স্বল্পকালেই পিতার চরিত্রের যে মহৎ গুণগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে এসেছিল তার সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়ে গেছেন 'আত্মচরিতে'। এক সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দকিশোর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "তাঁহার সঙ্গে আলাপে, ও তাঁহার ধর্ম্মভাব নম্রভাব দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছিলাম।"[৩] নন্দকিশোর 'স্পেশাল কমিশন' অফিসে যে কর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার দ্বারা তিনি যথেষ্ট ধনী, প্রতিপত্তিশালী হতে পারতেন, কিন্তু জীবনের এই দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। দেবোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে বহু লোক আসতেন এবং উৎকোচ প্রদান করেও নিজেদের বিপন্মুক্ত করতে চাইতেন। অনেকের পক্ষেই এই প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত

---

১. শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন— গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা পীতাম্বরচন্দ্র মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

২. দ্রষ্টব্য: 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আশ্বিন ১৭৬৯ শকাব্দ, পৃ, ৮৯-৯২

৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-কর্তৃক সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৬৮

রাখা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু নন্দকিশোর আপন চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমস্ত আবিলতার ঊর্ধ্বে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্পেশাল কমিশন অফিসে তাঁর বেতন ছিল ১৬০ টাকা, আর দেওয়ানী আদালতের লোকের কাগজপত্র তর্জমা করে রোজগার করতেন ৪০ টাকা। সর্বসাকুল্যে ২০০ টাকা হলেও স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থের মতো দিন-যাপন করতেন তিনি। তৎকালীন অর্থমূল্যে দুশো টাকা নিতান্ত কম টাকা ছিল না। কাজেই তাঁর আয়ের একটি বিশিষ্ট অংশ পরোপকারে ব্যয় করতে কোনো অসুবিধা হয় নি। তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী, আয় বুঝে ব্যয় করতেন, বিলাসিতা সকল সময় পরিহার করে চলতেন। "তাঁহাকে বড়মানুষী করিতে কেহ দেখে নাই।" কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তাঁর সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল না, তা তাঁর অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উৎকট সামাজিক বিধিবিধানের কালে বাস করেও নন্দকিশোর ছিলেন সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতিকে অর্থহীন মনে করতেন। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি করা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এ থেকেই অনুমান করতে পারি না যে, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। আত্মার তৃপ্তি বিধানই যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের লক্ষ্য হয়, তা হলে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মোপাসনার দ্বারাই সহজে সুনিশ্চিতভাবে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধান হতে পারে। এমত অবস্থায় পিণ্ডদানাদি বাহ্যানুষ্ঠান নিতান্তই অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়। নন্দকিশোরের এই-জাতীয় মনোভাব পুত্র রাজনারায়ণের মধ্যেও অনুক্রমিত হয়েছিল।

নন্দকিশোর জাতিবিচার করতেন না। তাঁর একাধিক মুসলমান বন্ধু ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমত মেলামেশা ছিল এবং 'যবনস্পৃষ্ট' আহারও চলত। এ-সব বিষয়ে তিনি রামমোহনের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করেছিলেন। কোনো রকম গোঁড়ামি তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাঁর গৃহে সবরকম খানাই চলত।

নন্দকিশোর সংগীতানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বোড়াল গ্রামে থাকাকালে তিনি নিয়মিত সংগীত, কথকতা প্রভৃতি শুনতেন। গ্রামে ছিল এক সংগীত-শাস্ত্রবিদ— নাম ভরতমালী। বসু-বংশীয় সকলের কাছে 'মালীপো' বলে সুপরিচিত ছিলেন তিনি। গ্রামের লোকে বলত মালীদাদা। তিনি

নন্দকিশোরের সংগীত-পিপাসা নিবারণ করতেন। মালীপো বিশেষ করে রামমোহনের গান শোনাতেন—'ভুলনা ভুলনা মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে।' আর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিষদ শ্রীপতি ঠাকুর কথক, তিনি তানপুরা বাজিয়ে ঠাকুর ও ঠাকুরানী -বিষয়ক গান শোনাতেন।

নন্দকিশোরের চারিত্রিক উৎকর্ষ অতুলনীয়। তিনি ছিলেন স্নেহশীল, আদর্শ পিতা। ব্রহ্মবাদী হয়েও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান যেমন তিনি পালন করতেন, তেমনি পানাভ্যাসের মধ্যেও কোনোরূপ দোষ দেখতেন না। এই অভ্যাস তাঁর নিজেরও ছিল। তবে রামমোহনের মতো তিনিও পরিমিত পান পছন্দ করতেন। অথচ অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অল্প বয়সেই পুত্র রাজনারায়ণের শরীর ভেঙে যায় এবং তিনি প্রায় ছয়মাস শয্যাগত থাকেন। স্নেহান্ধ পিতার হৃদয় পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীত, ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাঁর এই সময়কার বিচলিত মনের ভাব তিনি হাফেজের একটি মেস্‌রার[১] দ্বারা সব সময় প্রকাশ করতেন। পুত্র সুস্থ হলে তিনি তাকে পরিমিতপায়ী করার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর পানের উপকরণ পোলাও, কালিয়া, আসত বন্ধু মুনশী আমীর আলীর[২] বাড়ি থেকে। নন্দকিশোর পুত্রকে নিয়ে পানে বসে বলতেন: "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না।" বলা বাহুল্য, এর জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে কোনো অন্তরাল বা সংকোচ ছিল না। পর্বতশিখরের মতো এইরূপ উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল নন্দকিশোরের মনের। পুত্র রাজনারায়ণকে লিখিত পত্রগুলির মধ্যেও তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত রাজনারায়ণ রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে বায়ু-পরিবর্তনে গেলে[৩] নন্দকিশোর পুত্রকে যে পত্রগুলি লিখেছিলেন, তার বিভিন্ন

---

১. 'মেসেরা'—অর্থ পঙ্‌ক্তি।

পঙ্‌ক্তিটি হল এই—"হমচূ বেদ লর্জানও"— এর অর্থ, আমার চিত্ত বেতবৃক্ষের মতো কম্পিত হচ্ছে। প্রিয়তম কখন্ চলে যাবে এই আশঙ্কায়।

২. রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' মুনশী আমীর আলীর পরিচয় দিয়েছেন।

৩. এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সময়ের কথা রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন যে, সময়টা ছিল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। অথচ কলকাতা থেকে যাত্রার পূর্বে লেখা দুটি পত্রে সময়ের উল্লেখ

অংশে পরিস্ফুট হয়েছে পিতার স্নেহকাতর, কর্তব্যপরায়ণ, উদার মনের পরিচয়। তিনি পুত্রের দুঃসাহসিক অভিযানে চিন্তিত হয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উল্লিখিত পত্রগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

"I trembled when I read your last letter. "Adventures", "troubles" "difficulties" but as you say afterwards that they were not disasterous,— my mind was pacified."

"If you do not read the newspaper it will be piece of news to you that with reference to the resolution of Govt. of the 10th. October a public notice had been issued inviting all the Governors and propritors of schools public or private to furnish details regarding the situation of the institution."— Calcutta. 7th Nov. 1844.

অপর একটি পত্রে লিখেছেন :—

"If you come up on Sunday you must make your preparations and take care to bring wirh you your dispensary baggage and all that you might feel inconvenience here. The guddee and purdah must be brought up with you."— Thursday, 13th Nov. 1844.

নন্দকিশোর তাঁর জীবনকালেই ব্রাহ্ম ধর্মের পরবর্তী রূপ ও সমাজের উন্নতিবিধান দেখেছিলেন। রামমোহনের ব্রহ্মসভার পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩৯

আছে ১০ অক্টোবর, ১৮৪৩ ও ১৫ অক্টোবর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ; এবং পরে নন্দকিশোর বসু চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তারিখ আছে—৭ নভেম্বর ১৮৪৪। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিঠিগুলির প্রত্যেকটির সাল তারিখের মিল আছে। চিঠির তারিখ অনুযায়ীই কাল নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত। 'আত্মচরিতে' উল্লিখিত সময় সঠিক বলে ধরা যায় না। কারণ বৃদ্ধবয়সে রচিত 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণের বিবর্ণ স্মৃতির দরুন সাল-তারিখের ভুল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ— রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের নানারূপ সংগঠনকর্মে এইকালে ব্যস্ত। নন্দকিশোর এইসময় (১৮৪৩-১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ) ব্রাহ্মসমাজের কর্মে কতখানি জড়িত ছিলেন তা জানা যায় না। তবে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন তা জানা যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে লিখিত একটি পত্র থেকে।[১]

নন্দকিশোরের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। তিনি ছিলেন রুগ্‌ণ মানুষ। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বোড়াল গ্রামেই মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুত্র রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হোন। অথচ এই একইকালে দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানুরক্তি লক্ষ্য করে দ্বারকানাথ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হন। সমাজ-মনে তখনো এইভাবে চলেছে সংস্কারের দোটানা ভাব। তাই হিন্দু হয়েও মৃত্যুকালে পুত্র-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদে তাঁর গভীর অনুরক্তির কথা, সংস্কারমুক্ত মনের কথা দৃঢ়চিত্তে ব্যক্ত করেছিলেন নন্দকিশোর। জীবনের সায়াহ্নকালে নন্দকিশোর সত্য স্বীকারের দ্বারা দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করেছেন আত্মদ্বন্দ্ব থেকে। মহৎ ব্যক্তির এই উপযুক্ত কর্ম। নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করলেন, শুধু তাই নয়, ধর্মক্ষেত্রে তিনি যে সমন্বয়মার্গের পক্ষপাতী ছিলেন তা মৃত্যুকালে বুঝিয়ে গেলেন। প্রাচীন প্রথানুযায়ী মুমূর্ষু নন্দকিশোরকে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বোড়াল গ্রামের আদিগঙ্গার ঘাটে।

---

১. পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু

শ্রীহরি

শ্রীচরণাম্বুজেষু

পূর্ব্বকথা প্রমাণ ব্রাহ্মসভায় স্বাক্ষর ১৬ ষোল টাকা এবং মহাশয়কে প্রণামী ৪ চারি টঙ্কা একুনে বিশ টাকা শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস বাবাজীর হস্তে পাঠাই পৌছিবেক।

২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫

শ্রীনন্দকিশোর বসু—মেঃ সিমলা।

প্রণব জপ করতে করতে সেখানে তাঁর দেহান্ত হয়। শেষে দেখা গেল দুই হাতে আঙুলের অবস্থান নাম-জপের অনুরূপ। হিন্দুর ব্যাবহারিক আচার-অনুষ্ঠান তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ যে কোনোদিন রোধ করতে পারে নি তা এই থেকেই বোঝা যায়।

জন্ম ও বংশবৃত্তান্ত

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর (২৩ ভাদ্র, ১৭৪৮ শকাব্দ) নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম হয়েছিল চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে। সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের চাপড়া ষষ্ঠী। হিন্দুদের কাছে এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য আছে। হিন্দুসংস্কার অনুযায়ী দেবী ষষ্ঠীর বরেই সার্থক জন্ম হয়। তাই হিন্দুমাত্রই এই দিনগুলির কথা স্মরণ রাখেন। নন্দকিশোর বসুর পিতা, পিতামহ হিন্দু ছিলেন। নন্দকিশোর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মাত্র ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। চাপড়া ষষ্ঠীর দিনে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মকে পরিবারবর্গ সেদিন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণই মনে করেছিলেন। সংস্কারের কথা ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও দেখা যায় যে, বাংলা-দেশের এক ঐতিহাসিক শুভক্ষণে রাজনারায়ণের জন্ম। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে, এমন-কি, সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উন্মুখতা। জাতির জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে স্বল্পকালের ব্যবধানে নব্য-বাংলার ভবিষ্যৎ দিক্‌পালদের জন্ম হয়েছিল। রাজনারায়ণ সেই গোষ্ঠীরই একজন।

সমাজ-জীবনে দীর্ঘকাল সঞ্চিত ছিল মানসিক জড়তা, অজ্ঞতা, নৈতিক কালিমা— এগুলি সৃষ্টি করেছিল একটি অচলায়তনের। ক্রমে তা অপসারণের প্রচেষ্টা চলে এ-কালে। কলকাতা তখন শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রধানতম কেন্দ্র, এ-কেন্দ্রের কেন্দ্রমণি রামমোহন— সংস্কারকের খড়্গ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক দেশ-কালের (রাজনারায়ণের জন্মকালীন) কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ অগাস্টের 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি[১] থেকে এদেশীয়

---

১. "শ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট…অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যেং বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় তিন জন ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্দেশীর লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারদের প্রশংসা করিলেন ঐ ভাগ্যবান লোকেরদের নাম শ্রীশ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০, শ্রীযুতবাবু নরসিংহ চন্দ্র রায় ৪৬০০০ ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু

ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগের বিষয় জানা যায়। ঐ একই বছরের ১ মে তারিখে রাজনারায়ণের জন্মের মাত্র চার মাস পূর্বে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুলসহ) নবনির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আবার ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ অগাস্ট সোমবার-এর খবর হল, কলকাতার গড়েতে একটি নূতন ও অতি সুন্দর 'গীর্জাঘর' প্রস্তুত হয়েছে, এত সুন্দর গীর্জাঘর ইতিপূর্বে ছিল না। এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অর্থাৎ কৃষিবিদ্যাবিষয়ক সমাজের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত একটি তণ্ডুল-নিষ্পাদক যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল এক সাহেব (ডেভিড স্কার্ট) কর্তৃক এদেশে প্রেরিত হয়েছে। ঢেঁকিতে চাল প্রস্তুত করা অপেক্ষা, এই যন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রম লাঘব হয়— দেখে শহরবাসী বিস্মিত। সমাজের সাধারণের দৃষ্টি এইভাবে একালে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নিবদ্ধ ; আবার ধীরে ধীরে শিক্ষারও প্রসার হচ্ছে ; অন্য দিকে জাতির জীবনে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সভ্যতা ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হওয়ার সুযোগ সন্ধান করা চলেছে।

বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে দেশকালের দ্রুত-গতিতে পট-পরিবর্তন হয়ে চলেছে। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পর থেকে বারো বছরের (১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) মধ্যে দেশ ও জাতির উন্নয়নমূলক সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানাদি গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হল ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রভৃতি। এ ছাড়া 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হয়ে আবার বিলুপ্ত হয়েছে। এদিকে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হল রামমোহনের দুটি পুস্তক— 'ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহস্থের লক্ষণ' ও 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার'। এর দ্বারা সমাজমনের গতিবিধি পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করবার মতো। এ খ্রীস্টাব্দেরই ১৫ জুলাই 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত সংবাদটিও উল্লেখযোগ্য।[১] বাংলাভাষায় আত্মপ্রকাশের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিলে

১০০০০ সর্বসুদ্ধ ১০৬০০০ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড. ৩য় সংস্করণ, পৃ ৩৯

১. ১৮২৬-এর ১৫ জুলাই, ১ শ্রাবণ ১২৩৩ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত সংবাদ : "বাঙ্গলা হরকরা নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্য দ্বারা সর্ব্বত্র ধন্যহ

ভাষার বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন অনুভূত হল। সময়টা ছিল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকাল। এ-কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ। সারা ভারত বিপর্যস্ত এই যুদ্ধে।[২] ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সরকারের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন বাংলাদেশের এক-একটি অঞ্চলে ভাবী বাংলার সংগঠকরা জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে উত্তরকালের উপযোগী হয়ে উঠছেন। রাজনারায়ণের বয়স যখন মাত্র এক বছর, তখন নয়বছরের দেবেন্দ্রনাথ সবেমাত্র 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে' ভর্তি হলেন। আর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ছ'বছরের শিশু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন পাততাড়ি নিয়ে গ্রামের মেটে রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাচ্ছেন পাঠশালায়। ছয়বছরের শিশু অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রামের বাড়িতে গুরুমশায়ের কাছে বোধকরি অক্ষর-পরিচয় শুরু করলেন এই বছরেই। আর যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে মায়ের কাছে বসে সম্ভবত তখন থেকেই রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী শুনছেন দুইবছরের শিশু মধুসূদন। রাজনারায়ণের সহপাঠী ও সুহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো ছিলেন, তাঁর জন্ম ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দশকে এই-সমস্ত মনীষীকল্প ব্যক্তির আবির্ভাব দেশ ও জাতির উত্তরকালের বহুবিধ কল্যাণ-কর্মের শুভ সূচনা ঘোষণা করে।

পিতামাতার প্রথম সন্তান রাজনারায়ণ। তাঁর শৈশবের সাতটি বছর কাটে বোড়াল গ্রামের পারিবারিক গণ্ডীতে। বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শৈশবেই তাঁর চরিত্রে অনুক্রমিত হয়েছিল।

রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি সংপ্রতি বাঙ্গালা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কাণুতর্কদ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ, ৮৫

২. Mill's *History of British India*, H. H. Wilson, Ed., Vol. ix, (1885-1935).

বসু-বংশের পুরুষোত্তম রাজনারায়ণ। উক্ত বংশের পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল পুরনো কলকাতার গড়গোবিন্দপুর অঞ্চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোড়াল গ্রামের বসু-বংশীয়দের ঐ অঞ্চলে প্রথম আগমন। ইংরেজ জাতি দুর্গ নির্মাণের জন্য ডিহি কলকাতা, সুতানুটি সমেত গোবিন্দপুর গ্রাম অধিকার করেছিল। এই কারণেই বসু-বংশীয়দের এখানকার বাস তুলে দিতে হয়। এখানকার বাস্তুভিটা প্রথম পরিত্যাগ করেন শুকদেব বসুর পিতৃব্য আত্মারাম বসু। গড়গোবিন্দপুর অঞ্চলে কেল্লা নির্মাণের বন্দোবস্ত পাকা হলে ইংরাজদের কাছ থেকে এঁরা বোড়াল গ্রামের জমি 'এওজিস্বরূপ' লাভ করেছিলেন। উক্ত গ্রামে বসবাসের নিমিত্ত বসু-বংশীয়রা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসেন। প্রায় এক শতাব্দীকালে বোড়াল গ্রামে বাস করার পর এঁরা ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানে ঐ গ্রামে বসু-বংশীয়দের ভিটার চিহ্নমাত্র নেই; জনসাধারণের একান্ত আগ্রহে সেই স্থানে একটি পাঠাগার ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

রাজনারায়ণের প্রপিতামহ শুকদেব বসু। রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু শুকদেব বসুর দুই পুত্র; ভাগ্যবান রামসুন্দরের পুত্র নন্দকিশোর বসু-বংশের প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম।

চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রাম কলকাতা থেকে মাত্র দশ-বারো মাইল দূরে অবস্থিত। এক সময় গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল।[১] কিন্তু রাজনারায়ণের জন্মকালে বোড়াল গ্রামের পূর্বেকার সে শোভা, সৌন্দর্য ছিল

---

১. শ্রীবিনয় ঘোষ-লিখিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বোড়াল গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে এই বিবরণটুকু পাওয়া যায় :—"গঙ্গার লুপ্ত খাতের ধারে বোড়ালের পথে প্রাচীন দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট আজও বনাকীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। দীঘি ও পুষ্করিণী পুনরুদ্ধারকালে বোড়ালে কয়েকটি পাথরের মূর্তিও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিষ্ণুমূর্তি। মূর্তির স্থূলত্ব দেখে মনে হয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর (সেন আমলের) মূর্তির চেয়ে প্রাচীন। পালযুগেরও হতে পারে। বোড়ালের সুবৃহৎ সেনদীঘি (প্রায় ৪২ বিঘা জুড়ে), বোড়াল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের তাম্রশাসনলিপি এবং মৃত্তিকা-গর্ভোত্থিত অন্যান্য নিদর্শন থেকে মনে হয়, সেন আমলে গ্রামে একটি বর্ধিষ্ণু সভ্যতা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

"বোড়ালের গ্রাম্য দেব-দেবীদের মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্বপ্রধান। ধাতুময়ী মূর্তির পাদপীঠে পাষাণদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও রুদ্রের মূর্তি উৎকীর্ণ। তার উপর শিব শবরূপে শয়ান এবং শিবের নাভিপদ্মস্থিত পদ্মের উপর চতুর্ভুজা ত্রিনয়না ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি অধিষ্ঠিত।

না। পূর্বেকার মতো গ্রামে সম্পন্ন ব্যক্তি ও সমৃদ্ধিশালী লোকের বসতিও ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বোড়াল গ্রামের বসু-বংশীয় পুরুষদের নামকরণের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির আতিশয্য। অনেকেরই নামের শেষ শব্দ নারায়ণ' বা রাম, আবার প্রথম শব্দেও 'রাম'। যেমন, রামেশ্বর, রাজারাম, আত্মারাম, রামকিশোর, রামপ্রসাদ, রামসুন্দর, দুর্গানারায়ণ প্রভৃতি। তবে প্রাচীন কালের সমাজে এ একটা রীতি ছিল যে, সমাজস্থ ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ দেব-দেবীর (যে দেব-দেবীর তাঁরা ভক্ত হন) নামানুসারে পুত্র-কন্যাদের নামকরণ করতেন। তবে তাঁদের কৃষ্ণভক্তির কথা জোর করে কিছু বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ-লিখিত ডায়ারির অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল : "৯ ভাদ্র ২৪ অগাষ্ট (১২৯৫ সাল, ১৮৮৮ খৃঃ)...বৈকালে কথোপকথনের সময় গৌরদাস[১] বলেন চৈতন্যমতাবলম্বী নয়, কেবল বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, অনেক বঙ্গদেশে আছে। আমার পিতৃ-পুরুষেরা গোঁসাইএর শিষ্য নহে, ভট্টাচার্য্যের শিষ্য...অর্থাৎ ঐরূপ বিষ্ণুভক্ত।" রাজনারায়ণের এই মন্তব্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, বোড়াল গ্রামের মাঝেরপাড়ার বসু-বংশীয়রা এক সময় বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।[২] বংশের নামকরণের মধ্যে সেই বিষ্ণুভক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজনারায়ণের নামকরণও বংশের ধারানুসারেই হয়েছিল।

---

১. গৌরদাস বসাক— মধুসূদন দত্তের অন্যতম সুহৃদ। ১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সাঁওতাল পরগনার মধুপুরে বাস করছিলেন। ইনি ঐ সময় রাজনারায়ণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করতে দেওঘরে আসতেন। গৌরদাস বসাকের উক্তি (ডায়ারির অংশ) থেকে বঙ্গদেশব্যাপী বিষ্ণু-আরাধনার কথা জানা যায়। আবার এই প্রসঙ্গেই বলি যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' যে সন্তানসম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়েছেন, তাঁরা চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী নন। তাঁরা কৃষ্ণভক্ত নন, বিষ্ণুর উপাসক : ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ভাষায় বিষ্ণু "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধু-মুর-নরক-মর্দন, লোকপালন...।"— ('আনন্দমঠ', তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য যে, দেশ-প্রচলিত ধর্মকেই ঔপন্যাসিক তাঁর রচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বসু-বংশীয়দের বিষ্ণু-উপাসনার কাল ও বঙ্কিম-উপন্যাসের রচনাকাল— এই দুইয়ের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও উক্ত বংশের বিষ্ণুভক্তির কথা স্বীকার করা যায় : যেহেতু ঔপন্যাসিকরা একদিক থেকে ত্রিকালদর্শী।

২. বোড়াল গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে এক সময় বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর মূর্তি পর্যন্ত পুজো করতেন। উক্ত গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে বিষ্ণুর মূর্তিও পাওয়া গেছে। দ্রষ্টব্য : শ্রীবিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'।

রাজনারায়ণের পিতৃকুলের সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত অবস্থার সাধারণ মানুষ। এঁদের জীবনযাত্রায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের পরিতৃপ্তি ও সুখটুকু ছিল। উচ্চশিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ এঁদের জীবনে না থাকলেও, সকলেই ছিলেন সুরুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, অথচ সরল গ্রাম্য মানুষ। প্রপিতামহ থেকে আরম্ভ করে পিতামহ, পিতা, পিতৃব্য পর্যন্ত সকলেরই ঈশ্বরে ভক্তি, বিশ্বাস ও দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা ছিল অকুণ্ঠ। গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে সরল জীবনযাত্রায় বাহুল্য কোনোদিন ছিল না; তবে পোশাক-পরিচ্ছদে কখনো কখনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। বড়ো ঠাকুরদাদার (রামপ্রসাদ বসু) প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখেছেন: "সেকালে মুসলমান রীতিনীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা ভালবাসিতেন। বড়ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন।" যুগের হাওয়ায় অধিকাংশ মানুষই প্রভাবান্বিত হয়, এঁদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। প্রাচীন সমাজের নানারূপ প্রথা ও সংস্কারকেও এঁরা বর্জন করেন নি। প্রপিতামহ শুকদেব বসুর স্বপ্নাদ্য ওষুধের জন্য দেওঘরে যাওয়ার কাহিনী রাজনারায়ণ আত্মচরিতে বর্ণনা করেছেন।

রাজনারায়ণের পিতামহ রামসুন্দর বসুর পরদুঃখকাতরতার তুলনা ছিল না, সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় প্রীতি। পিতামহের কথায় রাজনারায়ণ বলেছেন: পরোপকারিতা যেমন তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল, তেমনি মানবতা ও উদারতার দিক থেকেও তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। রাজনারায়ণ-প্রদত্ত বিবরণেই তা বোঝা যায়— "ঠাকুরদাদা, বাটীতে যে সকল রোগী স্বপ্নাদ্য ঔষধ লইতে আসিত, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। ইহাতিনি পুণ্যকার্য্য জ্ঞান করিতেন।" বাল্যের অপরিণত দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ রামসুন্দর-চরিত্রের যে সেবাপরায়ণতা গুণ দেখেছিলেন, জ্যেষ্ঠ পিতামহ রামপ্রসাদ বসুর চরিত্রেও তার প্রতিফলন হয়। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন: "রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন।" সাধুচরিত্র মানুষ মাত্রেরই ধারণা, দান করলে অনেক পুণ্য হবে, আর এই পুণ্যের ফলেই তাদের স্বর্গলাভ হবে। বলা যায় বসুবংশও এইরূপ পুণ্য অর্জনে বিশেষ আগ্রহী ছিল।

রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর, পিতৃব্য হরিহর বসু ও জ্যেষ্ঠতাত মধুসূদন (নন্দকিশোরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) সকলেই শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পিতার ইংরাজী জ্ঞানের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল অসামান্য। প্রবল ধর্মানুরাগ এবং নিরতিশয় ব্রহ্মজ্ঞান-স্পৃহাই বোধকরি তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল। রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ও সমসাময়িক সমাজের প্রভাবে নন্দকিশোর একাধারে ধীরপন্থী ও উদারনীতিক হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত-কিছুই যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করতেন বলেই তিনি সমন্বয়বাদী হতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনে তিনি প্রাচীনতাকে একেবারে বর্জন করেন নি, নবীনতাকেও অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। ঘটনার উল্লেখে মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। গৌরবর্ণের ছিপ্‌ছিপে, অথচ সুঠাম দেহবিশিষ্ট একটি মানুষ অচঞ্চল ভঙ্গীতে ডেস্কের সম্মুখে দাঁড়িয়ে লিখে চলেছেন— এ-চিত্রটি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একজন বিদ্যানুরাগী, কর্তব্যনিষ্ঠ শান্তস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরে। আধুনিক চিত্র হল— সন্ধ্যায় পুত্র রাজনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে পানাহারে নিযুক্ত পিতা নন্দকিশোর।

রাজনারায়ণের পিতৃব্য হরিহর বসু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত। সংস্কৃত শ্লোক তিনি অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। ভ্রাতুষ্পুত্র রাজনারায়ণের বাল্যকালে তিনি যে কত সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও হরিহর বসুর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। হরিহর বসু ধর্মানুরাগী ছিলেন, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানস্পৃহা ছিল অতিপ্র..। পিতৃব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রাজনারায়ণ বলেছেন: "আমার খুড়া মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের কর্তা ছিলেন। আমার খুড়া মহাশয় নবযৌবনকালে রামমোহন রায়ের একজন অনুবর্তী ছিলেন, এইজন্য তাঁহার দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল।" হরিহর বসু তাঁর যৌবনকালে রামমোহন রায়ের গ্রন্থ খুবই পাঠ করতেন। কথিত আছে, মাঝেরপাড়ার প্রধান পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশ এইজন্য তাঁর প্রতি একবার ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, একবার তিনি প্রবল ক্রোধবশত রামমোহন রায়ের গ্রন্থপাঠরত হরিহর বসুকে তিরস্কার করেন এবং তাঁর হাত থেকে বইখানি ছিনিয়ে নিয়ে 'ধোবা পুষ্করিণী'র জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। কারণ অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী রামমোহনকে তাঁরা বিধর্মী বলেই

মনে করতেন।

রাজনারায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে— "রামসুন্দর বসুর দুই সংসার। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মধুসূদন বসু জন্মগ্রহণ করেন।"[১] সম্পর্কে মধুসূদন হলেন নন্দকিশোর বসুর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ সহোদর। জ্যেষ্ঠতাত মধুসূদন বসুর ইংরাজী জ্ঞানের কথা এবং তাঁরই কাছে প্রথম জীবনের পাঠ গ্রহণের কথা রাজনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

মধুসূদনের ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন রাজনারায়ণ ঃ—"মধুসূদন বসুজা মহাশয় উদোমাদা লোক ছিলেন।"[২] 'উদোমাদা' বলতে রাজনারায়ণ বসুজা-মহাশয়ের চরিত্রের সরলতার কথাই বুঝিয়েছেন। পূর্বপুরুষের উদারতা ও সরলতা গুণ রাজনারায়ণের চরিত্রেও বর্তেছিল।

রাজনারায়ণের পিতামহীও ছিলেন দয়াবতী, দানশীলা মহিলা। রাজনারায়ণের বিস্মৃতপ্রা স্মৃতি পিতামহী-চরিত্রের একটি দিক উদ্ভাসিত করেছে; "সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম বলিয়া গণিত হইত।... পিতামহী ঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য রাশীকৃত উষ্ণ অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দিতেন।" বাল্যের অপরিণত দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ অতিথিসেবা পরোপকারের ও মানবপ্রীতির যে নিদর্শন দেখেছিলেন, তাই তাঁর শিশুমনে গভীর রেখাপাত করেছিল; এবং পরবর্তীকালে গভীর মানবপ্রীতি থেকেই সম্ভবত তাঁর জাতিপ্রেম, দেশানুরাগের অনুভূতি জেগেছিল।

সহজাত গুণের সঙ্গে বংশাবলীর ধারানুযায়ী রাজনারায়ণের মানসিক পরিপুষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ হয়েছিল। পরিবার ও পরিবেশের প্রভাব কখনোই উপেক্ষিত হয় না। শুধুমাত্র পিতা; পিতৃব্য নয় জ্যেষ্ঠতাত ও আত্মীয়-পরিজনও নয়, জন্মসূত্রে রাজনারায়ণ অধিকারী হয়েছিলেন মাতার স্নেহ, প্রেম, দয়া ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণগুলির। বীরাঙ্গনাজননীদের চরিত্রে যে-সমস্ত মহত্ত্বের লক্ষণ ও সদ্‌গুণ বিদ্যমান থাকে তাই যুগে যুগে পুত্রেরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে আত্মসাৎ করে মহত্ত্-

---

১. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ৫৪

২. তদেব, পৃ. ৬২

শিখরে আরোহণ করেছেন। এই মহিলাগণ মহীয়সী বলে প্রখ্যাতা না হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সন্তানসন্ততিদের মহান্ করে তোলাই হয় তাঁদের ব্রত। সন্তানদের চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করতে পারলে তাঁদের জীবনের সার্থকতা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। রাজনারায়ণের মাতার চরিত্রে এই গুণটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েছিল। রাজনারায়ণের মাতা ছিলেন নম্রস্বভাবা, ধার্মিক, অথচ তেজস্বিনী মহিলা। স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে গড়া ছিল তাঁর অন্তর। কিন্তু তাই বলে সংসারকর্ম নির্বাহে ও পুত্রাদি প্রতিপালনে তিনি ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি কোনো দিন। পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েও নিজের কর্তৃত্ব কখনো পরিত্যাগ করেন নি। নিম্নোদ্ধৃত দুটি দৃষ্টান্তে এ-বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা যাবে। এতে মায়ের চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্নেহকাতরতা একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। রাজনারায়ণ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন কলকাতার পটলডাঙা অঞ্চলে মাতাপিতার সঙ্গে তিনি একই গৃহে বাস করতেন। একদিনের একটি ঘটনা : একদিন রাত্রে অতিমাত্রায় মদ্য পান করে 'টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফিরলেন রাজনারায়ণ। তাঁর বয়স তখন সতরো-আঠারো বছর। মা পুত্রের এইরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন, রুষ্টও হয়েছিলেন ; কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়ে পুত্রকে তিরস্কার বা শাসন করলেন না। বীর্যবতী মাতা কলকাতায় আর বাস না করার এবং বোড়াল গ্রামে গিয়ে বসবাস করার সংকল্পের কথা জানালেন স্বামীর কাছে। এই কথায় একদিকে পুত্রের প্রতি মায়ের স্নেহকাতর হৃদয়, অপর দিকে মায়ের আত্মসম্মানবোধ ও ব্যাক্তিত্ব উভয়ই প্রকাশিত। মাতার চরিত্রের এমনই দৃঢ়তা আর-একবার দেখা গিয়েছিল বোড়াল গ্রামের বাড়িতে। ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের অহেতুক ভীতিতে, আত্মসম্মানের অমর্যাদায় আঘাত-প্রাপ্ত এই নারী ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে পুত্রকে শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, "তোর মনে এই ছিল!" তিরস্কার নয়, কোনো কটু বাক্য নয়, ক্রোধোন্মত্ততায় কোনো লঘু কথা নয়, পুত্রের প্রতি অনেক আশা, ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্বের এইরূপ পূর্ব-সূচনা দেখে তাঁর এই হতাশ্বাসবাণী। মা তাঁর শিক্ষা, সংস্কার ও অন্তরদৃষ্টি দিয়ে পুত্রের যে উত্তরজীবনের ছবি চিত্রিত করে রেখেছিলেন, তার গরমিলেই তাঁর মনঃক্ষোভের অন্ত ছিল না। মাতার অনুপস্থিতিতে রাজনারায়ণ দুই ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ দিয়েছিলেন। তাই বোড়াল গ্রামের বাড়িতে তিনি

দেখেছিলেন মাতার এই মূর্তি। অন্তরে আঘাতের সুকঠিন ব্যথা, কিন্তু বাইরে কোনো প্রকাশ নেই।

মাতার এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পুত্রও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে জীবনের প্রচণ্ডতম আঘাতে রাজনারায়ণের কর্তব্যবোধ ও সহনশীলতা কখনো তিরোহিত হয় নি। জগতে প্রেমধর্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর, ক্ষমা যে পরম ধর্ম—এই দুই মূলমন্ত্র মাতৃসূত্রেই বিধৃত হয়েছিল তাঁর অন্তরে। এইরূপ মাতা-পিতার স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত, আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ক্ষমাসুন্দর মহত্ত্বে উদ্‌বুদ্ধ রাজনারায়ণের জীবন ও চরিত্র।

পিতা-মাতার প্রতি রাজনারায়ণের শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত ছিল না। পরিণত বয়সে তাঁর অনেকগুলি রচনায় পিতা-মাতার প্রসঙ্গ ভক্তিমিশ্রিত ভাবধারায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ভক্তিমান পুরুষ একসময়ে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে ঘোষণা করেছিলেন ঃ—

> "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
> মত্বাগৃহী নিষেবেত সদ্য সর্ব্বপ্রযত্নত ॥"

গৃহী ব্যক্তি পিতা-মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জেনে সর্বপ্রযত্নে সর্বদা তাঁদের সেবা করবেন। যেহেতু 'মাতা সেই পরম মাতার স্নেহময়ী প্রতিমূর্তি স্বরূপ।' রাজনারায়ণ এই পার্থিব মায়ের মধ্যে দিয়েই দেখেছিলেন বিশ্বজননীকে। মানবিক মা এই বিশ্বমায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ, আর পিতা-মাতা দেবতা-সদৃশ। রাজনারায়ণের অন্তরে পিতা-মাতা দেবতার আসনে সমাসীন। তাঁর ভক্তিবিনম্র চিত্তের বাণী : "সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু... মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর।"[১]

বংশপ্রভাব মানবচরিত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চরিত্রের পূর্ণবিকাশের পক্ষে পারিপার্শ্বিক প্রভাবও কোনোক্রমে উপেক্ষণীয় নয়। সেকালের গ্রাম্য সমাজে ব্যক্তিবিশেষের জীবন গঠিত হত কেবলমাত্র আপন পরিবারকে কেন্দ্র করেই নয়, উক্ত গ্রামের গণ্যমান্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের চরিত্র-সংস্পর্শেও। বোড়াল গ্রামের মাঝেরপাড়ার কমলাকান্ত সার্বভৌম, যিনি ছিলেন জমিদার

১. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আশ্বিন ১৭৮৬ শকাব্দ, পৃ. ৮৭-৮৮

সন্তোষ রায়ের সভাপণ্ডিত, তাঁর বিদ্যাবত্তা উদারতা ও বদান্যতার কথা রাজনারায়ণের অবিদিত ছিল না। বৈদ্যনাথ সার্বভৌমের মতো কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ও নৈয়ায়িক ব্যক্তির সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা, ও একশো পাঁচ বৎসর বয়স্ক রামনিধি তর্কবাগীশের মেধাশক্তির প্রসঙ্গ বালক রাজনারায়ণকে বিস্ময়-বিমূঢ় করেছিল। এ ছাড়া বোড়াল গ্রামের ঘোষ-বংশ, বসু-বংশের (শুকদেব বসুর বংশ নয়) বিবরণও রাজনারায়ণের স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল। উক্ত দুই বংশেরই ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের বর্ণনা করেছেন তিনি 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'। বসু-বংশের সরকারী কর্মের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি পরে রাজনারায়ণের কাছে দাসত্বেরই নামান্তর বলে মনে হয়েছে। ঘোষ-বংশের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর এবং তার পর তার বিলুপ্ত দশা রাজনারায়ণের শিশুমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বোধ করি পরিণত বয়সে তা তাঁর জীবন-দর্শন উন্মোচনে কিছুটা সহায়ক হয়ে থাকবে। নরনারায়ণ ঘোষের প্রসঙ্গ আলোচনায় তাঁর মন্তব্যে তাঁর চিত্তেরই প্রতিফলন হয়েছে: "সেই বাবুদের বাটী এক্ষণে পতিতাবস্থায়। যেখানে এরূপ আনন্দ উৎসব হইত সেই স্থান এক্ষণে নির্জন, নিরানন্দ ও নিরুৎসব। পৃথিবীর সকলই অস্থায়ী।"[১] 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' রাজনারায়ণ তাঁর গ্রামের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রতিবেশীদের কথা তাঁর মনোগঠনে বিশেষ প্রভাব-বিস্তার করেছিল।

রাজনারায়ণের জন্মকালের বিশেষ তাৎপর্য এবং যে পারিবারিক পরিবেশে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে, তা অনুধাবন করলে স্বতই মনে হবে যে, রাজনারায়ণের জ্ঞানস্পৃহা, তাঁর গুণগুলির বীজ কেবলমাত্র আজন্ম প্রোদ্ভিন্নই নয়, স্ববংশের প্রভাব-জাতও বটে। পরবর্তীকালে যোগ্য পরিবেশে এবং অনুকূল সাধনায় সেই গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি রাজনারায়ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে তার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।"[২] বাংলাদেশে এমন সব মানুষও জন্মেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে এঁরা একাধারে প্রতিভাবান ও হৃদয়বান;

১. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ১৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্রপূজা' (১৩৬৫), পৃ. ১৭; অপিচ দ্রষ্টব্য 'বিদ্যাসাগরচরিত'।

নিজেদের জ্ঞানগরিমাতে নিজেরা সমৃদ্ধ, আবার হৃদয়বত্তার দিক থেকেও এঁরা যথার্থ 'মানুষ'। রাজনারায়ণ তাঁদেরই একজন। রাজনারায়ণের জীবনকর্ম পর্যালোচনা করলে এমনই চারিত্রিক গুণাবলীবিশিষ্ট ও প্রতিভা-সম্পন্ন একটি ব্যক্তি-মানুষের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন

"সুমেরু সমতুল্য হিরণ্যদানে।
নাহি তুল্য নাহি তুল্য গোবিন্দ নামে।"[১]

গ্রামের একটি মেটে বাড়ির পুব দিকের একটা ঘরে, বৃদ্ধ, অন্ধ ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুয়ে এই-সব 'পদ্য' মুখস্থ করে চলেছে একটি শিশু। ভোর রাত্রে এক স্বপ্নময় পরিবেশে ঠাকুমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর করে সে রোজই এইরকম ভাবে পদ্য মুখস্থ করে।

রাতের শেষ অন্ধকারটুকু পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার পূর্বে, সন্ধিক্ষণে মানুষ ইষ্ট নাম স্মরণ করে একটি সুন্দর, শুভদিনের কামনায়। ঠাকুরমার নামজপে অন্তর্নিহিত রয়েছে হয়তো দুইটি অভীপ্সা— ইষ্টগুরুকে স্মরণ, মনন, ও ছোট্ট নাতিটির উজ্জ্বল, সম্ভাবনাপূর্ণ, সার্থক ভবিষ্যৎ জীবন।

ক্রমে রাত হয় ভোর। দিনের আলোয় পৃথিবী আলোকময়। পৃথিবীর কোন্ এক প্রান্তের এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতেও সূর্যরশ্মির কার্পণ্য অনুভূত হয় না। আলো-ঝলমলে গ্রাম, গ্রামের এই মেটে, খড়ো বাড়িটির পিছনে দু-চারটে বড়ো-বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ, একটু-আধটু ঝোপ-জঙ্গল। আর এ-সব পার হয়ে পিছন দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণেই বিরাট এক পুষ্করিণী।

ভোরের আলোয় ঘরের বাইরে আসে শিশুটি। নিজের মনের রঙে রঙ মিলিয়ে বাইরের জগতে দেখে শুধু আনন্দের ঢেউ। মুহূর্তেই দুরন্তপনার কতরকম ফন্দিই মাথায় খেলে যায়।

বাড়িতে গুরুজনদের শাসনের হাত থেকে রেহাই নেই। তাই সকালের নিয়মিত পাঠেও ফাঁকি মেলে না শিশুর। সদর দরজার পাশেই ছিল প্রকাণ্ড একটা আটচালা। সেই আটচালাতে জ্যেষ্ঠতাত শিশুটিকে কোলে বসিয়ে মুখস্থ করান আদি কবি বাল্মীকির শ্লোক। চাণক্য শ্লোকও কত মুখস্থ করাচ্ছেন,

১. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', ১৯১৪, পৃ. ৯০

আবার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইংরেজী শেখাতেও জ্যেষ্ঠতাত ভুলে যান নি। জ্যেষ্ঠতাতের কোলে বসে শিশুটি তাঁরই উচ্চারিত কথাগুলি আউড়ে চলে—

গাড—ঈশ্বর   লাড—ঈশ্বর

আই—আমি   ইউ—তুমি

কাম—আইস,   গো—যাও

এদিকে বেলা গড়িয়ে চলে। শিশুটি পাড়ায় পাড়ায় নানারকম দৌরাত্ম্য শুরু করে। মাছের চার, মশলা, ছিপের ফাতনা— সবই থাকে সঙ্গে সঙ্গে। কখনো দেখা যায়, কলার ছটায় শামুকের শাঁস বেঁধে পুকুরে ফেলে 'রামের পিতা দশরথ' ধরছে, কখনো বাকস ফুলের মধুপান করতে করতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার কোনোসময় কড়াইশুঁটির ক্ষেতে পড়ে দু'হাতে কড়াই ছিঁড়ে খাচ্ছে, পরের বাগানে দুপুরবেলা চুপি চুপি ঢুকে 'আঁব' চুরি করে খেতেও সে কসুর করে না। তারপর একসময় বাগানের মালিকের তাড়া খেয়ে কখনো দেখা যেত ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে। এইভাবে সারাদিন শিশুটির দুষ্টুমির আর অন্ত থাকে না। তারপর পুকুরে মাছ ধরা, সে আর-এক আনন্দ। ছিপের ফাতনা জলেতে একবার ডুবছে, আবার উঠছে— অদেখা বস্তু প্রাপ্তির উল্লাসে যেন ফেটে পড়তে চায় শিশুর হৃদয়।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়। দুপুর শেষ হয়ে অপরাহ্নের ম্লান আলো দ্বিগুণ ঘনীভূত হয়ে আসে পৃথিবীতে। এদিকে শিশুটির পুনরায় পাঠের সময় হয়। খুড়ামহাশয় সেই আটচালাটিতেই শিশুটিকে নিয়ে বসে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করান। খুড়ার উচ্চারিত কথাগুলি শিশুটি একই ভঙ্গীতে আউড়ে চলে :—

ধনাগমো নিত্যং আরোগিতাচ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনীচ।
বশস্থ পুত্র অর্থকরী চ বিদ্যা ষট্‌জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥
বিনা ধনেন সংসারঃ নয়নেন বিনা বপু
বিনা বৃথা জন্ম বিনা কৃষ্ণেন জীবতু॥

আবার—

আকর্ণয়ন্তি কিল কোকিলকূজিতানি সন্ধা
তুমেবানিজসপ্ত নলিং কিরাতাঃ ...ইত্যাদি।[১]

এইভাবেই সারাদিনের পাঠ শেষ হয়।

---

১. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', ১৯১৪, পৃ. ৭৯

সন্ধেবেলায় পুব দিকের সেই মেটে, খড়ো ঘরের দাওয়াতে ঠাকুমার সামনে বসে শিশুটি শোনে 'সিংহীর মামা ভন্দল দাস'— তার গল্প। সামনে মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেই আলো-আঁধারে দেখা যাচ্ছে শিশুর বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল মুখটি— সেখানে ছনিয়ার অবাক, বিস্ময়, আর আনন্দ, তাকে নিয়ে যায় কোন্ স্বপ্নরাজ্যে। "…প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য।"[১] বোধহয় এই সত্যকে জানার আনন্দেই শিশুমন উল্লসিত ; শিশুর মুখমণ্ডলে তারই প্রতিচ্ছবি।

সেদিনের এই শিশুটি বোড়াল গ্রামের মাঝেরপাড়ার নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়ণ বসু— উনবিংশ শতকের বাংলার সমাজ-সংস্কারক, ধর্মচিন্তার অন্যতম প্রবক্তা, জাতীয়তার অগ্রগামী পথপ্রদর্শক, কৃতবিদ্য ব্যক্তি। আর বৃদ্ধা ঠাকুমার পরিচয় রাজনারায়ণের ভাষাতেই দিই— "…গ্রামের ভঞ্জবংশের কন্যা আমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতামহী (আমার ঠাকুরের জেঠাই)…।"[২]

রাজনারায়ণের শিশুকাল কেটেছে বোড়াল গ্রামের পরিবেশে। এইসময় থেকেই জাগে তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি। এই প্রকৃতি-প্রীতি রাজনারায়ণের চিত্তে ভগবদ্‌ভক্তি জাগিয়ে তোলে। পরিণত বয়সে প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হতেন, শহুরে জীবন অপেক্ষা গ্রাম্যপরিবেশ তাই তাঁর এত প্রিয় ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর স্নিগ্ধ, মধুর লাবণ্যে তিনি বিশ্বনিয়ন্তারই প্রেমময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করতেন।

স্কুল-কলেজে পাঠকালীন জন্মভূমি বোড়াল গ্রামের নিসর্গ সৌন্দর্য কিশোর রাজনারায়ণকে আকর্ষণ করেছে বার বার। তাঁর এ আকর্ষণে প্রকৃতির সৌন্দর্য-তৃষ্ণার সঙ্গে ছিল জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা। গ্রামের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে জড়িত হয়ে ছিল তাঁর বাল্যের কত মধুময় স্মৃতি। সব মহাপুরুষেরই জন্মস্থানের প্রতি একটা প্রবলতম আকর্ষণ থাকে। বাল্যকালের মধুর স্মৃতিবিজড়িত বোড়াল গ্রামের বসতবাড়ির কথা রাজনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সেও বিস্মৃত হতে পারেন নি।

রাজনারায়ণ ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্তান নন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন উচ্চ

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলেভুলানো ছড়া", 'লোকসাহিত্য', পৃ. ১৪

২. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', ১৯১৪, পৃ. ৮৯

মধ্যবিত্ত। ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাড়ির যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, তা শিশুর মানসিক পরিপুষ্টি ও চিত্তবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। মেটে বাড়ির সামনের দিকের বৈঠকখানা ঘর দুটি প্রায় সব সময় লোকে পূর্ণ থাকত। 'সঙ্গীতশাস্ত্রনৈপুণ্য সুসভ্য ভরতমালী' ঐ একটি ঘরে বসে প্রতিদিন নন্দকিশোর বসুকে রামমোহন-সংগীত গেয়ে শোনাতেন। আবার ঐ ঘরে কখনো কখনো কথক শ্রীপতি ঠাকুরের আগমন হত। এতদ্ব্যতীত অভয়চরণ ভট্টাচার্য নামে এক যুবক প্রতিদিন কত গল্প করতেন। ক্রমে বালক রাজনারায়ণ এই যুবকের কাছ থেকে অনেক জ্ঞানার্জন করেন। নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড এবং এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের (কর্ণাট, বিষ্ণু, কাঞ্চী ও পাঞ্জাব) ছাত্র এসে পড়াশোনা করে এবং তারা বাংলাদেশের ছাত্রদের সঙ্গে পরস্পর সংকেতে কথাবার্তা বলে— এই-সমস্ত বিষয় রাজনারায়ণ ঐ যুবকের কাছ থেকেই বাল্যকালে প্রথম শোনেন। রাধামোহন ঘোষজা নামে গ্রামের আর-একজন সদাশয়, অমায়িক ব্যক্তি রাজনারায়ণদের বাড়িতে আসতেন। এঁর পাশাখেলার উদ্যম রাজনারায়ণ ছেলেবেলায় দেখেছেন। এ গেল এক ঘরের মজলিসি ব্যাপার। অপর একটি বৈঠকখানা ঘরে পিতৃব্য হরিহর বসু প্রায় সারাদিনই নানারকম আয়ুর্বেদী তেল তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন। কাজেই এই ঘরের সুগন্ধ কখনো নষ্ট হত না। আর শিশুকালের এই সুগন্ধের মধুর ঘ্রাণ বোধকরি রাজনারায়ণ বয়সকালেও কেবলমাত্র অতীত স্মৃতির অনুভব দ্বারা গ্রহণ করতেন। ঐ ঘরে কত বিচিত্র মেজাজের লোকের সমাগম হত— তার ইয়ত্তা নেই। এঁদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ ব্যতীত, নানান ক্রীড়া-কৌতুক ও বৈঠকও জমত।

"অক্ষর-পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ছড়া ও রূপকথার অরূপরাজ্যে।"[১] ছেলেবেলায় রাজনারায়ণের শিশুমন 'রূপকথার অরূপরাজ্যে' কত-যে বিচরণ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শিশুমন স্বভাবতই অরূপরাজ্যের সন্ধানবিলাসী। "শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে…।"[২] তাই বোধ হয় রূপকথার গল্পগুলি শিশু রাজনারায়ণের এত প্রিয় ছিল।

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ (১৩৭৭), পৃ. ২৮

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলে ভুলানো ছড়া", লোকসাহিত্য, পৃ. ২২

ঠাকুমার মুখে ছড়া, পদ্য, রূপকথার অসংখ্য গল্প শুনতেন রাজনারায়ণ, গল্প শোনানোর বিরাম ছিল না। আর জ্যেষ্ঠতাত মধুসূদন এবং পিতৃব্য হরিহর বসুর আদর ও স্নেহের নীড়ে রাজনারায়ণের শৈশবের পাঠ শুরু।

সেকালে শিশুদের প্রথম পাঠের ব্যবস্থা ছিল এই ধরনের। পাঁচ বছর বয়সে হাতে-খড়ি হলে সকাল-বিকাল শুরু হত পাঠশালায় যাওয়া। সেখানে অক্ষর পরিচয় হত মাটিতে খড়ি দিয়ে লিখে, এবং তার পর তালপাতায় 'দাগা বুলিয়ে' স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি লেখানো অভ্যাস হত। আর সর্দারপোড়ো দিয়ে মুখে মুখে পড়ানো হত কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া, শতকিয়া। তা ছাড়া তেরিজ, কাঠাকালি, বিঘাকালি, শুভঙ্করী প্রভৃতিও শিক্ষা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবশেষে শিখত চিঠি লিখতে আর জমা-খরচ রাখতে। পাঠশালার পড়ুয়াদের আর-একটি জিনিস গুরুমশাইরা শেখাতেন —সেটি মানসাঙ্ক। এতে পড়ুয়াদের স্মৃতিশক্তি বিকাশের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যেত।

এ তো গেল পাঠশালার পাঠের প্রসঙ্গ। একই সময়ে গৃহে মাতাপিতা, অভিভাবকরা মুখে মুখে শোনাতেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, চাণক্য শ্লোক ইত্যাদি আরো কত পদ্য, ছড়া, শ্লোক ; শিশুরা সেগুলি কণ্ঠস্থ করে, এবং ক্রমে এইভাবেই তাদের একটা সংস্কার জন্মায়। তখনকার দিনে অভিভাবকদের দূরদৃষ্টি ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এই-সমস্ত শ্লোকের অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ কালক্রমে শিশু-হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও সুদৃঢ় করে গড়ে তুলবে। এবং এই উপদেশাত্মক বাক্যগুলির মর্মানুসারে তাঁদের পরিণত বয়সের কর্মপদ্ধতিও নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই জীবনের শুভসূচনাকালে নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল— 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।'

হাতে-খড়ির পর রাজনারায়ণের পাঠের সূচনা হয় গুরুমহাশয়-পরিচালিত বোড়াল গ্রামের এক পাঠশালায়। গুরুমহাশয় ছিলেন বর্ধমানের এক 'উগ্র-ক্ষত্রিয়ঃ'। "তখন কলিকাতার দক্ষিণ প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখা যাইত। এই গুরুরা আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন।"[১] এই-সব গুরুমহাশয়দের ভরণপোষণ নির্বাহ হত

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৮০

ছাত্রদের প্রদত্ত গুরুদক্ষিণাতেই। পরিণত বয়সে রাজনারায়ণ গুরুমহাশয়ের গুরুগিরিসহ পাঠশালার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূতই। শৈশবের সেই ভীতিপ্রদ দিনগুলির কথা তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি, তাই গুরুমশায়ের স্বরূপ ও তাঁর শিক্ষাপ্রণালী, শাস্তিদান, পাঠশালার পঠন-পাঠন, একে একে সব বিষয়ই তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ইতস্তত লিপিবদ্ধ করেছেন। গুরুমশায় 'উগ্রক্ষত্রিয়' হলেও 'উগ্রস্বভাবের' ছিলেন না। তবুও তাঁর এক রাজনারায়ণ ডাকেই, রাজনারায়ণের 'আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইত' এবং 'ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া' দেখা যেত। রাজনারায়ণের এই অবস্থার দ্বারা তখনকার গুরুমশায়দের দাপটের কথা বোঝা যায়।

তখনকার দিনে পাঠশালার প্রধান বিশেষত্ব ছিল শাস্তিদানের ব্যবস্থা। রাজনারায়ণ এর প্রত্যক্ষদর্শী। অনুপস্থিতি বা অমনোযোগিতার জন্য পড়ুয়ারা শাস্তি পেত। 'হাতছড়ি', 'নাড়ুগোপাল', 'ত্রিভঙ্গ', 'চ্যাংদোলা' এবং 'প্রহার' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের সাজার বন্দোবস্ত ছিল। রাজনারায়ণের পাঠশালা-জীবনে এই তালিকার কিছু ন্যূনতা দেখা যায়। নাড়ুগোপাল করা, বিছুটি লাগানো, অথবা নির্দয় প্রহার— এই তিন প্রকারের একপ্রকার অবশ্যই জুটত পড়ুয়ার কপালে। রাজনারায়ণকে কোনোদিন এর কোনোটি ভোগ করতে হয় নি যদিও, তবু যেহেতু তিনি ছিলেন এর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, সেই হেতু গুরুমশায় বস্তুটি শিশুকাল থেকেই রাজনারায়ণের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাজনারায়ণ পাঠশালায় পড়েছিলেন দুটি বাংলা বই— 'গুরুদক্ষিণা' ও 'দাতাকর্ণ'। সব পড়ুয়াদেরই এই শিক্ষা পর্যন্ত গুরুমশায়ের প্রাধান্য। এদিকে পাঠশালায় পড়তে হত বাংলা বই, আর ইংরেজী পাঠ নিয়মিত গ্রহণ করতেন গৃহে অভিভাবকদের নিকটে। এই সময় 'বসুদের' (রাজনারায়ণ) বাড়ির একটি আটচালাতেই পাড়ার ছাত্রদের ইংরেজী হস্তাক্ষরচর্চার আড্ডা ছিল। সেখানে ছাত্রদের জন্য সারিবদ্ধভাবে ছোটো ছোটো ডেস্ক সাজানো থাকত। ছাত্ররা এক-একজন ডেস্কের সামনে বসে হস্তাক্ষর অভ্যাস করত।

রাজনারায়ণও এই সময় ইংরেজী লেখা অভ্যাস করতেন কপি স্লিপে (copy slips) লিখে। এ-সম্বন্ধে রাজনারায়ণের স্বউক্তি উদ্ধৃত হল—

"আমরা বাল্যকালে নয়ান চাঁদ বসুর নিকট হইতে ইংরিজী কপি-স্লিপস্ লিখাইয়া আনিয়া ইংরাজী লেখা অভ্যাস করিয়াছি।"[১] এইরূপ কপি স্লিপে লেখার তখন প্রচলন ছিল। বাজারে কিনতে পাওয়া যেত এই স্লিপ। এতদ্‌ব্যতীত যাদের হস্তাক্ষর সুন্দর, তাদের স্বহস্তলিখিত কপি স্লিপ বিতরণ করার রেওয়াজ ছিল। বোড়াল গ্রামের নয়ানচাঁদ বসু (দেওয়ান দয়ারাম বসুর ভাই) সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য স্বহস্তলিখিত এই প্রকার স্লিপ বিতরণ করতেন।

এই আটচালার পাঠাগারে অনুপস্থিত ছাত্রদের একটি অভিনব সাজার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য সহপাঠী বন্ধুরা তার ডেস্কটি সামনের গাছে ঝুলিয়ে রেখে আসত। পরদিন সেই ছাত্রকে ঐ ডেস্ক গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে পড়তে বসতে হত।

বোড়ালের পাঠশালায় শৈশবের পাঠ শেষ হলে— ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে— নন্দকিশোর পুত্র রাজনারায়ণকে নিয়ে এলেন কলকাতা শহরে, শিক্ষার জন্য। রাজনারায়ণ তখন সাত বছরের শিশু মাত্র। ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের মহান্ পুরুষদের কর্মভূমি কলকাতার সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা তখন প্রগতির পথে।

নন্দকিশোর পুত্রকে কলকাতার এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। গুরুমশায়ের পাঠশালায় কিছুদিন পাঠের পর পিতা নন্দকিশোর তাঁকে ভর্তি করে দেন শম্ভুমাস্টারের স্কুলে ইংরেজীর প্রথম পাঠ গ্রহণ করার জন্য। বৌবাজারের এক অন্ধকার গলিতে ছিল এই স্কুলটি। সে-সময় কলকাতায় স্বল্প ইংরেজী-শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ পাড়ায় পাড়ায় এইরকম ছোটো ছোটো স্কুল খুলে কিছু কিছু ছাত্র সংগ্রহ করে শিক্ষা দিতেন। পূর্ণচন্দ্র মিত্র, নবীনমাধব দে, মধু চক্রবর্তী ছিলেন এই ধরনের শিক্ষক; শম্ভু মাস্টার এঁদেরই সমগোত্রীয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের কয়েকজন শিক্ষকের স্কুলের নাম জনশিক্ষার ইতিহাসে আজও প্রথম স্থানের দাবি রাখে। উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জগমোহন বসু, গৌরমোহন আঢ্য, শারদাপ্রসাদ বসু প্রমুখ স্মরণীয়।

---

১. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান', ১৯১৪, পৃ. ১৫

স্কুল-জীবনের প্রথম গুরু শম্ভুমাস্টারের ইংরেজী জ্ঞানের দীনতার কথা রাজনারায়ণ পরিণত বয়সেও ভুলে যান নি। 'আত্মচরিতে' এ-বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজী শেখানোর জন্য শম্ভুমাস্টার গ্রিফ্ নামক একজন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাও কেবল 'লালমুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে'— এই কারণেই রাখা। অথচ গ্রিফ্ সাহেবের ইংরেজী জ্ঞান ছিল নিয়োগকর্তার বিদ্যাপেক্ষা অনেক কম। তাঁর চরিত্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি শিক্ষাদান অপেক্ষা শাস্তিদান প্রধান বলে মনে করতেন। পাঠ্যবিষয়ে সামান্য ত্রুটি হলেই 'ফ্রেল' (Latin 'Ferula') দ্বারা ছাত্রদের প্রহার করতেন। কৌতুকের কথা এই যে, শম্ভুমাস্টার ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল খুলেছিলেন, স্কুলে সাহেব নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন তিলকধারী, গোঁড়া হিন্দু।

শম্ভুমাস্টারের স্কুল থেকে রাজনারায়ণ ভর্তি হলেন হেয়ার সাহেবের স্কুলে। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই শিক্ষালাভ করেন। তখন স্কুলটির নাম ছিল 'স্কুল সোসাইটিজ স্কুল'।[১] এই স্কুলেই কিশোরীচাঁদ মিত্র ভর্তি হন ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে। তখন রাজনারায়ণ বোধ করি শম্ভুমাস্টারের স্কুলেরই ছাত্র।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে রাজনারায়ণ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। স্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ঐ স্কুলে রাজনারায়ণ

---

১. 'স্কুল সোসাইটি' কর্তৃক স্থাপিত স্কুলগুলির মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটি। তখন এর নাম ছিল 'স্কুল' সোসাইটিজ স্কুল', পরে হয় 'পটলডাঙ্গা স্কুল' : তখনো সাধারণে বলত হেয়ার সাহেবের স্কুল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই থেকেই এর ব্যয়ভার বহন করেছে স্কুল সোসাইটি ও ডেভিড হেয়ার স্বয়ং। সোসাইটির আদর্শ স্কুল এটি।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে একাধিকবার। 'প্রথম স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পূর্বেই শিক্ষা-সমিতির (Council of Education) অধীনে আসে এবং তখনই নাম হয়েছিল 'হিন্দু-কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল'। কারণ তখন সোসাইটি-কর্তৃক প্রতি বছর ত্রিশজন করে ছাত্র এখান থেকে প্রেরিত হত হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে শিক্ষালাভের জন্য।

যখন প্রথম শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) ছাত্র তখন উমাচরণ মিত্র ছিলেন প্রধান শিক্ষক ; ইনি ইংরেজী পড়াতেন।

গণিতের শিক্ষক ছিলেন রাধামাধব দে। আরো একজন শিক্ষক ছিলেন—তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনারায়ণের স্মৃতিপটে এই-সমস্ত পূজনীয় শিক্ষককুলের চিত্র চিরদিন উজ্জ্বল ছিল।

হেয়ার স্কুলের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে রাজনারায়ণের স্কুলজীবনের কৃতিত্ব, পাঠের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা। শিক্ষকের শিক্ষাগুণে এই সময় থেকেই তাঁর মন ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর গণিত-ভীতি চিরকালই ছিল। ছেলেবেলাকার স্কুলজীবনের স্মৃতি স্মরণ করে আত্মচরিতে লিখেছেন : "চিরকালই আমি গণিত বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত।" প্রবীণ বয়সে একে তিনি জলাতঙ্ক রোগের সঙ্গে তুলনা করে কৌতুক করেছেন।

এ তো ইংরেজী ও গণিত শিক্ষার বিষয়। স্কুলের নিয়মতালিকায় এই সময় ছাত্রদের জন্য আর-একটি বিষয় নির্দিষ্ট ছিল। প্রতি শনিবার হেয়ার সাহেবকে হাতের লেখা দেখাতে হত। অবাধ্য ছাত্ররা তাঁর বেত্রাঘাত থেকে নিস্তার পেত না। রাজনারায়ণের সৌভাগ্য যে, তাঁর কপালে কোনোদিন এ শাস্তি জোটে নি। কিন্তু সহপাঠীদের বেত-খাওয়া তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং এজন্য তাঁর মনের কোণে একটু একটু করে গভীর বেদনা সঞ্চিত হয়েছিল। হেয়ার সাহেবকে এই 'বেত্রচালনৈষণা' থেকে বিরত করার জন্য তিনি এক মতলব করেন। জনৈক ছাত্রের বেত খেয়ে আত্মহত্যা করার গল্প তিনি ইংরেজীতে লিখে হেয়ার সাহেবকে পড়তে দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এর দ্বারা হেয়ারসাহেব এই কার্য থেকে নিশ্চয় বিরত হবেন। এই কাজের দ্বারা বালক রাজনারায়ণের সহপাঠীদের প্রতি সমবেদনাবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ও বিনয়মূলক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিবাদ করার কৌশল সহজেই প্রকাশিত হয়েছে।

সহজাত উদ্‌ভাবনী শক্তির সঙ্গে অর্জিত বিদ্যার সংমিশ্রণ যদি প্রতিভার মৌলিক লক্ষণ হয়, তা হলে রাজনারায়ণের সে-প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে বাল্যকাল থেকেই। তখনকার কালে বালকদের প্রতিভা-পরিস্ফুটনে শিক্ষককুলের প্রচেষ্টা, শিক্ষাদানের রীতি ছিল অন্যতম মাধ্যম। স্কুলে এক 'বিতর্ক

সভা'র (Debating Club) পত্তন করেন হেয়ার সাহেব স্বয়ং ; ছাত্রদের মৌলিক রচনাশক্তির উন্মেষই তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য ছিল।

একবার এই 'বিতর্ক সভা'য় আলোচনার বিষয় ছিল 'বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কি না।' রাজনারায়ণ আলোচ্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখে উক্ত সভায় পাঠ করেন। গণিতের প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ হয়েও তিনি উক্ত প্রবন্ধে সাহিত্য অপেক্ষা গণিত বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। মাত্র বারো-তেরো বছরের বালকের এইরূপ মৌলিক রচনা-শক্তি ও বিচার-ক্ষমতা লক্ষ্য করে হেয়ার সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন!

এইরকম আর-এক 'বিতর্ক সভা'র সংবাদ পাওয়া যায়। ডিরোজিও, রিচার্ডসনের ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা, বক্তৃতাদান ইত্যাদি কোনো বিষয়েই দক্ষতার অভাব ছিল না। ভূদেব, মধুসূদন— এঁরাও হিন্দু কলেজের ছাত্র, রাজনারায়ণের সহপাঠী। উক্ত সভায় একদিন ভূদেব ও মধুসূদনের মধ্যে তর্ক হয়: বিতর্কের বিষয় ছিল 'শেক্সপীয়র এবং নিউটন— উভয়ের মধ্যে প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কে'। রাজনারায়ণের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও আর দু-একজন গণিত-পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করেন; কিন্তু মধুসূদন স্বীকার করেন শেক্সপীয়রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর মত ছিল শেক্সপীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করে শেক্সপীয়র হতে পারেন না এবং নিজে গণিত-বিদ্বেষী হয়েও ক্লাসে একদিন একটি অতি দুরূহ অঙ্ক বোর্ডে সকলের সামনে কষে তাঁর মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। আর শেক্সপীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারেন কি না— তা সহপাঠী ভূদেবকে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়ে দেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের এইরকম অসাধারণ মনীষা ও ধীশক্তি দেখে মনে হয় যে, প্রধানত যুগের পরিবেশেই এঁদের মানসিক গঠন রূপলাভ করেছিল। পুঁথিগত বিদ্যার জ্ঞান এর বাইরে। দেশ-কালের এই-ই ধর্ম।

'বিতর্ক-সভা'র দ্বারা রাজনারায়ণের বালকবয়স থেকেই যে সাহিত্যানুরাগ জন্মেছিল, তারই ফল 'হস্ত যন্ত্রে মুদ্রিত সংবাদপত্র'। হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি হাতে লিখে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। পত্রটি প্রকাশিত হত প্রতি সোমবার, নাম ছিল 'ক্লাব ম্যাগাজীন'। ছাত্রদের ক্লাবের নামেই এর নামকরণ হয়েছিল। হাতে লেখা সংবাদপত্র

ছলেও, রাজনারায়ণ এটিকে হুবহু মুদ্রিত সংবাদপত্রের মতো করার চেষ্টা করতেন। পত্রটির নাম প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে ইংরেজী বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা থাকত। সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিষয়গুলির (সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রেরিত পত্র প্রভৃতি আরো অন্যান্য বিভাগ) এ সমস্তই এতে যথাযথভাবে স্থান পেত। এ-কাজে রাজনারায়ণকে সাহায্য করতেন তাঁর সহপাঠীরা। সাহিত্যানুরাগ ও জনসেবার স্পৃহা— এই দুই বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহ গোড়া থেকেই দেখা যায়।

তখন স্কুল-কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা স্বহস্তলিখিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করত, নাহয় চলতি কোনো-না-কোনো পত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকত। হিন্দু কলেজের ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। অনেক সময় ছাত্রদের দুটি দায়িত্ব একসঙ্গে গ্রহণ করতে দেখা গেছে। সে যুগের এই আর-এক বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রাজনারায়ণের মতো মধুসূদনও হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়ীদের নিয়ে একটি হস্তলিখিত সংবাদপত্র একসময় প্রচার করতেন। মধুসূদন তখন হিন্দুকলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। উক্ত পত্রটি চলেছিল মাত্র তিন-চার মাস। হেয়ার সাহেব এই-সব বিষয়ে ছাত্রদের যেমন উৎসাহিত করতেন, রিচার্ডসনও এই-সব তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে প্রেরণাদানের জন্য এই ধরনের পত্রগুলি নিয়মিত পাঠ করতেন। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে রাজনারায়ণ-মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেবের জীবনে। ভূদেবও হিন্দু কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে স্বহস্তলিখিত একটি সংবাদপত্র প্রকাশে সচেষ্ট হন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'প্রাইভেট অবজারভার' (গুপ্ত পরিদর্শক)। ইংরেজী ভাষায় লিখে ক্লাসের ছাত্র বন্ধুদের তিনি পত্রিকাটি পড়ে শোনাতেন।

উনিশ শতকে কলকাতার জনজীবনে সভা-সমিতির উদ্ভব ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশের ঝোঁক লক্ষণীয়। এর জন্য তরুণ ছাত্রদল, শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়ের দ্বারাই উৎসাহিত হত।

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনারায়ণের মধ্যে জাগরণযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে মুকুলিত, বিকশিত হয়ে উঠছিল। স্কুলে থাকাকালীন তাঁর সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টাগুলির অন্তরালে শিক্ষক দুর্গাচরণ লক্ষ্য করেছিলেন কিশোর

রাজনারায়ণের উত্তরকালের সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন-মহীরুহের গুপ্ত বীজটি। ছাত্রটির সম্বন্ধে মনে মনে তিনি বিরাট আশা পোষণ করতেন, আর এ-সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীও ছিল।

রাজনারায়ণের কলেজ-জীবনের কৃতিত্ব অধিকতর উজ্জ্বল, ছাত্রজীবনের এই অংশেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সমধিক। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ প্রেরিত হন হেয়ার স্কুল থেকে হিন্দুকলেজে। একবছর পূর্বে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভর্তি হয়েছিলেন হিন্দুকলেজে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'স্কুল সোসাইটি'র নিয়মানুসারেই[১] রাজনারায়ণ হেয়ার স্কুল থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন উক্ত কলেজে। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কলকাতার হিন্দুকলেজ যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে, রাজনারায়ণ তখন এখানে প্রবেশ করেন। ডিরোজিওর কাল অতিবাহিত হয়েছে বেশ কিছুদিন; ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে রয়েছেন গণিতশাস্ত্রবিদ রিজ, হ্যালফোর্ড, ক্লিন্ট প্রমুখ সে-সময়কার খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শিক্ষাবিষয়ক নিয়ম তালিকার কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন লক্ষ্য করবার মতো। ইতিপূর্বে স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষার উপরই জোর দেওয়া হত। স্থির হল যে, এখন থেকে বাংলা ভাষার জন্যও স্কুলের সময়ের কিছু অংশ ব্যয়িত হবে; আরো স্থির হয়েছিল যে স্কুলে জুনিয়র বিভাগে তিনভাগের দুভাগ সময়ে ইংরেজী পড়ানো হবে, আর একভাগ সময়ে পড়ানো হবে বাংলা; সিনিয়র বিভাগেও এই নিয়ম করা হয়েছিল যে, সমস্ত স্কুল সময়ের একঘণ্টা কাল পঠিত হবে বাংলা, বাকি পুরো সময়টার জন্যে থাকবে ইংরেজী। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত *Regulations for the Schools and Colleges under the General Committee of Public Instruction* গ্রন্থে তখনকার সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগের ক্লাসে কী কী ইংরেজী ও বাংলা বই পড়ানো হত, তার একটি তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে যে নিম্ন শ্রেণী

১. স্কুল সোসাইটির নিয়ম হয়েছিল যে বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রতিবছর ৪০ জন করে ছাত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হবে— *Report of the General Committee of Public Instructions of the Presidency of Fort William in Bengal for the years 1835.*

থেকেই কী পরিমাণ ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠের ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে ফোর্থ ক্লাসেই অর্থাৎ বর্তমান কালের সপ্তম শ্রেণীতে রাজনারায়ণ পড়েছিলেন নিম্নলিখিত ইংরেজী বইগুলি—

1. Cards of letters, syllables and words, 2. Cards of easy sentences, 3. English Reader. No. I, 4. Cards of figures. রাজনারায়ণ এই-সমস্ত ইংরেজী পাঠ স্কুলেই শেষ করে এসেছিলেন। তা ছাড়া জুনিয়র বিভাগের ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে অর্থাৎ পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের তালিকাও[১] ছিল বেশ দীর্ঘ।

হিন্দু কলেজে প্রথম বছর থেকেই রাজনারায়ণ প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম বছর (১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে) তিনি হিন্দু-কলেজের স্কুল বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে (থার্ডক্লাসে) ভর্তি হন। এই শ্রেণীতে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল আঠারো। গুণানুসারে তাদের স্থান (position) নির্দিষ্ট হয়েছিল।[২] যদিও ঐ শ্রেণীতে রাজনারায়ণের স্থান ছিল চতুর্থ, তবুও সাহিত্য (Literature) পরীক্ষায় তিনিই সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন

---

১. জুনিয়র বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা—

1st. Class : 1. Selections from Probhod Chundrica-Readers. 2. Essay writing on given subjects. 3. Translation from Eng. Lessons. 4. Exercise and Parsing on Grammar. 5. Dictation.

2nd Class : 1. Gyunornub-Reader. 2. Parsing and Exercises on Grammar. 3. Translation from English lessons into Bengalee and to compare there-upon 4. Pattroqummudi Letter Writer (Serampore Edition). 5. Composition of Letters, etc. 6. Dictation. 7. Smyth's Zemindary account. —উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দুজাতি ও শিক্ষা' (২য় ভাগ

২. স্থান অনুযায়ী নামের তালিকা দেওয়া হল :

১ কৈলাসচন্দ্র সাহা ২ শ্রীনাথ সেন ৩ আনন্দপ্রসাদ মুখার্জী ৪ রাজনারায়ণ বসু ৫ মতিলাল দে ৬ শ্যামাচরণ বোস ৭ চণ্ডীচরণ ধর ৮ প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ৯ কানাইলাল সাহা ১০ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১১ কাশীনাথ চন্দ্র ১২ বেণীমাধব ব্যানার্জী ১৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪ হরনন্দ মুখার্জী ১৫ দ্বারকানাথ বসাক ১৭ নবীন মুখার্জী ১৭ হরলাল গুপ্ত ১৮ ভুবনেশ্বর দে

—*General Report of the Late General Committee of Public Instruction in Bengal for 1840-41*, p. 61.

করেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখা যায় স্কুল জীবন থেকেই। 'General Committee of Public Instruction'-এর সেক্রেটারি ডাঃ ওয়াইজ এই বছর সাহিত্যের পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার পর তিনি যে লিখিত বিবরণটি দেন, তাতে ছাত্রদের নির্দিষ্ট অধিগত বিদ্যায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে জানা যায়। ডাঃ ওয়াইজের বিবরণটি উল্লেখযোগ্য :

"I examined this class in the Literary studies by requiring each to read. explain, and parse a passage in Milton's Paradise Lost. The reading was generally very good, the explanations (sometimes difficult) were ready, and generally good ; and the parsing correct. I award the prize to Rajnarain Bose."[১]

রাজনারায়ণ ব্যতীত আরো কয়েকজন সাহিত্য পরীক্ষায় প্রশংসাপত্র লাভ করেছিলেন— এঁরা হলেন, রাজমোহন মিত্র, হরলাল গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র সাহা, কেশবচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র মুখার্জী, গোবিন্দচন্দ্র দে, শ্যামাচরণ বোস, গোবিন্দচন্দ্র শীল, দীননাথ দে, নবীনচন্দ্র পালিত। এঁরা ঐ একই বছর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও (Natural Philosophy) পুরস্কার পেয়েছিলেন ; বাকী কয়েকজন ছাত্র লাভ করেছিলেন প্রশংসাপত্র। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও ডাঃ ওয়াইজ মন্তব্য[২] করেছিলেন।

হিন্দুকলেজে রাজনারায়ণ কলেজবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (সেকেণ্ড ক্লাস) ওঠেন ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছর মধুসূদনও পড়ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। একটি

---

১. *General Report of the Late General Committee of Public Instruction in Bengal for 1840-41*, p. 59

২. "In Natural Philosophy, the examination. was satisfactory, the greater number of the students shewed that their knowledge though not extensive, was accurate. I award the prize in this department of study to Dinnonuth Dey, and I was much pleased with the manner in which the following students answered the questions put to them : Gobin chunder Seal, Gopalloll Roy, Rajnarain Bose, and Krishno chunder Ghosh."— *General Report of the Late General Committee of Public Instruction in the Bengal Presidency for 1841-42*, p. 60.

পত্রে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন : "আমি যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, মধুসূদন তখন আমার সঙ্গে পড়িতেন।"[১] এই একই সময় কলেজের সিনিয়র বিভাগের হেডমাস্টার ছিলেন কারসাহেব, আর সহকারী সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন হ্যালফোর্ড সাহেব।

১৮৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দে সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ হিন্দুকলেজের সিনিয়র বিভাগের বৃত্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন ; তিনি ৩০ টাকা হারে সরকারী সেকেণ্ড ক্লাস বৃত্তি পেয়েছিলেন দু'বছর।[২]

ছাত্রদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা তা বালক বয়সে থেকেই প্রকাশ পায়। ইংরেজী সাহিত্য (Literature) এবং পুরাবৃত্ত (History) উভয় বিষয়েই ছিল রাজনারায়ণের অসীম অনুরাগ। বালকবয়সেই শেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রনে তার অধিকারও জন্মেছিল আশ্চর্যজনকরূপে। প্রাচীনের প্রতি রাজনারায়ণের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। বালক বয়সেই ক্লাসের পাঠে, পরীক্ষার খাতায় সুষ্ঠু, নির্ভুল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখায়[৩] তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুল ও কলেজে রাজনারায়ণ-লিখিত পুরাবৃত্তের প্রশ্নগুলির দু-একটি আলোচনা করলে, বিষয়টি স্পষ্ট হবে আমাদের কাছে। হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পুরাবৃত্তের প্রশ্ন ছিল— Which of the sects of the Greek Philosophers was supposed to be derived from India, and upon what ground ? উত্তরে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন— "The Pythagorian sect who maintained the opinion of the Metempsychosis, or transmigration of souls, which was supposed to be taken from the woody retrears of the Brahmans who maintained the same opinion. But some say it to be derived from the Egyptians. Pythagoras maintained that there is a

---

১. যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্র। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত।

২. *General Report of the Late General Committee of Public Instruction in the Bengal Presidency for 1841-42*. p. 69.

৩. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও রাজনারায়ণ-লিখিত উত্তরের নিদর্শন : পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

creator of the universe. and that he is also the soul of it, which opinions are maintained by the Hindoo Brahmans, and are chiefly inculcated by the Vedant." এই অংশটুকু প্রশ্নটির এক অংশের উত্তর। একই প্রশ্নের বাকী অংশটুকু হল— What was the name by which the Brahmns were known among the Greeks, and what remarkable act is recorded of one of them? রাজনারায়ণ লিখিত এই অংশের উত্তর— "The Brahmans were called by the Grecians, Gymnosophists, or naked philosophers. The remarkable act reported of one of them is that of Calanus. He accompanied Alexander in his return from India and burnt himself on a pile in Caramania, according to the custom of his country. The Grecians were astonished at this act heroic, yet unsanctioned by the laws of God."

বিষয়টি হয়তো গ্রীসদেশের ইতিহাসে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচিত হয়েছে এবং রাজনারায়ণ সম্ভবত তা পাঠ করেই প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন। কিন্তু আলোচনার এই দুরূহ বিষয়টিকে আয়ত্তে আনা অল্প আয়াসের কাজ নয় বলেই মনে হয়। পিথাগোরাসের মতবাদ, আত্মার এক দেহ থেকে ভিন্ন দেহে বিবর্তন, এবং এই মতবাদটি যে আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের তপোবনের ধ্যান-ধারণা-প্রসূত ও ভারতবর্ষ থেকে একজন ব্রাহ্মণ ঋষির দ্বারা যে এই মতবাদ একসময় গ্রীসদেশে পৌঁচেছিল এবং গ্রীক দার্শনিকদের অনুরূপ মতবাদে আস্থা যে ভারতেরই দার্শনিক চিন্তাধারার মূলগত ভাব— এই-সমস্ত বিষয়গুলি কতখানি গভীরভাবে হৃদয়ংগম করতে পারলে, তবেই অতি সংক্ষেপে, বাহুল্য বর্জন করে প্রকাশ সম্ভব হয়। তদুপরি 'Metempsychosis' 'Gymnosophists' প্রভৃতি গ্রীক শব্দগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা এবং নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা বিদ্যালয়ের একটি তরুণ ছাত্রের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হত সভার আয়োজন ক'রে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। এই সভায় কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হয় এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের পুরস্কৃতও করা

হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি সকাল ১০টায় টাউন হলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার কলকাতার স্কুলের সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড।[১]

হিন্দুকলেজের সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর (সেকেণ্ড ক্লাস) বৃত্তি পরীক্ষায় পুরাবৃত্তে (History) রাজনারায়ণ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বর্তমান স্কুলের ছাত্রদের কাছে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকিউরাস প্রভৃতি দার্শনিকরা কতকগুলি গালভরা নামের সমষ্টি মাত্র, এঁদের বিষয় গভীরভাবে জানার সুযোগ বোধহয় তাদের হয় না। অথচ তখনকার দিনে ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের দ্বারা স্কুল-কলেজের পাঠ্য-তালিকা এমনভাবে তৈরি করা হত যে, বালকেরা সকলেই অনেক বিষয় জানার সুযোগ লাভ করত, কলেজে তো কথাই নেই। তা ছাড়া বিদেশী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের রীতিও ছিল স্বতন্ত্র। তাই প্রধানত শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশীদের দানের প্রশংসা আমাদের করতেই হয়।

সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরাবৃত্তের বৃত্তি পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন[২] ছিল প্লেটো ও এপিকিউরাসের দার্শনিক মত সম্বন্ধে। প্রশ্নোত্তরে বোঝা যাবে যে রাজনারায়ণ প্লেটো ও এপিকিউরাসের দার্শনিক মত কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে একজন স্কুলের ছাত্র প্লেটোর ঈশ্বর-বিশ্বাসের হেতু এবং আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধীয় দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন ; শুধু তাই নয়, এপিকিউরাস যে ঈশ্বরকে মানেন না এবং তাঁর মতে বিশ্বসৃষ্টি যে 'সৌরজগতের দুঃসম্ভব ঘটনামাত্র' তাও আলোচনা করেছেন। বালক রাজনারায়ণ লেকুইপাস ও ডেমোক্রিটাসের আণবিক তত্ত্বের উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। একটি বালকের পক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের এই জটিলতার মধ্যে অনুপ্রবেশ বিস্ময়কর বটে।

পুরাবৃত্তের বিষয়বস্তুর দুরূহতা বালক রাজনারায়ণের বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি বলা যায়। ছাত্রজীবনে প্রাপ্ত তাঁর 'Historian' আখ্যা সার্থক।

---

১. দ্র. *General Report of the Late General Committee of Public Instruction in Bengal for 1840-41 & 1841-42*, Appendix No. VIII, p. IIII-IIV.

২. প্রশ্নটি হল এই : What do you know respecting the philosophy of Plato ? How did it differ from the system of Epicurus ? দ্র. পরিশিষ্ট।

কলেজের সিনিয়র বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে (ফার্স্ট ক্লাস) পাঠকালেও (১৮৪২-১৮৪৩ খ্রী) রাজনারায়ণ মেধাবী ও ক্লাসের সেরা ছাত্ররূপেই পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীতে রাজনারায়ণ ইংরেজী পড়েছেন রিচার্ডসন সাহেবের কাছে। রীজ ছিলেন গণিতের অধ্যাপক; কার সাহেব ছিলেন সিনিয়র বিভাগের প্রধান শিক্ষক, আর হ্যালফোর্ড ছিলেন তাঁর সহকারী। রামতনু লাহিড়ী তখন হিন্দুকলেজের জুনিয়র বিভাগের ফোর্থ মাস্টার।

কলেজের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে জানা যায় যে, '…কলেজ বিভাগে দুই শ্রেণী মাত্র ছিল। এই দুই শ্রেণী এখনকার কলেজের চারি শ্রেণীর কায করিত।'[১] হিন্দুকলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরও ভীতির সঞ্চার করে। পাঠ্যতালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করলে এবিষয় বোঝা যাবে।

পুরাবৃত্তের (History) তালিকা—

Hume's History of England, (Unabridged) ; Gibbon's Roman Empire (Unabridged) ; Mitford's History of Greece, Ferguson's Roman Empire : Elphinstone's India ; Russell's Modern Europe. (সর্বসুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভল্যুম হবে)

পুরাবৃত্তের প্রশ্নের বিষয় কিছু নির্দিষ্ট না থাকাতে, উপরি-উক্ত সমস্ত পুস্তকগুলিই ছাত্রদের রীতিমত পাঠ করতে হত। তবে অসাধারণ অধ্যয়নশীল ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাজনারায়ণের পক্ষে এ ব্যবস্থা এমন-কিছু কঠিন ছিল না।

ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়তে হত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি—

1. Bacon's Essays ; 2. Shakespeare's Macbeth, King Lear, Othello, Hamlet ; 3. Milton's Paradise Lost, Lycidus, Comus, L'allegro, Il penseroso, Sonnets, etc. ; 4. Pope's Essay on Criticism, Rape of the Locke, Ilaisa Abelard, Elegy on the death of A young Lady, Prologue To the Satires ete. ; 5. Young's Night's Thoughts ; 6. Grey's Poems.

---

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পরিশিষ্ট; রাজনারায়ণ বসু -লিখিত পত্রাংশ।

একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এইরকম পাঠ্যতালিকা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তৎকালীন গভর্নমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে এই ধরনের বৃহৎ তালিকা ছিল।

কিন্তু পাঠ্যতালিকার দীর্ঘ কলেবর হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে ভীতির সঞ্চার করে জ্ঞানসমুদ্রের বারি পান থেকে বিরত করতে পারে নি। রাজনারায়ণের সহপাঠী মধুসূদন কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই হোমার, ভার্জিল, দান্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রাজনারায়ণেরও সুগভীর পরিচয় ছিল মেকলে, বেকন, স্পেনসর, টমসন, বায়রন প্রভৃতি কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকারদের রচনার সঙ্গে। তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। এঁদের রচনা তিনি শুধু পড়তেন বা পড়তে ভালোবাসতেন বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, বলা উচিত, এঁদের তিনি নির্বিচারে গলাধঃকরণ করতেন। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতাম।"[১] তিনি আরো বলেছেন, "প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা পড়িতাম।" ক্লাসে এ-ব্যাপারে তাঁর সহপাঠী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। ইনি ছিলেন ছোটো আদালতের জজ রসময় দত্তের পুত্র ও কবি তরু দত্তের পিতা। এইভাবে দেখা যায় যে, রাজনারায়ণের প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জেগেছিল শিক্ষককুলের প্রভাবে এবং যুগপরিবেশে। এই স্পৃহা তাঁর জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত একইভাবে উজ্জ্বল ছিল।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে রাজনারায়ণের সমান দখল ছিল। বালক বয়স থেকেই তাঁর মনে অতি সহজেই বিদেশী ভাষার যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় রয়েছে প্রথম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রশ্নোত্তরগুলিতে। ম্যাকবেথ নাটক থেকে "That function is smothered in surmise"[২] এই উক্তিটির ব্যাখ্যায় রাজনারায়ণ যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে যে সতেরো বছরের বালকের বিদ্যাবত্তা ও মানসিক উৎকর্ষ কত গভীর।—

"That intention, the actual execution of which is but yet existent only in his phantasy or imagination, shakes his

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১) পৃ. ১৮।

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

single state of man, i. e. convulses his little microcosm so much that 'function is smothered in surmise', i. e. his natural functions are impeded and, as it were suffocated in their operations, by surmise, i.e. by anticipation or the bloody and dark act of assassination which is preparatory to his ascension on the Throne of Scotland."[১]

অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বর্জন করে সংহত ও সরল ভাষায় সাহিত্যের এই বিষয়টির প্রকাশ কত সুস্পষ্ট এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক।

সাহিত্যের পত্রে বেকন-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"Lord Bacon is the founder of modern science. He it was, who freed philosophy from the cloister of monks, and the Jargon of the middle ages. Though he himself did make few actual discoveries in physical science, yet to him we owe a Newton, a Boyle and a Laplace. He has been well compared by Thomson the poet of the seasons, to Moses, as the person who out of the gloom of the dark ages, conducted men to the land of true science and true philosophy".[২]

লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাজনারায়ণ কলেজের পাঠ্যতালিকানুযায়ী বেকন পড়েছেন, প্লেটো, সক্রেটিস, এপিকিউরস, অ্যারিস্টটল শেক্সপীয়ার প্রভৃতি দার্শনিক প্রবন্ধকার ও নাট্যকারদের বক্তব্যগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। পারসী কবি জালাল-উদ্দীন-রুমি ও বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র ইজরাইল-মুক্তির প্রসঙ্গও তিনি ছাত্রাবস্থাতেই উত্তমরূপে পাঠ করেছিলেন। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরে এই-সব বিষয়ে লেখায় তাঁর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পেয়েছে।[৩]

সাহিত্য (Literature) ও পুরাবৃত্ত (History) ব্যতীত প্রথম শ্রেণীতে

---

১. *General Report of Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44*, Appendix, p. ii.

২. I bid, p. I.

৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

(ফার্স্ট ক্লাস) ছিল অঙ্কশাস্ত্রের বিরাট তালিকা।[১] এতদ্‌ব্যতীত পাঠ্যতালিকায় ছিল আরো নানান বিষয়। যেমন :

1. Drawing ; 2. Perspective ; 3. Mechanical and Architechtural Drawing ; 4. Practical Surveyings.

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই পাঠ্যজীবন শেষ হত না— কারিগরী বিদ্যাও কিছু শেখানো হত; এই তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে।

কলেজের সিনিয়র বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা ও সংস্কৃতের পাঠ্যতালিকাও নিতান্ত কম ছিল না। বাংলার মধ্যে ছিল :

1. Essay writing ; 2. Translation from Eng. Pieces ; 3. Exercises and parsing on Grammar etc.— এগুলি ছিল বাংলা ব্যাকরণ, ভাষায় রূপান্তরীকরণ, শব্দ-গঠন ও পদ-প্রকরণের নিয়মাবলী-সংবলিত পুস্তক।

আর 1. Grammer, 2. Dictation, 3. Composition, 4. Hittopodesha, and 5. Rughoo.— ইত্যাদি এগুলি ছিল সংস্কৃতে পাঠ্য। এই-সমস্ত বিষয়গুলিতে রাজনারায়ণের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কথা জানা না গেলেও তখন প্রতিটি বিষয় যে তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর উত্তরকালের সাহিত্যাদি রচনার মধ্যে।

একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রেই রাজনারায়ণ স্কুলে বা কলেজে কোনোদিন পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। গণিতের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে অবশ্য তাঁর স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট প্রমাণ। "...গণিতের যেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে, যে গণিতাধ্যাপক রিজ্ সাহেবের সময় আসিলে কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ্‌কাইয়া পলাইত। আমি কখন রেল টপ্‌কাইয়া পলাই নাই, কিন্তু একবার আমার স্মরণ হয়, ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয়তলের হলে কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া

---

১. তালিকাটি ছিল এইরূপ :

1 Algebra. 2 Integral and differential calculus. 3 Plane and Spherical Trigonometry. 4 Berkeley's Astronomy (Society for the diffusion of useful knowledge and Herschell.) 5 Webster's Hydrostatics. 6 Felop's Optics & Hydraulics.

ছিলাম।...[১] বলাবাহুল্য এইরকম গণিত-ভীতি রাজনারায়ণের সহাধ্যায়ী 'মেঘনাদ-বধ'কাব্য-প্রণেতা মধুসূদনেরও ছিল। বাংলাদেশের আর-একজন মনীষীকল্প ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের ছাত্রজীবনেও ভয়ানক গণিত-ভীতি ছিল। বিদেশী সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে মেকলে, গোল্ডস্মিথ, গ্রে প্রভৃতি ব্যক্তির স্কুল জীবনেরও 'গণিতাতঙ্ক' সর্বজনবিদিত। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে তখনকার ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং শিক্ষকদেরও ঐ সাহিত্য, দর্শনাদির প্রতি নিবিষ্ট করানোর প্রবল প্রয়াস। ডিরোজিও ও রিচার্ডসন ছিলেন এ-বিষয়ে উৎসাহী। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা লোপ পেয়েছিল। উক্ত দুই বিদেশী শিক্ষকের প্রেরণায় দীর্ঘদিন পরে আবার সাহিত্যের সেই বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়।

কিন্তু গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতার অভাব রাজনারায়ণের পরীক্ষায় কৃতিত্ব-লাভের বা ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির অন্তরায় কোনোদিন হয় নি। কলেজের প্রথম শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) বার্ষিক পরীক্ষায় (১৮৪২-১৮৪৩) রাজনারায়ণ সিনিয়র বিভাগের সর্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করেছিলেন প্রথম বিভাগ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে। এই বৃত্তি তিনি ৪০ টাকা হারে দু বছর পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী দীনবন্ধু দে এই একই বছর লাভ করেছিলেন সমান হারের বৃত্তি। আরো তিন হারের (৩০, ১৮ ও ১২ টাকা) বৃত্তি রাজনারায়ণের কয়েকজন সহপাঠীও[২] লাভ করেছিলেন।

---

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৫

২. গুণানুসারে সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগের বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৮৪২-৪৩) ছাত্রদের নামের তালিকা উদ্ধৃত হল :

১	রাজনারায়ণ বসু	৪০ টাকা হারে।
২	দীননাথ দে	
৩	জগদীশনাথ রায়	৩০ টাকা হারে।
৪	ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	
৫	চন্দ্রনাথ মৈত্র	
৬	কেশবচন্দ্র ঘোষ	১৮ টাকা হারে।
৭	নবীনচন্দ্র পালিত	১২ টাকা হারে।

—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44*, p. 29.

রাজনারায়ণের কলেজ জীবনের পঠনপাঠন, পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্বের কথা, বিশেষ বিষয়ে (subject) তাঁর অনুরাগের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল।

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা লক্ষণীয়।[১] বাংলা পঠনপাঠনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নিয়ম-নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করলেন। কিন্তু বাংলা পড়ার নিয়ম চালু হলেও স্কুল-কলেজে পাঠকালে রাজনারায়ণ বাংলা ভাষা অনুশীলনে খুব উৎসাহের পরিচয় দেন নি। যেহেতু তখন কলেজের ভালো-মন্দ সব ছাত্রেরই ঝোঁক ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের দিকে। সে যুগের ছাত্রেরা যে ইংরেজীতে বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন, তা রাজনারায়ণের পাঠ্যজীবনের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। স্কুল এবং কলেজে বরাবরই তিনি সকল বিষয় ইংরেজীতে পাঠ করে এসেছেন।

সরকারী শিক্ষাবিভাগ বাংলা ভাষা চালু করলেও এবং স্কুল-কলেজে তার পঠন-পাঠন শুরু হলেও ছাত্রেরা বাংলাশিক্ষায় উৎসাহী ছিল না। রাজনারায়ণ লিখেছেন : "আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গলা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল।"[২]

ক্লাসের মেধাবী, অধ্যয়নশীল ছাত্র হয়েও কৈশোরের স্বভাব-সুলভ চাপল্য

---

১. "We however, increased the time allowed for studying Bengalee, directed the necessary Text Books to be supplied, and a more strict surveillance to be exercised over the Pundits,··· In addition to this, to compel our pupils not only to keep up their Bengalee studies, but to advance to a higher stage than they have yet attained, we have in our new Rules determined, that every candidate for a Senior Scholarship shall write an Essay in Bengalee, upon some subject which will oblige him to convey European information through a Vernacular medium."— *General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency for 1843 44*, pp. 21-22.

২. রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল' (২য় সং ১৩৬৩), পৃ. ৫৩

ও দুষ্টামি রাজনারায়ণের চরিত্রে ছিল। বাংলাপড়ার ক্লাসে কতপ্রকারে ফাঁকি দেওয়া যায়, সেই সুযোগ রাজনারায়ণ খুঁজতেন। এই সম্পর্কে একটি কৌতুক-পূর্ণ কাহিনী তিনি নিজেই তাঁর 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'র চরিত্র বর্ণনায় বিবৃত করে গেছেন। কথিত আছে যে, রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ প্রভুর তদারকে হিন্দু-কলেজে একসময় পণ্ডিতিকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন রাজনারায়ণ প্রমুখ তৎকালের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদল উক্ত কলেজের ছাত্র। বাংলা পড়ার প্রতি অমনোযোগবশত তাঁরা উক্ত পাঠের সময় "...পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পাকক্রিয়া ঘটিত এক প্রসঙ্গ পাড়িতেন, তাহাতেই সময় কাটিয়া যাইত, আর বাঙ্গলা পড়িতে হইত না।..." ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ থেকে যেমন বাংলা পড়ার নিয়ম হয়, তেমনি হিন্দুকলেজের প্রথম শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) ছাত্রদের নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাও হয়। এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী স্মিথের *Moral Sentiment* পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ ছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড এদেশের শিক্ষা-বিভাগের জন্য পার্লামেণ্ট থেকে একলক্ষ টাকার অনুমোদন করান ; এবং শিক্ষাবিভাগের অধিকতর উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, "...ছাত্রদিগের বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি-বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই, এ স্থলে আমাদিগের এমৎ তাৎপর্য্য নহে যে কেবল নীতি-পুস্তকের কিঞ্চিদংশ পাঠ করাইলেই তাহাদিগের সুনীতি জন্মিবে, ফলত প্রতিদিন অনুশীলন দ্বারা তাহাদিগের মনে সৎ প্রবৃত্তির অঙ্কুরের প্রাদুর্ভাব...।"[১] এই প্রসঙ্গে তৎকালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' (মে ১৮৪২, সংখ্যা ২) প্রকাশিত সংবাদটি[২] পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং হিন্দুকলেজে এর কোনো ব্যবস্থা না থাকার দরুন তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাদবিতর্ক চলতে থাকে। এবং শীঘ্র এই মর্মে জাতির পক্ষে শুভফলদায়ক একটি সংবাদ বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় (১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়।[৩]

...

১. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, (১ম সং) গ্রন্থে মুদ্রিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা— এপ্রিল ১৮৪২, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৭৭

২. তদেব, পৃ. ১৮২ : "খেদের বিষয় এই যে এখানে গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন তাহা আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিলাম ও যাহাতে সর্বাঙ্গ মঙ্গল হয় তাহার সহিত কোন মতে ঐক্য নহে যেহেতু প্রধান বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে নীতি শিক্ষার প্রথা নাই।"

৩. তদেব, পৃ. ১৯৪

ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য তদানীন্তন কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট ক্যামেরন একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। "...তত্রস্থ (হিন্দু কলেজের) প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে যে বালক নীতি বিষয়ে উত্তম রচনা করিতে পারিবেন তিনি স্বনাম স্বাক্ষরিত এক স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন।[১]

ক্যামেরন সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী নিয়মটি শীঘ্রই চালু হয় হিন্দুকলেজে। এবং ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সিনিয়র বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের স্মিথের পুস্তকের পরীক্ষাও গৃহীত হয়। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারি রিপোর্টে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"The prizes for proficiency in Adam Smith's Moral Sentiments, given by the President of the Council of Education, were contended for at the Institution on the 11th March.

The answers to the questions were all written in the presence of the President without reference to books or other assistance.

The answers were examined by the President, and he awarded the Gold Medal to Annundkissen Bose, and the Silver Medal to Rajnarain Bose...".[২]

স্মিথের পুস্তক রাজনারায়ণ কতটা অধিগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার পরিচয় রয়েছে পরীক্ষার খাতায়। দেশভেদে, জাতিভেদে reason-এর উপর প্রতিষ্ঠিত right and wrong-এর যে কিরূপ তফাত হয়, এবং তাতে এককালে প্রচলিত 'rude sympathy'-র চেহারাটা যে কি-রকম বদলে যায়, তা রাজনারায়ণ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।[৩]

এইভাবে দেখা যায় যে, রাজনারায়ণের ছাত্রজীবন তাঁর জীবনের বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়। স্কুল-কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে

---

১. বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার সংবাদ— (ইং ১, ডিসেম্বর ১৮৪২) : দ্র. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ৩য় খণ্ড, (১ম সং), পৃ. ১৯৪

২. *General Report on Public Instruction in the LowerProvinces of the Bengal Presidency, for1843-44*, p. 33.

৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

আঠারো বছর বয়সে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। সময়টা ছিল ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক। কলেজজীবন থেকেই ইংরেজী ভাষা ব্যতীত রাজনারায়ণ পারসী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। "আমি যে সময়ে কলেজে পরিতাম সে সময়ে ইংরেজী, বাংলা, পারসী এই তিন ভাষায় সমান মনোযোগ প্রদান করিতে হইত···।"[১] এতদ্ব্যতীত "উক্ত ভাষাত্রয়ে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই।"[২] তা ছাড়া পিতা নন্দকিশোরের একান্ত যত্ন ও চেষ্টা পুত্রের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করেছিল। পারসী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য নন্দকিশোর গৃহে একজন মুনশী নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর নিজেরও আরবী, পারসীতে বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। এই সময়ে পিতার আগ্রহাতিশয্যে রাজনারায়ণকে বাংলা পাঠেও মনোযোগী হতে হয়েছিল।[৩]

'চরিতকথা' পাঠ তাঁর বাল্যকালের আর-এক গুণ। রাজনারায়ণের কলেজ-জীবনে আমরা তাঁর পুরাবৃত্ত পাঠের অতিরিক্ত আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। পুরাবৃত্ত মানবজাতির ইতিবৃত্ত, আর জীবনচরিত ব্যক্তিবিশেষের ইতিকথা। উভয়ই শিক্ষাপ্রদ। তবে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিবিশেষের জীবন-চরিত অধিকতর মূল্যবান। মানুষের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, মহাত্মা ব্যক্তিগণের জীবনচরিত অনুশীলনে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ হয়। রাজনারায়ণ সম্ভবত আপন চিত্ত ও চরিত্রের সমুন্নতির জন্য বাল্যকাল থেকেই চরিত-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। মনের কোণে বোধকরি তাঁর এই আশাই ছিল যে, একটি জীবনাদর্শের দ্যুতি আর-একটি জীবনাদর্শকে উত্তরকালে দীপ্তিময়ী করে তুলবে।

হিন্দু কলেজের প্রাথমিক কালের প্রায় সব ছাত্রদের 'বহুগ্রন্থপাঠী' বলা যায়। ভূদেব, মধুসূদনের জীবনে এর পরিচয় রয়েছে। রাজনারায়ণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কলেজের সুবৃহৎ পাঠ্য-তালিকার স্তূপ অতিক্রম করেও তিনি পাঠ্যবহির্ভূত প্রচুর পড়াশুনো করতেন

---

১. *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1843-44.* Appendix D. p. IXVIII

২. রাজনারায়ণ বসু, "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত", 'বিবিধ প্রবন্ধ', পৃ. ২৬

৩. তদেব. পৃ ২৭

অল্প বয়স থেকেই। কলেজের ছুটির দিনগুলোতে মাঝে মাঝে যেতেন বোড়াল গ্রামে। সেখানে তাঁর আলস্যের সহস্র সঞ্চয় হত মেকলের রচনাবলী থেকে। কলেজ পরিত্যাগের পরেও রাজনারায়ণ নিয়মিত পাঠ থেকে বিরত হন নি। রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে যখন (অক্টোবর ১৮৪৪) ভ্রমণে (গৌড় ও রাজমহল) গিয়েছিলেন, তখন ভ্রমণের পূর্বে পিতা নন্দকিশোরকে লিখিত পত্রে তাঁর বইয়ের তালিকা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। রাজনারায়ণ পিতাকে লিখেছিলেন, "I will take with me a set of Hume large typed which I have procured..."[১] ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে তিনি লিখেছেন, "এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনাবলী ('মেকলে'জ এসেজ') পাঠ করি। তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম।"[২]

এইভাবে বাল্যকাল থেকেই রাজনারায়ণের পাঠের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় তিনি অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতেন না। "রাস্তায় যদি কোন তামাশা হইত, তাঁহার মাতা বলিতেন, "রাজনারায়ণ একবার দেখ্ না।" তিনি বলিতেন, "ও সব দেখে কি হবে মা?" এই বলিয়া পুস্তকে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন।"[৩] বাল্যকালের এই অধ্যয়নশীলতা তাঁর পরিণত-বয়সেও সমান গভীর ছিল। স্ব-লিখিত ডায়ারির বিবরণ থেকে এ-বিষয় জানা যায়।

ডায়ারির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

> ৪ আষাঢ়, ১৭ জুন, মঙ্গলবার—
>
> ...অদ্য Max O'Reills John Bull and his Island গ্রন্থ পাঠ করি, অতি কৌতুহলজনক গ্রন্থ।
>
> ১০ আষাঢ়, ২৩ জুন, সোমবার—
>
> ...জোন্স সাহেবের সঙ্গে "Monir Williams—...Life in India বিষয় কথা হয়।
>
> ১৮ আষাঢ়, ১ জুলাই, মঙ্গলবার—
>
> অদ্য প্রাতে রাসবিহারী দত্ত ও হেডমাষ্টারের সঙ্গে "Sir George Birdwood's Manufactures India" পাঠ করি। ইহার প্রথম ভাগে আমাদিগের দেবদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে।

---

১. কলকাতা থেকে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর রবিবার পত্রটি লিখিত।

২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ২০

৩. "স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু", 'অন্তঃপুর' পত্রিকা, মাঘ ১৩০৬, পৃ ৮৩

২৩ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার—

…বৃন্দাবন দাস রচিত "চৈতন্য ভাগবত" পাঠ করিতেছি।

১৫ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর, শনিবার—

অদ্য "Max Muller's Biographical Essays" পাঠ করি, তাহাতে রামমোহন রায়ের, কেশববাবু ও দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনচরিত আছে।

২৪ অগ্রহায়ণ, ৮ ডিসেম্বর সোমবার—

…অদ্য "Max Muller's Biographical Essays নামক পুস্তকে বুন্সনের (Bunson's) জীবন পাঠ করি।

ডায়ারির পাতা এইভাবে ভরে আছে কত জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের তালিকাতে।

কৈশোরেই রাজনারায়ণের চিত্তে জেগেছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা। পুস্তকপাঠে ও দেশভ্রমণে তাঁর সেই চিত্তগত পিপাসা নিবারিত হয়েছিল। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানগুলির মাহাত্ম্য কথা তিনি কিশোরকালেই জেনেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ১০ নভেম্বর রাজমহল থেকে পিতাকে রাজনারায়ণ লিখেছেন :

From Malda, I have proceeced to Rajmahal, a place celebrated for its salubrious position, for its magnificent ruins and for its vicinity to a range of delightful little hills.

পুস্তক-পাঠ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির লীলাপাঠে মানুষের চিত্ত ও জ্ঞান— উভয়েরই প্রসারতা। রাজনারায়ণ এ-জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল কৈশোরেই। মালদা থেকে পিতাকে পত্রে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন : "Travel I repeat is a kind of education …" পত্রটি মালদার ইংলিশবাজার থেকে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩ নভেম্বর লিখিত।

হিন্দু কলেজের দুই যুগ— ডিরোজিও যুগ, ও রিচার্ডসন যুগ। ডিরোজিও যুগের মূলমন্ত্র ছিল জ্ঞানেই শক্তি। কিন্তু রিচার্ডসন যুগে জ্ঞান শক্তিপ্রদায়িনী বটে, আবার আনন্দরূপিণীও। রিচার্ডসনের ছাত্ররা এই দুই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তাঁরা শক্তি প্রেরণায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন দেশ ও সমাজের

কর্মে; আর আনন্দের অনুভূতিতে পরিবেশন করে গেছেন সাহিত্যরস। এঁদের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা, অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা অতুলনীয় কর্মনৈষণা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রাজনারায়ণ, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হিন্দুকলেজের রিচার্ডসন যুগের অন্যতম সৃষ্টি। রাজনারায়ণ এঁদেরই সমগোত্রীয়।

বাল্যকাল থেকেই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য, নির্জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে মা তাঁকে 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' বলে কৌতুকানুভব করতেন। অল্প বয়সেই অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের জন্য তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোনোরকম চঞ্চলতা ছিল না। শিশুকালেই 'ঘুঙুরে'র কড়াইগুলি না খুলে দিলে তিনি পরতেন না, মাকে কখনো খোঁপায় 'সোনার পুঁটে' পরতে দিতেন না। রাজনারায়ণের এইরকম সব আচার-আচরণ লক্ষ্য করে বয়স্করা তখন তাঁর 'আমিন' হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

স্কুল-কলেজে পাঠকালীন রাজনারায়ণের এমনই স্বভাব ছিল যে, নিজের সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব অপেক্ষা বয়স্কদের সংসর্গে থাকতে এবং তাঁদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করতে ভালোবাসতেন। এই বয়সেই কখনো বয়স্ক ব্যক্তিদের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সোজাসুজি বলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। অথচ গাম্ভীর্য— যে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তা সবসময় রক্ষা করে চলতেন। এ-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য যথার্থ: "আমার এমন স্মরণ হয় না যে, যে আট বৎসর কলেজে ছিলাম, সে আট বৎসর মাষ্টার সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ ও টাউন্ হলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর পাঠের সময় ব্যতীত আমি কখন গোণা দশটি কথার অধিক এককালে কহিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন কাল দূরে থাকুক, আমার সমস্ত জীবনে এমন ঘটনা হইয়াছে কি না সন্দেহ।"[১] প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে স্বল্পবাক্ হন, রাজনারায়ণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলেজে ভুলে সহপাঠীদের সঙ্গেও কখনো তাঁকে রহস্যালাপ করতে দেখা যায় নি। বন্ধুদের সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়ের আলোচনা অপেক্ষা, তাদের পরস্পর ব্যবহার-দর্শন এবং মনে মনে নানান্ লৌকিক ব্যাপার ও ঘটনার বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা ছিল তাঁর অধিক প্রিয়। হয়তো-বা এ উত্তরকালের শিক্ষাগুরুর আগামী বাস্তবোজ্জল দিনেরই স্বপ্নদর্শন।

---

১. রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত", 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড), পৃ. ২৬

রাজনারায়ণ ছিলেন আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান। তাঁর দীর্ঘ জীবনকালে পিতার সাহচর্য লাভ করেছিলেন জীবনের মাত্র উনিশটি বছর। এই স্বল্পকালেই তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছে মুলত পিতার চরিত্রপ্রভাবেই। পিতার প্রগতিবাদী দৃষ্টির সম্মুখে, ইংরেজী শিক্ষাগুণে রাজনারায়ণ হয়েছিলেন সাহসী, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ। ফলে পিতার নিকট ন্যায়-অন্যায় প্রকাশ করতে কোনোদিন কুণ্ঠা-বোধ করেন নি। অথচ তাঁর সে প্রকাশে ছিল শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয় ও নম্রতা।

কলেজ জীবনের অন্তে আত্মীয় রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রাজমহল গৌড় ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে কলকাতা থেকে পত্র লেখেন রাজনারায়ণ। বলাবাহুল্য পত্রটিতে রাজনারায়ণের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা নব্য ইংরেজী শিক্ষিত, মদ্যপানাসক্ত, অনুকরণ প্রবৃত্তিতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উচ্ছৃঙ্খল তরুণ ছাত্রের নয়, পরন্তু সাহসী, বিনয়ী, পিতৃআজ্ঞাপালনে যত্নশীল কিশোর রাজ-নারায়ণের শান্ত, সংযত, সুন্দর চিত্র। সুদীর্ঘ পত্রটির[১] কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল: "Babu Ramgopal will start next Wednesday from Chandpal Ghat for a voyage upwards in his newly constructed and beautiful steamer the Lotus. Ramgopal Baboo has advised me to accompany him, He will go as far as Moorshedabad and Malda. I went this morning to Baboo Ram Gopal's. He said that he would be very glad to take such a companion as myself with him.

...

I will be very sorry indeed if you refuse to allow me to adopt such a convenient opportunity of going with a respectable gentleman and in a fine steamer to improve my health and to satisfy a liberal and an innocent curiosity ; nor do I expect such a refusal from a person of your educated and anglicized feelings. Very glad on the otherhand I will be if you imitate the conduct of those Europeans who send their sons over sea and land, far and abroad.

...

১. কলকাতা থেকে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর পত্রটি লেখিত।

Hoping that you are well, that you will comply with my request yet resolving that whatever you will order will be obeyed by me."

পত্রটির আর দু-একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে পরিস্ফুট হবে আধুনিক পিতার ততোধিক আধুনিক পুত্রের মনোভাবটি :

"I will be very temperate in eating, drinking and study during the voyage."

"I take a little wine usually in the evening on account of the cool temperature of the atmosphere incumbent on the river." বহরমপুর থেকে রাজনারায়ণ এই পত্রটি লিখেছিলেন ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর। রাজনারায়ণ এই সময় আঠারো বছর বয়সের কিশোর।

রাজনারায়ণের জন্মসময়ে ও শিক্ষাকালে দেশের আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদির আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ কলকাতার ছাত্রজীবন তথা জনজীবনও। সর্বত্রই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ। তারই প্রভাবে মনুষ্যসমাজের পক্ষে যেমন বাল্য থেকে যৌবনের বিকাশের অবস্থার অন্তরায় হয়েছিল, তেমনি বিদ্যার্জন এবং ছাত্রদের চরিত্র-গঠনেও বাধার সৃষ্টি করেছিল। মানসিক পরিপুষ্টির জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়।...ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে— ইহাই স্বাভাবিক বিধান।"[১] বিশিষ্ট চিন্তাবিদ রুসো ও এইরূপ 'নেগেটিভ্ এডুকেশন'-এর পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্পর্কে রুসোর মতটি এখানে স্মরণীয়: "... the education of the earliest years should be merely negative. It consists, not in teaching virtues or truth, but in preserving the heart from vice and from the spirit of error."[২]

১, "শিক্ষাসমস্যা", রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, (বিশ্বভারতী ১৩৬৭), পৃ. ৩১১

২. Rousseau, *Emile*, Book II, p. 57

কিন্তু শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, রুসো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষাধীন ছাত্রদের যে বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছেন, তার কোনো-টিই বোধহয় তৎকালীন হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমাদের বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকালে যেমন উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় সরস, প্রাণবন্ত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর হৃদয় উপযুক্তরূপে কর্ষণ করে নেওয়ার। 'আবাদী জমিতেই ফসল ভাল ফলে, পতিত জমিতে নয়।' তাই বলা যায় যে-মাত্রায় হিন্দুকলেজের ছাত্ররা জ্ঞানার্জন করেছেন, সে-মাত্রায় তাঁদের মানসিক গঠন সুষ্ঠু হয় নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার অধিকাংশ তরুণ ছাত্রের জীবনে দেখা গেছে 'প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা।' মধুসূদনের জীবন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরন্তু অল্প বয়স থেকে অতিমাত্রায় মদ্যপানের জন্য রাজ-নারায়ণেরও পেটের পীড়া হয়, ফলে অতি আগ্রহ ও ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে কলেজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। হিন্দুকলেজের বেশির ভাগ ছাত্র কলেজজীবন থেকেই এইরূপ পানাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজ-নারায়ণের সুহৃদ ভূদেবের মতো নীতিবাগীশ ব্রাহ্মণসন্তান সেখানে খুব কমই ছিলেন। এ-সম্পর্কে রাজনারায়ণের উক্তিটি হিন্দুকলেজের তৎকালীন ছাত্রদেরই প্রতিধ্বনি বলা যায়। "আমি ও আমার সহচরেরা[১] এই মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।"[২] কাজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, এই-সব ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা, ও নীতি-উপদেশ ফলপ্রসূ হয় নি। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ও উপায়কে যে-সকল মনস্বী চিন্তাবিদ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন, তাঁরা নীতিশিক্ষার অসারতাই প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নীতিশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—'নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম'। রাজনারায়ণ কিন্তু নীতিশিক্ষার পক্ষ-পাতী ছিলেন। দীর্ঘদিন পরে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'সেকাল আর একাল' পুস্তক রচনা কালে, তিনি শিক্ষার মধ্যে নীতিশিক্ষার অভাব অনুভব করে লিখেছেন : "নীতিশিক্ষা না হইলে আমি বলি কোন শিক্ষাই হইল না।"[৩] রাজনারায়ণ,

---

১. সহচরদের মধ্যে ছিলেন— ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে শান্তিপুরে অনেক দিন কাজ করেছিলেন), প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র।

২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ ২৬

৩. রাজনারায়ণ বসু, 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৯১৪), পৃ. ৫৮

মধুসূদন, ভূদেব প্রমুখ হিন্দুকলেজের ছাত্ররা কলেজ জীবনে নীতিশিক্ষা সমধিক লাভ করেছিলেন পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু এঁদের জীবনে সেই শিক্ষার পরিচয় সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। অথচ উক্ত পুরুষদের জীবনে এই শিক্ষা কার্যকর হয়েছিল পরোক্ষভাবে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মদ্যপান নৈতিক অধঃ-পতন বলে অনুমিত হলেও, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের কাছে ছিল সভ্যতার লক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, খানা খাওয়ার ও মদ খাওয়ার দুটি স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল— একটি রামমোহন থেকে, অপরটি ডিরোজিও থেকে। "ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের ছাত্রদের পানে মাত্রাজ্ঞান থাকত না, তদুপরি এঁরা ইংরেজীখানার পক্ষপাতী ছিলেন। ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করে।"[১] রিচার্ডসন-শিষ্য রাজনারায়ণের পানদোষ ছিল। এ বিষয় তিনি নিজেই 'আত্ম-চরিতে' লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে রাজনারায়ণ এই মদ্যপানের বিরোধী হয়েছিলেন। 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে তিনি লিখেছেন: "ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্টসাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।"[২]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাজনারায়ণের শিক্ষালাভকালে দেশের আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। কিন্তু যে-বংশে তাঁর জন্ম, যে-গৃহে তিনি শিশুকাল থেকে বর্ধিত হয়েছিলেন, যে-শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন— তা তাঁর চরিত্রগঠনে, মানসিক পরিপুষ্টির বিকাশ সাধনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। রাজ-নারায়ণের বংশের কথা, গৃহের পরিবেশের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁর ছাত্রজীবনের শিক্ষকদের প্রসঙ্গ আলোচনা কালে বলা যায় যে এঁদের প্রভাবেই রাজনারায়ণের জীবনের লক্ষ্য হয়েছিল স্থির ও নির্দিষ্ট।

স্কুলজীবনের তিনজন শিক্ষকের কথা পূর্বেই বলেছি। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মজীবনীতে এঁদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। উমাচরণ মিশ্র ছিলেন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁরই শিক্ষাগুণে রাজনারায়ণের লেখনী ইংরেজী ভাষায় বলিষ্ঠ হয়েছিল। ছাত্রদিগের পাঠ্যবিষয় অধিগত করানোর পন্থা ছিল তাঁর চমৎকার। স্কটের 'আইভানহো', পোপের 'পোয়েমজ', প্রিয়রের 'হেনরি

---

১. রাজনারায়ণ বসু, 'সে কাল আর এ কাল' (২য় সং), পৃ. ৩২

২. তদেব, পৃ. ৪৮

টু এমা' এবং আরো নানান গদ্য, পদ্য এমনই দরদ দিয়ে পড়াতেন যে, তা শুধু মস্তিষ্কেই সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করত তা নয়, তা গভীরভাবে স্পর্শ করত ছাত্রদের হৃদয়। তাই স্কুলের ইংরেজী পড়ানোর কথায় শিক্ষক উমাচরণ মিত্রকে স্মরণ করে রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখেছেন : "···আমাদিগের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপে ঐ সকল কাব্য পড়িতেন তাহা কখন ভুলিবার নহে।" নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অতিরিক্ত পুস্তক পাঠের দ্বারা ছাত্রদের মনে তাঁর অনুরাগ সঞ্চারের চেষ্টার অবধি ছিল না। "উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না।" গণিত শিক্ষক রাধামাধব দে'র কথা স্মরণ করে রাজনারায়ণ আরো লিখেছেন : "গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি।"

হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে রাজনারায়ণের পাঠ্যজীবন সমধিক উন্নত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। রাজনারায়ণের ছাত্রজীবনে জ্ঞানের দীপশিখাটিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনাদানে দ্বিগুণতর উজ্জ্বল করেছিলেন শিক্ষক দুর্গাচরণ। তাঁর ছাত্রজীবনের এই প্রসঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে 'আত্মচরিতে'র পৃষ্ঠায়। রাজনারায়ণের নিজের উক্তিই এর পরিচয় দিচ্ছে : "দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন।" তাঁর দেশপ্রীতি ছিল প্রগাঢ়, স্বধর্মে নিষ্ঠা ছিল ততোধিক। ধর্ম-বিষয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা দেশের সবিশেষ উপকারের ধারণা তাঁদের উভয়েরই ছিল। ইনি ছিলেন দেশপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু ও তাঁর ইংরেজী শিক্ষক।

আদর্শ শিক্ষকের চরিত্রপ্রভাবে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য উভয়পক্ষের শ্রদ্ধা, প্রীতি সমান অংশ দাবি করে। তবে যুগপ্রভাবে, কালপরিবর্তনে উভয় সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি আর্যপূর্ব যুগে যা ছিল, আর্যযুগে তা ছিল না, প্রাচীনকালে যা ছিল, আধুনিককালে তা নেই। কাজেই রামমোহনের কালে যা হয়েছে, রাজনারায়ণের কালে তা আশা করা যায় না। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে

ডিরোজিয়ো-সহ তাঁর শিষ্যদের যা দেখেছি, রিচার্ডসনের শিষ্যদেরই দেখেছি ভিন্নরূপে। ডিরোজিওর ছাত্ররা হয়েছিলেন সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, আর রিচার্ডসনের ছাত্ররা সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিকরূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষাগুণে রাজনারায়ণের সুপ্ত শক্তির উন্মেষ হতে থাকে। ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত, এদিকে রিচার্ডসনের প্রভাবে সুগঠিত হয়েছিল রাজনারায়ণের সমগ্র জীবনের আদর্শ ও চরিত্র।

উনিশ শতকের আদর্শ শিক্ষক হেয়ার, ডিরোজিও ও রিচার্ডসন। হেয়ারের প্রসঙ্গ এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, হিন্দুকলেজকে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণের চেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, হেয়ারসাহেবকে স্মরণ করে রাজনারায়ণ পরিণত বয়সে সশ্রদ্ধচিত্তে ডায়ারিতে (অপ্রকাশিত) লিখেছেন : 'হেয়ার সাহেব আমার মানসিক বিকাশ ও সকল উন্নতির মূল।' রাজনারায়ণ পঠদ্দশায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর চরিত্রের মূলভিত্তি গঠনের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল বিদেশীয় শিক্ষকদের আনুকূল্যেই।

হিন্দুকলেজে পাঠকালীন যে-সব শিক্ষকের কাছে রাজনারায়ণ শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং যাঁদের চরিত্র-প্রভাবে তাঁর চরিত্র সুগঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রধানত হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, ভি. এল. রীজ সাহেব, কার সাহেব, হালফোর্ড সাহেব, ক্লিণ্ট সাহেব প্রভৃতি। এ-সব মনস্বী শিক্ষকগণের মধ্যে ভি. এল. রীজ সংশয়বাদী ছিলেন, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন তা ছিলেন না, কিন্তু নিজের ধর্মে তাঁর বিশ্বাসও ছিল না। শিক্ষকদিগের চরিত্রের এই দিক লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ পরিণত বয়সে আত্মচরিতে মন্তব্য করেছেন : "কবিরা কখনও সংশয়বাদী হইতে পারে না। রিচার্ডসন সাহেব যেমন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, তেমনি সুকবিও ছিলেন।"

ডিরোজিও ও রিচার্ডসন সমসাময়িক কালের নন। তবে আদর্শ শিক্ষক-হিসেবে দুজনেই সমতুল্য। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে হিন্দুকলেজের শিক্ষায় ও ছাত্রজীবনে এই দুই শিক্ষকের প্রভাব অসামান্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

প্রতিভাবান বালকদের জীবনে কেবলমাত্র বংশের ভাবধারার অনুসরণ, শিক্ষকদের আদর্শের অনুকরণই থাকে না, থাকে দেশীয় বা বিদেশীয় প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের অদৃশ্য প্রভাব। সর্বকালে সবদেশেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম

হয়েছে বলে জানা নেই। উনিশ শতকের বাংলাদেশের মহামানবদের জীবনের এটি একটি অনিবার্য সত্য সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের জীবনে প্রিয় গ্রন্থ ছিল বায়রনের জীবনী। বায়রনের আদর্শ-অনুযায়ী মধুসূদনের জীবনের সুনীতি-দুর্নীতির মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়েছিল। রাজনারায়ণ ছেলেবেলা থেকেই মেকলের ভক্ত। কাজেই তাঁর জীবনে মেকলের পরোক্ষ প্রভাব থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। অধিক বয়সে দেওঘরে বাসকালেও তিনি মেকলের রচনা, তাঁর জীবনী গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করতেন। 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'তে লিখিত তাঁর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করলে সে সম্বন্ধে জানা যায়:

২৯ কার্তিক—অদ্য "Life of Macaulay by George Trevelyan" পাঠ করি।...এই পুস্তকে অদ্য মেকলের শৈশব বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম। মেকলে এচোড়ে পাকা ছেলে ছিলেন। কিন্তু অনেক এচোড়ে পাকা ছেলে এচোড়ে পাকিয়া যেমন শীঘ্র বিস্বাদ হইয়া যায় মেকলে এরূপ ছিলেন না। তাঁহার বয়সের সঙ্গে তাঁহার স্বাদুতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, পরিশেষে তাঁহাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে লোকের সাধ মিটিত না।...[১]

কলেজের শিক্ষকদিগের বিষয় রাজনারায়ণ সবিস্তারে, নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধে এবং 'আত্মচরিতে'। এই-সব রচনা থেকে জানা যায় যে, রাজনারায়ণ যেমন শিক্ষকদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন, তেমনি শিক্ষকদিগের প্রতি তাঁর নিজেরও শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল অসাধারণ। রিচার্ডসন প্রসঙ্গে তিনি ('আত্মচরিত', পৃ ১৫-১৬) লিখেছেন: "তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারে না—।" কার সাহেবের কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সে রাজনারায়ণ লিখেছেন: "...আমি এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে স্কটলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি আর তিনি আমাকে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।" একই কালে ছাত্র-শিক্ষকের মধুরসম্পর্ক না থাকলে, ছাত্রের বৃদ্ধবয়সের স্মৃতিচারণ এত গভীর ও ভাবগ্রাহী হতে পারে না।

পাঠের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় গণিতে রাজনারায়ণের আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন না হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দুকলেজের গণিতের অধ্যাপক ভি. এল. রীজ

---

১. "দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৭০৮ শক, পৃ. ৪০

তাঁকে যে কত স্নেহ করতেন, রাজনারায়ণের স্বউক্তিই তার যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয় : "একদিন তাঁহার ক্লাসে বসিয়া আমি সম্মুখে কাগজ রাখিয়া তাহাতে আঁকড়ি জুঁকড়ি পাড়িতেছিলাম, তিনি আমার পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আমার দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া মুখটি আমার মুখের অতি নিকটে আনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেরূপ করিয়া বলিলেন, "সাহিত্যে এত ভাল, গণিতে ভাল নয় কেন ?" ('আত্মচরিত', পৃ. ১৬)

রাজনারায়ণের বাল্যসঙ্গী ও হিন্দুকলেজের সহধ্যায়ীগণ উত্তরকালে খ্যাতিমান দিক্‌পালরূপে এক-একজন প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি বাংলা-দেশের সমসাময়িক কালের ইতিহাসের এক-একটি উজ্জ্বল চরিত্র। সহধ্যায়ীদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীল-মাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি তখনকার কলকাতার শিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ।

দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ শতকে য়ুরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোকে এদেশ সর্ববিষয়ে উন্নত হয়েছিল। এমন-কি, মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীর গতিবেগ পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ যেমন একালে অনুসৃত হয় নি, তেমনি শিক্ষাধীন জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ অবলম্বন— এই ধারাবাহিকতা উনিশ শতকীয় জীবনধারায় পরিলক্ষিত হয় না। ব্রহ্মচর্য পালনে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে স্বভাবের গতিরোধ করা হত না, উপযুক্ত শিক্ষায় স্বভাবের সহজ, সুন্দর প্রবাহের পথ প্রস্তুত করে দেওয়া হত। এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবন হত সতেজ, সুন্দর। রাজনারায়ণের জীবনে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের তপোবনের আদর্শ অনুসৃত হয় নি। জীবনের প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তির অপ্রকৃতিস্থতার জন্যে কষ্টভোগ করেছেন ; অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই আক্রান্ত হয়েছিলেন কঠিন পীড়ায়। তারপর বিবাহ হয়েছে অল্পবয়সেই, তখনো তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন নি।

রাজনারায়ণের দুটি বিবাহ। প্রথম বিবাহ হয় ছাত্রজীবনে 'সেয়ালদহের' রামমোহন মিত্রের কন্যা প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে। পিতা নন্দকিশোর বসুর জীবদ্দশাতেই অকালে জলে ডুবে প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজনারায়ণ বসু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন হাটখোলার দত্ত-বংশে। দ্বিতীয়া পত্নী নিস্তারিণী দেবী অভয়াচরণ দত্তের কন্যা। অভয়াচরণ দত্তের চার

পুত্র (শ্যামাচরণ, বামাচরণ, আশুতোষ, নরসিংহ) ও এক কন্যার (নিস্তারিণী দেবী) বিষয়ই জানা যায়।

অভয়াচরণ ছিলেন উদার প্রকৃতির ব্যক্তি। সামাজিক ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য তিনি প্রাধান্য দিতেন না। ধর্মমতে তিনি শাক্ত হয়েও ব্রাহ্ম জামাতাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে হিন্দু বালিকার এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দত্তবংশে ও হিন্দুসমাজে প্রবল উত্তেজনা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। অভয়াচরণ এদিকে কর্ণপাত না করে আপন কর্তব্যকর্ম সমাধা করেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের কিছু দিন পূর্বেই রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন (১৮৪৬-এর প্রারম্ভে)।

কর্মজীবন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রাজনারায়ণকে অল্প বয়সে অর্থের চিন্তা করতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা ও ছোটো ভ্রাতাদের দায়িত্বভার তাঁর উপরেই আসে। ইতিপূর্বে ছাত্রাবস্থায় সতেরো বছর বয়সে (১৮৪৩ খ্রী.) রাজনারায়ণ প্রথমবার দার পরিগ্রহ করেন। এগারো বছরের বালিকা প্রসন্নময়ীও পরিবারের একজন, সুতরাং সমগ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের সময় রাজনারায়ণের বয়স মাত্র উনিশ বছর; তখনো অশৌচান্ত হয় নি, সেই শোকবিহ্বল অবস্থাতেই তিনি পিতৃবন্ধু দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না হলেও (হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না) তাঁর ধর্মপ্রাণতার কথা পিতার কাছে রাজনারায়ণ নিশ্চয় শুনে থাকবেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর মনে যে ধর্মভাব জাগে এবং তিনি যে একই কালে কয়েকটি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তার মধ্যে থেকে যথার্থ ধর্মপথের নির্দেশ পাওয়ার জন্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা মোচনের নিমিত্ত রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাজনারায়ণকে তাঁর কর্মপথের, তাঁর ধর্মপ্রচারের যথার্থ সহায়ক চিন্তা করে দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে উল্লসিত হন।

দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল পরমার্থসাধনা, উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন যে, দেশে খ্রীস্টধর্মের স্রোত বন্ধ করতে হলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য সভা সংস্থাপন করা প্রয়োজন। এদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বছর ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ। এই বছর দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন (১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন)। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় গঠনের পূর্বসূচনা বলা যেতে পারে। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই পৌষে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করবার পর থেকে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। কলকাতার সমাজে ডিরোজিওপন্থীদের পরে সর্বপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায় ব্রাহ্মসমাজকে। মিশনরিদের দৃষ্টান্তেই দেবেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে সভার অধীনে একটি বিদ্যালয়

স্থাপন করাও প্রয়োজন। উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের হৃদয়ে বেদান্ত প্রভৃতি জাতীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি মুদ্রিত করে দিতে পারলে দেশে খ্রীস্টধর্মের গতি রুদ্ধ হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে রামমোহন উক্ত আদর্শ-প্রণোদিত হয়েই একসময় ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনায় জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান করতে পারবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' পুস্তকে বলেছেন : "প্রথম যখন সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিত।" এ-সংবাদ নিঃসন্দেহে রামমোহনের উদারতার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু রামমোহনের অকালমৃত্যুতে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারের আদর্শ 'ব্রহ্মসভা'র মধ্যে যেন সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ; এবং এই সভার কাজ গতানুগতিকভাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ব্রহ্মসভায় বেদপাঠের সঙ্গে 'রামের অবতার মাহাত্ম্য' বর্ণনা সেই কথাই প্রমাণ করে।[১] দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, উক্ত সভায় 'জলস্রোতের মত লক্ষ্যহীন অবস্থায় লোকে আসে, যায় ; ধর্ম এখানে প্রাচীরবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অথচ ধর্মভাব মানবের হৃদয়বদ্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্মে যোগদান করার পর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ব্রহ্মসভার এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে উভয় সভাকে একীভূত করেন।

দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ক্রমে ধর্মচিন্তা সম্পর্কে মানসিক দ্বন্দ্বের নিরসন হলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করেন রাজনারায়ণ। এ হল ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়াকার কথা। দীক্ষান্তে উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মে যোগদান করলেন দেবেন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহাতিশয্যে। রাজনারায়ণ এইভাবে দুটি সংকট থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল উপনিষদ ইংরেজীতে অনুবাদ করাবেন। বলা বাহুল্য, রাজনারায়ণের ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান-গভীরতার বিষয় দেবেন্দ্রনাথের জানা ছিল। কাজেই এখন যোগ্য সহকর্মী

---

১. দ্রষ্টব্য : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরে পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', (১৩৮০), পৃ. ১৬

পেয়ে তিনি সেই কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট হলেন। অথচ সংস্কৃত ভাষায় রাজনারায়ণের জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু তিনি নিজে উপনিষদের শ্লোকসমূহ সংস্কৃত থেকে ব্যাখ্যা করে দিতেন, আর রাজনারায়ণ তা অনুবাদ করে যেতেন ইংরেজীতে। এইভাবে যুগ্ম-প্রচেষ্টায় কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল[১] এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একসময় (১৭৬৮ শকে) প্রকাশিত হয়েছিল নিয়মিতভাবে। রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' থেকে জানা যায় যে এই অনুবাদ খুব প্রশংসিত হয়েছিল। বীটন সভার সভাপতি কৈলাসচন্দ্র বসু -সম্পাদিত 'লিটারারি ক্রনিক্‌ল' (*Literary Chronicle*) এবং ডঃ রো -সম্পাদিত 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' (*Bibliotheca Indica*) পত্রে এই অনুবাদের যে প্রশংসা হয় তা রাজনারায়ণ নিজেই বলে গেছেন। সভার কর্মভারের জন্য রাজনারায়ণের মাসিক বেতন ছিল ৬০ টাকা মাত্র। তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যমণি দেবেন্দ্রনাথের কর্মোৎসাহে ও আনুকূল্যেই রাজনারায়ণের আর্থিক উপার্জন সম্ভব হয়।

স্বভাবতই এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। রামমোহন ইতিপূর্বে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় রাজনারায়ণকে সেই কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন কেন? আমরা জানি রামমোহন উপনিষদের শংকরভাষ্য অনুমোদন করতেন, (পুরোপুরি না হলেও) দেবেন্দ্রনাথ তা করতেন না। সম্ভবত এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় উপনিষদ অনুবাদের কাজে প্রয়াসী হন। ধর্মীয় ধারণার পার্থক্য এখানে বড়ো কথা।

বস্তুত এই কর্মে নিযুক্ত হয়েই রাজনারায়ণ হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সন্ধান প্রথম লাভ করেন। আমরা দেখব রাজনারায়ণের সমগ্র কর্মজীবনে ও চিন্তাধারায় উপনিষদোক্ত মর্মবাণীর প্রভাব কিভাবে, কতখানি কার্যকর হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে রাজনারায়ণ সমাজের আর-একটি কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই (১৮৪৬ খ্রী) রাজনারায়ণ সমাজে প্রায়ই বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ে ও আগ্রহে তিনি এই কর্মে সাহসী হন। কারণ তাঁর নিজের বাংলাভাষার জ্ঞান-সম্পর্কে নিজেরই সংশয় ছিল। রাজনারায়ণের ধারণা ছিল যে, তিনি ইংরেজীর মতো ভালো

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

বাংলা লিখতে পারবেন না। অথচ বাংলায় রচনার আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। তাঁর জীবনের এই সম্পর্কিত ঘটনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা[1] রচনা করে দেবেন্দ্রনাথকে দেখানোর সাহস হয় নি তাঁর। এইসময় নিয়মিত দেবেন্দ্রনাথের গৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। রাজনারায়ণ একদিন অত্যন্ত কুণ্ঠিত চিত্তে দেবেন্দ্রনাথের তাকিয়ার নীচে একটি রচনা রেখে চলে আসেন। পরদিন দেবেন্দ্রনাথের নিকট তিনি অজস্র প্রশংসা লাভ করেছিলেন এই রচনার জন্য। তাঁর আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত অমূলক প্রতিপন্ন হয়। এই বক্তৃতাটি রাজনারায়ণ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে ১৭৬৮ শকের ২৯ শ্রাবণ (১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে) পাঠ করেছিলেন। রাজনারায়ণের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর।

এরপর থেকে তিনি কলকাতা সমাজে একাধিকবার বক্তৃতা দেন। এবং মেদিনীপুরে নূতন কর্ম গ্রহণ করে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৮৪৬-৫০ খ্রী) তিনি ব্রাহ্মসমাজে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই-সমস্ত বক্তৃতা একসময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত এবং তার পর একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৭৮০ শকে)। উক্ত বক্তৃতাগুলিতে ঈশ্বরের প্রতি অসীম ভক্তি, প্রীতি, মানবজীবনের পরিণাম, সংসারের অনিত্যতা, মানবজীবনে পবিত্র সুখের কারণ ইত্যাদি বিষয় সহজ, সরল, অথচ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া কয়েকটির মধ্যে সর্বকর্মে শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও রাজনারায়ণ বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মারাধনাতেও শারীরিক সুস্থতার একান্ত প্রয়োজন। মনে হয়, অল্প বয়সে নিজের শারীরিক অসুস্থতাই তাঁকে অনুরূপ বিষয়ে লোকশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত করেছিল। রাজনারায়ণ এই সময় বেদান্ত-উপনিষদাদি পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। বক্তৃতাগুলিতে তাঁর সেই চিন্তা-মগ্নতারই প্রকাশ। বেদান্ত-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ একালে তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না। দূরদেশ ভ্রমণেও সঙ্গে থাকতেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে পুজোর সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণ উলুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর নদ নৌকাযোগে পার হয়ে বর্ধমানে যান। বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ বাহাদুরের আহ্বানে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ তাঁর অতিথি হতে বাধ্য হন।

---

১. প্রথম রচনার নিদর্শনস্বরূপ বক্তৃতার প্রথম পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল— "এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দিক অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীতি হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই— ক্ষমার আর পার নাই।..." —রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ১ম ভাগ।

রাজা তাঁদের আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজার প্রচেষ্টায় ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল।

একালে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে যে 'গ্রন্থসভা' (Paper Committee) স্থাপিত হয়েছিল, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ১৭৬৮ শক থেকে ১৭৭৪ শক পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক বিবরণের মধ্যে গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে সভার উপরি-উক্ত জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। কোনো প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী কিনা তা এঁদের দ্বারা নির্বাচিত হত। রাজনারায়ণ উক্ত সভার সঙ্গে বেশ কিছুকাল যুক্ত ছিলেন এবং তার পর হঠাৎ একদিন সভাটি বিলুপ্ত হয়। রাজনারায়ণ বসুর একটি রচনা (মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা : ৬ ভাদ্র, ১৭৭৫ শক) উক্ত সভা কর্তৃক মনোনীত না হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথের অসন্তোষ এবং তা থেকে সমাজে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই 'গ্রন্থ-সভা'র বিলুপ্তি ঘটে। এ-প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত পত্রগুলিই উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। ১৭৭৫ শকে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে মেদিনীপুরে একটি পত্র লেখেন : "…গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধব মণ্ডলী মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি।…কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ-পদ হইতে বঞ্চিত না করিয়া দিলে তার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত বক্তৃতা আশু বা বিলম্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অবশ্য প্রকাশিত হইবেক।"[১] রাজনারায়ণকে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত একটি পত্র (৩০এ বৈশাখ ?) থেকে জানা যায় : "তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষসভা কোন তারিখে উঠিয়া যায়, যদি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার একটি বক্তৃতা সংক্রান্ত মোকদ্দমাই উহা উঠিয়া যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারিবেন বোধহয়।…" রাজনারায়ণের রচনা যে উক্ত সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকত, তা এই থেকেই বোঝা যায়।

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, 'পত্রাবলী', ১০ নং পত্র।

কর্মজীবনের প্রথম কয়েক বছর রাজনারায়ণ কোনো কাজেই স্থিতিশীল হতে পারেন নি। ব্রাহ্মসমাজ তথা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিটি কর্মে জড়িত থাকাতে, দেবেন্দ্রনাথের ভাগ্যের গতিবিধি অনুসারে তাঁর ভাগ্যফলও নির্ধারিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ উক্ত সমাজ এবং ধর্মকে পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সমাজ ও ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজগত অনুষ্ঠানের নিয়ম-নীতি এবং ধর্মগত অনুষ্ঠান প্রণয়নে যত্নশীল হন। সর্বোপরি ব্রাহ্মধর্মে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির জন্য তিনি একালে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যেই একালে (১৮৪০-৪৫ খ্রী) গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন বেদ ও উপনিষদ চর্চায়। এ-বিষয়ে প্রথমে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তাঁর মৃত্যুর পর এখন একমাত্র রাজনারায়ণই দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত কর্মের সহায়ক, উপদেষ্টা ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন: "তখন ব্রাহ্মসমাজের আকাশে পশ্চিমকোণে এবং পূর্বকোণে, দুই কোণেই কালো মেঘ জমিয়াছিল এবং দুই দিক হইতেই এমন ঝড় ওঠে যে রাজনারাণবাবুর মত একজন সুদক্ষ মাঝিকে না পাইলে সমাজের কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে একলা ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা কষ্টকর ছিল।"[১] ঐতিহাসিকের এ উক্তি যথার্থ। ১৮৪৫-১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরকাল ব্রাহ্মসমাজের এই 'ঝড়ের' সময় ও দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষামূলক কাল। খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিবাদ, বেদ-চর্চার জন্য সবিশেষ আগ্রহ, পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুতে অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধের প্রস্তাবে জ্ঞাতিদিগের সঙ্গে মনোমালিন্য, অপৌরুষেয়তা নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে মতভেদ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ন— ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থা। এদিকে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পর ব্রাহ্মসমাজে কর্মকর্তা তখন প্রধানত তিনিই। রামমোহনের পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রচেষ্টায় সমাজের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের (২১ আশ্বিন ১৭৬১ শক) পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ সমাজের অন্যতম কর্ণধাররূপে উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সংকটকালে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রয়োজন ছিল একজন উপযুক্ত সহায়ক ও পরিচালকের। "রাজনারায়ণবাবু এইসময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৯১৬); সংস্করণ, ৬ মাঘ ১৩৭৭ পৃ. ১০১

কাজে যোগ দেওয়ায়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ একজন মস্ত সহায় পাইলেন।"[১] এতে তিনি সংকটজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেলেন, আর রাজনারায়ণও খুঁজে পেলেন তাঁর নিজের কর্মজীবনের প্রধান সূত্রটিকে।

খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিরোধের কারণ তাদের ব্যাপক খ্রীস্টধর্ম প্রচার এবং বেদান্ত ধর্মের বিরূপ সমালোচনা। খ্রীস্টান মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে রামমোহন একসময় উৎসাহিত করেছিলেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার-কর্মে। আমরা জানি যে, ডাফ্‌ এদেশে কেবলমাত্র শিক্ষাকর্মেই নিযুক্ত ছিলেন না, ধর্মপ্রচারের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন। ডাফের চেষ্টায় হিন্দু-সমাজের তরুণরা সহজেই এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এইভাবে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার সমসময়ে খ্রীস্টধর্মের প্রতি আনুগত্যের এক প্রবল স্রোত এসেছিল। তরুণদলের কয়েকজন খ্রীস্টানও হয়েছিলেন। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ প্রচণ্ড হল, যখন উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে জোর করে খ্রীস্টান করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ-সহ কলকাতার নামজাদা প্রধানরা উদ্যোগী হয়ে খ্রীস্টান হওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁরা সংগঠনমূলক কোনো কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থাপন করলেন 'হিন্দু-হিতার্থী' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। তৎকালীন কলকাতার খ্যাতনামা, অথচ রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এই কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রাজনারায়ণেরও এ-ব্যাপারে উৎসাহের অভাব ছিল না। উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি যে দেবেন্দ্রনাথকে সৎপরামর্শ দেন নি, তা বোধহয় জোর করে বলা যায় না। আমাদের এই অনুমান আরো দৃঢ় হয়, যখন দেখি উক্ত স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক রাজনারায়ণেরই সহপাঠী ও সুহৃদ স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এবং এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যখন দেখি, কিছুকাল পরেই (৩১ জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসংবৎ ৫২) রাজনারায়ণ দেশবাসীর অন্তরে জাতীয়ভাব উদ্দীপন করতে 'ধর্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়' স্থাপনে সংকল্পাধীন হয়েছেন। স্কুলটির নামকরণের (হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়) মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— উভয়ের উদার, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেও হিন্দুত্বকে কোনোক্রমেই বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন

---

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) ; সংস্করণ, ৬ মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ১০১

৬

না। বলা বাহুল্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী সমাজে সংস্কারকার্যে অবতীর্ণ দেবেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন রাজনারায়ণ। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ডাফের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের একালে আর-এক দফা বিরোধ হয়। পাশ্চাত্য-দেশের ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট মতের এবং ইংলণ্ডের হুইগদলের সঙ্গে টোরীদলের একসময় যে বিরোধ-বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল, তা অনেকটা হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে খ্রীস্টানধর্মের বিরোধেরই অনুরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম দশকে বাঙালীকে খ্রীস্টান করার পথে প্রধান অন্তরায় হল ব্রাহ্মসমাজ। সুতরাং ডাফের কর্মপ্রচেষ্টার আর-একদিক হল ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার। তাঁর এইরকম আক্রমণাত্মক মনোভাবের এক কারণ ছিল। ডাফ্ অনুমান করেছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষায় বাঙালীর মনের প্রসারতা বৃদ্ধি হলে, সমগ্র বাঙালী একদিন বেদান্তমত গ্রহণ করবে। এবং বেদান্তমতের প্রতি আকৃষ্ট বাঙালী ক্রমে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। আর তা যদি কোনোদিন হয়, তা হলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ইংরেজ মিশনারিদেরও এদেশ ছাড়তে হবে। আরো এক কারণ ছিল। সেকালে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে খ্রীস্টীয়েতর ধর্মকে বিশেষত হিন্দুধর্মকে অতি হীন মূর্তিতে চিত্রিত করলে, খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলে তথাকার দানশীল ব্যক্তিগণ প্রচারকাজে অর্থসাহায্য করতেন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অর্থের প্রয়োজনে সকল মিশনারিই এই উপায় অবলম্বন করতেন। বলা বাহুল্য, ডাফ্ও এই পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে (১৭৫৬ শকে) তিনি প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানেই ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে (১৭৬১ শকে) *Indian and Indian Missions* নামে পুস্তক প্রণয়ন ক'রে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করেন।[১] এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে তখন তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই রচনাগুলি পরে একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—*Vedantic Doctrines Vindicated* নামে।[২] দেবেন্দ্রনাথের এই রচনায়

---

১. দ্রষ্টব্য: 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', চৈত্র ১৮০৭ শক।

২. অনেকে অনুমান করেন এই প্রবন্ধগুলি দেবেন্দ্রনাথের রচনা, আবার রাজনারায়ণ বসুর রচনা বলেও অনেকের অনুমান।

রাজনারায়ণের কোনো উপদেশ, সংপরামর্শ, সাহায্য যে একেবারে ছিল না এ কথা বলা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে; ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া থেকে ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন-মূলক কোনো কাজে নিযুক্ত না হলেও, একালে তিনি যে পরোক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের সর্ববিধ কর্মে যুক্ত ছিলেন, তা আমরা জোর করেই বলতে পারি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে একালে আর-একদফা মতপার্থক্য হল দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের। ধর্মজ্ঞান প্রচার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। সেই অনুসারে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত-বিষয়ক রচনা ছাড়া ধর্ম ও দর্শনচিন্তামূলক রচনাদি প্রকাশ করতেন। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে, জগৎ ও জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের ধারণার বৈশিষ্ট্য দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন। 'একমাত্র পরম ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ সত্তাতে জগতের ভ্রম হচ্ছে, কেবল ব্রহ্মই আছে, জগৎ সৃষ্টিও হয় না, এখনো নেই। জগৎ সৃষ্টি কখনো হবে না। জীবন ও ব্রহ্মের ভেদ নেই, অভেদ'— ব্রাহ্মসমাজ ছিল বেদান্ত-দর্শনের এই তিন দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত। শংকরের মতও এই। বেদান্তদর্শনের মতে রামমোহনের সঙ্গে শংকরের মতের সাদৃশ্য যেমন ছিল, বৈসাদৃশ্যও ছিল। অক্ষয়কুমার প্রথম অনুরূপ ধর্মমতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন ও বিচারে প্রয়াসী হন। এইভাবে তাঁর নির্দেশিত পথেই দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত-উপনিষদাদির ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। তাঁর আর-এক লক্ষ্য ছিল— বেদান্ত-উপনিষদাদির দৃষ্টান্তেই পৌত্তলিকতা পরিহার করে একেশ্বরের উপাসনা কিভাবে প্রবর্তন করা যায়। এর জন্য তাঁর সুবিস্তৃত প্রচেষ্টার কথা আমাদের জানা আছে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণও বেদান্ত-উপনিষদাদির চর্চায় যেমন নিবিষ্ট হতেন, তেমনি নিজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্র পাঠে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। এর পরিচয় আমরা তাঁর 'ধর্মদীপিকা' গ্রন্থে পাই।

অক্ষয়কুমার আর-একটি প্রতিবাদের ঝড় তোলেন; তাতে দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত রাজনারায়ণকেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। অবশ্য তত্ত্ববোধিনী সভাতে রাজনারায়ণের যোগদানের পূর্বে থেকেই এই নিয়ে

অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল এর মাঝখানে রাজনারায়ণের শুভাগমন তাকে প্রবলতর করে তোলে। সূচনা হয়েছিল বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে। ব্রাহ্মগণের বিশ্বাস ছিল বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত, সুতরাং অভ্রান্ত। তত্ত্ববোধিনী সভাতে ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে অবধি অক্ষয়কুমার এই মতই ব্যক্ত করেছেন যে, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয়— সুতরাং অভ্রান্ত শাস্ত্র হতে পারে না। আরো এক কথা, অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে, জগতের সমস্ত কার্য প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে, ঈশ্বর সেই নিয়মের উপর কোনো কাজ করেন না। তা হলে ঈশ্বরের কাছে সেই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করে ফল কি? যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা যা সংঘটিত হয়, তার জন্য প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নেই। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে একবার কোনো বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার প্রশ্ন উঠলে অক্ষয়কুমার এই মত প্রকাশ করেন।[১] বলা বাহুল্য, রাজনারায়ণও এই ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলেন। অর্থাৎ এঁরা প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করতেন ও বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলে মানতেন। কিন্তু প্রথমে এঁরাও ছিলেন বেদান্তবাদী।

অবশ্য এই মীমাংসা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সহজে করে উঠতে পারেন নি। ফলে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব নিরসনেই অশান্তচিত্ত নিয়ে রাজনারায়ণ-সহ গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে যাত্রা করেন। রাজনারায়ণের সঙ্গে বেদ-বেদান্তচর্চা, ধর্মকথা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ব্যতীত এইসময়ে তাঁর অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হত না। ভ্রমণের প্রতিদিনকার ঘটনা এইসময় রাজনারায়ণ 'দৈনন্দিন লিপি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন। সময়টা ছিল ১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাস।

ইতিমধ্যে দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদ (১ অগস্ট ১৮৪৬ লণ্ডনে মৃত্যু হয়) প্রাপ্ত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শেষ পর্যন্ত পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করতে মনস্থ করেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশ ও সমাজের কথা চিন্তা করলে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এটি বিশেষ দুঃসাহসিক কর্ম সন্দেহ নেই। এ কাজেও তাঁর অন্যতম সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিলেন রাজনারায়ণ। ব্রাহ্মধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে এইসময় থেকে প্রায়ই উভয়ের নানারূপ চিন্তা ও পরিকল্পনা চলত।

১. দ্রষ্টব্য : মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি. 'শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত', কলিকাতা, ১৮৮৬

রাজনারায়ণ এ-সম্পর্কে তাঁর 'আত্মচরিতে' লেখেন, "ঠিক যে ব্রাহ্ম প্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দুসমাজের কথা বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।" এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথকে বহু বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঠাকুরপরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়; ইংলিশম্যান কাগজে Justicia ছদ্মনামের অন্তরালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এই সূত্রে বিভেদের বীজ প্রবেশ করে। এই প্রকার সংকট মুহূর্তে একমাত্র রাজনারায়ণই মহর্ষির পার্শ্বে থেকে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। তিনি দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করে ইংলিশম্যান ও তত্ত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্যের সমর্থন করেছিলেন। মহর্ষি Justicia-র যে প্রতিবাদ করেছিলেন তাতেও রাজনারায়ণের সমর্থন ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নানা দিক থেকে বিপর্যয় দেখা দেয়। তাঁর আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এইসময় রাজনারায়ণেরও আর্থিক দুশ্চিন্তা আসে। এদিকে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা দেবেন্দ্রনাথের এই অবস্থা-বিপর্যয়ে লোপ পাবার উপক্রম হয়, এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা অনতিবিলম্বে (১৭৬৮ শকাব্দে) বন্ধও হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজনারায়ণকৃত উপনিষদের অনুবাদের কাজও বন্ধ হয়। শুধু তাই নয়, "...১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কার্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।" —আত্মচরিতে রাজনারায়ণ এ কথা অকপটভাবেই প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ মন্দীভূত হয়ে পড়ে। ফলে রাজনারায়ণকেও উক্ত সভার কর্মে ইস্তফা দিতে হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, এরপর দেড় বৎসর কাল তাঁকে বেকার থাকতে হয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যেও তাঁর অর্থগত যাবতীয় প্রয়োজন দেবেন্দ্রনাথই মিটিয়েছেন সাধ্যমতো।

এইসময় থেকেই রাজনারায়ণকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভাসমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হতে দেখা যায়। অবশ্য ইতিপূর্বেও যে তিনি সভার সঙ্গে বা কোনো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তা বলা যায় না। কারণ তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মে তিনি যুক্ত ছিলেন; গ্রন্থসভা, আত্মীয় সভায় (দেবেন্দ্রনাথ,

অক্ষয়কুমার স্থাপিত) যোগদানের কথাও আমাদের জানা আছে। তাঁর বক্তৃতাদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হত নিয়মিত। 'হেয়ার-স্মৃতি সমিতি'র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন ডেভিড হেয়ার পরলোকগমন করেন। হেয়ার স্মৃতি সমিতি সেই দিনটিতে তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতে থাকেন ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন থেকে। এই স্মৃতিসমিতির সম্পাদক ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তৎকালীন কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্মৃতিবাসরে প্রতি বছর বক্তৃতাদি দিতেন। এইভাবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১ জুনের স্মৃতি-সভায় সভাপতির আসনে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। আর এই বছরের প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ। তিনি স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ, সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি উইলিয়ম অ্যাডামের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। বস্তুত সমগ্র রচনাটিতে রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রীতির অদ্ভুত প্রকাশ ঘটেছে। রচনাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭০ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে।

একটা বছর রাজনারায়ণের অতিবাহিত হয় কোনোপ্রকার নির্দিষ্ট কর্মবিহীন অবস্থায়। অবশেষে তিনি ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে, ৭০ টাকা বেতনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।[১] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সংস্কৃত কলেজে তখন ব্যাকরণ,

---

১. সংস্কৃত কলেজ রেকর্ড থেকে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের সেক্রেটারির (এফ. জে. মৌয়ট) আদেশ-পত্রের অনুলিপি উদ্ধৃত করা গেল :

Extract from the Procedings of the Council of Education *dated 9th May 1849.*

(No VI) "Read letter from the Secretary Sanscrit College No 498 dated 26th April forwarding for the consideration and orders of the Council a letter from the 2nd master of the English class of the Sanscrit College tendering his resignation submits also 8 applications for the expected vacancy and requests that a person may be selected either from among the candidates whose applications are forwarded on the Council's List ordered : that Rajnarain Bose be appointed to the vacancy, upon condition of obtaining the Teacher's Certificate within six months of his taking charge of the class."

Sd/ F. J. Mouat

Secretary, Council of Education.

সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি— ইত্যাদি সব বিভাগের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ, যথা— তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালংকার, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। একবছর পরে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-বিভাগের অধ্যাপক হয়ে আসেন। রাজনারায়ণের পূর্বে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন নবীনচন্দ্র পালিত। ইনিও ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইংরেজী-বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন— হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র। এ-প্রসঙ্গে আরো একটা বিষয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষপদের সৃষ্টি হয় নি, কাজেই সেক্রেটারিই যাবতীয় কার্যভার নির্বাহ করতেন। রাজনারায়ণ বসু যখন সংস্কৃত কলেজে কর্মভার গ্রহণ করেন তখন উক্ত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন রসময় দত্ত, রাজনারায়ণের সহাধ্যায়ী গোবিন্দচন্দ্র দত্তের পিতা ছোটো আদালতের জজ।

সংস্কৃত কলেজে রাজনারায়ণের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এখানে তিনি কেবলমাত্র ক্লাসের ছাত্রদেরই ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন না, উত্তরকালের বাংলাদেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেরও তিনি ছিলেন ইংরেজী ভাষার শিক্ষাগুরু। এঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[১], প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এঁদের প্রধান হলেন রামগতি ন্যায়রত্ন। বলা বাহুল্য, ছাত্রদের মনীষার কষ্টিপাথরে শিক্ষাগুরুর প্রতিভার যথার্থ মূল্যমান নিরূপিত হয়।

রাজনারায়ণ জীবনের প্রথম ভাগেই আর্থিক কষ্ট ভোগ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেজন্য অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। তাঁর মন থেকে এই দুঃখ কোনো-দিন যায় নি। বহুদিন পরে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে (চৈত্র ১৭৯৫ শকাব্দ) দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের পূর্বেকার অবস্থা চিন্তা করে যে পত্রটি লেখেন তাতে তাঁর

---

১. এই সম্পর্কে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর জীবনী'র অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল: "বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে দুর্গাচরণ বাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তার সূচনা হয়, এবং সেই আত্মীয়তা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে।" পৃ. ৭৬-৭৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র পত্রযোগে ঘটনার সত্যতা জানিয়েছিলেন।

বেদনাকাতর হৃদয়ের পরিচয় একটি ছত্রেই পরিস্ফুট হয়েছে "আমার ব্যয়ের ভার লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে ৭০ টাকা বেতনে কষ্টকর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"[১] এর দ্বারা বোঝা যায় যে কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক ছিল উভয়ের মধ্যে।

কয়েকবছর ধরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণও ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় যে জটিল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এর মধ্যে একে একে সেগুলি থেকে উত্তীর্ণ হবার সময় আসে। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই-সমস্ত সমস্যা উত্থিত হয়েছিল এবং তার সমাধানও হয়েছিল। বেদ ও উপনিষদ্ পাঠে দেবেন্দ্রনাথের বহুকাল-পোষিত ধারণার পরিবর্তন হল। দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন যে, বেদে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুয়েরই কথা আছে। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় তিনি পূর্বাবধি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবন-নিয়ামক মত ও পথ সেই অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছিল। এমন-কি, তিনি ঋগ্বেদের একটি বাক্যকে[২] একালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোভূষণ করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক এইসময় (১৮৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতির পরিবর্তন সংসাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এ রামমোহন-রচিত ব্রহ্মোপাসনা থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কলকাতা সমাজের প্রথম দিককার 'কার্য' (নামান্তরে উপাসনাও বলা যায়) কিভাবে সম্পন্ন হত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন রাজ-নারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে : "ঐ অধ্যায়ে প্রথমে "স্বভাবমেকং কবয়ো বদন্তি" এই শ্লোক আছে সেই অধ্যায় সমস্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে "জ্ঞ কাল কালো" শব্দ আছে সেখানে "জ্ঞ" অক্ষরের উপর ভয়ানক জোর দেওয়া হইত।" ব্রহ্মোপাসনার যে দুই মহাবাক্য— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এবং আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি—এর সঙ্গে যুক্ত হল শান্তং শিবং অদ্বৈতং। দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের সাধনার এই আধ্যাত্মিক বিকাশের বোধকরি অন্যতম সহযোগী ছিলেন রাজ-নারায়ণ। সংস্কৃত গায়ত্রী মন্ত্র জপ সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না ; তাই দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী পরিবর্তন করে বাংলা ভাষায় মন্ত্রের অনুবাদ পাঠ অনুমোদন করলেন।

ইতিপূর্বে (১৮৪৪ খ্রী) মহানির্বাণ-তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র সংশোধন করে

---

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৮০।

২. বাক্যটি হল এই—অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

'নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়', প্রভৃতি যে চারিটি শ্লোক প্রস্তুত করা হয়েছিল উপাসনাকালে তা-ই পাঠ করা হত। উপাসনায় এ-পর্যন্ত এই রীতি চলে আসছিল। দীর্ঘকাল পরে (১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের অনেক পরে) 'নমস্তে সতে তে'— এই স্তোত্রের শেষে তার বাংলা অনুবাদ যোগ করা হয়েছিল এবং 'অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—এই প্রার্থনা-মন্ত্রও যুক্ত হয়েছিল। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী অনু-সারেই এ-নিয়ম করা হয়েছিল। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে এ-সম্পর্কে বলেছেন, "ওঁ নমস্তে সতে তে ভগত-কারণায়"[১] ইহার বাংলা অনুবাদ এবং "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়"[২] এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী হইতে লওয়া হয়।"[৩] এইভাবে নানা পরিবর্তনের পর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালীর ব্রহ্ম-স্তোত্রের একটা নির্দিষ্টরূপ স্থির হল। ব্রাহ্ম-প্রতিজ্ঞাপত্রও অনেক সংশোধনের পর একটা রূপ পেয়েছিল। রাজনারায়ণের মতো এমন যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে না পেলে দেবেন্দ্রনাথ-কৃত উক্ত কর্মগুলি সহজে ও শীঘ্র হয়তো সম্পাদিত হত না। রামমোহন ব্রহ্মসভা (পরবর্তী সময়ে দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক রূপান্তরিত ব্রাহ্মসমাজ)

---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৩. উপাসনাপ্রণালীতে রাজনারায়ণ দীর্ঘদিন পরে কিছু সংযোজন করতে এবং গায়ত্রী মন্ত্র ব্রাহ্মসমাজে সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় (১লা মাঘ ১৮১১ শক,) প্রকাশিত সংবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; "ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদের প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট ২টি প্রস্তাব করেন। তাহার প্রথমটি এই যে আমাদের আরাধনায় 'সত্যমজ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম' প্রভৃতি যে স্বরূপ পাঠ করা হয়, তাহার সঙ্গে "ধর্মাবহ পাপনুদং ভগেশং" ইহাও যোগ করা হউক। শুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্ ইহাতে শুধু তাঁহার নির্মলতা ও পাপরোহিত্য বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার নামে পাপ ক্ষয় হয় ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এটি বেশ বুঝা যায় না। এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে গায়ত্রী মন্ত্র যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই গায়ত্রীতে অনুপ্রাণের ভাব স্পষ্ট আছে। "তিনিই আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" জীবনের শেষভাগে ডায়ারিতেও তিনি এ কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।*

* ১৭ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর. বৃহস্পতিবার (১২৯২ সাল, ১৮৮৫ খ্রী)—অদ্য সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা হয় তাহাতে বজরংবিহারী গান করেন। আমি উপাসনাতে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরে "ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" ব্যবহার করি।

সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র। তারপর তার স্থিতিসাধনের জন্য ব্রহ্মস্তোত্র সংকলন, দীক্ষা-প্রণালী, উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি প্রবর্তনের তাৎপর্য গভীরভাবে চিন্তা করেন দেবেন্দ্রনাথ ; তাঁর মুখ্য সহকর্মী ছিলেন রাজনারায়ণ। কিন্তু জাতীয় কোনো চিহ্ন ধারণ করা, না-করা নিয়ে ক্রমেই নানারূপ গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল।

সমস্ত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন, এবং ব্রাহ্মধর্মেরও ভিত্তি-ভূমি নির্ধারিত হবে— এমন এক ধর্মপুস্তকের প্রয়োজন দেবেন্দ্রনাথ বহুকাল অবধি অনুভব করছিলেন। রাজনারায়ণ মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে দীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইংরেজীতে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি মহর্ষিকে উৎসাহিত করেন 'ব্রাহ্মধর্ম'গ্রন্থ রচনার জন্য। উক্ত পত্রের বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হল : "আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের উন্নতি ও পুনঃপ্রচার যখন আপনার জীবনের ব্রত তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করুন।"[১] বলা বাহুল্য, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই যে ব্রাহ্মধর্মের সার সত্য নিহিত আছে, তা এই বয়সেই রাজনারায়ণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মহর্ষিকে পরামর্শ দিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের শ্লোকসমূহের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য প্রকাশ করা হোক— যাতে সর্বশ্রেণীর লোকই হিন্দুধর্মের সারই যে ব্রাহ্মধর্ম এ কথা বুঝতে পারেন। অনেক শ্লোকের বাংলা তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেন। রাজনারায়ণ মহর্ষি-রচিত 'ব্রাহ্মধর্মবীজ' সম্বন্ধে আত্মচরিতে লিখেছেন : "ব্রাহ্মধর্মবীজে সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্— তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটি মহর্ষির নিজের রচিত।... পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্মৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে, উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা।" বলা বাহুল্য, বাংলাসাহিত্যে ধর্মমূলক বক্তৃতা রচনার এক

১. এই পত্রটির বাংলা অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত" প্রবন্ধে ; দ্র. 'দাসী' পত্রিকা (ডিসেম্বর ১৮৯৫)।

বিশেষ দিকের সূত্রপাত হয় দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক বীজচতুষ্টয়[1] ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা। এই-সমস্ত বীজের মূল ভাব অবলম্বনে ও ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের এক-একটি শ্লোকাংশ অবলম্বনে তখন থেকেই ধর্মমূলক বক্তৃতার প্রচলন হয়। রাজনারায়ণ-কৃত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা এইরূপ এক-একটি শ্লোকের মূল ভাবের অনুগরূপে রচনা। তাঁর প্রথম বক্তৃতার শিরোনামাস্বরূপ শ্লোকের অংশ হল "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এস-ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ"— এই শ্লোকাংশটি রাজনারায়ণের প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে এবং উক্ত শ্লোকের ভাব অবলম্বনে সমস্ত বক্তৃতাটি রচিত। এইভাবে শ্লোকের বা শ্লোকাংশের[2] অনুসরণে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতাগুলি রচিত হয়।

বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কিনা এই নিয়ে যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের যে বাদানুবাদ চলে এতদিনে (১৮৪৯-৫০ খ্রী) তার একটা স্থির মীমাংসা হল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে কাশী থেকে বেদাধ্যয়ন করে ফিরে আসার পরই এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। রাজনারায়ণ এ-সম্পর্কে তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, "দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুইজনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকাব্দের ১১ই মাঘ (১৮৫১ খ্রী) দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।" দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবত রক্ষণশীল ছিলেন। তবু তিনি যুক্তি ও তথ্যের আনুগত্য করে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট এবং নির্ভুল বলে মনে করেন নি। তাই রাজনারায়ণ মহর্ষিকে বেদ-সম্বন্ধীয় ধারণার প্রথম প্রবর্তকরূপে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত লিখে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেন যে, বেদের আধিপত্য থেকে ব্রাহ্মসমাজকে মুক্ত করার

---

১. দ্রষ্টব্য : বরদাকান্ত বসু -সম্পাদিত 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৯৬৪), পৃ. ৪

২. কয়েকটি বক্তৃতার শিরোনামা উদ্ধৃত হল :—

১ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ৯ পৌষ, ১৭৬৮ শকে পঠিত : "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক জ্ঞানেন"। ২ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ১ পৌষ ১৭৬৯ শকে পঠিত : "নিত্যো নিত্যানাং"। ৩ কলিকাতা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে ১১ মাঘ ১৭৭১ শকে পঠিত : "উপাসিতব্যং"।

গৌরব একমাত্র অক্ষয়কুমারেরই প্রাপ্য। রাজনারায়ণ এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। "জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য" নামক প্রবন্ধে তিনি দেখান যে দেবেন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মননশীলতা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে এই ভাবধারা প্রবেশ করত না। এই প্রবন্ধটি 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১২৯৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, রচনার পরে রাজনারায়ণ উক্ত প্রবন্ধটি দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন। ডায়ারিতে[১] এর উল্লেখ আছে।

বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট ও অভ্রান্ত কিনা— এই বিতর্কে রাজনারায়ণের দান নিতান্ত কম নয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, বাইশ বছরের একটি ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক বেদ-উপনিষদাদির ব্যাপক চর্চা করেছেন, ঐ নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাগুলিতে রাজনারায়ণ বেদান্ত ও উপনিষদ্ জ্ঞানের প্রভূত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে মহর্ষির অভিমত সমর্থন করতেন। কিন্তু প্রথম থেকেই অন্ধবিশ্বাস পরিহার করে যুক্তিপথের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই আত্মচরিতে বলেছেন: "আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।" ব্রাহ্মসমাজ বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় মনে করে নি কেন, তার আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের সমাজ-মন্দিরে "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj" নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বিবেক ও বুদ্ধির প্রয়োগ দিয়ে বেদকে ঈশ্বর বাক্য বলা যায় না, কারণ এতে কিছু কিছু ভুলও আছে। বেদের যে উক্তিগুলি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল, সেগুলি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে, কিন্তু যে আকারে বেদকে বর্তমানে পাওয়া যায়, তা নিশ্চয় কোনো ঋষির রচনা। 'জগদ্বন্ধু' নামক পত্রিকায় বেদ-প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার প্রতিবাদ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ।[২] তাতে বলা হয়েছিল যে,

---

১. ডায়ারির অংশ— ১ আশ্বিন, ১৬ সেপ্টেম্বর, (১২৯২ সাল, ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রী) বুধবার··· অদ্য দেবেন্দ্রবাবুকে মহেন্দ্রনাথ রায়ের লেখার প্রতিবাদ পাঠাই। মহেন্দ্রনাথ রায় অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত লেখক।

২. দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২, পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৭৪

"জগদীশ্বর প্রথম মনুষ্যের চিত্তেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহা সমুদয় যুক্তি ও পুরাবৃত্তান্ত এবং স্বয়ং বেদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এই প্রকার পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে ইহা শ্রুতি নামে খ্যাত হইল। পরে যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং ভাষারও প্রাচুর্য্য হইল তখন ঋষিসকল সেই পরম্পরা-গৃহীত বেদ-ভাবকে শব্দ দ্বারা গদ্য পদ্যতে রচনা করিলেন।"[১] রাজনারায়ণ বেদের ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্টতায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না। বেদকে তিনি যুক্তি ও বিচার দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন। আত্মপ্রত্যয় (Intuition) ও যুক্তি (Reason)— এই দুটি শব্দের উপর তিনি খুব জোর দিয়েছেন। বেদকে তিনি Revelation অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলেন নি। তাঁর মতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঋষিদের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই ছিল বেদের লক্ষ্য। বেদের মধ্যে যুক্তিসাধ্য বিষয় আছে— যা মানুষের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। জ্ঞানযোগী ও ভক্ত ছিলেন বলেই রাজনারায়ণ বেদের অপৌরুষেয়তাকে যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বেদকে অগ্রাহ্য করেন নি, আবার অন্ধবিশ্বাসে বা নির্বিচারে গ্রহণও করেন নি।

রাজনারায়ণের কর্মজীবনে বেদের সমস্যা ছাড়া আর-একটি সমস্যা এসেছিল সেটি প্রার্থনার সার্থকতা সম্বন্ধে। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। দীক্ষিত ব্রাহ্মদের মধ্যে বেদের অভ্রান্ততা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উপযোগিতা, এই-সব বিষয় নিয়ে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হয়। অক্ষয়কুমার মনে করতেন যে, ঈশ্বর তাঁর অখণ্ড নিয়মসকল কখনো উল্লঙ্ঘন করেন না, এবং নিন্দা-স্তুতি বন্দনার দ্বারা বিচলিতও হন না। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে লাভ কি? যা ঘটবার, তা বিনা প্রার্থনাতেই ঘটবে। রাজনারায়ণ এই অভিমত স্বীকার করেন নি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সকলেই প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করতেন। রাজনারায়ণ তাঁর *Religion of Love* নামক পুস্তকে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার (of Prayer. Chapter. V.) উপযোগিতা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রার্থনার দ্বারা মন বিশুদ্ধ হয়, ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় হয়, চিত্তে নির্মল আনন্দের স্ফুরণ হয়। চরিত্রশোধন ও আনন্দলাভের মুখ্য প্রয়োজনেই প্রার্থনার সার্থকতা। সাংসারিক কামনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা নয়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে ১৭৭১ শকাব্দের ১১ মাঘ

---

১. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', চৈত্র ১৭৬৮ শকাব্দ, পৃ. ৪৭৪

তারিখে রাজনারায়ণ যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে তিনি অক্ষয়কুমারের অভিমতের প্রতি কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন : "যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্তব্য কর্ম।... পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্তব্য কর্ম নহে। তাহা অত্যন্ত আনন্দজনক।" রাজনারায়ণের চিত্ত ছিল ভক্তি-বিগলিত। সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে তিনি হৃদয়ের ভক্তিভাব মিশিয়ে প্রার্থনার প্রাধান্য উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার প্রয়োজনে অবিশ্বাস করবার কারণ নেই।

ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা, প্রতিজ্ঞাপত্র, উপাসনা, সমাজগঠন প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে রাজনারায়ণ নানাভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের এও একটি বিস্তৃত অধ্যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে একাধিকবার পরিবর্তন ও প্রয়োজনবিশেষে পরিবর্ধন করা হয়। রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' বলেছেন : 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্র যে কত পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না।" ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিজ্ঞাপত্র[১] শেষবারের মতো সংশোধিত হয়ে চূড়ান্ত রূপ নিলে, এবং এই সময় থেকেই 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের' স্থানে 'ব্রাহ্মধর্ম' শব্দ যুক্ত হল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *History of the Brahmo Samaj* (Vol. I) গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৮৪৪ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মদিগকে দীক্ষার কালে শিখা ও সূত্র ত্যাগ করতে হত। দীক্ষার পর তাঁরা পুনরায় সূত্র ধারণ করতে পারতেন। একটা প্রথা বেশ কিছুদিন চলেছিল, সেটা হল যে, একটি ধুনুচিতে ধূপ জ্বালিয়ে দীক্ষার স্থানে আনা হত এবং সেই ধুনুচির আগুনেই যজ্ঞোপবীত পুড়িয়ে ফেলা হত। দীক্ষার্থীকে একটি আংটি দেওয়া হত, তাতে "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র খোদিত থাকত। কথিত আছে যে, মহানির্বাণতন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীদিগকে মন্ত্র দিতেন। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে' বলেছেন : "...যাঁহারদের ধর্ম-দীক্ষা হইবে, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। প্রথম লোক আনিবার জন্য যত্ন, পরে তাহারদিগকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবার জন্য যত্ন এখন তাহারদিগকে অনুষ্ঠানে বদ্ধ করিবার জন্য যত্ন হইতেছে।" রাজনারায়ণ ব্যতীত একা দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা এই 'যত্ন' কতটা কার্যকর হত বলা কঠিন।

---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্র সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত পূর্বে বিবৃত হয়েছে। প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করে দীক্ষা গ্রহণের বিধি সম্পর্কে রাজনারায়ণ যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আত্মচরিতের সেই অংশটুকু উদ্ধৃত হল : "যে সকল ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্ম' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনা সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন।" অর্থাৎ রাজনারায়ণের বক্তব্যে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে উপাসনা সময়ে কোনো বর্ণ-মূলক জাতিসূচক চিহ্ন ধারণ না করার প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করতেন প্রাথমিক যুগের ব্রাহ্মেরা। উক্ত ধর্মে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ সম্পর্কে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের এই ব্যবস্থা হইল যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া কোনো সমাজে আসিয়া বেদীর সম্মুখে উপবেশন করতঃ ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। উপাসনান্তে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিবেন। পরে সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য করিবার শক্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। আচার্য বা উপাচার্য এই প্রতিজ্ঞা পাঠের পূর্বে ও পরে দীক্ষার্থীকে ধর্ম-পালন করিবার উপযোগী উপদেশ প্রদান করিবেন।"[১] বলা বাহুল্য, এই সম্পর্কে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল ; এবং উক্ত বিজ্ঞাপনটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (ভাদ্র ১৭৮৫ শক) এক সময় প্রকাশিতও হয়েছিল। যা হোক, প্রতিজ্ঞাপূর্বক দীক্ষাগ্রহণের রীতিতে একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথের প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে, অপর দিকে এর দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের এক নূতন দিকের সূচনা হয়েছে। রাজনারায়ণ পরবর্তীকালে উক্ত অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন : "নূতন ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াই এই সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যেমন বাক্য-দ্বারা উপদেশ প্রদান হইবে, তেমনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক, কি সামাজিক, সকল উপদেশের পক্ষেই এই নিয়ম।"[২] কিন্তু এরই মধ্যে উক্ত নিয়মসকল (প্রতিজ্ঞাপাঠ পূর্বক দীক্ষাগ্রহণ ও ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী) প্রবর্তনের সময় থেকে সমাজজীবনে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল একটি বিক্ষোভ। বিক্ষোভটি হল এই যে, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত কি না। এই

---

১. রাজনারায়ণ বসু, "দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি", 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৪৬৩

২. তদেব, পৃ. ৪৬৫

নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল তা দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মীমাংসিত হয়।

সমাজে যখনই কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ অশান্তচিত্তে ভ্রমণে গেছেন রাজনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে। রাজনারায়ণের সঙ্গে এই নির্জন আলাপ-আলোচনায় তাঁর মনের দ্বন্দ্ব অনেক সময় অনেক প্রশমিত হয়েছে। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এইভাবে দেবেন্দ্রনাথ আর একবার ভ্রমণে বহির্গত হন। এবার তিনি ক্যাপ্টেন হিকি সাহেবের নেতৃত্বে 'যমুনা' নামক স্টীমারে আসাম প্রদেশে গমন করেন। সঙ্গী যথারীতি ছিলেন রাজনারায়ণ। এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে বর্ণনা করেছেন।

অল্প সময়ের ব্যবধানে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় সংগ্রামের সাময়িক অবসান হয়ে পুনরায় সাংস্কৃতিক উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। এ হল ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের কথা। সমাজের জন্য নূতন ত্রিতল গৃহে একটি সুন্দর মর্মর বেদিকা স্থাপিত হল। এই নূতন মন্দিরে, নূতন সংগীত, নূতন সমাবেশ এবং অভিনব ভঙ্গির প্রার্থনায় দেবেন্দ্রনাথ পরম সন্তোষে বাৎসরিক অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করেন। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ-বছর থেকেই সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত রাজনারায়ণ বসুর অপূর্ব কর্মকুশলতায়। তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের জীবন ছিল বুদ্ধি ও তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভক্তিভাবের প্রেরণা সেখানে ছিল না। এর কিছুকাল আগেই রাজনারায়ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই ত্রুটি তুলে ধরেছিলেন। ফলে মহর্ষি ফরাসী দেশের ক্যামব্রের পুণ্যশ্লোক আর্চবিশপ ফেনেলনের প্রার্থনাপাঠ অনুমোদন করেন যাতে প্রেমের ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, যে ধর্ম ফরাসী ধর্মযাজকের কাছে ছিল পরম আকর্ষণের বস্তু। রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের হয়ে সেই প্রার্থনাগুলির অনুবাদ[১] করেন বাংলা ভাষায়। উক্ত অনুবাদ পাঠ করে জনগণ আশ্চর্যরকম অভিভূত হয়েছিল। এইভাবে সমাজের উপাসনায় ভক্তির আবেগ সঞ্চারিত হওয়ায় একপ্রকার নূতনত্বের সৃষ্টি হল।[২]

---

১. দ্রষ্টব্য: অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬)

২. Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, 2nd Ed. 1919, Vol. I.

রাজনারায়ণের ভক্তিমূলক ভাবের বক্তৃতাগুলি পরম উপভোগ্য হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন : "আমার উক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা (১৮৪৬ থেকে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাতটি বক্তৃতা) ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার কারণ আমার পারশি শিক্ষা।"[১]

এইভাবে আমরা দেখি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক যুগে উক্ত ধর্ম ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতিবিধানে যত্নবান হয়েছিলেন রাজনারায়ণ এবং অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সমাজের জন্য কর্তব্য পালন করে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি নিরূপণে একাধারে উপদেষ্টা ও সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক, জ্ঞানমূলক বক্তৃতার মধ্যে প্রীতিভাব সঞ্চার করে তিনি যুগপৎ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও বাংলাসাহিত্যে ধর্মীয় বক্তৃতার মূল্যমান বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর রাজনারায়ণ সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অনুষ্ঠানে বদ্ধ করতে অগ্রণী হলেন। অবশ্য এই দিকে দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথেরও ছিল। রাজনারায়ণ নিজেই বলেছেন যে, "এই সময়ে ব্রাহ্মগণ যেমন সজীব, সচেষ্ট, উদ্যতহস্ত ও চিন্তাপরায়ণ ছিলেন, এমন তার তাঁহারা কখনই ছিলেন না।" বস্তুত একদিকে সজীবতা প্রাণোচ্ছলতার প্রেরণা অপর দিকে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাগিদ। তৎকালীন সমাজের কিরূপ অবস্থায় তাঁরা কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন, তা জানা যাবে রাজনারায়ণের রচনার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি থেকে। তিনি লিখেছেন : "...তাহার পূর্বে দেবেন্দ্রবাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান এবং তাঁহার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তদ্দ্বারা ধর্মের মূলমন্ত্র ব্রহ্মোপাসনার সারতত্ত্ব ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন। কেশববাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু কর্তব্য নিষ্ঠাবলে আহার-পানাদি সম্পর্কীয় জাতীয় নিয়মভঙ্গ ও স্ত্রীদিগের অবরোধরূপ দুর্গভঙ্গে সাহস ও যত্ননিয়োগ করিয়াছেন। এদিকে মিশনারীরা ব্রাহ্মদিগের ধর্মের যত দোষ দেখিতে পায়, শত্রুরা তাহা দেখাইয়া ব্রাহ্মধর্মকে মিথ্যাধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন অবস্থায় দেবেন্দ্রবাবুর মহার্ঘ উপদেশসকল প্রতিপালন নিমিত্ত, দেশের সাক্ষাৎ অনিষ্টকর কুপ্রথা-সকল নিবারণের নিমিত্ত

১. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৩২

এবং মিশনারীদিগের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন ও ব্রাহ্মধর্মের সত্যতা ও সারবত্তা প্রদর্শন নিমিত্ত ব্রাহ্মগণ অনুষ্ঠানের চর্চা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।"[১] রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকাকালেই অনুষ্ঠান প্রণয়ন -সম্পর্কিত মতামত জানিয়েছেন ও দেবেন্দ্রনাথকে নানারূপ পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজনারায়ণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর তাঁর দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র। রাজনারায়ণের জীবনে এটি দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বটে, কিন্তু গুরুত্বে প্রথম। কারণ এই কর্মক্ষেত্র থেকেই উত্তরকালের মহাপুরুষের বিচিত্র কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলাদেশের অনেক মনীষীকল্প ব্যক্তির (রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু) মুখের গঠন-বৈচিত্র্য বিচার করে চরিত্র সমালোচনা করেছেন স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্র-সহকারে। রাজনারায়ণ সম্পর্কে লিখেছেন তিনি: "...কপাল উৎকৃষ্ট। রাজনারায়ণবাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এইজন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারাণ বসুর বেশি ঝোঁক। ইহার ফল,—তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা'। রাজনারায়ণবাবুর মধ্য-কপালও ভরা ভরা— ইহাতে ইহার ঘটনার স্মরণশক্তি সূচিত হইতেছে। এইজন্য ইতিহাসে তাঁহার বিলক্ষণ দখল আছে এবং ছোট ছোট রাশি রাশি ঘটনার গল্প তিনি অজস্র করিতে পারেন এবং তাঁহার লেখাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়— তাঁহার লেখা "সেকাল-একাল" তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁর উপর দিককার কপাল ভরপূর থাকায় তাঁহার নানাপ্রকার মতলব (Plan) মাথায় আইসে— এবং নীচের দিককার কপাল ততটা ভরাট না থাকায় এক এক সময় সে সব মতলব অনেকটা ভাসমান-বিলাসী সৃষ্টিছাড়া হইয়া পড়ে।...রাজনারায়ণবাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটাকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়।... রাজনারায়ণবাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও যত্নভাব প্রকাশ পায়।..."[২]

শিল্পের ভাণ্ডারে বৈচিত্র্যের অনটন হয় না। যে-কোনো শিল্পেই শিল্পীর

১. রাজনারায়ণ বসু, "দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি", 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৪৬৪

২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মুখচেনা", 'বালক', চৈত্র, ১২৯২, পৃ. ৫৫-৫৬

কারুকর্মে উদ্‌ঘাটিত হয় শিল্পীর ঈপ্সিত বস্তুর রূপটি, অপর দিকে শিল্পের পরিপূর্ণ গঠন-সৌন্দর্য। এক কথায় শিল্পী কী চায়, তার শিল্পের স্বরূপ কী—দুইই বিকশিত হয় শিল্পকর্মে। রাজনারায়ণ বসুর চিত্রে কয়েকটি রেখার টানে শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন তত্ত্বজ্ঞানী রাজনারায়ণকে, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু রাজনারায়ণকে, কল্পনা-বিলাসী, সাহিত্যরসিক, স্বপ্নভাববিলাসী রাজনারায়ণকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রেখার মনোহর রহস্যের দ্বারা রাজনারায়ণের দেহগত লাবণ্য যেমন ফুটিয়েছেন, তেমনি শরীর ভেদ করে তাঁর অন্তরগত সৌন্দর্যেরও সন্ধান দিয়েছেন। শিল্পীর শিল্প সার্থক এখানে। চারুকলায় (Fine Arts) যা সম্ভব হয়েছে, সাহিত্য শিল্পে তা সম্ভব হয় না। কর্মের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক বাক্য ও অর্থের সম্পর্কের মতো অচ্ছেদ্য। মানুষের জীবনের কথা, তা তার কর্মেরই ইতিহাস। স্বল্পায়ু ব্যক্তির জীবনকথা অনেক সময় আয়ুষ্কালের দ্বিগুণ পৃষ্ঠা পূর্ণ করে। আমাদের দেশে শংকরাচার্য ও বিবেকানন্দের জীবনকথা তারই প্রমাণ। আবার সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালের অধিকারী ব্যক্তির কর্মজীবনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো কিছু থাকে না। রাজনারায়ণ যেমন দীর্ঘায়ুর অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁর জীবনও ছিল কর্মবহুল। সে-কর্মের স্ফুরণ হয়েছে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ-বৈচিত্র্যে। দেহ ও মন নিয়ে মানুষের কর্ম-বৈচিত্র্যের পূর্ণ বিকাশ। দেহগত বলবীর্য ও হৃদয়গত মাধুর্যে রাজনারায়ণের জীবন ছিল কর্মমুখর। "রাজনারায়ণবাবুর দেহ ভেদ করিয়া তাঁহার সকল ভাব বাহির হইয়া পড়িত।"[১] দেহমনের অসাধারণ সরলতার স্বাক্ষর রয়েছে সহজ জীবনের কার্যাবলীর মধ্যে। তবু বলব তাঁর দেহসৌষ্ঠবের তুলনায় তাঁর কর্ম অনেক বেশি মহৎ, তাঁর মন অনেক বেশি সুন্দর, তাঁর চিন্তাধারা অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের।

তিনি সংস্কৃত কলেজে কর্মে রত ছিলেন অতি অল্পদিনই। তারপর কলকাতা পরিত্যাগ করেন। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে তিনি যোগদান করলেন 'মেদিনীপুর জেলা স্কুলে'। এখানে তাঁর ছিল প্রধান শিক্ষকের পদ।

কর্মজীবনে উচ্চপদাভিষিক্ত হয়ে ধনবান হব, সাংসারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করব এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহের সন্তান তিনি, তাই একান্ত অভিলাষী

---

১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকল্পে", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৮৪৪ শক, পৃ. ১৬০। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিসভায় পঠিত।

ছিলেন সরল অনাড়ম্বর জীবনের। প্রথম জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদপ্রার্থী হয়ে বিফলমনোরথ হয়েছিলেন। এই বিফলতাই কিছুকাল পরে তাঁকে শিক্ষা-ব্রতের সংকল্প গ্রহণে অধিকতর দৃঢ় করেছিল। এবং জীবনের কোনো অবস্থাতেই এই সংকল্প থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। এই দিক থেকে তিনি রামতনু লাহিড়ী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয়। শিক্ষকতা উভয়েরই জীবনের ছিল ব্রত ও আদর্শ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরিণত বয়সে ছাত্র-শিক্ষা ও লোকশিক্ষা এ দুয়ের জন্যই পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু রামতনু ছিলেন সেকালের গুরুর মতো একনিষ্ঠ আচার্য।

বাংলাদেশে এই সময়টা ছিল (১৮৫১-১৮৫৩ খ্রী) নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। প্রাচীন ও নব্যপন্থী সকলেই এতে যোগদান করেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব হলেন সভাপতি, সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশ, এই সভার দ্বারাই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের পক্ষে পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি প্রেরিত হয়। অবশ্য ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তি হলে তবেই পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি প্রেরণ সম্ভব হবে। এরই পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ উক্ত সভা স্থাপন এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্রের প্রকাশ। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি পাঠানোর দুটি উপায়ই দু' বছরে (১৮৫১-১৮৫৩ খ্রী) অবলম্বিত হয়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীলকরদের অত্যাচার-অনাচার, অপর পক্ষে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন সাহেবের এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রবল উদ্যম। দু'বছর পূর্বে (১৮৪৯ খ্রী) 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে রামতনু লাহিড়ী বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন। আর ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন হাওড়া স্কুলে কর্মরত। বাংলা সাহিত্যে সুললিত গদ্যরচনায় আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে একালে। ১৮৫১-তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' ও অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হল।

বলা প্রয়োজন যে, মেদিনীপুরে যাওয়ার দরুন ব্রাহ্মসমাজের ও অসংখ্য হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রাজনারায়ণের সম্পর্ক সাময়িকভাবে ছিন্ন হলেও, সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের মধ্য দিয়ে ও পত্রপত্রিকাদির দ্বারা সংযোগ

বরাবরই ছিল। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকাকালীন বার বার তাঁকে পত্রাদির দ্বারা স্মরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত এই পত্রগুলির মধ্যে একাধারে প্রকৃত বন্ধুর প্রীতি, ভালোবাসা, হিতৈষীর শুভকামনা ও পথপ্রদর্শকের উপদেশবাণী একত্রে ভাষায় সমুজ্জ্বল। রাজনারায়ণ মেদিনীপুর থেকে পৌঁছ সংবাদ দিলে অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রোত্তরে (১ চৈত্র, ১৮৫১) প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় ব্যক্ত করেছেন : "আপনকার নির্বিঘ্নে পৌঁছ সংবাদ পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি কিন্তু যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, আবার সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোন সন্দেহ নাই। তবে সেস্থান নূতন এখানে যেমন সর্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্বদা তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন সেখানে আপনার তাহা দুর্লভ সুতরাং তন্নিমিত্ত কিছুদিন মনের অর্থের পরিবর্তে প্রিয় সুহৃদদিগের সংসর্গ ও আলাপ পরিত্যাগ করিতে হইল এবং প্রিয়-কর্মসকল হইতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল, (আর এক প্রধান কারণ এই যে অর্থের নিমিত্তে গণিত বিদ্যাতেও মনোযোগ দিতে হইল।) কিন্তু আপনি মনে রাখিবেন যে এখনও আপনি মর্ত্যলোকে আছেন। অতএব এ সংসারের স্বভাব কি প্রকারে একেবারে অতিক্রম করিতে পারিবেন।"[১]

রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষাব্রতী জীবনের শুভসূচনা হল মেদিনীপুরেই। এ সময় থেকেই মেদিনীপুরে সপরিবারে তিনি বসবাস শুরু করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেরও তিনি উত্তমরূপে শিক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে মেদিনীপুরে নিয়ে যান এবং উক্ত স্কুলেই ভর্তি করে দেন। এ সংবাদ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথের পত্র থেকে।[২] কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শিক্ষা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে নানা নির্দেশ দেন। কলকাতা থেকে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্রটি (২৯ পৌষ, ১৭৭৩ শক) হল এই : "তোমার ভ্রাতাদিগের কি প্রকার লেখা পড়া হইতেছে? বোধ হয় তোমারই বিদ্যালয়ে তাহারা ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রকার তুমি দেখিয়াছ যে আমি কতক বালককে ব্রাহ্মধর্ম্মে অধ্যাপনা করিতেছি, সেই প্রকার তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে পড়াইলে অনেক উপকার হয়।"[৩]

শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরেই যে স্থায়ী বাসস্থান নির্মিত হয়, তাতে অদ্যাবধি

১. রাজনারায়ণ-দৌহিত্রী ৺বাসন্তী চক্রবর্তী -সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

২. দ্রষ্টব্য : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২

৩. তদেব, পত্র ৪

দুর্গানারায়ণ বসুর[১] বংশধরেরা বাস করে আসছেন। সেখানে যাওয়ার কিছুকাল পরেই (১৮৫২।৫৩ খ্রীস্টাব্দে) রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার জন্ম। কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন "৭ই পৌষ অবশ্যই শুভদিন, সেই দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয়। স্বর্ণলতাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তমরূপে শিখাইতে হইবেক।" পত্রটি ৭ মাঘ ১৭৭৪ শকে লিখিত। পত্রের কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, ৭ই পৌষ সমাজের শুভদিন, সেইদিন স্বর্ণলতারও শুভ জন্মদিন।

মেদিনীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্তির সংবাদে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরবর্তী ৪ঠা মার্চ তারিখের এক পত্রে শিক্ষা-কমিশনকে (Council of Education) প্রথম জানান: I have the honour to report for the information of the Council of Education that Babu Rajnarain Bose has resigned his post of the Second Master of the English Department in the Sanskrit College on the 22nd ultimo having been appointed Head Master of the Midnapore School."[২] শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট থেকেও উক্ত সংবাদ জানা যায়।

মেদিনীপুর স্কুলের সঙ্গে রাজনারায়ণের শিক্ষক-জীবনের অচ্ছেদ্য সংযোগ। অতএব মেদিনীপুর স্কুলের পূর্ব ইতিহাস প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কিছু উল্লেখ করা গেল। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুন (১২ শ্রাবণ ১২৪১) তারিখের 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল:

"আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা অবগত লইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।"[৩] 'সমাচার দর্পণ'

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাজনারায়ণ বসু', সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৪

২. "Babu Rajnarain Bose, Second Master of the English department, having been appointed head master of the Midnapore School, resigned and was succeeded by Babu Biswanath Singh, master of the second class, section B., Junior Division, school department. of the Hooghly College."— *General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1850-51*, p. 33.

৩. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), ৩য় সংস্করণ পৃ. ৮৪

এই সংবাদটি 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক সমসাময়িক অন্য একখানি সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করেছিল। ঐ একই বছরের ৯ অগাস্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পুনরায় মেদিনীপুর স্কুল সম্বন্ধে যে সংবাদটি[১] প্রকাশিত হয়েছিল— তাতে বর্ধমানের মহারাজার অতি বদান্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। বর্ধমানের মহারাজার অর্থ-সাহায্যে ও কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর স্কুলটি মাত্র আঠারো জন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, ৯ অগাস্টের পরবর্তী কোনো শুভদিনে এই স্কুলটি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। অতঃপর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল তারিখের একখানি পত্রে মেদিনীপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত সালেরই ১৮ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' সেই পত্রখানির[২] নকল প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত ১৮৩৫।৩৬ খ্রীস্টাব্দে গভর্নমেণ্টের হস্তে স্কুলটির ভার অর্পিত হয়। ঐ সময় এর শিক্ষক ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন।

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুলাই থেকে এফ. টীড মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। টীড সাহেব এই পদে বহাল ছিলেন দীর্ঘ এগারো বছর। তাঁর সময়েই ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে গভর্নমেণ্ট-প্রবর্তিত নূতন আইনানুসারে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার সদরে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর স্কুলটি সেই সময় থেকেই জেলা স্কুলে পরিণত হয়।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, জেলা স্কুলে টীড প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন ১৮৪৪ সালে সাহিত্যসম্রাট

---

১. বর্ধমানের মহারাজা।- মেদিনীপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার কল্প আছে তাহার চাঁদাতে বর্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌণ্ডতাপুর্ব্বক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই বার্ত্তা প্রকাশকরণেতে আমাদের পরমাহ্লাদ জন্মিল।—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), ৩য় সংস্করণ, পৃ ৮৪

২. "...বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে মেদিনীপুর নিবাসী ও ইউরোপীয় লোকেরা এক সভা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পীড়িত লোকেরদের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাঁদা করিবেন।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪১২

৩. রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "আমার মেদিনীপুরস্থ কর্মে আমার পুর্বে দুইজন সাহেব ছিলেন। তাঁহাদের নাম Tydd ও Sinclair। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়।" আমাদের অনুমান, এ স্থলে তিনি জিলা স্কুল 'সংস্থাপনের' কথাই লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত স্কুলে ভর্তি হন; এবং এইখানেই তাঁর ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সূচনা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তেরো বছরের কিশোর মাত্র। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় মেদিনীপুরে সেট্‌লমেণ্ট বিভাগের অন্যতম ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন। ইনি ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুরে অবস্থান করেন।

ইতিমধ্যে টীড সাহেব ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুলাই ঢাকা কলেজে বদলী হয়ে যান, আর ঐ পদে অগাস্ট মাসে ডব্লিউ. সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব্ নিযুক্ত হন।[১] এই পদে আড়াই্ বছর থাকার পর ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।[২] সিনক্লেয়ারের মৃত্যুর পর রাজনারায়ণ বসু উক্ত পদে নিয়োজিত হন ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দেড় শত টাকা বেতনে। উক্ত দুই সাহেবের বেতন ছিল মাসিক তিনশত টাকা করে।

মেদিনীপুর জেলা স্কুলে এই সময়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ চ্যাটার্জী (সেকেণ্ড মাস্টার), ভোলানাথ ঘোষ (থার্ড মাস্টার), কাউর শীল (ফোর্থ মাস্টার), নীলাম্বর নাগ (ফিফ্‌থ্ মাস্টার) রাখালদাস দত্ত (সিক্সস্থ মাস্টার); ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে স্কুলে পণ্ডিত ছিলেন গুরুদাস বিদ্যালংকার। এ ছাড়া রাজনারায়ণ বসুর সমসাময়িক আরো কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন; এঁরা হলেন—হেড পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী,[৩] ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের মধ্যে স্বর্গীয় রসিকলাল ঘোষ, দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,

---

১. Mr. Tydd, the Head Master, having been removed to Dacca, Mr. Sinclair was nominated to the vacancy in August 1847. —*Report of the Council of Education for 1847-48* : Midnapure School অনুচ্ছেদের বিবরণ।

২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (১৮৩০-৪০), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭১৭

৩. "রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের অাদর্শে তিনি (ভোলানাথ চক্রবর্তী) 'সেই একদিন আর এই একদিন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ১৭৯৭ শকাব্দায় (১৮৭৬ খৃঃ অঃ) ফাল্গুন মাসে কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি বঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।" —যোগেশচন্দ্র বসু লিখিত অপ্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসু ও তৎকালীন মেদিনীপুর' রচনার পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৬

ভোলানাথ চক্রবর্তী সম্বন্ধে রাজনারায়ণ দীর্ঘদিন পরে ডায়ারিতে (অপ্রকাশিত) লেখেন— ১৩ শ্রাবণ, ২৭ জুলাই, ১৮৮৪ খৃঃ, অদ্য হরলালবাবুর মুখে আমার অতি পুরাতন বন্ধু এবং

দুর্গানারায়ণ বসু, নীলকমল দে, ও বাবুরাম মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষকগণ শিক্ষানৈপুণ্যে ও অন্যান্য গুণে সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[১]

প্রধানত শিক্ষক হিসেবেই রাজনারায়ণ আসেন মেদিনীপুরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় মেদিনীপুরের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মেদিনীপুরবাসীর নিমিত্ত তাঁর অশেষপ্রকার কল্যাণকর্মে তাঁরা রাজনারায়ণকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করছে।

শিক্ষকরূপে রাজনারায়ণ তাঁর শিক্ষাদর্শের সাফল্য কী পরিমাণ অর্জন করেছিলেন এই প্রসঙ্গে বিচার্য। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনিও আপন গুরুদিগের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। প্রথমত ছাত্রদের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ। শিক্ষাদানে রাজনারায়ণের ছিল দুটি অবলম্বন— মস্তিষ্ক ও হৃদয়। হৃদয় জয় করে মস্তিষ্কে আঘাত করলে মানসিক বৃত্তি বিকাশ সহজ হবে, এই ছিল তাঁর ধারণা। এইজন্য তাঁর শিক্ষাদান রীতিও ছিল স্বতন্ত্র। "আমি করিতাম কি না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের অর্থ একেবারে বলে দিতাম না, প্রশ্ন কৌশলে সেই স্থানের প্রকৃত অর্থটি তাহাদিগের মুখ দিয়া বাহির করাইতাম।"[২] এ রাজনারায়ণের নিজেরই উক্তি। তিনি আরো বলেছেন "…কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম।"[৩] আরও কি. "শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদ-জনক গল্প করিতাম তাহাতে বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত।"[৪] এটি শিক্ষাদানের আর এক কৌশল বটে। ডিরোজিওর প্রতি ছাত্রদের একান্ত

মেদিনীপুর কলেজের ভূতপুর্ব্ব হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত…পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যাহার পর নাই শোকাকুল হই। মেদিনীপুর জেলায় প্রবাস… ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যে এবং অধ্যয়ন কার্য্যে তিনি আমাকে উৎসাহের সহিত সাহায্য…কি উৎসাহ তিনি না প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি উপভোগ করুক। তিনি গত ৬ শ্রাবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" (…চিহ্নিত অংশ অস্পষ্ট)

১. যোগেশচন্দ্র বসু লিখিত 'রাজনারায়ণ বসু ও তৎকালীন মেদিনীপুর' নামক রচনার পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

২. রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল' (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৬

৩. তদেব।

৪. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৪৫

অনুরাগের কথা রাজনারায়ণ ছাত্রজীবনে অনেক শুনেছেন। রিচার্ডসনের আদর্শানুগত ছাত্র তো তিনি নিজেই। আরো জানা যায় "স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বাবু মহাশয়ের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্র, মদীয় জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার পড়াইবার প্রথম অঙ্গ ছিল, আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণশুদ্ধি ও গতিচ্ছেদ ঠিক হইত তিনি নিজেও বারবার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ত্রুটি করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাঁহার আবৃত্তিগুণে ছাত্রদের বোধগম্য হইয়া যাইত। আবৃত্তির পর ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। শব্দের প্রতিশব্দ বলিলেই ব্যাখ্যা হইত না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বলা হইত, তৎপরে তিনি উহার এক-একটি শব্দ হইতে তাহার অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও যথাস্থানে প্রয়োগ এবং অন্য লেখকদিগের গ্রন্থে তাহা কিভাবে উক্ত হইয়াছে, যতক্ষণ না তাহা বিশদরূপে ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, ততক্ষণ তাঁহার শিক্ষা দেওয়া শেষ হইত না। এই কারণে প্রাত্যহিক পাঠ বেশী দূর অগ্রসর না হইলেও ছাত্রগণ তাহাদের সে-দিনের সেই শিক্ষার মধ্যে ভবিষ্যৎ পাঠের অনেক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া রাখিত।"[১] এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের গুরু রিচার্ডসনের পাঠ্য প্রণালী আর-একবার স্মরণ করা যেতে পারে। উত্তম আবৃত্তি শেখানোর জন্য তিনি ছাত্রদের নাট্যালয়ে যাওয়ার উপদেশ দিতেন।

দেহমনে শক্তিসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের নিমিত্তও অনুরূপ আশা পোষণ করা কিছু আশ্চর্য নয়। ছাত্ররা 'প্রশ্নের চিহ্নের মত' ঠেস দিয়ে ক্লাসে বসে থাকলে যে তাদের দৈহিক শক্তির অপব্যয় হবে, ফলে মানসিক শক্তিরও বিকাশ ঘটবে না, যেহেতু দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ অচ্ছেদ্য ; শিক্ষাক্ষেত্রের এই তুচ্ছ, অথচ মৌলিক ত্রুটির প্রতি রাজনারায়ণের মতো শিক্ষকেরই দৃষ্টি ঠিক পড়েছিল। তাই তিনি ছাত্রদের 'পিঠের জন্য ঠেস ও পায়ের জন্য টুলে'র ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রদের শরীর রক্ষার জন্য খেলাধুলার বন্দোবস্তও তিনি করেছিলেন। মেদিনীপুর স্কুল-গৃহায়তনের মধ্যে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি র‍্যাকেট কোর্ট চাঁদার সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করে তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং এর জন্য প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কর্মভীরু বাঙালী, নির্ভরশীল বাঙালী— বাঙালীজাতির দীর্ঘকালের এই-সমস্ত অপবাদগুলি রাজনারায়ণ অপনোদন

১. যোগেশচন্দ্র বসু লিখিত 'রাজনারায়ণ বসু ও তৎকালীন মেদিনীপুর' নামক অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩৫

করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরী বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। এ-প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের তদানীন্তন সেচ বিভাগের কর্তা ক্যাপ্টেন বিডেল সাহেবের প্রশংসাবাণী[১] উল্লেখযোগ্য। জীবনের যে অতি মূল্যবান অংশ রাজনারায়ণ মানুষ-গড়ার কাজে নিয়োগ করেছিলেন তা চিরদিন সারা দেশবাসীর অকুণ্ঠ চিত্তের প্রশংসাবাণীর দাবি করে।

এ হল মেদিনীপুর স্কুলের তথা রাজনারায়ণের শিক্ষক জীবনের মূল বিষয়ের বিবরণ। এখনকার আলোচ্য বিষয় 'মেদিনীপুর জেলা স্কুলে'র সংগঠন, তার বাৎসরিক ফলাফল, ইনস্পেক্টরদের রিপোর্ট অনুসারে স্কুলের বিবরণ ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, টাড ও সিনক্লেয়ারের সময় স্কুলের কাজ গতানুগতিকভাবে চলেছিল। রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করে গেছেন—"তাঁহার (সিন-ক্লেয়ারের) সময় স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়।" রাজনারায়ণ এ জীর্ণ তরীর কর্ণধার হয়ে, এর ভগ্নদশার অনেক পরিবর্তন করেন। ক্রমে ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক সংখ্যারও বৃদ্ধি হয়।

পূর্বেকার মফঃস্বল স্কুল-কলেজগুলির ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। সরকারি কলেজ বা স্কুলে স্থানীয় পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও মান্যগণ্য বাঙালীদের নিয়ে 'লোক্যাল কমিটি' গঠিত হত। প্রথমে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' এবং পরে কাউন্সিল উঠে গেলে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এই কমিটির উপর স্কুল বা কলেজের পরিচালন-ভার অর্পণ করতেন। কিন্তু 'লোক্যাল কমিটি'র রিপোর্ট সরকারি রিপোর্টেরই অঙ্গীভূত হত। সরকারি শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (*General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency*) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ শিক্ষক থাকাকালীন স্কুলের 'লোক্যাল কমিটি'র সদস্য ছিলেন এঁরা : W. Luke (Judge), G. F. Cockburn (officiating collector), V. H. Schalch (Magistrate), E. B. Thring (Civil Surgeon), A. Davidson (Principal Sadar Ameen), G. Allan (Deputy Collector), Babu Issur Chunder Ganguly (Sub-Assistant Surgeon), Issur Chunder Ghosal (Deputy Magistrate)। কমিটির এই-সমস্ত য়ুরোপীয় সদস্যদের উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অবহেলার ভাব লক্ষ্য ক'রে

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

রাজনারায়ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আত্মচরিতে তাঁদের বিষয়ে কৌতুকপ্রদ কয়েকটি কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন।[১]

কিন্তু লোক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ রাজনারায়ণকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর কর্মের প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। সরকারি রিপোর্টগুলিই আজ তার সাক্ষীস্বরূপ। এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। স্কুলের কর্মে যোগদানের পরের বছরই (১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে) 'লোক্যাল কমিটি' যে রিপোর্ট[২] দেন, তাতে একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের প্রশংসাই লক্ষণীয়।

দু'বছর পরেই 'লোক্যাল কমিটি'র পরিবর্তন সাধিত হয়। V. H. Schalch, E. B. Thring, A. Davidson-এর স্থলে J. H. Revenshaw, W. Terry— প্রভৃতি ব্যক্তি স্কুল-কমিটির সদস্যভুক্ত হন। সরকারি রিপোর্টে স্কুলের দোষত্রুটিও দেখানো হত। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের সরকারি রিপোর্টেই স্কুলের দোষত্রুটির বিষয়ও উল্লেখ আছে—"A few minor defects of detail were pointed out to the Head Master and have doubtless since been rectified."[৩]—অর্থাৎ "পরিচালনাগত সামান্য দোষত্রুটি প্রধান শিক্ষকের

---

১. দ্রষ্টব্য: 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৪৭-৪৮

২. "Only two boys of the first class were examined throughout, and the general result of this was satisfactory; they were most proficient in History, Geography and grammer. In reading and the vernacular not so good, and in Mathematics deficient. The average age of the Class is 15 years. The general progress is good. No prizes are given in this class. The second class have passed a very good examination; they have done very well in History and Geography, fairly in grammer and Reading, and tolerably in Mathematics and the vernacular.... The third class has passed a very satisfactory examination indeed,···The fourth class has passed a very tolerably examination....The fifth class has done pretty well....The sixth class have generaly passed a fair examination··· This institution was visited and inspected in December last by the Secretary to the Council, who reported that on the whole he had reason to be pleased with the state of the school and its classes."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1851-52.* 'মেদিনীপুর স্কুল' অনুচ্ছেদ, পৃ. ১১৬

৩. *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1851-52*, 'মেদিনীপুর স্কুল' অনুচ্ছেদ, পৃ. ১১৬

দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেগুলি এতদিনে সংশোধিত হয়েছে।" ১৮৫৬ সালের শেষের দিকে, বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলি পরিদর্শন করে ইনস্পেক্টর প্রাট সাহেব যে লিখিত বিবরণ[১] দিয়েছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে, দু'বছর পরেই (১৮৫৬ খ্রী) স্কুলের বিশেষ উন্নতি হয় নি; অনুমান করা যায় যে, রাজনারায়ণের উচ্চমানের শিক্ষাদান প্রণালীই এর কারণ। রাজনারায়ণ তাঁর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে নিজে বলেছেন, "কিন্তু এরূপে পড়ানতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমার নিন্দা হইতে লাগিল।"

মহৎকাজে নিন্দা এবং বাধা-বিপত্তি অবধার্য। মেদিনীপুরের কল্যাণ-সাধন করতে গিয়ে রাজনারায়ণকে অনেক সময় অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছে, নিন্দাও শুনতে হয়েছে। তবে তাঁর সৎকাজের জন্য তিনি প্রশংসা যে একেবারে পান নি, তা নয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক সরকারি রিপোর্টের ('মেদিনীপুর স্কুল' অনুচ্ছেদ) এই মর্মের বিবরণটি পাঠ করলেই সে বিষয় বোঝা যাবে।—

"The Head Master Baboo Rajnarain Bose has been connected with this school since the year 1851. The committee consider him a very zealous officer, taking much pains with the boys in his class and always watchful over the interests of the school. By his exemplary conduct and his attention to the interests of the school he has gained for it a high reputation among the inhabitants of the district, who are now shewing their appreciation of the benefits of a sound English Education. The school appears to have flourished under the management of Baboo Rajnarain Bose."[২]

এইভাবে ক্রমশ সমস্ত জেলা স্কুলগুলি যে উন্নত হয়েছিল, তা তৎকালীন স্কুল-পরিদর্শক এইচ. উড্রো সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন।[৩]

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সময় মেদিনীপুর

---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1857-58*, Vol.1, Appendix A. pp 307-308.

৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

জেলা স্কুলটিকে নূতন বিধান অনুসারে হাইস্কুলে পরিণত করার জন্য রাজনারায়ণকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এরই ফলে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানানুসারে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর স্কুল থেকে সর্বপ্রথম সাতজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।[১]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকাকালীন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। মেদিনীপুর জেলাতে এই বিদ্রোহের উত্তেজনা প্রথম থেকেই কিছু কম ছিল না। ঐ অঞ্চলের সিপাহী-বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে; তাতে তিনি একটি চমকপ্রদ কাহিনীরও বর্ণনা দিয়েছেন: "আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল।"[২]

১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে পরিদর্শক ই. রোব লক্ষ্য করলেন যে শিক্ষক রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র শিক্ষায়তনটিরই ক্রমোন্নতি হয় নি, মেদিনীপুরের সাধারণ ব্যক্তিও শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। শিক্ষাবিষয়ক সরকারি রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে, পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত শিক্ষাও তখন মেদিনীপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও কতটা প্রচলিত হয়েছিল।[৩] এরজন্য যাবতীয় কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী প্রথমত এবং প্রধানত রাজনারায়ণ।

---

১. দ্রষ্টব্য: যোগেশচন্দ্র বসু লিখিত 'রাজনারায়ণ বসু ও তৎকালীন মেদিনীপুর' নামক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

২. 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৬৬

৩. "To this may be added that many of the Head Masters use their best endeavours to interest their fellow-laborers in their common work. Thus the Head Masters of the Midnapore, Cuttack, and Poree schools have introduced meetings for discussion on educational and literary subjects, in which the other Teachers and the pupils of the first class take a share."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1858-59*, Report of the Inspector of Schools.

স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই। ২৩৮ জন ছাত্রের স্থানে এ বছর হল ২৭০ জন। স্থানাভাবে দুটি অতিরিক্ত ঘর নির্মিত হল; এবং সর্বোপরি স্কুলের আয়ের কিছু উদ্বৃত্ত থাকাতে, কলকাতা থেকে নূতন শিক্ষক নিয়োগের কথা তোলেন পরিদর্শক মিঃ এইচ. উড্রো। এইভাবে মেদিনীপুর স্কুলের ক্রমোন্নতি হয়েছে, ছাত্ররা ক্রমশ পরীক্ষার ফল ভালো করেছে। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক হয়েছে নিবিড়। উভয়ের মধ্যে সাহিত্যাদি আলোচনার জন্য 'বিতর্ক-সভা'র আয়োজন হয়েছিল রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাতেই। প্রসঙ্গত তিনি নিজের ছাত্রদের বক্তৃতা-শক্তি ও চিন্তাশক্তি উন্মেষের জন্য 'বিতর্ক সভা'র আয়োজন করেন। এর দ্বারা স্কুলের ছাত্ররা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল; এবং এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচালক সমিতি রাজনারায়ণকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দের সরকারি শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট[১] তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। ঐ একই বছর মেদিনীপুর স্কুলের আরো কয়েকটি উন্নতিমূলক কার্যের সংবাদ[২] প্রকাশিত হয় সরকারি রিপোর্টে। এই-সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে বিদ্যমান ছিল রাজনারায়ণের একান্ত যত্ন, কঠিন পরিশ্রম ও প্রবল উদ্যম।

মেদিনীপুর স্কুলের 'বিতর্ক-সভার' কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া

---

১. "The results of the Examination on the whole cannot, the Committee think, but be considered as satisfactory, shewing that the instructive staff have paid due attention to their laborious work. Baboo Rajnarain Bose, the Head Master, is entitled to the special thanks of the Committee for his excellent management of his school, which appears just now to be in as flourishing a condition as could be expected."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1858-59.*

২. সংবাদটি হল এই : "Among the improvements introduced during the session under review may be noticed—

1. The adoption of the Rules as laid down in the Report of the School Committee for the improvement of schools bearing on the general management and discipline of schools. These rules are working well and bear evident marks of improvement over old ones.

2. The introduction of a system of discussion on a given subject amongst themselves conducted by the boys in the presence of the masters. An hour

আরো তিনটি বিষয় এ-থেকে জানা যায়; দুটি স্কুলের ছাত্রদের সম্পর্কে, আর একটি স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী বা সংগঠকগোষ্ঠী সম্পর্কে: ১. পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে প্রতি ছাত্রকে অন্য কোনো নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করতে দেওয়া হত এবং সেই পুস্তকের পরীক্ষা গ্রহণ করে নম্বর দেওয়া হত, ২. ছাত্র-শিক্ষক মিলিত হয়ে একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোলা হয়, এতে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল এবং এক পয়সা, দু' পয়সা হারে যে যেমন পারতেন দিতেন।

শিক্ষক হিসেবে রাজনারায়ণের কৃতিত্ব অসাধারণ। এর জন্য সমগ্র মেদিনীপুরবাসী যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, সরকার পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল।[১]

রাজনারায়ণ যে বছর (১৮৫১ খ্রী) থেকে মেদিনীপুর স্কুলের কাজ গ্রহণ করেন সেই বছর থেকেই ছাত্রেরা বৃত্তি পেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তৎকালে স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না;

---

devoted to the subject once or twice a week cannot but be very profitably spent.

3. Extra studies requiring the boys to study a given book, not comprised in the class course and giving marks for the same.

4. With a view to inculcate habits of benevolence and a desire to help the poor, a little subscription at the rate of a pice or two from such boys and masters as are able and willing to pay, is raised monthly from which the decrepid and the old are paid".—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1858-59*. p. 320.

১. "To the Head Master particularly the thanks of the Committee are due for his vigilance and attention to duties, and unwearied exertions to advance the interests of the school, which seems to be in as prosperous and healthy a condition as could be wished. The school is daily rising in the estimation of the people of the district, the poorer portion of whom actually yearn for instruction in it. Notwithstanding the establishment within the session of a Missionary school in the Town, which admits boys gratis, there are numerous new applications every months for admission into our school."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1859-60*, p. 226.

ছাত্রদিগকে যথাক্রমে সিনিয়র ও জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিতে হত। তৎপূর্বে এই স্কুল থেকে কেউ বৃত্তি পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁর সময়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে চন্দ্রকোণা নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দাস মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তরকালে (১৮৮৪-১৮৯ খ্রীঃ) মেদিনীপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শততে রাজনারায়ণের শিক্ষাব্রতী জীবন সমগ্র দেশের আদর্শ। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে ছাত্রদের জ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দিলেন যিনি, এমন গুরুকে ভাবীকালের ছাত্র-জগৎ চিরকাল প্রণাম জানাবে। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় ছাত্ররা পারদর্শিতা এবং শিক্ষা বিভাগের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করবে—এ-ধারণা রাজনারায়ণের কোনোদিন ছিল না। অধীত বিদ্যার দ্বারা তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে, সত্যের পথ স্থির ও নির্দিষ্ট হবে উত্তরকালে আদর্শ মানুষ -রূপে গড়ে উঠবে তারা— চিরদিনই এই শুভ-কামনাই ছিল তাঁর।

সেই মানুষ-গড়ার ব্রতেই রাজনারায়ণের জীবন উৎসর্গীকৃত। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়ার পূর্বে, যৌবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃত মানুষ প্রস্তুত না হলে বাংলা তথা ভারতের মঙ্গল সম্ভব নয়। এই কারণেই তিনি অর্থ ও প্রাচুর্যের প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং দেশের ছেলেদের মানুষ করার জন্য ডেপুটিগিরি অবলম্বন না ক'রে কলেজে উচ্চ অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করে দারিদ্র্যকেই বন্ধুরূপে বরণ করেছিলেন। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দু-একটিই আছে। বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী গোখেলের আদর্শ ছিল রাজনারায়ণের আদর্শেরই সমতুল্য। তিনি দেশের ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য নিজের সমুদয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনের স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করেছিলেন। এক সময় 'রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভা'য় বক্তৃতাকালে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে যদি শত সহস্র ব্যক্তিও এইভাবে স্বার্থকে পদদলিত করে তা হলে "দেখিব যে প্রকৃত স্বরাজ লাভের পথ শত সহস্র পদ অগ্রসর হইয়াছে।"

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণের বহুবিধ কল্যাণকর্ম শিক্ষায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। তাঁর কৃত বিভিন্ন প্রকার সদনুষ্ঠানে সমগ্র মেদিনীপুরবাসী উপকৃত। সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ শিক্ষক

হওয়া সত্ত্বেও মেদিনীপুরের সর্বত্র তাঁর মঙ্গলহস্তের স্পর্শ। এ ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরেরই সমকক্ষ।)

মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এক সময় এই লাইব্রেরি সংগঠনে তিনি যথেষ্ট সময় ও উৎসাহ ব্যয় করেছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক থাকাকালীন রাজনারায়ণ ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর মেদিনীপুর লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ[১] প্রকাশ করেন। এই বিবরণ থেকে লাইব্রেরির ইতিহাস জানা যায়।

মিঃ হেনরি ভিনসেণ্ট বেলীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মেদিনীপুর-বাসীরা; উক্ত লাইব্রেরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের জেলা কালেক্টর ও একই সঙ্গে পরম হিতৈষী বন্ধু। উক্ত জেলার তৎকালীন জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উৎসাহ ও অর্থসাহায্যে এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে ইনি মেদিনীপুরের তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ২৪০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। লাইব্রেরির বিভিন্ন খাতে এই অর্থ ব্যয়িত হয়। পাঠাগারের জমিটিও দানস্বরূপ প্রাপ্ত। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বেই নব-নির্মিত গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। মিঃ বেলীর প্রচেষ্টা সার্থক হল গ্রন্থাগারটির "বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরি" নামকরণে। এই গ্রন্থাগারে বেলী সাহেব নিজে বহুবিধ পুস্তক দান করে গেছেন। একসময় তিনি ইংরেজী, বাংলা— দুই ভাষারই পুস্তক সংগ্রহ করতেন। কলকাতায় অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পুস্তক প্রকাশিত হলে, বেলী সাহেব তাও সংগ্রহ করেছিলেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের পত্র[২] থেকে এ-বিষয় জানা যায়।

---

১. Brojendranath Bandyopadhyaya, "Rajnarain Bose on The Midnapur Library", *The Modern Review*, May 1934.

২. "বেলী সাহেবের নিকট হইতে 'মানব প্রকৃতির' প্রথম ভাগের মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাগ ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি কি তাহার কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। তথাকার যে যে মহাশয় প্রথম ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ গ্রহণ করিবেন না?

ইতি ২৮ চৈত্র (১৮৫১)

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত"

আরো অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি, পত্রিকা প্রভৃতি সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিঃ ককবার্ন (মেদিনীপুর জেলা-কালেক্টর), মহামান্য টাকাজী হোলকার, রাধানাথ গাঙ্গুলি, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও আগ্রার গভর্নমেণ্ট, এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিও পুস্তক দান করে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া স্থানীয় উচ্চপদস্থ-রাজকর্মচারী, উকিল, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সিভিল ও মিলিটারি ইংরেজি অফিসাদেরও প্রচুর দান (পুস্তক) এতে আছে। সবশেষে স্থানীয় 'বুক ক্লাব'ও পাঠকদের জন্য লাইব্রেরিকে কতকগুলি পত্রিকা ধার দিয়েছিল। এইভাবে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে লাইব্রেরির পুস্তক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯৩৬, এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দেই এই সংখ্যা দাঁড়াল ১৮৭০-এ।[১]

এর মূলে ছিল রাজনারায়ণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। একে আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত করার ভার নিয়েছিলেন তিনিই। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরে শিক্ষকতাকার্যে যোগদানের সময় থেকে তিনি ছিলেন এর সম্পাদক ও প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।"[২] রাজনারায়ণ কেবলমাত্র ভাণ্ডারী ছিলেন না, প্রকৃত গ্রন্থবোধ যে তাঁর ছিল— লাইব্রেরির শেল্ফে সাজানো পুস্তকগুলি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শিক্ষাব্রত নিয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে কাটিয়েছেন এবং উক্ত গ্রন্থাগারের গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন, কিন্তু তা মাত্র 'ভাণ্ডারী'র যোগ্যতা নিয়ে নয়, সেবকের সুষ্ঠু দায়িত্ববোধও তাঁর ছিল। এখানে তিনি যথার্থ সাধক, নির্লোভ, সর্বঅহংকারশূন্য যোগ্যতম পুরুষ।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে পরিদর্শক মিঃ এইচ. রিকেট্স্ রাজনারায়ণের উৎসাহ ও

"মেদিনীপুরস্থ কার্ত্তিকবাবুর নিকট পাঁচখান এবং বেলি সাহেবের নিকট একখান 'বাহ্য বস্তু' প্রেরণ করিয়াছি। এতদিনে পৌছিয়া থাকিবেক।...

ইতি ৩ আষাঢ় (১৮৫২)

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

উল্লিখিত পত্রাংশ রাজনারায়ণ দৌহিত্রী ৺বাসন্তী চক্রবর্তী সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত।

১. দ্রষ্টব্য: শ্রীরাসবিহারী রায়, "রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়", 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার শতবার্ষিক জয়ন্তী'।

২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২২২

প্রচেষ্টায় সুউন্নত গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হন এবং দেশের সর্বত্র অনুরূপ পাঠাগার স্থাপনের নির্দেশ দেন।

(মেদিনীপুরের ইতিহাসে তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে মেদিনীপুরে। দেশবাসী কিন্তু রাজনারায়ণের অপরিশোধ্য ঋণের কথা বিস্মৃত হতে পারে নি। গুণমুগ্ধ মেদিনীপুরবাসী তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গ্রন্থাগারটির নামকরণ 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিপাঠাগারে' পরিবর্তিত করে। উক্ত পাঠাগারটি শুধু মেদিনীপুরে নয়, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাধারণ পাঠাগার।[১] তাই এই পাঠাগার শুধুমাত্র মেদিনীপুরবাসীর শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু নয়, সমগ্র জাতির বিনম্র শ্রদ্ধার দাবি রাখে।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণের জীবনের এই আর-একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

মেদিনীপুরে তাঁর আর-এক ভূমিকা দেখি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকরূপে। তবে যাতে সকল বিষয়েই সেখানকার কল্যাণ হয়, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি তথায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন, এবং সাধারণের গ্রামোন্নতির জন্য পাঠশালারও প্রতিষ্ঠা করেন। এই-সমস্ত কাজ তিনি নিজেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন।

নারীজাতির উন্নতির জন্য তিনি মেদিনীপুরে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নারীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও স্নেহের চক্ষে দেখতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল, স্বাধীনতার বিষয়েও তেমনি তাঁর অনুরাগ ছিল। তবে স্ত্রীলোকদিগকে তিনি এই দুই ব্যাপারেই অত্যন্ত সংযত হতে বলতেন। তিনি বলতেন যে, "যখন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন হয়, তখন আমাকে একজন সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "বাবা আগুন নিয়ে খেলা, টের পাবা।"[২]

---

১. এই পাঠাগার সম্বন্ধে জানা যায় যে, বিগত শতাব্দীতে ও স্বদেশী যুগে মেদিনীপুর পাঠাগারে অনেক সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছে— তাঁরা হলেন অ্যানি বেসান্ট, সিস্টার নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি; উক্ত পাঠাগারের সঙ্গে এঁদের স্মৃতিও বিজড়িত হয়ে আছে।

২. 'রাজনারায়ণ (তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের অসম্পূর্ণ চিত্র, তাঁর এক [লীলাবতী মিত্র] কন্যা কর্তৃক প্রকাশিত)', পৃ. ৩

আজ থেকে শতবৎসরের অধিককাল পূর্বে রাজনারায়ণ কারিগরী বিদ্যারও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায়। মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখযোগ্য : (২২ জুন ১৮৬০ খ্রী) "অত্রত্য কতকগুলি কৃতবিদ্যের উৎসাহ বলে শ্রমজীবিদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি "নাইট স্কুল" সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ইহার সম্পাদকীয় কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন··· ।"

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মাণ, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার মুখ্যত রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাতেই হয়। উক্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ রাজনারায়ণের আগমনের পূর্ব থেকেই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। কোন্নগরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব (পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হয়েছিলেন) যখন মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন সেই সময় সম্ভবত ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি এখানকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১] শিবচন্দ্র দেব মেদিনীপুর থেকে বদলী হলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়। রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এই সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়। তাঁর সারাজীবনের সমস্ত কর্মেই দেবেন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা ও উৎসাহ ছিল। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ-কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলীর শুভ সূচনা হলে, দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে রাজনারায়ণকে পত্রে (২৯ পৌষ, ১৭৭৩) লেখেন : "আমি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক অবগত হইলাম যে, তুমি সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছ। সকল বিষয়েরই আরম্ভই 'ছোট্টো খাট্টো', তজ্জন্য নিরাশ হইবে না।"[২] উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো গৃহের ব্যবস্থা না হওয়াতে, প্রথম প্রথম তখনকার আবগারী সেরেস্তাদার বলাগড় নিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা-বাটীতে উপাসনা হত। তারপরে স্কুলগৃহে বা সংলগ্ন রাজনারায়ণ বসুর গৃহেই উপাসনাদির ব্যবস্থা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, মেদিনীপুরে সুদূর গ্রামাঞ্চলে (বিশেষ করে কাঁথি মহকুমা অঞ্চলে) অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ করলে রাজনারায়ণের এককালীন কর্মনিষ্ঠা ও প্রভাবের কথাই মনে পড়ে।

মেদিনীপুরবাসীদিগের 'ধর্মে মতি ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন বা বর্ধিত'

---

১. যোগেশচন্দ্র বসু, 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৪৩৭

২. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, 'পত্রাবলী', পত্র ২

করার জন্য রাজনারায়ণ নিয়মিত সমাজে বক্তৃতা দিতেন। "...গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধব মণ্ডলী মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। ইহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, ভক্তির প্রগাঢ়তা, উৎসাহের প্রবলতা, ভাবের সরলতা দীপ্যমান রহিয়াছে। এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন।"[১] —দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন রাজনারায়ণকে।

মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না অনেকদিন পর্যন্ত। সমাজের উপাসনার নিমিত্ত গৃহ নির্মাণ ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু অর্থাভাবে কাজ অসমাপ্ত পড়ে থাকে; এবং শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যেই নির্মাণকার্য সমাধা হয়। এ-বিষয়ে রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন— "ইহার নির্মাণে দুই সহস্র টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবেন্দ্রবাবু আট শত টাকা দেন।" ৭ আষাঢ়, ১৭৮৩ শকাব্দ কলকাতা থেকে ও ৩১ ভাদ্র ১৭৮৩ শকাব্দ শিলাইদহ (কুমারখালি) থেকে দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র দুটিতে এই সংবাদই পাওয়া যায়। "মেদিনীপুরের সমাজ-গৃহ অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই, কত টাকার অকুলান হইয়াছে জানিতে বাসনা করি।"[২] দ্বিতীয়টিতে জানতে চেয়েছেন "মেদিনীপুরে নূতন গৃহে কবে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। বোধ হয় এতদিনে গৃহের ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।"[৩] মেদিনীপুর-সমাজগৃহ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ যে কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তা এই পত্র থেকেই বোঝা যায়।

প্রথম গৃহপ্রবেশের দিন ধূমধাম হয়েছিল, তাতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীবিগের সঙ্গে হিন্দুধর্মাবলম্বীরাও যোগদান করেছিলেন। রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' তার বিবরণ দিয়েছেন। এই সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হয় ২৩ মাঘ, ১৭৭৫ শকাব্দে (১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। রাজনারায়ণ বসু এই উৎসব-সভায় 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণসকল সহজ, সরল ভাষায় ব্যক্ত করেন।

রাজনারায়ণ মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন একাধিকবার। মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি 'ধর্মালোচনা সভা'ও ছিল। এই সভাতে

---

১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ১০; ২৬ ফাল্গুন, ১৭৭৫ শকে লিখিত।

২ তদেব, পত্র ২৫।

৩ তদেব, পত্র ২৭।

ধর্মবিষয়ক আলোচনা হত। অল্পদিনের মধ্যে এটির স্থান অধিকার করে 'সঙ্গত-সভা'। 'ধর্মালোচনা সভা' তখন বন্ধ হয়েছে।

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং উক্ত ধর্মের আশ্রয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি সঞ্চারের জন্য রাজনারায়ণের শুভ প্রচেষ্টার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি দেবেন্দ্রনাথও তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য সব সময় নানান উপদেশ ও সদ্যুক্তি দিয়েছেন। উভয়ের মধ্যে লিখিত পত্রাদি ব্যতীত এগুলির বিষয় জানার এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই। 'পত্রাবলী' থেকে দেবেন্দ্রনাথের পত্রগুলি উদ্ধারযোগ্য। "···নিয়মিত রূপে যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হয় সেইখানেই যথার্থ কার্য্য সিদ্ধ হয়। তোমার চেষ্টাতে এমত মরুভূমি যে মেদিনীপুর তাহাও উর্ব্বরা হইয়াছে। তোমার ক্রমাগত যত্নেতে তুমি অল্পে অল্পে কৃতকার্য্য হইতেছ। মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া এখানে যে আসা হয় নাই ইহা সৎ যুক্তি হইয়াছে।"[১] মেদিনীপুর সমাজব্যবস্থা (ব্রাহ্ম-সমাজ)-সম্পর্কীয় উপদেশাদিও[২] দেবেন্দ্রনাথ সময়বিশেষে দিতেন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাতে স্থানীয় অধিবাসী যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। রাজনারায়ণ লিখেছেন (আত্মচরিতে): "মেদিনীপুরে এতদূর পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য

---

১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২৫। কলকাতা থেকে ১৭৮০ শকে লিখিত।

২ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী'র ৫৫ নং পত্রে (৫ ভাদ্র, ১৭৮২ শকাব্দে লিখিত) দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : "আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্য্যের কার্য্য সুন্দর রূপে কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না।··· কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উপাচার্য্য রাখিয়া রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া এইক্ষণে তাহাদের প্রতি নিরাশ হইয়াছি। এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিনজনকে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী করিয়াছি, তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।··· এতদনুসারে মেদিনীপুরেতেও যদি এই প্রকার করা হয় তাহা হইলেও তো ভাল হয়। লোক দেখান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কি কার্য্য। তথাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন কোন উত্তম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে উপাচার্য্যের কর্ম্মে বৃত করিলেও তো হয় এবং তাহার সঙ্গে তোমার একত্র বসিলেও তো হয়।"

দেবেন্দ্রনাথের মতানুযায়ী রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সমাজের জন্য কতখানি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা জানা যায় না ; তবে তাঁদের উভয়ের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা যে একই ছিল মেদিনীপুরে ধর্মপ্রচারের দ্বারা রাজনারায়ণ তার পরিচয় দিয়েছেন।

ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" তিনি আরো বলেছেন (আত্মচরিতে): "মেদিনীপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।" জানা যায় যে, মেদিনীপুরের জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অনিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে প্রভৃতি ব্যক্তি সামাজিক ক্রিয়াকর্মাদিতে পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলতেন।

আবার রাজনারায়ণের ধর্মজীবনের প্রভাবে সাময়িকভাবে মদ্যপান থেকে বিরত হয়ে, ধর্মজীবন লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন, এমন ব্যক্তি হলেন স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব।[১] ইনি সে-সময় মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। "ইহাকে আমি ব্রাহ্ম করি"—আত্মচরিতে রাজনারায়ণ লিখেছেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়ের নিমিত্তে তথায় একজন জমীদারের পুত্র পাইয়াছ অতি আহ্লাদের বিষয়। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দিবে এবং তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে যাহাতে তাঁহার যত্ন হয় এমত উপদেশ দিবে।" কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন রাজনারায়ণকে। সময়টা ছিল ২৪ চৈত্র ১৭৮১ শকাব্দ।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। মদ্যপান পরিত্যাগের নিমিত্ত হঠাৎ একদিন 'সুরাপান নিবারণী সভা'র প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে মদ্যপান পরিত্যাগের সংকল্প করেন। মেদিনীপুরে সন্ধ্যাকালে স্বগৃহে অনুষ্ঠিত উপাসনা ও সংগীতাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁর চিরাভ্যাসের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি।

রাজনারায়ণের ধর্মোপদেশে কত লোক যে উপকৃত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত রয়েছে আত্মচরিতের পাতায়: মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর গ্রামের ব্রাহ্ম অধিবাসী কার্তিকচন্দ্র রায়ের পিতা মৃত্যুকালে বলেছিলেন: "আমাকে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা পড়িয়া শুনাও।" স্মরণ করা যেতে পারে ১৭৭৬ শকাব্দের ২৯ চৈত্রে রাজনারায়ণ সমাজে 'মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং

---

১. মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের সালবিহীন একটি পত্রে (২২ মাঘ) ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব সম্পর্কে লিখিত হয়েছে: "শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটি হইয়া চলিলেন। ইনি আমার পরমাত্মীয় ও পরম স্নেহাস্পদ। আপনি ইঁহার প্রতি স্নেহ রাখিবেন ও প্রয়োজনানুসারে অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।..."

ক্ষিতৌ বিমুখা বান্ধবাযান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি।'—এই শীর্ষকে যে বক্তৃতা (বক্তৃতার মূল কথা—'মৃত্যুর নিকট ব্যক্তির বিচার নেই। জীবনের অসম্পূর্ণ অবস্থায় মৃত্যু পূর্ণতা আনে। কিন্তু ঐ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ধর্ম আচরণের দ্বারা মানুষ পূর্ণতাকে অধিকতর শান্তিপূর্ণ করতে পারে।) দিয়েছিলেন, সম্ভবত তাই ভক্তের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল ; মৃত্যুকালে তিনি রাজনারায়ণের বক্তৃতা শুনে শান্তিলাভ করেন।

আর-একবার জলেশ্বরের দারোগার বাড়িতে রাজনারায়ণ ধর্মকথা শুনিয়েছিলেন। শ্রবণান্তে দারোগামশায় অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর পদদ্বয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন, রাজনারায়ণ তাঁকে সেদিন বুঝিয়েছিলেন, "মানুষের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন।"[১] তিনি আরো বলেন, "তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তাঁহারই হাতে।"[২] শোনা যায় শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণও তাঁর সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ এইভাবে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামেও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন।

"মেদিনীপুরে অবস্থিতিকালে আমি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্তিত করি। সে প্রথা নৈসর্গিক শোভায় শোভিত সুরম্যস্থানে কখন কখন উপাসনা।"[৩] রাজনারায়ণ তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে সাধারণত বসন্তকালে মেদিনীপুরের গোপগিরিতে[৪] প্রকৃতির উন্মুক্ত, উদার পরিবেশে উপাসনা করতেন।[৫] "মেদিনীপুর গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা" নাম দিয়ে উপাসনা-অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধগুলি 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বর কোনো বিশেষ, নির্দিষ্টস্থানের, নির্দিষ্ট

---

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৫১

২. তদেব।

৩. তদেব।

৪. যোগেশচন্দ্র বসু -রচিত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' থেকে জানা যায় "মেদিনীপুর সহরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে গোপগিরি নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, ঐ স্থানে মহাভারতোক্ত মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার "দক্ষিণ গোগৃহ" ছিল।"

৫. মেদিনীপুরে বসন্তকালীন গোপোৎসবের প্রবর্তক রাজনারায়ণ। এই মর্মে 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা' (চৈত্র, ১৮০২ শক, পৃ. ২৩৯) থেকে সংবাদ পাওয়া যায়।

সমাজগৃহে বদ্ধ নয়, বিশ্বজুড়ে তাঁর স্থান, বিশ্বময় তাঁর বিকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত উদার পরিবেশেও ব্রহ্মের প্রকাশ। আর এই নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখে ভক্তহৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়— এই ভাব সর্বসাধারণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যই রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে গোপগিরিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে উপাসনার প্রবর্তন করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *The Religion of Love* পুস্তকে বলেছেন: "Nature's beauty in solitary places is a great aid to divine communion।" সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই উচিত কিছুদিন ঐরূপ নির্জন স্থানে বাস করা। কারণ, তিনি আরো বলেছেন, "When thou seest the picture, remember the painter." এই ধরনের উপাসনা এবং উপাসনাস্থলে রাজনারাণ-কর্তৃক বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। "এমত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতা তো আমি শীঘ্র দেখি নাই।"[১] দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে রাজনারায়ণকে পত্রে (২৪ চৈত্র, ১৭৮১ শকাব্দ) অভিনন্দন জানান।

এই মেদিনীপুরেই বাসকালীন রাজনারায়ণ ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্মমূলক সংগীতে এমনই বিভোর হয়েছিলেন যে কখনো কখনো দিনরাত্রি অতিক্রম হয়ে গেলেও, তাঁর খেয়াল থাকত না। এইরকম ঘটনা একবার ঘটেছিল ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ দেব মহাশয়ের গৃহে। চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ 'ব্রাহ্ম গায়ক' প্রেমচাঁদ গুপ্ত সেদিন মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আগমনেই এই অঞ্চলে সংগীতের আসর বেশি জমত। এইভাবে একদিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হয়। প্রভাত হলেও উপাসনা ও সংগীতের বিরাম হল না। সকলে নিকটবর্তী গোপগিরিতে গিয়ে ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হলেন। সমস্ত দিন উপাসনা, ধ্যান, সংগীত চলল। পুনরায় সন্ধ্যার সময় মেদিনীপুরের তৎকালীন সদর-আলা অভয়কুমার দত্ত মশায়ের নিমন্ত্রণে তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে উপাসনা আরম্ভ হল। এই উপাসনা চলে রাত্রি দশটা অবধি। এইভাবে ত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হলে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্রাহ্মধর্মের নবীন প্রচারক রাজনারায়ণ তাঁর প্রথম প্রচারকেন্দ্র মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ও তথায় ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে শহরবাসীর অন্তরে যে ধর্মপিপাসা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার মর্ম রাজনারায়ণের জীবিতকালেই মেদিনীপুরবাসীরা উপলব্ধি করেছিলেন। 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত "মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২১।

THE

RELIGION OF LOVE

INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.

Based chiefly on the Hindu Shastras.

BY

RAJNARAIN BOSE

President of the Adi Brahmo Samaj.

We are thine; thou art ours."

—*Rigveda*

He who seeth Him in the soul, his is peace everlastin
gs. He who seeth Him in the soul, his is bliss everlas
ners."

—*Upanishad.*

tationed in divine communion, work."

—*Bhagavat-gita or the Song Celestial.*

To him who in any place taketh refuge in me, I devote myself."

—*Ibid.*

Thou, O God!, art the goal of all men, pursuing paths, straight
vious according to their inclinations as of waters is the sea."

—*Mahimnastava.*

1894.

সমাজের বিবরণ" থেকে এ-বিষয় জানা যায়।[১] এই প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১ খ্রী)—"Midnapnr Brahmo Samaj" শীর্ষক রচনাটিও উল্লেখযোগ্য।

একবার কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ নানাস্থানের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করে উপস্থিত হলেন মেদিনীপুরে। এখানকার সমাজের কার্যপ্রণালী পরিদর্শন করে তিনি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। তাঁর এই সম্পর্কিত লিপিবদ্ধ বিষয় থেকে তা জানা যায়: "মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকনপূর্ব্বক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয়ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছি।... সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন।... শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয় গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজনারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে। তথাকার সকল ব্রাহ্মেরাই তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারা মনের সহিত শ্রদ্ধা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য সাংসারিক কষ্ট ও লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি বিমুখ নহেন, ত্যাগ স্বীকার করা তাঁহার অভ্যাস পাইয়াছে। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহ-মুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃতবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই হইবে।"[২]

রাজনারায়ণের বহুবিধ কীর্তি-প্রসূত মেদিনীপুরে তাঁর সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলির স্বাক্ষর রয়েছে অম্লান। রাজনারায়ণের দীর্ঘ জীবনের বৃহত্তম অংশ মেদিনীপুরেই সীমাবদ্ধ, কালও যেমন দীর্ঘ, তাঁর কর্মপ্রয়াসও তেমনি বিবিধ। তিনি বহু জনহিতকর সভাসমিতি, প্রতিষ্ঠানাদি, স্থাপন করেছিলেন— যেগুলির উদ্দেশ্য সুপ্রচারিত হয়ে পরবর্তী বাংলার সংস্কৃতি, সভ্যতা রক্ষণে ও পোষণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। সুদক্ষ শিক্ষাব্রতী ও দূরদর্শী সমাজসেবকরূপে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে সুবিদিত। তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে এর পরিচয় রয়েছে। শারীরিক উন্নতির জন্য তিনি 'ব্যায়ামাগার', বিচারশক্তির উন্নতির

---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক, ১৭৮৪ শক, পৃ. ১২৩

জন্য 'বিতর্ক সভা', ধর্মপ্রচার নিমিত্ত 'ধর্মালোচনা সভা', সাহিত্য চর্চার জন্য 'সাহিত্য উৎসাহিনী সভা', জাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগের উন্নতি জন্য 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', সুরাপান বন্ধ করার জন্য 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রধানত রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাতেই একসময় সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। কথিত আছে, সভার এত বাহুল্য দেখে জনৈক মেদিনীপুরবাসী কৌতুকবশত মন্তব্য করেছিলেন যে, এখন একটা 'সভানিবারণী সভা' সংস্থাপনের অত্যন্ত আবশ্যক হয়েছে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 'সুরাপান নিবারণী সভা' মেদিনীপুরেই রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। প্যারীচরণ সরকার উক্ত বিষয়ক সভা করেন আরো পরে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই সভার দ্বারা মেদিনীপুরের সুরাসক্ত অনেকেই মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মদ্যপান অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়। উনিশ শতকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা এ-ব্যাপারে সেরকম কিছু কাজ করেছিলেন। তবে মদ্যপাননিরোধের সব কৃতিত্বই কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের নয়।

বলা বাহুল্য, একাল থেকেই আলাপে আলোচনায়, ব্যবহারে সৌজন্যে, সববিষয়েই স্বদেশীয় ভাবধারা প্রকাশ করা রাজনারায়ণের কাম্য ছিল। তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার দ্বারা। এই সময়ই উক্ত সভার কার্যবিবরণ *Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal*— নামে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় নবগোপাল মিত্র ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্রের জন্য হিন্দু মেলা বা চৈত্রমেলা ও জাতীয় সভা (মেলা পরিচালনার জন্য) স্থাপন করেছিলেন, তিনি তার প্রেরণা পেয়েছিলেন রাজনারায়ণের উক্ত সভা ও সভার অনুষ্ঠানপত্র থেকে।

'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' যে স্বাদেশিকতার প্রতিষ্ঠান— তা বোঝা যায় উক্ত সভার নিয়মাবলী থেকে। 'গুডমর্নিং, 'গুডইভনিং'-এর পরিবর্তে 'সুপ্রভাত,' 'সুরজনী,' কথার চলন এবং ১লা জানুয়ারির পরিবর্তে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপন ও পরস্পরের মধ্যে অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন, কথাবার্তায় ইংরেজী ব্যবহৃত হলে প্রতিটি শব্দের জন্য এক পয়সা দণ্ডস্বরূপ দান— সভ্যগণকে এই নিয়ম মেনে চলতে হত। তখন শিক্ষিতসমাজে ইংরিজিয়ানার অত্যধিক প্রচলন হওয়ায় রাজনারায়ণ এই নিয়ম করেন।

স্বাদেশিকতার উদ্দীপনাতেই পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ কলকাতার এক সাহিত্য সভার নাম 'The Bengal Academy of Literature'-এর পরিবর্তে "বঙ্গসাহিত্য পরিষদ্" নাম প্রস্তাব করেছিলেন। অধুনা তা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নামে কলকাতার সুপরিচিত, সর্বজনীন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। শুধু নামকরণ মাত্রই নয়, উক্ত পরিষদের নিয়মাবলী ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-ভাষায় প্রচলন করেন রাজনারায়ণ।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণের অবিশ্রান্ত কর্মস্রোতের মধ্যে লেখনীর বিরাম ছিল না। তাঁর ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাগুলি অধিকাংশ মেদিনীপুরেই রচিত হয়েছিল, এগুলি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সময়ে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রহ্মসাধন' মেদিনীপুরে রচিত (১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ)। রাজনারায়ণের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থ রচনা মেদিনীপুর থাকাকালীন ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে শুরু করেন, সমাপ্ত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। দিল্লী থেকে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন (২৬ আশ্বিন ১৭৭৬ শকাব্দ) "যাহা বহুদিন স্থায়ী হয় তাহা বহুদিনেই হয়।"[১] তাঁর এই পত্র থেকেই গ্রন্থের গুরুত্ব, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় যে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মেদিনী' (আশ্বিন ১২৮৬) পত্রিকার সঙ্গেও রাজনারায়ণ যুক্ত ছিলেন। এই মর্মে 'সাধারণী' পত্রিকার সংবাদটি[২] উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে শারদীয় অবকাশে (অক্টোবর মাস নাগাদ) রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রগণ (সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ)-সহ, ও আরো কয়েক ব্যক্তি (কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী) একত্রে নৌকাযোগে রাজমহল ভ্রমণে যান। কলেজে পাঠকালে রাজনারায়ণ কয়েকবার স্টীমারযোগে ভ্রমণে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে। সে কথা আমরা জানি। ভ্রমণের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল ধর্ম ও তত্ত্বালোচনায়, গল্পে, আলাপে ও হাস্যকৌতুকে।

রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকাকালীন ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা শহরে বিধবাবিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ' গ্রন্থ

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, 'পত্রাবলী', পত্র ১২

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

প্রকাশ করা থেকেই আন্দোলনের শুরু এবং এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়
১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলে। ঈশ্বরচন্দ্র
তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচারসংগত ব'লে
জনমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপনে কৃতকার্য হলেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত দায়ভাগের ব্যাপার নিয়ে সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে
আপত্তি উঠল বিধবাবিবাহ অসংগত বলে। কিন্তু উক্ত প্রথার সংগতি রক্ষার
জন্য ঈশ্বরচন্দ্র স্বপক্ষীয় ব্যক্তিদের একটি আবেদন পত্র গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ
করেন। এই আবেদন পত্রে রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
ব্যতীত সকলেই স্বাক্ষরদান করেছিলেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু,
রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বিধবাবিবাহ বিধি প্রচারিত হল ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই। দেখা যায়
যে, তিনমাসের মধ্যেই প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হয়। প্রথম বিধবাবিবাহ
করেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ইনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক, পরে ডেপুটি
ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পাত্র পাণিহাটির মধুসূদন
ঘোষ।

আরো দুটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই।
"১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল নিবাসী
সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ বসু ও
সহোদর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু ক্রমান্বয়ে এক একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ
করেন। এই উভয় বিবাহেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয়
হইয়াছিল।"[১]

উক্ত বিবাহের অনুষ্ঠানকালে রাজনারায়ণের মাতা ছিলেন মথুরায়। শোনা
যায়, মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তনের দিন রাজনারায়ণ মাতার ভয়ে সারাদিন উক্ত
বালিকা দুইটিকে তাঁদের বোড়াল গ্রামের বাড়ির একটি ঘরের পালঙ্কের নীচে
লুকিয়ে রাখেন। রাত্রে মাতা রাজনারায়ণকে আহারের জন্য ডাকলে, তিনি
খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, যেহেতু গৃহে আরো দুজন অভুক্ত
আছেন। এরপর রাজনারায়ণ মাকে সব বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু তখনো মাতা

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), পৃ. ২৭৯

জানতেন না যে, কন্যা দুটি তাঁরই গৃহে রয়েছে। অভুক্ত পুত্রের আহারের জন্য তখনকার মতো তিনি এ-বিবাহ মেনে নিলেন বটে, কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর যে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ ছিল সে আর কোনোদিন তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি।)

(বিধবাবিবাহ সমর্থন, বিদ্যাসাগরকে উক্ত কর্মে আন্তরিকভাবে সাহায্য দান ও আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে দুই বিধবা বালিকার বিবাহ দেওয়াতে রাজনারায়ণ নিন্দা এবং প্রশংসা— দুইই লাভ করেছিলেন। পরন্তু প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার ভাগই ছিল অধিক। তখনকার সমাজ-মনের কথা চিন্তা করলে রাজনারায়ণের এ-প্রাপ্য কিছু অধিক হয় নি। স্বগ্রাম বোড়ালের অধিবাসীরা যেমন তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েছিল, মেদিনীপুরবাসীরাও তেমনি ক্রোধে তাঁর প্রাণনাশের সংকল্প পর্যন্ত করেছিল। যেহেতু রাজনারায়ণ 'বাংলা ঘরে' বাস করেন, সেইহেতু, তারা অনায়াসেই তাঁকে পুড়িয়ে মারতে পারে— মেদিনীপুরবাসীরাও রাজনারায়ণকে এই ধরনের রূঢ় বাক্য বলে একদিন ভয় দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার উত্তরপাড়াবাসী যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরের জঙ্গল থেকে মোটা লাঠি কেটে আনেন যাতে বিপদের সময়ে অসুবিধায় না পড়তে হয়। এ-ঘটনার কথা রাজনারায়ণ নিজেই উল্লেখ করেছেন।)

রাজনারায়ণের প্রতি গভীর স্নেহসত্ত্বেও তাঁর মাতা ও পিতৃব্য হরিহর বসু তাঁর এই কর্মের জন্যে রাজনারায়ণকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। খুড়ামহাশয় রাজনারায়ণকে দুটি কারণে জাতিচ্যুত করেছিলেন বলা যায়। প্রথমত তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং দ্বিতীয় তাঁর বিধবা-বিবাহ সমর্থন। তিনি পূর্ব থেকেই জানিয়েছিলেন যে, বোড়ালে তাঁর আর এক গৃহে, একসঙ্গে থাকা চলবে না, সুতরাং তিনি যেন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। সেই অনুসারে পিতৃপুরুষের ভিটাতেই রাজনারায়ণ ও তাঁর খুড়ামহাশয়ের বসবাসের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়; এবং রাজনারায়ণ তারপর যতবারই বোড়ালে গেছেন ঐরূপ পৃথকভাবেই বাস করে এসেছেন। অবশ্য এরূপ পৃথকভাবে বাস করার পূর্বেও নিজেদের পরিবারে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পর রাজনারায়ণ কোনোদিন দিনের আলোয় স্বগ্রামে যান নি। রাত্রে যেতেন, আর ভোর না হতেই আবার বেরিয়ে পড়তেন। গ্রামবাসীরা রাজনারায়ণ এবং দুর্গানারায়ণকেও সুনজরে দেখত না।)

(কিন্তু ঘরে এবং বাইরের সমস্ত অভিযোগ ও অশান্তির বিষয় অবগত হয়েও

রাজনারায়ণ এ-কর্মে পিছ-পা হন নি। যে-কর্মে সমাজের মঙ্গল হবে বলে তিনি মনে করতেন, তাতে চিরদিনই তিনি দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হয়েছেন। এ ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

বিধবাবিবাহের পক্ষপাতিত্বের জন্য রাজনারায়ণকে অনেক বিরূপ মন্তব্য ও তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছিল. তাঁর এই কর্মের বোধহয় একমাত্র সমর্থক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। উক্ত অনুষ্ঠানকালে তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন. কিন্তু পরে তিনি রাজনারায়ণের এই কার্যের প্রকৃত সমাদর করে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা পরবর্তী বাংলাদেশ অবশ্যই মনে রাখবে।— "তুমি ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন বিষয়ে কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হও নাই, কিন্তু অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত লোকদিগকে প্রদর্শন করিতেছ। ইহাতে তোমাকে আপাতত যে গরল ভক্ষণ করিতে হইতেছে, অবশেষে তাহা অমৃতরূপে পরিণত হইবে।"[১] বিদ্যাসাগরের প্রশংসাপত্রটিও রাজনারায়ণের প্রতি তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতারই নিদর্শন। বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহের কাজে যাঁরা একান্তভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। কার্যসমাধা হলে তাই রাজনারায়ণকে একটি পত্র লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র ; সে পত্রে কৃতজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের সঙ্গে গুণগ্রাহীর সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে: "আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি···যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অবধি আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি। বস্তুত আপনি অতি মহাত্মার কর্ম্ম করিয়াছেন। এ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।"[২] রাজনারায়ণের এই সময়কার অবস্থাটি দেবেন্দ্রনাথের বক্তব্যে অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে: "...তুমি পূজার সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলে এবং তোমার গ্রামস্থ লোকের অত্যাচার ভয়ে বোড়ালে থাকিতে পারহ নাই, অতি সংগোপনে এক রাত্রির জন্য তথায় যাইয়া তোমার খুড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। এই সকল উৎপাতে তুমি অত্যন্ত অসুখী হইয়া থাকিবে। আহা! যাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে সকল লোক সুখী হউক, তাহার মনে আঘাত দিতে যাহারা সংকল্প করে তাহারদিগের মন কি কঠোর। কিন্তু আমি

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, 'পত্রাবলী', পত্র ১৭

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) থেকে পত্রটি উদ্‌ধৃত।

জানিতেছি যে পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্তা মঙ্গল স্বরূপের শীতল ছায়াতে বাস করিয়া এ সকল অসহ্য অত্যাচার তুমি অতিক্রম করিতে পারিতেছ।"[১]

রাজনারায়ণ এ-সময়ে মেদিনীপুরে বাস করলেও কলকাতা সমাজের সঙ্গে যে তার সংযোগ অক্ষুণ্ন ছিল, তা সমাজের অনুষ্ঠানগুলির দ্বারাই বোঝা যায়। তিনি সমাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন, বক্তৃতাদিও দিয়েছেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ৭ পৌষ কলকাতা সমাজে রাজনারায়ণকে 'ব্রাহ্মসমাজের পুনরাবৃত্ত' বিষয়ক বক্তৃতা[২] দেওয়ার কথা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি স্থির করেন। যথানির্দিষ্ট দিবসে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্মবিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যের পর উক্ত বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতায় রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তা যেন কালে সুফল প্রদান করে— এই আকাঙ্ক্ষাই একদিন দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন রাজনারায়ণের নিকট।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণের জীবনের আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই বছর সরকারের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণকে 'অ্যাসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স' পদ গ্রহণ করার আহ্বান আসে। তা ছাড়া হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদও[৩] শূন্য হলে ডিরেক্টর সাহেব তাঁকে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু "...প্রিয় মেদিনীপুরের উন্নতি সাধন কার্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া" রাজনারায়ণ তা গ্রহণ করেন নি। তারপর হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদও শূন্য হলে, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনারায়ণের নাম প্রস্তাব করেন। ইতিপূর্বে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দেও বর্ধমানের কমিশনার এবং রেভিনিউ হ্যাণ্ডবুকের প্রণেতা জে. এইচ. ইয়ং মেদিনীপুরে যখন পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন স্কুল দেখে, ও রাজনারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি বার্ষিক রিপোর্টে রাজনারায়ণকে ডেপুটি কালেক্টারের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। রাজনারায়ণ তাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মেদিনীপুরের জন্যই।

---

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৪৯। শিমলা থেকে ২ চৈত্র ১৭৭৯ শকে লিখিত।

২. রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়—১৭৮২ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।

৩. উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। এখান থেকে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

মেদিনীপুরের প্রতি অসীম ভালোবাসায় নিজের সুখ-দুঃখের কথাও রাজনারায়ণ বিস্মৃত হতেন।

রাজনারায়ণ যত কর্মব্যস্তই হোন তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না কখনো। অবশ্য এও তাঁর কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল— নিছক সাহিত্যচর্চা ছিল না। রাম-মোহন-প্রবর্তিত ও দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মকে সর্বতো-ভাবে রক্ষার গুরুদায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। তাই তাঁর নিজ জীবনের ও সমাজের কোনো অবস্থাতেই সেই সংকল্পবিচ্যুতি ঘটে নি। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান মিশনারীদের আক্রমণ চলছিল রামমোহনের কাল থেকে। মিশনারীরা ব্রাহ্মসমাজের নীতিবিরুদ্ধতা, মতবিরোধিতা ও সর্বোপরি ঈশ্বরস্বরূপ উপলব্ধির বিষয় নির্দেশ করে একালে (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর থাকাকালীন) আক্রমণ করলে রাজনারায়ণ তার প্রকৃত জবাব দিয়েছিলেন এক মহতী সভায়। মেদিনীপুর সমাজগৃহে এই উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুন। রাজনারায়ণের বক্তৃতার শিরোনামা হল "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj"।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ। রাজনারায়ণের জীবনে প্রথম ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান তাঁর প্রথমা কন্যা স্বর্ণলতার বিবাহ।[১] দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ মনেপ্রাণে ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাঁদের ধারণা ছিল সাধারণকে উৎসাহিত করে তাদের মধ্যে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির প্রচলন করতে পারলেই নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এ-সব বুঝেও প্রথম কন্যার বিবাহানুষ্ঠান কিভাবে (ব্রাহ্মমতে, না হিন্দু মতে) করবেন— এই নিয়ে রাজনারায়ণের মনে প্রথমাবধি খুব একটা চিন্তা ও সংশয় ছিল। তিনি এক কথাতেই সংস্কারমুক্ত হতে পারছিলেন না। রাজনারায়ণকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একটি পত্র[২] তার যথার্থ প্রমাণ। রাজনারায়ণ তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনের ভাব প্রকাশ করে তাঁর পরম

---

১. 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে' দেবেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন : "গত বৎসরে (১৭৮৫ শকাব্দে) সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মনারায়ণ শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টো-পাধ্যায় এবং এই গত রবিবারের আমাদের প্রিয় সুহৃৎ ব্রহ্মবাদী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারা কৃতপুণ্য হইয়া সকল ব্রাহ্মদিগের আদরণীয় হইয়াছেন।..."

২. ৬ আশ্বিন (সালবিহীন) লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্রটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :

হিতৈষী বন্ধু বিদ্যাসাগরের কাছে এই ব্যাপারে সৎ-পরামর্শ চেয়েছিলেন। এই কাজে মহর্ষি ছিলেন অগ্রণী। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষি-কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম মতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান এই প্রথম। বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম মতে মেদিনীপুরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আত্মচরিতে রাজনারায়ণ বলেছেন, "আমার ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্মমতে দেওয়া।" লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই বিবাহ অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতা-বর্জিত ব্রাহ্ম বিবাহ হলেও, "ইহা কিন্তু জাতিভেদ-ভঙ্গকারী অসবর্ণ নয়। একই কায়স্থ সমাজের 'ঘোষ' এবং 'বসু'তে বিবাহ।"[১] কন্যার বিবাহের বর্ণনায় রাজনারায়ণ বলেছেন (আত্মচরিতে): "এই বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন।" এবং এই অনুষ্ঠানে কলকাতা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বহু ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে স্কুলের হেড পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রধান। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কলকাতা শহর ব্যতীত মেদিনীপুরের মতো মফঃস্বল এলাকাতেও জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির মত পরিবর্তন হয়েছে। সকলে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগদান করছে। এ-যে রাজনারায়ণের প্রচেষ্টার ফল— তা বলাই বাহুল্য। (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে) কন্যার বিবাহ ও ধর্মপ্রচার কার্য শেষ করে রাজনারায়ণ আরো দু-বছর মেদিনী-

---

"কয়েক দিবস হইল মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা প্রযুক্ত এতদিন উত্তর লিখিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে।...

তবে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে এরূপ বিষয়ে আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে ঈদৃশ স্থানে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয় তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায় তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।"— পত্রটি রাজনারায়ণ-দৌহিত্রী বাসন্তী চক্রবর্তী -সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

১. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ' (১ম সংস্করণ), পৃ. ২

পুরে অবস্থান করেন। কিন্তু মেদিনীপুরের সর্ববিধ উন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতিসাধন ও এতদ্‌সম্পর্কে পুস্তক রচনা করতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখে তাঁর যে শিরঃপীড়া প্রথম শুরু হয়, তা আর কোনোদিনই সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নি। এ-কারণেই নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ না হতেই তিনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(বেতনভোগী শিক্ষক হয়ে রাজনারায়ণকে মেদিনীপুরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তার তুলনা নাই। ঐস্থানের 'হিতচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান'ই তাঁর প্রিয়ব্রত ছিল। যদিও মেদিনীপুরের তিনি অধিবাসী ছিলেন না, তবু এ ছিল তাঁর জন্মভূমি সদৃশ। মেদিনীপুরে বিদায়-অনুষ্ঠানের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে রাজনারায়ণ সভাপতিকে (নবীনচন্দ্র পালিত) যে পত্রোত্তর পাঠিয়েছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে যে, তাঁর ঐ কর্মভূমির সঙ্গে শুধু হৃদয়ের যোগই ছিল না, ছিল যেন প্রকৃতই নাড়ীর বন্ধন :)"মেদিনীপুরে আমার জীবনের সার ও সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম "বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত নহি, "মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত।...আমি যেখানে থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবার্তা, আপনাদিগের কুশলবার্তা ও তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্তা আমার মনকে যেমন আহ্লাদিত করিবে এমত আর অন্য কিছু করতে পারিবেক না।"[১] এ মেদিনীপুরের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী রাজনারায়ণের মুখের কথা নয়, প্রকৃতই অন্তরবাণী। তিনি আরো বলেছেন, "আমার সকল স্থানের সুহৃদগণকে বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে ঐ ঘটনার পরে আমার ভস্মসাৎ শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ন্যায় গোপগিরির উপরিস্থিত এক সমাধিমন্দিরে তাহা রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জন্ম ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে।"[২]

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে আদর্শ শিক্ষকের অভাব ছিল না। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর মতো একাধারে এমন নিষ্ঠাবান শিক্ষক, আত্মবিস্মৃত লোক-সেবক, সংস্কারমুক্ত সমাজ-সংস্কারক, ভক্তিমান ধর্মপ্রচারক দ্বিতীয় ছিলেন কিনা

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৮৩

২. তদেব।

সন্দেহ। জীবিতকালে মেদিনীপুরের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন রাজনারায়ণ, মৃত্যুর পরও তাঁর পঞ্চভূতের দেহ যেন মেদিনীপুরের জল, হাওয়া, মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়—এই আন্তরিক ইচ্ছাই আমরণ পোষণ করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার বাণী শুনে লোকে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হবে, উৎসাহিত বোধ করবে— এ ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁর স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি কিভাবে স্ব-দেশ, স্ব-জাতি, ও স্ব-ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বমানবপ্রীতিতে পরিণত হবে— এই অন্তিম কামনায় তিনি মেদিনীপুরবাসীর নিকট অনুরোধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিক্ষেত্রে যেন এই কয়েকটি কথা লেখা থাকে : "প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।..."[১]

রাজনারায়ণ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে দীর্ঘ ষোল বছর অনুপস্থিত থাকাকালীন সমাজে একাধিক ঘটনার সূত্রপাত, বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব, নূতন ব্রাহ্মদল গঠন ইত্যাদি দ্বারা সমাজের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই-সমস্ত ঘটনাগুলি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের মূললক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গতিবিধি এবং সমাজে রাজনারায়ণের ভূমিকার বিষয় সম্যকরূপে জানা যাবে।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম যুগে (১৮৪৩-১৮৫০ সাল) মুখ্যত দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রধান সহকর্মী রাজনারায়ণের সহায়তায় ব্রাহ্মধর্মের স্বতন্ত্র 'ধর্মগ্রন্থ' রচিত হয়, এবং উক্ত ধর্মের আচরণীয় দিকগুলির (উপাসনাপ্রণালী, প্রতিজ্ঞাপত্র, দীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি) একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংযত রূপ স্থিরীকৃত হয়। ১৮৫০ সালের পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানাদির (জাতকর্ম, নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি-পারলৌকিক ক্রিয়া ইত্যাদি) পৌত্তলিকতাবর্জিত হিন্দুশাস্ত্রানুগ, উপনিষদোক্ত বাণীর মর্মানুযায়ী নিয়মকানুন প্রবর্তনে একান্ত যত্নশীল ছিলেন। আর এ কাজে তাঁকে সদ্যুক্তি ও সদুপদেশ দিয়ে একান্তভাবে সাহায্য করেন রাজনারায়ণ। মহর্ষি ও রাজনারায়ণের মধ্যে যে-সমস্ত পত্রবিনিময় হয়েছিল— আজ সেইগুলিই এর বিশিষ্ট প্রমাণ।

মহর্ষি এরপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং প্রধানত তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (বেহালা, খিদিরপুর, ভবানীপুর, কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় এই একই কালে। শুধু তাই নয়,

---

১. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৮৩

মহর্ষি একটি ক্ষুদ্র প্রচারক দলও গড়ে তোলেন— যাঁরা বাংলাদেশের সর্বত্র কয়েকবছর পূর্ণোদ্যমে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। রাজনারায়ণও একালে শিক্ষকতা ব্যতীত ধর্ম-প্রচারের মহত্তম কর্মে সচেষ্ট ছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিবিধান প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই হয়েছিল। রাজনারায়ণের এই কর্মনিষ্ঠাকে মহর্ষি অভিনন্দিত করেছিলেন একটি পত্রে: "তথাকার ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি সম্বাদ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এখানেও ব্রাহ্ম সমাজের অত্যন্ত উন্নতি। এইক্ষণে এখানকার ব্রাহ্মসমাজে অনেক শ্রদ্ধাবান্ যুবা ব্রাহ্মেরা নিয়ত আসিয়া থাকেন।"[১]

দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের কাজ চলতে থাকে। প্রমূর্ত দেবতার স্থানে অমূর্ত দেবতার উপাসনা যাতে দেশব্যাপী প্রচারিত হয়, সেদিকে তাঁর স্থির লক্ষ্য ছিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয় কার্য সাধন— দেশব্যাপী সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের যাতে এই লক্ষ্য হয় সেদিকে তাঁর যত্নের শিথিলতা বিন্দুমাত্র প্রদর্শিত হয় নি। কাজেই কোনোদিন ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে এই আদর্শবিচ্যুতিতে তিনি যে আঘাত প্রাপ্ত হবেন, এতে আর আশ্চর্য কী। প্রথম আঘাত আসে সমাজভুক্ত ব্যক্তি অক্ষয়কুমার দত্তের দিক থেকে। অক্ষয়কুমার একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম হয়েও ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তিতে নির্ণয়ের চেষ্টা না করে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা করার প্রয়াসী ছিলেন, অথচ তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এই সন্দেহ-ভাব মহর্ষি বরদাস্ত করেন নি। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুও মন্তব্য করেন: "The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu Sects."[২] রাজনারায়ণ তাঁর সম্বন্ধে আরো বলেছেন, "অক্ষয়বাবুর সংশয়-ভাব-সময়ে চারু-পাঠের অনেক সংস্করণ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার কালে রচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।…অক্ষয়বাবু যে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন,

---

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত পত্রাবলী, পত্র ৩৬। রাজনারায়ণকে মহর্ষি পত্রটি লিখেছিলেন, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৫ শকে।

২. অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে রাজনারায়ণের এই মন্তব্যটি একটি পত্রের অংশবিশেষ। দ্রষ্টব্য: "ব্রাহ্ম-সমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৮০৮ শকাব্দ, পৃ. ১৪৩

আমি বলিয়াছি, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্বকাল সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার সংশয়ভাব ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবারপর এবং প্রথম ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা লিখিবার (১৭৯১ শকের) পূর্বে তাঁহার মনে উদিত হয়, কিন্তু উহার বীজ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্বে তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু কোনকালে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন না।"[১] অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ কোনো বিরূপ মনোভাব-বশত এ কথা বলেন নি, অক্ষয়কুমারের চরিত্রবৈশিষ্ট্য যা— তিনি তারই সত্যরূপ বিবৃত করেছেন। সংশয়বাদী হয়েও অক্ষয়কুমার ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে দাবি রাখেন। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ে যুক্তির অবতারণা তাঁরই। রাজনারায়ণ অধিকন্তু যোগ করলেন 'আত্মপ্রত্যয়' (Intuition)। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিকেও (Reason) স্বীকার করেছিলেন। তবে রাজনারায়ণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক জটিলতা সরল করতে আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিরও প্রকারভেদ দেখিয়েছেন।[২] ব্রাহ্মধর্ম তথা ব্রাহ্মসমাজকে রাজনারায়ণ একালে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। স্বতন্ত্র ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা সংশয়মূলক হলে, উক্ত ধর্মপ্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে— এ কথা রাজনারায়ণ পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থ রচনায়।

যা হোক, অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুবসম্প্রদায়ের সঙ্গে একালে (১৮৫৩-৫৪ সালে) দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের ধর্মীয় আদর্শের সংঘাত এবং শেষপর্যন্ত সমাজোন্নতির মতবিরোধও ঘটে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও যুবক-সম্প্রদায়ের এই আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে তৎকালে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়; পত্রিকার প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে— স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ সমর্থন, বহুবিবাহ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম মতকে যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপন, সমাজের কার্যাবলী গঠনমূলক নিয়ম-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত-করণ; সর্বোপরি সামাজিক বিষয়গুলি কার্যকর করার জন্য ১৮৫৪ সালে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে স্থাপিত 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'তে যোগদান করেন অক্ষয়কুমার। যদিও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সমিতির সভাপতি, তথাপি সামাজিক বিষয়গুলিতে দেবেন্দ্রনাথ

---

১. রাজনারায়ণ বসু,"জীবনবৃত্ত ও লেখকদিগের দৌরাত্ম্য",'নব্যভারত', চৈত্র ১২৯৪, পৃ. ৬৫৬

২. দ্রষ্টব্য রাজনারায়ণ বসু, 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা', ১ম ভাগ।

যুবকসম্প্রদায়ের সমর্থক ছিলেন না। মতানৈক্যের ফলে উভয়দলের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হয়। 'অক্ষয়বাবুর সময়ের ইতিহাস' প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেছেন যে, "ব্রাহ্মসমাজের আপাত প্রতীয়মান শুভ লক্ষণ সকল তদন্তর্গত বহুতর অশুভলক্ষণে পরিপূর্ণ, বস্তুত ইহা অসত্য নয়।"[১] রাজনারায়ণের এ কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেও, এ-কালের প্রতি তাঁর দৃষ্টি যে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তাঁর অনেক মন্তব্য ও আলোচনায় এর প্রমাণ রয়েছে। এর একবছর পূর্বে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র অনুকরণে অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। ঈশ্বর-বিষয়ক আলোচনাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্রমে দেখা গেল এই সভায় ঈশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ক মীমাংসা হাত তুলে স্থির করা হচ্ছে। দেবেন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরভক্তের পক্ষে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল; এবং শেষপর্যন্ত সমাজের এই অবস্থায় ব্যথিত হয়েই তিনি সিমলা পর্বতে গমন করেন। রাজনারায়ণ কিন্তু হতাশ হন নি। তাঁর এই সম্পর্কিত মন্তব্য[২] বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অক্ষয়কুমার দত্ত তৎকালীন যুবকদের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিমূলক ধর্মের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু করে গেলেন তা স্থায়ী হয় নি কিন্তু এর চরম পরিণতি দেখা যায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হলে। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রধানত দুইজন মননিষ্ঠ ব্যক্তির উপর— একজন দেবেন্দ্রনাথ, অপর জন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।

---

১ রাজনারায়ণ বসু, "ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র", 'প্রবাসী', পৌষ ১৩৩৪, পৃ [illegible]

২ মন্তব্যটি হল এই— "ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু ঘটিয়াছে তাহা উন্নতির নিমিত্তই ঘটিয়াছে ইহা [illegible] করা যাইতে পারিবে। বর্তমান উন্নতির চিত্র যথার্থ প্রকাশ করিতে হইলে একটি [illegible] তুলনা আনিতে হয়, যেমন বটবৃক্ষের একটি উন্নতি-মূলক প্রধান শাখা আছে ও তাহার [illegible] হইতে বহুসংখ্যক [illegible] আত্মীয়-সভার [illegible] অক্ষয়বাবুর [illegible] নবীন [illegible] সকল শাখা [illegible] তাহাদের একদিকে গতি হয় না, [illegible] হয় না, যুক্তি ও উন্নতির [illegible] হয় না, কিন্তু সকলেরই এক উদ্দেশ্য থাকে [illegible]....." রাজনারায়ণ বসু, "ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র", 'প্রবাসী', পৌষ ১৩৩৪।

শিমলা থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ এ ভার গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বেই অক্ষয়কুমার শিরঃরোগে আক্রান্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার ভার ত্যাগ করেন এবং নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এই ভার অর্পিত হয়।

কলকাতার সমাজের যখন এই অবস্থা রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুরে দৃঢ় মত প্রচারে একান্ত যত্নশীল। যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ধর্মপ্রচার করা— রাম-মোহনের এই আদর্শের অনুগামী ছিলেন রাজনারায়ণ। অক্ষয়কুমারের মতো একজন যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক সদস্য সমাজ পরিত্যাগ করলে, সমাজ-প্রধানেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মেদিনীপুরে বসেই রাজনারায়ণ এ-বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করেন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, "জগতে কিছুর অভাব চিরকাল থাকে না, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও তাহাই দৃষ্ট হইল। অক্ষয়বাবু পীড়িত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার স্থানীয় সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ সত্যেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুকে প্রাপ্ত হইলেন।"[১] এইভাবে একদিকে প্রচার কাজ চলছে দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়, অন্য দিকে চলছে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা ও উদ্দেশ্য লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করতে রাজনারায়ণের আপ্রাণ চেষ্টা। মেদিনীপুরে বসেই তিনি এই বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন, 'তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'—তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ইতিপূর্বে যে মত দেবেন্দ্রনাথ সমাজে প্রচার করেছিলেন, সমগ্র মেদিনীপুরবাসীর নিকট রাজনারায়ণ এই বাণীই প্রচার করেন। উপরন্তু, তিনি দেশের মানুষকে জানালেন, 'একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি'— একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ১৭৭৪ শকে ২৩ মাঘ রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে পবিত্র, সনাতন ব্রাহ্মধর্ম সর্বসাধারণের বোধগম্য করবার নিমিত্ত "ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ" সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতায় রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের আটটি লক্ষণ সরল, সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মধর্মের উপলব্ধি মূলক রাজনারায়ণের অন্তরে যে কত গভীর ছিল— তা উক্ত বক্তৃতাটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। এতদ্ব্যতীত রাজনারায়ণ একান্তে যে গভীরভাবে ধর্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁর রচিত 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' ও 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তক তার প্রমাণ। তাঁর সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমপ্রসূত ও গভীর দর্শনচিন্তায় পরিপূর্ণ গ্রন্থ

১. রাজনারায়ণ বসু, "ধর্মবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র", 'প্রবাসী', পৌষ ১৩০৮, পৃ. ৩০৭

'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ "ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান" দ্বিতীয় অংশ 'ধর্মতত্ত্ববিবেক"। বাংলা ভাষায় এই ধরনের ধর্মবিজ্ঞান (Theology) -সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা রাজনারায়ণের কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই। 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তকে নামান্তরে যোগসাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রসঙ্গ এবং অষ্টবিধ উপায় অবলম্বনের দ্বারা যোগসাধন-পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনার বিষয়ে রাজনারায়ণ সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পর্বতে থাকাকালীনই কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান এবং তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের তৃতীয় রূপান্তরের সূচনা হয়। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সময়ে সমাজের দ্বিতীয় রূপান্তরের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই সময়কার প্রধান আন্দোলন হল ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান প্রণালী প্রণয়ন নিয়ে। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, রাজনারায়ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। আন্দোলনগুলির বিষয় এখানে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে রাজনারায়ণের এই সম্পর্কিত চিন্তাধারার সূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হবে; এগুলিকে রাজনারায়ণ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন এবং এগুলির সমস্যা সমাধানে তিনি ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন, তাও জানা যাবে।

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা একেশ্বরে বিশ্বাসী, একেশ্বরের উপাসক। তাঁদের চিন্তায় ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি চিন্ময়। ঈশ্বর এক, ও সমস্ত মানবমণ্ডলী পরস্পরের ভাই ভগিনী— ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য এইই। কাজেই এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র কোনো জাতিগত বৈষম্য আসতে পারে না। রাজনারায়ণ সর্বতোভাবে এই কথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ৭ই পৌষ গোরিটির বাগানে[1] অনুষ্ঠিত মেলায়[2] দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য ব্রাহ্ম যুবকদের কাছে উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব ক'রে স্বমত প্রকাশ করেন। সেদিন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাখালদাস হালদার। এরপর থেকেই সমাজে এই নিয়ে বাদবিতণ্ডা শুরু হয় প্রবলভাবে।

---

১. মতান্তরে পলতার বাগান। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', পরিশিষ্ট (৪র্থ সং), পৃ. ৪০৯

২. ৭ই পৌষের মেলা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। ঐদিন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার দিন। উক্ত দিনটিকে স্মরণীয় করবার জন্য ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গোরিটির বাগানে একটি মেলার আয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, সেই সময় থেকে শান্তিনিকেতনে এই মেলার অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

রাজনারায়ণ কিন্তু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের উপবীত ত্যাগ করার অনিবার্য আবশ্যকতা স্বীকার করেন নি। ধর্মীয় ও সামাজিক কোনো ব্যাপারেই রাজনারায়ণ উগ্রতা পছন্দ করতেন না। হিন্দুধর্মেরই সমুন্নত রূপ ব্রাহ্মধর্ম। কাজেই ব্রাহ্মধর্ম যখন একেবারে কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম নয়, তখন এ-ধর্ম অবলম্বন করলেই যে হিন্দুধর্মের সব-কিছু বর্জন করতে হবে, এর স্বপক্ষে রাজনারায়ণ কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। যাই হোক, উপনয়ন-প্রথা নিয়ে সমাজে বাদ-বিতণ্ডা চলতেই থাকে। এই ঘটনার চরম পর্যায় লক্ষ্য করি কেশবচন্দ্র সেন -কর্তৃক 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হলে দেবেন্দ্রনাথ নিজে উপবীত ত্যাগ করেন এবং তারপর হিন্দুধর্ম মতে (কেবলমাত্র পৌত্তলিক অংশ বর্জন করে) কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণের মনেও এই সমস্যা জাগে প্রথমা কন্যার বিবাহকালে। পৌত্তলিকতা বর্জন করেও, বিবাহ সবর্ণে দেওয়া সংগত হবে—না অসবর্ণে, এই নিয়ে রাজনারায়ণের চিত্তে ভয়ানক উদ্‌বেগের সঞ্চার হয়। শুধু তাই নয়, কন্যার বিবাহে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কিভাবে পালন করবেন, তা নিয়েও তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। বিবাহকালে জামাতাকে মধুপর্ক, অঙ্গুরী, আসন ও বস্ত্র দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন কিনা, সর্বোপরি ভিন্নজাতিতে বিবাহ দেবেন কিনা এ নিয়েও তাঁর সমস্যার অন্ত ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু রাজনারায়ণের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে পত্রে জানান যে, "তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।...তোমার কন্যার বিবাহ যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে দিতে মানস করিয়াছ, তাহা একবার আমাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইবে, বোধ হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি হইবে না। তদনুসারেই তোমার কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। আমরা নামের জন্য কার্য্যকে ভুলি না। বাস্তবিক পুত্তলিকা-পূজা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সাংসারিক বিবাহ আদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলেই নির্দ্দোষ হয়, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রতের রক্ষা হয়।"[১] মনে হয় রাজনারায়ণের মনোভাব বুঝতে পেরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যার জন্য 'কায়স্থ পাত্র' নির্বাচন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যার বিবাহ হয় পৌত্তলিক

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত পত্রাবলী, পত্র ২৯। কলকাতা থেকে ১৩ মাঘ ১৭৮৪ শকে লিখিত।

অনুষ্ঠান-বর্জিত হিন্দু পদ্ধতিতে, যেভাবে দেবেন্দ্রনাথের কন্যার বিবাহ হয়েছিল। একে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান বলাই সংগত। এ-বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন।

জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মবিবাহবিধি নিয়েও প্রথম প্রস্তাব ওঠে পলতার বাগানে দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক নিমন্ত্রিত কয়েকজন ব্রাহ্মের মধ্যে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যা হয়েছিল সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে। বিশেষ করে জাতিভেদের বিচার না করে পরস্পর ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির বিবাহ-কার্য প্রচলিত না করলে, ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যের প্রচার হয় না। কাজেই বাগানে সেদিনের এই অনুষ্ঠানে সকলে কন্যা আদান-প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এবং দেবেন্দ্রনাথ 'এইক্ষণে এই বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন' করতে থাকেন। তিনি পত্রে রাজনারায়ণকে জানালেন যে, "আবহমান প্রচলিত পদবী থাকিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলিয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে। তাহা বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইলে যে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ হইল না, ইহা স্বীকার করা যায় না।"[১] দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য এই সময় সংকর বর্ণে বিবাহবিধির স্বপক্ষে ছিলেন এবং এর জন্য রাজনিয়মের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন।[২]

রাজনারায়ণ বরাবরই তাঁর নিজের মতে স্থির এবং দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল "জাতিবিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল জাতীয় মনুষ্য সমাজে থাকিবেই থাকিবে।"[৩] কারণ সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে, হঠাৎ এইরকম সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে সুতরাং এ-সম্পর্কে ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যুক্তিযুক্ত। রাজনারায়ণের মনে এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, "যেহেতু সমাজনায়কেরা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা আমার স্বভাব নহে, তাহা পালন করা কর্তব্য মনে করি।"[৪] সর্বোপরি রাজনারায়ণ ধর্মীয় ও সামাজিক— সর্ববিষয়ে

---

১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত পত্রাবলী, পত্র ২৯। কলকাতা থেকে ১৩ মাঘ, ১৭৮৪ শকে লিখিত।

২. দ্রষ্টব্য : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, পত্রাবলী, পত্র ২৫।

৩. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১) পৃ. ১৫০

৪. তদেব।

জাতীয়ভাব অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ-কারণেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে হিন্দু-পদ্ধতি প্রয়োগের সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তাঁর *Brahmic Question of the Day— Answered* পুস্তিকায় এ-সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ যখন সিমলায় বাস করছিলেন তখন গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান কেশবচন্দ্র সেন গোপনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বসু -রচিত 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' নামক পুস্তিকাখানি পাঠ করে কেশবচন্দ্র উক্ত ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের অকৃত্রিম ভক্ত ও উৎসাহী কর্মী। তিনি ধর্মসভা, গুডউইল ফ্রেটার্নিটি, এবং সংগত সভার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সংগতসভা' ভক্তদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা (Street Procession) বার করে।[১] এর প্রতিবিধানস্বরূপ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সংস্কারমূলক একটি আন্দোলনের তীব্রতা সূচিত হয়। প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের মতভেদ সম্ভাবনাও প্রকট হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের এই সংকট রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ সংরক্ষণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের এই উজ্জ্বলতার মুখে রাজনারায়ণ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজ কক্ষে এক সাধারণ সভায় রাজনারায়ণ "ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের প্রাথমিক যুগের বিবরণ দিয়ে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তিনি সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এর এক বছর পরে, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে কেশবচন্দ্র সোৎসাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কাজ শুরু করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য প্রকাশিত হল এবং ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা কলেজ' স্থাপিত হল।

এই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা সামাজিক রক্ষণশীলতার সীমা অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁরা সংকর-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সোৎসাহে সমর্থন করলেন। এমন-কি, ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপবীত-ধারণের সমীচীনতা অস্বীকার করেন। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বিরোধী ও

---

১. দ্রষ্টব্য: Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj,* (Vol 1.) (2nd. ed.), pp. 127-28

সংস্কারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এই প্রগতিবাদী যুবকদলের উগ্রতা সমর্থন করলেন না। তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিরক্ত হয়ে নূতন দলের কার্যক্রমের সুফল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হলেন। মহর্ষির অনুগামী রাজনারায়ণ কেশবচন্দ্রের কার্যাবলীকে ব্রাহ্মধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে ন্যায় ও সত্যের পথে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। এই উপলক্ষেই এলাহাবাদে তিনি "Brahmic Question of the Day— Answered"-বক্তৃতাটি দান করেন। পৌত্তলিক ধর্ম পরিহার করবার স্বপক্ষে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ছিল না। কিন্তু প্রচার-কার্যের পদ্ধতির দিক থেকে রাজনারায়ণ স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করতেন। কেশবচন্দ্র চেয়েছিলেন ধর্মীয় সংস্কারের জন্য প্রথমত সমাজ-সংস্কার। তাঁর ধারণা ছিল যে সামাজিক কুপ্রথাগুলি বিদূরিত করবার জন্যই সর্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত। রাজনারায়ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, ধর্মসংস্কারের জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। সমাজ-সংস্কার হবে স্বাভাবিকভাবে, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। মতবাদের এই পার্থক্যের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষকদের গুরুতর মতভেদ ঘটে। কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষার নিমিত্ত রক্ষণশীলতার গণ্ডী ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, নিজের ধর্মমত স্বতন্ত্রভাবে প্রচারের জন্য 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনুগামীদের নিয়ে অসবর্ণ বিবাহ, উপাসনার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মহর্ষির অনুমোদন না পেয়ে কেশবচন্দ্র একটি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে, ১১ নভেম্বর তারিখে তাঁর নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল।

রাজনারায়ণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতার এই বিভ্রান্তির মধ্যেও মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ রচনা করেছিলেন এবং তাতে রাজনারায়ণের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক অংশ বর্জন করলেই অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মসমাজের অনুগত হবে রাজনারায়ণের এই মতবাদের ভিত্তিতে জাতকর্ম, নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি-পারলৌকিক ক্রিয়া কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে— তাইই স্থির করে দেবেন্দ্রনাথ 'অনুষ্ঠান-প্রণালী' প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান-বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা অন্য

প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে, মেদিনীপুরে বিদ্যালয় গঠন ও সমাজ-সংস্কার কাজে একনিবিষ্ট থেকেও রাজনারায়ণ কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিটি সমস্যার সমাধানকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে রাজনারায়ণ অসুস্থ হয়ে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করেন এবং কলকাতায় আসেন চিকিৎসার জন্য। এখানে তিনি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় নেন পরম বন্ধু, হিতৈষী ও আত্মীয়ের মতো। অত্যন্ত যত্নে ও সেবায় তাঁর এখানকার দিনগুলি অতিবাহিত হয়। চিকিৎসা করেন তৎকালীন বিখ্যাত হারাধন কবিরাজ।

রাজনারায়ণ যখন কলকাতায় ছিলেন তখন তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহবিবরণ তত্ত্বোধিনী পত্রিকার ১৭৮৯ শকের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১] পত্রিকাটি ঐ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে, "এক্ষণে বোধ হইতেছে হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসিতেছে।" রাজনারায়ণ উগ্র বিপ্লববাদী ছিলেন না। অসবর্ণবিবাহ, স্বেচ্ছাবিবাহ প্রভৃতি অমিতাচার তিনি পছন্দ করতেন না। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশারও তিনি উগ্র সমর্থক ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে অগ্রগণ্যা মিস মেরী কার্পেণ্টার[২] কলকাতায় এলে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ গুরুচরণ মহলানবিশ প্রভৃতি সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর সঙ্গে আপন পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা সস্ত্রীক প্রকাশ্য ভ্রমণেও উৎসাহী ছিলেন। রাজনারায়ণ সামাজিক অবস্থার এত দ্রুত আকস্মিক পরিবর্তন শুভকর মনে করেন নি। মেরী কার্পেণ্টারের অভ্যর্থনা-সভায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন মন্তব্য করেন, "রাজনারায়ণ ধর্মের ডিস্‌পেপসিয়ায় মরমর।"[৩] রাজনারায়ণের আত্মচরিতে উল্লিখিত আছে যে প্রগতিবাদীরা রাজনারায়ণকে সংরক্ষণশীল মনে করতেন। হিন্দুত্বের মৌলিক আদর্শ আঁকড়ে থাকার জন্যই রাজনারায়ণ প্রগতিবাদীগোষ্ঠীর সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশতে পারেন নি।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ স্বাস্থ্যান্বেষণে ভাগলপুর যান। সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষ সরকারি চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পীড়া

---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৩. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৭২

বৃদ্ধি হওয়ায় আগা সাহেব নামক একজন হাকিমের চিকিৎসাধীনে থাকেন। শরীরের এই অপটু অবস্থা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ বাংলাদেশের বাইরে দু'বছর বাস করে এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ভাগলপুর থেকে রাজনারায়ণ গিয়েছিলেন এলাহাবাদ। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনারায়ণের বহু পুরাতন বন্ধু বাস করতেন। তাঁরাই সেখানে ধর্মসভা ও জ্ঞানালোচনার সূত্রপাত করেন। রাজনারায়ণের উপস্থিতিতে এই-সব অঞ্চলে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়। ভাগলপুর থাকাকালীনও তিনি নিয়মিত সমাজে যেতেন, বক্তৃতা দিতেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। এলাহাবাদেও দুটি ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্ট হয়েছিল তখন— একটি উন্নতিশীল দলের আর-একটি নীলকমল মিত্রের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের। বন্ধু নীলকমলের বাড়ি থেকেই তিনি নিয়মিত উপাসনা করতে যেতেন। সেখানকার সমাজে তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে যে জ্ঞানগর্ভ আবেগময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতাগুলি পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদ থেকে তিনি আগ্রা হয়ে লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

পূর্বে লক্ষ্ণৌএর সমাজের নাম 'ব্রাহ্মসমাজ' ছিল না, অন্য নামে অভিহিত হত।[১] লক্ষ্ণৌতে রাজনারায়ণ তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন দক্ষিণারঞ্জন

---

১. তখনকার ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু -লিখিত "সেকালের কথা" প্রবন্ধে ('প্রবাসী', কার্তিক ১৩৩৪) থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হল: "তখন স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে এক একটি সভা হইত। তাহার কার্য্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-সমাজেরই আদর্শে নির্ব্বাহিত হইত। কিছুদিন এইরূপে চলিবার পরে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগ্রহ করিত।" রাজনারায়ণ কেশবচন্দ্রের 'গুডউইল ফ্রেটার্নিটি' সভা স্থাপনের প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করলেও, মন্তব্যটি তখনকার প্রায় সমস্ত সভা স্থাপনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

সমাজের নামকরণ সম্বন্ধে ঈশানচন্দ্র বসু -রচিত 'ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা' পুস্তকের অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য: "এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত (১৮৮০ সালের) কলিকাতার চতুর্দিকে বঙ্গদেশের নানা স্থানে এবং উত্তর, পশ্চিম ও বম্বাই প্রদেশে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশে যে সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সকলের এক নাম ছিল না। কোন স্থানে "জ্ঞান প্রকাশের সভা" কোন স্থানে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা" কোন স্থানে বা "প্রার্থনা সমাজ" ইত্যাদি বহু নামে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত সভা বা সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল।"

মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। উক্ত গৃহে একদিন 'উপাসনা'র আয়োজন হয়েছিল, পৌরোহিত্য করেছিলেন রাজনারায়ণ স্বয়ং। এ-সম্বন্ধে তিনি পরে লিখেছেন, "এ উপাসনায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন।"[১]

লক্ষ্ণৌতে কিছুদিন অবস্থান করে রাজনারায়ণ পুনরায় এলাহাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু কানপুর ব্রাহ্মসমাজ থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসায় শেষ পর্যন্ত এই আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য হন এবং কানপুরের উপাসনায় তিনি যোগদান করেন।

কানপুর থেকে এবার লক্ষ্ণৌ ফিরে এসে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুনরায় তিন সপ্তাহ বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্বেই রাজনারায়ণ পুনরায় কানপুরে ফিরে যান এবং কানপুর-সমাজের ঐ উৎসবে যোগ দেন। উৎসব-অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ-প্রদত্ত বক্তৃতাটি যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায়'। ব্রাহ্মধর্ম যে মূল হিন্দুধর্মেরই অংশ, স্বতন্ত্র কোনো ধর্মমত নয়— উক্ত বক্তৃতায় রাজনারায়ণ প্রধানত সেই জিনিসটিই বুঝিয়ে দেন।

কানপুরে ছিলেন আটমাস, তার মধ্যে এক মাস ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হেমচন্দ্র সিংহের বাড়িতে, আর একমাস ছিলেন অক্ষয়কুমার দের বাড়িতে। জানা যায়, উক্ত অঞ্চলের ব্রাহ্মদের দ্বারা রাজনারায়ণ বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। এই কানপুর থেকেই তিনি অদূরে কনোজ পিতৃভূমি[২] পরিদর্শন করতে যান আবাল্যসুহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (ইনি তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্কুলসমূহ পরিদর্শনরত।) সঙ্গে। পিতৃভূমি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ লিখেছেন "কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন, এই জন্য আমরা ঐ স্থানকে পিতৃভূমি সংজ্ঞা

---

১. "আমার পশ্চিম ভ্রমণ (শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত)", 'দাসী' পত্রিকা (জুন, ১৮৯৫), পৃ. ২৯০

২. পিতৃভূমি সম্বন্ধে রাজনারারণ তাঁর "পিতৃভূমি দর্শন" প্রবন্ধে ('দাসী' পত্রিকা, মে ১৮৯৫ খ্রী) বলেছেন: "মহারাজ আদিশূরের সময় যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের বংশাবলী আজি বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সেই ইতিহাসবিশ্রুত কান্যকুব্জ বা কনোজ এই ফতেগড় জেলার অন্তর্গত। ইহা কলিকাতা হইতে ৬৮২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে আর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং আর্য্য শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল।"

দিয়াছিলাম।"[১] এ-মতের যাথার্থ্য ইতিহাস বিচার করবে। ফরাক্কাবাদ জেলায় অবস্থিত পিতৃভূমি কনোজের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা করেছেন রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে। সেখানকার ভগ্ন, শ্রীহীন অবস্থা দেখে তাঁর মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়েছিল ; আত্মচরিতের পাতায় মনের সেই ভাবই ফুটে উঠেছে।

কানপুরে অবস্থানকালেই রাজনারায়ণ একদিন বিঠুর গ্রামে 'বাল্মীকি-তপোবন' দেখতে গিয়ে সেখানে বসে উপাসনা করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাজনারায়ণের কাছে প্রাকৃতিক-পরিবেশে উপাসনা অত্যন্ত প্রীতিদায়ক ছিল। নীল আকাশের নীচে চতুর্দিকে নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টির লীলায় সহজেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। তাঁর মতে এইভাবেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য সম্ভব হয়। 'বাল্মীকি-তপোবনে' উপাসনার পর অপরাহ্ণে 'সীতাপরিহার' মন্দিরের বিপরীত দিকের ঘাটে বসে 'রামায়ণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন রাজনারায়ণ। এই বক্তৃতায় তিনি সংক্ষিপ্ত সহজ ও সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেন 'রামের জন্মবৃত্তান্ত'।[২] ভূমিকায় রামায়ণের রচনাকাল, 'শ্লোক' শব্দের উৎপত্তি, রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা কে, ইত্যাদি গবেষণামূলক বিষয় নিয়ে অতি স্বল্প কথায় সুন্দর আলোচনা করেন।

এদিকে রাজনারায়ণ কানপুরে অবস্থানকালে আর-একটি ঘটনা ঘটে। কেশবচন্দ্র একালে তাঁর দলবলসহ বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলায় ও ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে প্রচারে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণের ধর্মীয় উপদেশের প্রভাবে তখন এই-সব অঞ্চলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল প্রচারকাজে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। আরো এক কারণ ছিল। কেশবচন্দ্র প্রথমে নিজে না গিয়ে তাঁর সহকর্মিবৃন্দকে (ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি) যুবকদলকে পশ্চিমে প্রেরণ করেছিলেন। তারপর এখানে কেশবচন্দ্র উপস্থিত হলে তাঁর সুবিন্যস্ত ভাষণে, প্রখর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কানপুরবাসী সহজেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁর ধর্মমত গ্রহণে বিশেষ উৎসাহিত হয়। ইতিপূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে রাজনারায়ণ-কর্তৃক তারা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' লিখেছেন যে, এই সময় থেকে কানপুরের আবহাওয়া যেন বদলে যায় ; এবং

১. "পিতৃভূমি দর্শন (শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত)", 'দাসী' পত্রিকা, মে, ১৮৯৫, পৃ. ২২৩

২. বক্তৃতাটি ১৭৮৯ শকের পৌষ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর থেকেই কানপুর সমাজে উপাসনার সময় সকলেই রাজনারায়ণের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁকে দোষারোপ করতে থাকেন। প্রসঙ্গত বলি যে, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হবার পর উপাসনাগৃহে বা প্রকাশ্য সভায় রক্ষণশীল দল ও প্রগতিশীল দলকে বিলক্ষণ বিরোধমূলক বিতর্কে লিপ্ত থাকতে দেখা যেত।

এইরকম উভয়দলের অসন্তোষ বা চাপা বিরোধের আর-একটি পরিচয় পাওয়া যায় কানপুর সমাজেই। প্রগতিশীলদলভুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় এই সময় উক্ত অঞ্চলে গমন করেন। একদিন উপাসনার অব্যবহিত পূর্বে প্রগতিশীল সমাজ থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসতে লাগল রাজনারায়ণের কাছে। তাদের অনুরোধ, সেদিনের উপাসনায় রাজনারায়ণকে যোগদান করতে হবে; রাজনারায়ণ এর কারণ প্রথমে কিছু অনুমান করতে পারেন নি বটে, কিন্তু পরে উপাসনা সভায় যোগদান করে ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। কানপুর-সমাজের ব্রাহ্মদের ধারণা ছিল যে, রাজনারায়ণ বসু অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্ম, যিনি ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দু 'নামাবলী'টি[১] ছাড়তে পারেন নি, যিনি 'বাল্মীকি-তপোবনে' উপাসনা করতে যান, 'রামের জন্ম-বৃত্তান্ত' আলোচনা করেন। সুতরাং এইরূপ একজন গোঁড়া ব্রাহ্মকে একটু অপদস্থ করা প্রয়োজন। সেদিন যথারীতি সমাজে উপাসনা হল, শেষে গৌরগোবিন্দ রায় কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ' থেকে বাইবেল, কোরানের নির্বাচিত শ্লোকগুলি পাঠ করেন। রাজনারায়ণ লিখেছেন যে, "কানপুরের ব্রাহ্মেরা মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল ম্লেচ্ছধর্মগ্রন্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করতঃ সমাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইব।"[২] কিন্তু তা তো হলই না, পরন্তু সভার শেষে রাজনারায়ণ সকলকে জানালেন যে, কোরান এবং বাইবেল থেকে সার-সংগ্রহ তিনিও করেছেন। রাজনারায়ণের রচিত *Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theist's* নামক পুস্তিকাই বাইবেলের

---

১. এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখেছেন: "যে আট মাস কানপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর একমাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়েই যারপরনাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন।" পৃ. ৭৬

২. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ৮৫

সারসংগ্রহ। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ১২ নভেম্বর আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হলে রাজনারায়ণ ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা দেন, বিষয়বস্তু ছিল 'ব্রহ্মবাদ কি ?' ("What is Brahmoism ?")। উক্ত বক্তৃতার প্রথম অংশে রাজনারায়ণ ব্রহ্মবাদের বিষয় বুঝিয়েছেন কোরান ও বাইবেল থেকে উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে ; দ্বিতীয় অংশ কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করে রচনা। রাজনারায়ণের উক্ত বক্তৃতার প্রথম অংশ—*Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theist's* নাম দিয়ে পরম হিতৈষী বিদেশী বন্ধু রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সী -কর্তৃক লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি এই পুস্তিকা কলকাতায় ছাপানোর ভার দেন তাঁর তৃতীয় জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। রাজনারায়ণের এই পুস্তিকাটি দেশী ও বিদেশী ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে একসময় তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। লণ্ডন থেকে বিশিষ্ট একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক চার্লস ভয়সী রাজনারায়ণকে লিখে জানালেন যে, "I want to place you in my gallery along with Theodore Parker, Professor Newman and Miss Cobbe. But you are a *truer theist* than any of them except Newman."[১]

কানপুরের আর-একটি ঘটনাও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনারায়ণ উক্ত অঞ্চলে অবস্থানকালে প্রগতিশীলদলভুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এলেন কানপুরে। যেদিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনা করেন সেদিন কানপুরের সরকারী ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের সঙ্গে রাজনারায়ণও উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন। যথানিয়মে উপাসনা সমাধা হল। পরিশেষে দেখা গেল যে, উপাসনান্তে কোনো কোনো ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পদদ্বয় ধরে প্রার্থনা করছেন, 'প্রভু আমাকে পরিত্রাণ করুন।' কেউ বলেছেন, 'আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।' যা হোক, সেদিনকার এই সভায় ব্রাহ্মেরা সবশেষে রাজনারায়ণের পদযুগল লক্ষ্য করেও অগ্রসর হন যেহেতু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু এই অব্রাহ্মজনোচিত আচরণ লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং অনেক অনুনয়ের পর তাঁদের বিরত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে মানুষের নিকট পরিত্রাতারূপে প্রার্থনা শুনে রাজনারায়ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-উপাসক ব্রাহ্মদের মধ্যে নরপূজা তথা অবতারবাদের

১. রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সীর উক্ত পত্রাংশ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১, পৃ. ৮৯) থেকে উদ্‌ধৃত।

আবির্ভাব আশঙ্কায় স্তব্ধ হলেন। এই স্তব্ধতার প্রকাশ হল বিস্ফোরণে। রাজনারায়ণের প্রতিবাদস্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি ধর্ম ও সমাজ -বিষয়ে, যখন যেখানে অন্যায় দেখেছেন, দৃঢ় লেখনীতে, অথচ শান্ত, সংযতভাবে আক্রমণ করেছেন। "Brahmic Advice, Caution and Help" নামক বক্তৃতা রচনা করে রাজনারায়ণ আক্রমণ করলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথা কেশবচন্দ্রের দলকে। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন : "আমি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলাম।" উক্ত বক্তৃতায় তিনি পাপের জন্য দুঃখপ্রকাশ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মদের মূল্যবান ছ'টি উপদেশ দিয়ে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ আলোচনা করেছেন। ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পর্কেও রাজনারায়ণের মতামত এই বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন যে, কোনো মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করাকে তিনি অকার্য বলে মনে করেন। কোনো পার্থিব বস্তু বা মূর্তিকে ভগবান জ্ঞানে প্রণাম করা ব্রাহ্মদের কাছে পৌত্তলিকতা। মানুষকেও ভগবান জেনে প্রণাম করা অনুরূপ পৌত্তলিকতা। ধর্মগুরুকে একেবারে ত্রুটিবিহীন ভগবদ্স্বরূপ কল্পনা করা ব্রাহ্মের পক্ষে উচিত নয়। যিনি সেরূপ ভাববেন, তিনি একান্তই পৌত্তলিক। রাজনারায়ণ আরো বলেছেন, গুরুর উপদেশের যথাযথতা যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ দ্বারা বুঝে নিতে হবে। তার মুখের উক্তিকেই বেদবাক্য বলে গণ্য করা হবে না। নিজস্ব বিচারের ওপর এই দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্যই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের পার্থক্য। কোনো মানুষই ঈশ্বরের মতো পূর্ণ সত্তা নয়। রাজনারায়ণ তাই বারবার বলেছেন যে, গুরুকুলের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত, কিন্তু তাদের দেবতা বানিয়ে লাভ নেই। যে গুরুরা শিষ্যদের বিচারহীন অন্ধ ভক্তে পরিণত করেন, তিনি গুরু নামের অযোগ্য।

উনিশ শতকের প্রতিভাবান পুরুষ রাজনারায়ণ বিশ্বসৃষ্টিতে ঐশী শক্তির বিচিত্র প্রকাশকে স্বীকৃতি দিয়েও মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে প্রোজ্জ্বল রাখতেই চেয়েছিলেন। ব্রহ্মকে বড়ো করেও মানবিক সত্তার অবমাননা কোনোদিন করেন নি। এই ভারতবর্ষের ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে তথা দেশবাসীকে বলেছেন, যে ধর্মগুরুদের ঈশ্বরাবতার কল্পনা করাই এখানকার মানুষদের প্রবণতা ; এই প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকবার জন্য তিনি ব্রাহ্মদের বার বার উপদেশ দিয়েছেন। গুরুর পদযুগল স্পর্শ করে শিষ্যের কৃপা প্রার্থনা করাকে রাজনারায়ণ 'আধ্যাত্মিক দাসত্ব' বলেছেন। তাঁর মতে

যে ধর্মগুরুরা নিজেদের শিষ্যদের আধ্যাত্মিক দাসত্বের এমন শোচনীয় দীনতায় নিয়ে আসেন, তাঁরা ভগবানের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

রাজনারায়ণের এই বক্তৃতায় ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম সমাজেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে তাঁকে 'ঝগড়ার বই' লেখা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, আবার অনেকে এই ধরনের পুস্তক পড়া বা লেখাকেও অধর্ম বলে মনে করতেন।

এই সময়ে (১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ) কেশবচন্দ্রের ভক্তিধর্ম প্রচারের ফলে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র ধর্মাচরণের পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথমত কেশবচন্দ্রের দুটি বক্তৃতায় ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস সকলের দৃষ্টিগোচর হল; একটি হল "যীশুখৃষ্ট—ইয়োরোপ ও এসিয়া" (৬ মে, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ), ও অপরটি হল "মহাপুরুষ" ("Great Men", 28 Sept. 1866); দ্বিতীয় বক্তৃতাটিতে স্বদেশের ও বিদেশের সমস্ত ধর্ম-প্রবক্তাগণের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পিত হয়েছে। এই থেকেই ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রতি প্রগতিশীল দলের অতিরিক্ত ভক্তি, বাইবেল, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ, খ্রীস্টের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা[১] এবং বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাস, গৌরলীলা-বিষয়ক সংগীত শ্রবণ ইত্যাদির প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এই থেকেই প্রগতিশীলদল ও রক্ষণশীলদলের বিভেদ-বৈষম্যগত বিরোধ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় সমাজভুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমাজ ত্যাগ করলেন এবং কেশবচন্দ্রের ভক্তিভাবোচ্ছ্বাসের বিপক্ষে মসীযুদ্ধ শুরু করেন।[২] তা ছাড়া "নরপূজা" "মনুষ্যপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ-

---

১. এই মর্মে 'ন্যাশন্যাল পেপারে' প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীলদলের পত্রিকায় তখন উন্নতিশীলদলের সংবাদগুলি এইভাবে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নূতন ব্রাহ্মদের Parvenu ও "পাতিনেড়ে" বলে ব্যঙ্গ করত। ফরাসী ভাষায় Parvenu অর্থে 'হঠাৎ বড়লোক' বুঝায়।

'ন্যাশন্যাল পেপারে'র (১ জানুয়ারি, ১৮৬৮ খ্রী) সংবাদটি হল এই :—

"A friend informs us that the 'Parvenu Brahmos' celebrated the Christmas headed by the 'Chief Missionary' by prayers and fasting at a meeting held at the house of Baboo Protap Chunder Mazumder. Several pictures of Christ were hung on the walls of the room in which the prayer meeting was held."

২. "Avatarism"-শীর্ষকে কেশবচন্দ্রের বিপক্ষে পত্র লেখেন যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দ্রষ্টব্য : *The National Paper* (Dec. 30, 1868)।

সমূহ প্রকাশিত হতে লাগল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। কেশবচন্দ্রের ভক্তি-আন্দোলন আরো এক ধাপ অগ্রসর হল। দেখা গেল যে, 'ভারতবর্ষীয় সমাজে' বৈষ্ণবধর্মের ভাবাবেগের প্রভাবে খোল, করতাল, একতারার আবির্ভাব ও সংকীর্তনের প্রবর্তন হল কেশবচন্দ্রের দ্বারা। ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭ খ্রী) ৯ অগ্রহায়ণ প্রথম ব্রাহ্মোৎসবে (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে) সভায় সমস্ত দিন পবিত্র ব্রাহ্ম আরাধনা, প্রার্থনা, সংকীর্তনাদি চলে।[১] আবার ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি (১১ মাঘ) উক্ত সমাজের নূতন মন্দিরে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে সমাজস্থ ব্যক্তিদের পতাকা হস্তে[২] 'নগর-সংকীর্তন' শহরে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। রাজনারায়ণ প্রমুখ রক্ষণশীল দলভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রতিপক্ষদলের প্রতি কটাক্ষ করে 'ন্যাশন্যাল পেপারে' মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[৩]

কেশবচন্দ্রের ভক্তির আবেগ ও ধর্মপ্রচারের চরম রূপ দেখা যায় মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক (১৮৬৮) উৎসব অনুষ্ঠানে; পূজ্যবোধে পদধূলি গ্রহণ, গলবস্ত্র হয়ে ভোজনাবশিষ্ট যাচ্ঞাপূর্বক গ্রহণ, ভক্তদের দ্বারা কেশবচন্দ্রের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদিতে মুঙ্গেরে ধর্মোন্মত্ততার লক্ষণ প্রবলভাবে দেখা যায়। ব্রাহ্মদের পরস্পর পদধূলি গ্রহণ করা সম্পর্কে রাজনারায়ণের অভিমত এই যে, "কোন বিশেষ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ ক্বচিৎ পদধূলি লইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহাকে ধর্মের একটি অঙ্গ করার প্রতি আমার বিশেষ আপত্তি আছে।"[৪]

মুঙ্গের থেকে সিমলা হয়ে কেশবচন্দ্র ফিরে আসেন এলাহাবাদে। রাজনারায়ণও তখন কানপুর থেকে ওখানে এসেছেন। তিনি এতদিন যে-সমস্ত সংবাদ দূর থেকে শুনছিলেন, এখানে তা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন। রেলস্টেশনে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সম্প্রদায়দিগের মধ্যে পদধূলি গ্রহণের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ আপনার পদস্পর্শে

---

১. দ্রষ্টব্য: গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়. 'আচার্য কেশবচন্দ্র', ১ম খণ্ড (১৯৩৮), পৃ. ৪২৬

২. পতাকাত্রয়ে পর্যায়ক্রমে এই তিনটি সত্য অঙ্কিত ছিল—'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

৩. ন্যাশন্যাল পেপারে (২২ জানুয়ারি, ১৮৬৮)—"The Brahmo Procession"-শীর্ষক সংবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৪. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৮৬

বাধা দিলে, উন্নতিশীলদলের মধ্যে তাঁর দুর্নাম রটে গিয়েছিল। কিন্তু মিথ্যা অপযশের জন্য তিনি বিচলিত হন নি। অথচ এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের আরাধনার মধ্যে পৌত্তলিকতার আচরণবিধি লক্ষ্য করে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। প্রধানত তিনিই প্রথম থেকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র সর্বপ্রকার উগ্র আচরণ ও ব্রাহ্ম আদর্শ-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর উৎসাহে রাজনারায়ণ বারবার বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন কেশবচন্দ্র ও তাঁর দলীয় সমাজের প্রতি। সে বাণ সূচ্যগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণভেদী ছিল, কিন্তু বিষজর্জরিত ছিল না; তাতে উপদেষ্টার উপদেশ ছিল, কিন্তু সমালোচকের খোঁচা ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে কেশবচন্দ্রের ভক্তি-ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ পুনরায় তাঁর বিপক্ষে লিখলেন, "Brahmic Questions of the Day—Answered" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, "Brahmic Advice Caution and Help" ও "Brahmic Questions of the Day—Answered" প্রবন্ধ দুটি এলাহাবাদেই ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্ম ইয়ারবুকে'র (১৮৭৬-৭৭ খ্রী) "Literature in the Brahmo Samaj (Propagandist and Expository)"-শীর্ষকের সংবাদটি[১] উল্লেখযোগ্য। এই-সমস্ত পুস্তিকা-মারফত রাজনারায়ণ ভারতের ধর্মীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মধর্মের মূল ভাব, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করে

---

১. সংবাদটি হল এই :—

"There is another Literary Brahmo whose labours here claim an honorable place. Babu Raj Narain Bose combines some of the features of the old Vedantic Brahmoism with some that belong to the progressive School. He wrote a good deal in the Tattvabodhiny Patrika; he has given many lectures in English; and he is now the Secretary to the Adi Somaj at Calcutta. Two tracts issued by him in 1869 ('Brahmic Questions of the Day, answered by an old Brahmo.' and 'Brahmic Advice, Caution and Help, by an old Brahmo') should be mentioned as interesting to the outside reader from their earnest and able opposition to Mr. Sen's broader theological sympathies and Augustinian fervours. These controversies, now mostly forgotten, form a curious parallal to similar conflicts in the Christian Church."—*Brahmo Year Book* (1876-1877), pp. 31-32.

বিপথগামী ব্রাহ্মদের তথা সমগ্র ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। ধর্মপ্রচারকালে তিনি এ কথাই বারবার ঘোষণা করেছেন যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই মূলীভূত অংশ। কাজেই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর পক্ষে প্রচারের ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে মেতে ওঠা উচিত হয় না। রাজনারায়ণ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভারতের ধর্মীয় আদর্শ অনুধাবন করেছিলেন। তাই ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়ভাব গ্রহণের একান্ত পরিপন্থী ছিলেন।

রাজনারায়ণ উগ্রপন্থী ব্রাহ্মদের পৌত্তলিকতার নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা সমর্থন করেন নি। *Brahmic Questions of the Day— Answered*-পুস্তকে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পৌত্তলিকতা পাপ নয়, তবে অজ্ঞতাজনিত ভ্রম। বিবেকশীল, ধার্মিক পৌত্তলিককে তিনি নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মের তুলনায় অধিকতর শ্রদ্ধেয় মনে করেন। সুতরাং প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসবলে যাঁরা পৌত্তলিক, তাঁরা সর্বথা ঘোরতর পাপীরূপে ঘৃণিত নন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সর্বপ্রকার পৌত্তলিকতা ও ধর্মোন্মত্ততা লক্ষ করেও রাজনারায়ণ এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সমর্থক ছিলেন।

'কৈশবরা' কেশবচন্দ্রকে অবতাররূপে প্রচার করলে রাজনারায়ণ উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হন, এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তাঁর মত ছিল, "This is a plain and obvious truth which requires no proof that man is man and is not God."[১] অবতারবাদের স্বীকৃতিকে ধর্ম ও সমাজজীবনে পরম ক্ষতি-কররূপে তিনি মনে করতেন। ব্রাহ্মমতবাদের সঙ্গে অবতারবাদের সম্পর্ক কিছুতেই যে স্থাপিত হতে পারে না, তাই ছিল রাজনারায়ণের প্রবল বিশ্বাস। রাজনারায়ণ প্রগতিবাদীদের ভক্তির আতিশয্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন যে, এক মুহূর্তের যে আবেগ চঞ্চলতা, তাকে Frenzy বলা যায়, কিন্তু তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অসম্ভব। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—"Our religion is not a religion of frenzy, like that of the bouls or the Chaitanya Vaishnavas of this country or the howling Dervishes of Constantinople. Religious madness is not surely be highest religious state which man can attain."[২] যুক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে

---

১. Rajnarain Bose, *Brahmic Questions of the Day—Answered*, p. 21

২. Ibid., p. 22

রাজনারায়ণ যুক্তি ও বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও প্রশান্তি, ধ্যান ও কর্মের সার্থক সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবে অযথা আড়ম্বর হৈচৈ, শোভাযাত্রা— রাজনারায়ণ সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন যে ধর্মোৎসবে বাহ্যানুষ্ঠানের সমারোহ যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত, অনেকে মনে করেন যে অনুষ্ঠান জাঁকজমক-সহকারে সম্পাদন করলে, অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান রাজনারায়ণের মতে জনকোলাহল ও সমারোহ মাত্র নয়।

রাজনারায়ণ যেমন তাঁর দৃঢ় লেখনীতে আক্রমণ করেছিলেন কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুচরবৃন্দকে, তেমনি কেশবের অনুচরদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর সংসর্গ পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত ভক্তিবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভক্তির স্রোত অনেক মন্দীভূত হল—১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যাওয়ার পর।

১৮৬৯ সালের শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বেই রাজনারায়ণ সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ধর্মপ্রচারকের গুরুদায়িত্ব ও আপনার মনোগত বাসনা পূর্ণ করে ফিরে আসেন কলকাতায়। একান্ত অনুরাগী সুহৃদ ও সহকর্মী ফিরে এলে দেবেন্দ্রনাথ যেমন আনন্দিত হলেন, তেমনি উদ্‌বিগ্নও হয়েছিলেন তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য। যেহেতু রাজনারায়ণের কর্মধারায় দেবেন্দ্রনাথের আস্থা ছিল অপরিসীম, তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, রাজনারায়ণের মতো ব্যক্তি সুস্থ থাকলে ব্রাহ্মধর্মের অনেক উপকার হবে। ধর্মীয় আদর্শ ও দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ— যুগপৎ এই দুই দিকের মূল সূত্রই প্রচার করেছেন রাজনারায়ণ বাংলা ও বাংলার বাইরে। প্রচারকের আদর্শ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেছেন যে, প্রথমে স্বদেশবাসীদের মধ্যে এবং তারপর অন্যান্য জাতির মধ্যে ধর্ম প্রচারিত হওয়া উচিত। এই আদর্শ তিনি নিজেও প্রতিপালন করেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে। কিন্তু এটাও তিনি স্মরণ রেখেছিলেন যে, আদর্শকে উচ্চস্থান দিয়ে শক্তির অপব্যয় করা উচিত নয়। তিনি বলতেন যে চাষা যেমন চাষ করবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ঠিক করে নেয়, চাষের জন্য সারা পৃথিবীর প্রয়োজন হয় না, সেইরকম প্রচারকদেরও সীমানা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। রাজনারায়ণ আরো বলেছেন যে ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলে ক্ষতি নেই, মোটকথা উদ্যমী এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী বা প্রকৃত ব্রহ্মবাদী হওয়া চাই। ধর্মমত ও নীতিতে রাজনারায়ণ যে কত উদার ও সমন্বয়পন্থী ছিলেন, তা বোঝা যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিদের

সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলি উদ্ধৃত করলে। এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তবু সংক্ষেপে আসল কথাগুলির দু-একটি আলোচনা করা গেল : ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ব্রহ্মবাদী হবার জন্য জাতি, ধর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। আবার ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রাচীন ধর্মমতে আস্থাশীল ব্যক্তি, যাঁদের পক্ষে পরিবেশগত সংস্কার একেবারে পরিহার করা সম্ভব নয়, তাঁরা নিজের ধর্মের মধ্যে থেকেও পূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারেন। তাঁদের শুধুমাত্র ধর্মানুষ্ঠান-ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নিলেই হয়। মূলকথা হল ঈশ্বরবিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করে ভ্রমাত্মক ধারণা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-পদ্ধতি বর্জন করলেই ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে যে-পদ্ধতিতে ঈশ্বরপূজা করে, সে সেই পদ্ধতি বজায় রেখেও যুক্তিমূলক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে পারে। কাজেই রাজনারায়ণের মতে সামাজিক বা আচরণগত বাহ্য ব্যবধান দ্বারা ঈশ্বরবাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হবার পর রাজনারায়ণ সর্বপ্রথম সমাজের সামনে উপস্থাপিত করলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজের মত ও নীতি' (*Adi Brahma Samaj— its views and principle*)-পুস্তক। এ ছিল ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের কথা। ব্রাহ্মরা যাতে কোনোক্রমেই আদর্শবিচ্যুত না হন, একালে রাজনারায়ণ বক্তৃতা ও রচনার দ্বারা সেই চেষ্টাই করে গেছেন।

যা হোক, কলকাতায় ফিরেই রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এখন থেকে তিনি বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিযুক্ত থেকে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে দেশ ও জাতির আত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্ত শ্রমস্বীকার করেন। বাস্তবিক ধর্মান্দোলনের মাধ্যমেই রাজনারায়ণ জাতিকে নির্দিষ্ট ধর্মপথ দেখিয়েছেন, সমাজসংস্কার করেছেন। একালেও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখেন ও সভা-সমিতি স্থাপন করেছেন ; তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর লক্ষ্য ছিল জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের দিকে। আবার এইসময় তিনি অবসর যাপন করেছেন উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে ও রম্য-রচনা লিখে। দিনের বিবরণে ডায়ারির পাতা ভর্তি করে, অতীত জীবনের বিষয় চিন্তা করেছেন 'আত্মচরিত' রচনার জন্য। সর্বোপরি আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় নিমগ্ন হয়ে উন্নত এবং স্বাবলম্বী দেশের প্রতিষ্ঠাকল্পনা এই সময় তাঁর মনে সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ট্রাস্টীর ক্ষমতাবলে ১৭৯২ শকের মাঘ মাস (১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) থেকে রাজনারায়ণকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় থেকেই রাজনারায়ণ জীবিতকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিপদ অলংকৃত করেছেন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেওঘর গমন করার পর থেকে উক্ত সমাজের সভাপতির আসনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হাইকোর্টের উকিল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, রাজনারায়ণ সভাপতি হয়ে যোগ্য সহকর্মীরূপে পেলেন মহর্ষির চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের সহযোগে ১৭৯১ শকের প্রারম্ভেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত হন। এ-কাজে তিনি এককভাবে ১৮০৬ শকের ভাদ্র মাস পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তখন মাত্র একবছরের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজের কাজের সূত্র এবং মহর্ষির জ্যৈষ্ঠ পুত্র হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ গভীর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের বন্ধুত্বের কাহিনী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এদিকে রাজনারায়ণ কলকাতায় আসার দু'বছর পর বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে (ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুরের গোপগিরি) প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি একত্রে পুস্তকাকারে 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা'-২য় খণ্ড নামে এলাহাবাদ থেকে ১৭৯২ শকে প্রকাশিত হল নীলকমল মিত্রের পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রের দ্বারা। পুস্তকটির 'বিজ্ঞাপনে' প্রকাশক এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন যে, "বোধ হয় ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে।" তখন শুধুমাত্র এই পুস্তকটি প্রকাশেই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনারায়ণের একাধিক রচনার দ্বারাও ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই-সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, গগনচন্দ্র হোম -কর্তৃক সম্পাদিত 'আলোচনা' নামক মাসিক পত্রিকা, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'নব্যভারত', 'অনুসন্ধান', 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মেরই সমুন্নত রূপ, তা যে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম নয়, ভারতবর্ষের পুরাতন ধর্ম— তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রকৃত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মধর্ম" (বৈশাখ ১৭৯৫ শক) নামক প্রবন্ধে রাজনারায়ণ এই বিষয়ই ব্যক্ত করেন; আরো বলেন: "বেদ উপনিষদের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই বলিলে

অত্যুক্তি হয় না, সেই বেদ উপনিষদরূপ মৃত্তিকার গর্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বীজ নিহিত আছে।"[১] কেশবচন্দ্রের উগ্র সংস্কার-প্রচেষ্টা, ধর্মের প্রমত্ততা তিনি কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি, তা আমরা জানি। ভক্তির স্রোতে ভাসমান, কেশবচন্দ্রের নির্দেশিত পথে ব্রাহ্মধর্মের বিপথগামী (রক্ষণশীলদের মতে) জনসাধারণকে উক্ত ধর্মের যথানির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার জন্য রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজ ভবনে বক্তৃতা দিলেন 'ব্রহ্মবাদ কি ?'—(What is Brahmoism) বিষয়ে। ধর্ম-বিষয়ক আলোচনার দিক পরিহার করে, যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ববিদ্যার (Metaphysical) দিকটা আলোচনা করলেন উক্ত প্রবন্ধে। আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক উৎপত্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অনন্তত্ব. তাঁর পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং বন্ধুত্ব, ঈশ্বর-সান্নিধ্য, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, পরকাল, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। মানবাত্মার চিরপ্রগতিশীলতা ও ঈশ্বরের পাপ-বিমোচন ক্ষমতার বিষয় সংক্ষেপে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন রাজনারায়ণ। তাঁর মতে যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁদের এই কয়টি বিষয়ে আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি প্রজ্ঞা, প্রেম ও সামঞ্জস্যবোধ— ব্রহ্মবাদের এই তিনটি মূল সূত্রের কথা রাজনারায়ণ ঘোষণা করলেন।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলে ব্রাহ্মবিবাহ নিয়ে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় ব্রাহ্মসমাজের দুটি দলে। বিবাহ আইনসংগত করার জন্য ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই কেশবচন্দ্র সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সকলের মতামত গ্রহণের জন্য তিনি একটি সভা আহ্বান করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এক কমিটি গঠন করেন। আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে কমিটির সভ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। হিন্দু সাধারণের মধ্যেও এই নিয়ে বাদানুবাদ চলে। এ-সমস্ত কারণে উক্ত বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাকে। আন্দোলনটি দুই দিকে খুব জটিল হয়ে ওঠে যখন ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করবার জন্য অকস্মাৎ কেশবচন্দ্র একটি প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করেন।

একদলের মত সরকার-কর্তৃক ব্রাহ্ম বিবাহ আইনসংগত হোক ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নব-প্রণীত বিবাহ-পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে তাদের মনে সংশয় ছিল। আর-একদল বললেন, ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের সাহায্য কোনোদিন কোনো ধর্মগোষ্ঠী নেয় নি, কাজেই আজও তা সংগত হবে না। এবং শুধু তাই নয়,

১. রাজনারায়ণ বসু, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ ১৭৯৫ শক।

'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' এই নামকরণেও তাঁরা বিশেষ আপত্তি তুললেন। আন্দোলনের প্রথম দলের প্রধান হলেন কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় দলের প্রধান রাজনারায়ণ। উভয় দলের মধ্যে সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের দ্বারা বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। রক্ষণশীলদের মতে দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বিবাহ-পদ্ধতি ও সবর্ণ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মতে উভয় দলের পদ্ধতিই অবৈধ। পৌত্তলিকতা পরিহার করলেও হিন্দুবিবাহে নান্দী, শ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা আছে। তা ছাড়া হিন্দুদের অষ্টপ্রকার বিবাহ কোনোটিই ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী নয়। আবার ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে-তার বৈধতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। তাই কেশবচন্দ্র চিন্তা করেছিলেন যে, আইন বিধিবদ্ধ করলে শাস্ত্রোক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বৈধ বলে স্বীকৃতি পাবে। শুধুমাত্র এই কারণেই নয়, কেশবচন্দ্রের মতো চিন্তাশীল ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন আরো গভীরভাবে। দেখা যায়, "কেশবচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-ধর্মীদের 'মানুষ' বলিয়াই মান্য করিতেন—বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতিনিধিরূপে নয়। তাই তিনি জাতিভেদহীন, বিশেষ সংস্কারমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।"[১] কিন্তু এর একটি মূলগত অসংগতি ছিল : যেহেতু সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের রক্তের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে, শ্রেণীহীন এক সমাজ গঠন করাও কঠিন। তাই কেশবচন্দ্র জাতিধর্মনির্বিশেষে সবর্ণ, অসবর্ণ—সমস্ত বিবাহ বৈধ করতে চাইলেন আইন বেঁধে। কিন্তু রাজনারায়ণ বললেন, "যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কন্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখসম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"[২] রাজনারায়ণের মতে ব্রাহ্মদের এই বিবাহ-প্রথা সময়ে একটা সাম্প্রদায়িক প্রথায় বিধিবদ্ধ হয়ে যেত, এর জন্য আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু তিনি ইতিপূর্বেও বলেছেন যে সমাজ-সংস্কার সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে আপনি হবে, কিন্তু পূর্বে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন। কাজেই কেশবচন্দ্রের 'তিন তাড়াতাড়ি' এই কাজের জন্য রাজনারায়ণ যৎপরোনাস্তি বাধা দানে উদ্যত হলেন। আরো এক কথা : কেশবচন্দ্র হিন্দু, মুসলমান, এবং 'ভারতবর্ষের

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৩৯

২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৩৮

প্রচলিত ধর্মত্যাগী' সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। একসময় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এই নিয়ম ঘোর আপত্তিজনক ছিল। রাজনারায়ণ এই নিয়মের দোষ-ত্রুটি দেখালেন এইভাবে: "...যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মে জন্মিয়া সেই ধর্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্মের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহ করে তাহা হইলেও সে বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে।"[১] কাজেই এ-সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ দেখালেন যে 'প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অমান্য করা কার্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।' অতএব রাজনারায়ণ উপরোক্ত বিবাহ-বিধি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই সংগত মনে করেন। প্রথম থেকেই (১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে) ন্যাশন্যাল পেপারে এই নিয়ে ('Legalization of Brahmo Marriages') লেখালেখি শুরু হয়।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র মুঙ্গের থেকে সিমলা গিয়ে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লরেন্স সাহেবকে ব্রাহ্মবিবাহ আইনবদ্ধ করতে অনুরোধ করেন। তারপর উক্ত সনে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সচিব মেয়ন সাহেব বর্তমান 'সিভিল ম্যারেজ' বিল-এর ন্যায় একটি বিল প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তার ত্রুটির সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মতামত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থাসচিব স্টিফেন বিবাহ বিলটির অল্প কিছু পরিবর্তন করে 'ব্রাহ্মবিবাহ বিল' আইনসংগত করতে উদ্যত হলে, আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে আপত্তি ওঠে 'ব্রাহ্ম' নাম নিয়ে। যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম উন্নত হিন্দুধর্ম অতএব ঐরূপ নামের সমীচীনতা কোথায়। এদিকে অবস্থা সঙ্গীন বুঝে স্টিফেন কেশবচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। এবং কেশবচন্দ্র অবস্থার বিপাকে পড়ে 'আমি হিন্দু নই' এ কথা বলতে বাধ্য হলেন। স্টিফেনের পক্ষে এতে সুবিধেই হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বিবাহ বিল আইনসভা থেকে পাস হয়। তখন ব্রাহ্মবিবাহবিধি নাম ত্যাগ করে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের 'তিন আইন' নামে এই সিভিল বিবাহবিধি প্রচলিত হয়। এই সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড নেপিয়ার অফ এট্রিক। আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার দিনে 'কাউন্সিল-হাউসের' কৌতুকপ্রদ দৃশ্যের বর্ণনা করে গেছেন রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে।

---

১. আত্মচরিত, পৃ. ১৩৯

রাজনারায়ণ যে এই নূতন বিবাহআইন নিয়ে প্রথম থেকেই কিরূপ আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার আর-একটি প্রমাণ রয়েছে তাঁর লিখিত 'উদ্দীপন-পত্রী'তে। নূতন বিবাহআইন পাস হবার পর ভারতবর্ষের ব্রাহ্মগণের প্রতি রাজনারায়ণ স্বলিখিত একটি আবেদন পত্র মুদ্রিত করে কেশব সেনের ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। বিরুদ্ধদলের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি এ কাজ থেকে নিরস্ত হন নি। 'ঘাড়ে চাপান আইন' যে তিনি কোনো-মতেই মেনে নিতে রাজী নন— এ কথাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করলেন। রাজনারায়ণের অভিযোগ আইনসভার প্রতি নয়, অভিযোগ ছিল তাঁদের প্রতি যাঁরা সামাজিক ব্যাপারে আইনসভার দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে ধার্মিক ব্যক্তি হয়েও, ব্রাহ্মবিবাহে কী করে ধর্মের দিক একেবারে পরিহার করেছেন— একথা ভেবে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। রাজনারায়ণের মতে এই আইনের দ্বারা সমাজ-জীবনে ধর্মের দিক একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে, কেবলমাত্র সামাজিক বৈধতার দিকটাই বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। এইভাবে আইনকে প্রাধান্য দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহ আইনের উল্লেখ করে রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন যে, এই-সব ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ কোথাও করা হয় নি। ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনি এর পরিণাম সম্বন্ধেও গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কোনো কালে, কোনো দেশে আইন দিয়ে ধর্মাচরণের গতিবিধি নির্দেশ করা হয় নি; অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আইনের প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করা উচিত। এ পরিণামে যে সুফল প্রদান করবে না, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতটি হল: "...ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ রেজিষ্ট্রার, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ।"[১]

এইভাবে রাজনারায়ণের প্রতিবাদ-ধ্বনি ব্রাহ্মসমাজে একদা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শেষ এখানেই হয় নি। আইন পাস হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে রাজনারায়ণ পৌরোহিত্য করে স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন।

---

১. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯৬১), পৃ. ১৪৫

এদিকে ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন চারি দিকেই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সমাজ ও ধর্ম নিয়ে হিন্দু সমাজের চারি দিকে 'গেল গেল' রব উঠেছিল। শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুর স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'য় হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনপূর্বক মনোমোহন বসুর দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াতে লাগলেন। এর দ্বারা একদিকে যেমন কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত বিবাহ-আইনের প্রতিবাদ হয়েছিল, অপর দিকে এইসভার উদ্যোগে হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বৃদ্ধি হতে লাগল। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে 'ব্রহ্মসভা' ও ধর্মসভা' সমাজে যে উদ্দেশ্য সাধন করেছিল, উক্ত শতকের সপ্তম দশকে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও 'সনাতন হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' সেই উদ্দেশ্যই সাধন করেছে বলা যায়।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রচিত *Theistic Toleration and Diffusion of Theism* নামক পুস্তিকায় রাজনারায়ণ ভারতীয় ব্রহ্মবাদের স্বরূপ স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ব্রাহ্মদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। এই একই বছরে (১৭৯৪ শকে) ব্রাহ্মদের মধ্যে থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে রাজনারায়ণ একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন "প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে?" ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পূর্বোক্ত ধর্মকে ঘৃণা করাকে তিনি এই প্রবন্ধে 'অসভ্যতা' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "সকল প্রচলিত ধর্মে ব্রাহ্মধর্ম অন্তর্ভূত রহিয়াছে।" অতঃপর আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-নীতি ও কর্মপ্রণালীর বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন রাজনারায়ণ এক বছর পর— ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর *Adi Brahmo Samaj— As A Church* নামক পুস্তিকায়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বক্তৃতা করেন। বিষয় হল—"ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব।" উক্ত পুস্তকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের প্রকৃত আদর্শ কী হওয়া উচিত— এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেশবচন্দ্রের *Jesus Christ— Europe and Asia* এবং *Great men* এই দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ করে তিনি কেশবের খ্রীস্টভক্তির প্রতি এবং নিজেকে অবতার বলে প্রচার-প্রবৃত্তিকে কটাক্ষ করেছিলেন এই পুস্তকে।

ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলন চরম হল যখন ১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ কেশবচন্দ্র নিজের প্রবর্তিত নিয়ম নিজে ভঙ্গ করে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার

১১

সঙ্গে আপনার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। দেশের চারি দিকে তুমুল আন্দোলনের ঝড় উঠল। একমাত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরার' এই ঘটনার দ্বারা সামাজিক অগ্রগতির কথাই প্রচার করেছিল। এদিকে কেশবচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন এই বলে যে, তিনি ঈশ্বর-কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়েই এ কাজ করেছেন। উক্ত বিবাহে বাল্যবিবাহের অনুমোদন ও পৌত্তলিকতাচরণ প্রভৃতির জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ব্রাহ্মগণ ক্ষুণ্ণ হয়ে কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে দুটি স্বতন্ত্র দলে বিচ্ছিন্ন হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামক পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সোৎসাহে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিগুণ উৎসাহে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ; প্রভৃতি প্রচারকগণকে নিয়ে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ প্রবল উদ্যমে 'নববিধান' নামক নূতন সমাজের দ্বারা সর্বধর্মসমন্বয় মত প্রচারে উৎসাহী হন। 'সাধারণী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ) এই মর্মে প্রকাশিত সংবাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে : "ব্রাহ্ম সমাজে আবার বিপ্লব উপস্থিত। কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই ইহার সূত্রপাত হয়,...এখন তিনটি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ হইল। আদি সমাজ, ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং সাধারণ সমাজ।

"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে না পারিলে শান্তি মিলিবে না, সাধারণ ভারতবাসীর এইরূপ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।"

এরই মধ্যে রাজনারায়ণ যখন ব্রাহ্মধর্মনীতি ও তার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার প্রয়াসে খুবই ব্যস্ত—তখন তাঁরই সভাপতিত্বে ১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'ব্রাহ্মবোধিনী সভা'। সভার উদ্দেশ্য ছিল 'ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোকেদের ব্রাহ্মধর্ম উপদেশ করা।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র ছিলেন এই সভার সম্পাদক। নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই সভা আপাতত দুটি উপায় অবলম্বন করেছেন। 'প্রথম স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।' স্থির হয়েছিল যে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে সভাপতি রাজনারায়ণ ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিবেন, অন্য রবিবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের ব্যাখ্যা করবেন, তৃতীয় রবিবারে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ধর্মনীতি বিষয়ে ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্ত ও অন্যান্য

হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিবেন।[১] 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা'র আর-কয়েকটি সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদের ভার অর্পিত হয়েছিল রাজনারায়ণ বসুর উপর। উক্ত সভার এক অধিবেশনে উল্লিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। সভায় আরো স্থির হয়েছিল যে, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হিন্দী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইবে।'[২] উক্ত সভা পল্লী অঞ্চলেও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর কার্যক্রম ও পরিণতি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ স্বয়ং লিখেছেন, "...শকে ইংরাজী...সালে আমি ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা স্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের ট্রাষ্ট ডীড অনুসারে উহা এখন দস্তুর-মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না। ...আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচারকার্যের কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের লোক সভার কার্য নির্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসাত নিবাসী, ইনি দিনকতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয় ভাব রক্ষা পূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না।"[৩]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য বছর। তিন আইনের বিবাহবিধি পাস হয়েছে, নারীশিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছে পুরোদমে, সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হল এই সালেই। জাতীয় নাট্যশালার (National Theatre) প্রতিষ্ঠাও উল্লেখ্য। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির সর্ববিধ উন্নতি আন্দোলন প্রবলতর হয়। প্রগতিবাদী ব্রাহ্মেরা 'ব্রাহ্ম-

---

১. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ ও মাঘ ১৭৯৪ শক, পৃ. ১৬, ১৭৩

২. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক, পৃ. ১৮০

৩. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৪৭। আত্মচরিতে সভাস্থাপনে কাল নির্দেশ নেই। সম্ভবত স্মৃতিতে না থাকায় কালনির্দেশের স্থানে লেখক ফাঁক রেখে গেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুরোনো ফাইল থেকে জানা যায় যে উক্ত সভা ১৭৯৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

বন্ধুসভা', 'বামাবোধিনী' নামক মাসিক পত্রিকা, 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা, 'ব্রাহ্মিকা সমাজ', 'ভারত আশ্রম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে 'হিন্দুমহিলা' বিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উচ্চাদর্শ সকলে স্বীকার করলেও শিক্ষাপদ্ধতি ও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার সীমা নিয়ে আন্দোলনকারীরা একমত হতে পারে নি। যাঁরা উগ্র প্রগতিবাদী নন, তাঁরা 'সমদর্শী' বা, *Liberal* পত্রিকায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। রাজনারায়ণ স্বভাবতই ছিলেন নরমপন্থী। এই পত্রিকায় তিনি রচনা প্রকাশ করতেন। *Hindu Theists Brotherly Gift to English Theists* এবং *Science of Religion* সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমাজ-সংস্কারের সর্বপ্রকার যুক্তিযুক্ত আন্দোলন রাজনারায়ণ সমর্থন করতেন। তিনি বলেছেন, "জগতে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই। সকল পদার্থ পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন। লোকসমাজও এই পরিবর্ত্তনের নিয়মের অতীত নহে।"[১] ঝোঁকের মাথায় সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা রাজনারায়ণের মতে বুদ্ধিহীন কার্য। স্ত্রীস্বাধীনতাকে তিনি সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে সমর্থন করতেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি বাল্যবিবাহের সমর্থন করেন নি, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দ করতেন না, স্বেচ্ছা-বিবাহের সমর্থকও ছিলেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় জোরালো যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর অভিমতগুলি ব্যক্ত করেছেন। অকস্মাৎ বিপ্লবের হাত থেকে সমাজ-রক্ষার চেষ্টা করা তিনি কর্তব্যকর্ম বলে মনে করতেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে ঐ পত্রিকার সঙ্গে রাজনারায়ণ যোগ দেন। পত্রিকাটি ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। ঐ সমাজের সম্পাদক ছিলেন শিবচন্দ্র দেব। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মেরা এই বছরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবীন যুবকদল স্বভাবতই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ষীয়ানদের মতামত ও উপদেশ সব সময় আশা করতেন। রাজনারায়ণ এঁদের সৎপরামর্শ ও উপদেশ বরাবরই দিয়েছেন। রাজনারায়ণের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং তা বিশেষ করে আপন দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে। ব্রাহ্মধর্ম ভারতবাসীর জাতীয় ধর্ম, একে জাতীয় রূপ দেওয়াই সকল ব্রাহ্মের কর্তব্য; রাজনারায়ণ তাঁর বিভিন্ন

১. 'বিবিধ প্রবন্ধে'র (১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ) অন্তর্গত "সমাজসংস্কার" প্রবন্ধ, পৃ. ১১২

সময়কার রচনায় এবং বিভিন্ন জনকে পত্রেও এই উপদেশ দিয়েছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে একাধিক পত্রে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মের কর্তব্যের নির্দেশ দেন। পত্রটির রচনাকাল ১৫ জুন ১৮৭৮ :

"We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text book and national ritual as far as all this could be done consistently with the dictates of conscience. We should renounce marked foreign customs and manners that we might have without much thought or reflection but innocently, adopted from Europeans but which are repugnant to the general feeling of the nation and by renouncing which we do not act against Brahmoism...

"We should conduct our reformatory movements in a national way so as to suit the tastes and ideas of the nation without compromising our Brahmo principles."

শিবচন্দ্র দেবের পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।[১] তা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রাজনারায়ণের সংযোগের আরো সংবাদ পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভা উক্ত সমাজ-মন্দিরের ট্রাস্ট-ডীডের প াণ্ডুলিপি সম্বন্ধে পরামর্শদানকারীদিগের প্রতি (রাজনারায়ণ বসু, ক্ষীরদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শরৎচন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ বসু, রামচন্দ্র ঘোষ) কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। এই মর্মে ১৮০১ শকের, শ্রাবণ মাসের 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে,'আদি ব্রাহ্মসমাজ' পরে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারিরূপে রাজনারায়ণ দীর্ঘদিন তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। *Brahmo Year Book* (১৮৭৬-৭৯)-এ রাজনারায়ণের এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে : "The Secretary, however, is an able and well-known man, who had has long been a chief pillar of the conservative Brahmos. He is an accomplished English writer, and has issued several English lectures and tracts." ("The Metropolitan Somajes", p. 19.)

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০১ শক, পৃ. ১১৮

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে সভাসমিতি ও সাধারণ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগাযোগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণের এ-যুগের কার্যধারার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে তাঁর গভীর লোকহিতৈষণা এবং স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের এই ছিল জাতীয় অভীপ্সা। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনারায়ণের ভাবধারা যে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল, তা আমরা জানি। আবার এই হিন্দুমেলা ও তার অধ্যক্ষ বিভাগ, বা পরিচালন-কেন্দ্র—'জাতীয় সভা'কে কেন্দ্র করে রাজনারায়ণের কর্মধারার এক বিশেষ দিকের প্রকাশ হয়েছে একালে। অতিমাত্রায় বিদেশীভাবাপন্ন বাঙালী জাতির দৃষ্টি পরিবর্তনের নিমিত্ত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার মাধ্যমে দেশে স্বাদেশিকতা উদ্‌বোধনের প্রচেষ্টা করেন রাজনারায়ণ ও আরো অনেকে। রাজনারায়ণের সঙ্গে একালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য যে, প্রথম তিনবছর মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল চৈত্র-সংক্রান্তিতে, তাই নাম ছিল চৈত্র-মেলা; 'হিন্দু-মেলা' নাম হয়েছিল পরে। এটি ছিল একটি সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। হিন্দুমেলার অন্যতম প্রধান কর্ণধার ছিলেন নবগোপাল মিত্র তাঁর দুই প্রধান সহায়ক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, আর নবগোপাল ছিলেন সহকারী সম্পাদক। "তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাব-বীজটি ফল-পুষ্প-ভারাবনত একটি সুন্দর মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করে ১৭৮৮ শকে (১৮৬৭ সাল) চৈত্র সংক্রান্তিতে।"[১] মেলার বিবরণ রাজনারায়ণের বর্ণনায় পরিস্ফুট: "১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দুমেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শন জন্য নানপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন। নানাপ্রকার ফলমূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য প্রদর্শিত হইত। আমার স্মরণ হয়, বস্ত্র বয়নের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' (৩য় সংস্করণ, ১৩৬৭), পৃ. ৮৪

করিতেন।"[১] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে (পৃ. ৭৮) লিখেছেন: "এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও এই মেলায় যোগদান করেছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুমেলার পর পর দ্বাদশটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনা ব্যতীত, দেশের শিল্প, বাণিজ্য, স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে গুণী ব্যক্তিরা বক্তৃতা দান করতেন; এঁদের মধ্যে ঠাকুর-পরিবারের ভূমিকা সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মেলার প্রথম অধিবেশনে (বেলগাছিয়ার উদ্যান—১২ এপ্রিল, ১৮৬৭ সাল, ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তি) রাজনারায়ণ যোগ দিতে পারেন নি। অসুস্থতার জন্য তখন মেদিনীপুর স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে স্বগ্রাম বোড়ালে অবস্থান করছিলেন। জাতীয় মেলায় পাঠের নিমিত্ত রাজনারায়ণ ও বোড়ালবাসীদের রচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রাজনারায়ণ-কর্তৃক সংশোধিত হয়ে কলকাতার উক্ত মেলায় প্রেরিত হয়েছিল। "বোড়াল কবিবৃন্দ কর্তৃক বিরচিত বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন" নামটি রাজনারায়ণেরই দেওয়া। কবিতাটি জাতীয় মেলায় পঠিত এবং পরে 'আত্মচরিতে' ও 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' স্থান পেয়েছে। উক্ত কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে 'বলবীর্য্যহীন' বাঙালি জাতির জন্য কবিদের বেদনার স্বরূপ বোঝা যাবে—

হায় হায় কোথায় আমাদের সে দিন।
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন ক্ষীণ॥
সাহস সহিত গেল আমাদের বল।
হেরিয়া কালের গতি হ'লাম বিকল॥
থাকিত মোদের যদি সে শুভ সময়।
তা হ'লে এ অপমান সহিতে কি হয়?

ভারতের জাতীয়তাবোধের ইতিহাসে এই মেলার গুরুত্ব অনেকখানি। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণের সভাপতিত্বে হিন্দুমেলার যে অধিবেশন (পঞ্চম) হয়েছিল, সেই অধিবেশনে কবিতা পাঠ করেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'জাতীয় সভা'র অধিবেশন হত প্রতিমাসেই। উক্ত সভায় একজন অধ্যক্ষ, বা সভাপতি হতেন, প্রধান সব ব্যক্তিরা থাকতেন বক্তা হিসেবে। সভার নাম

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৬৩

জাতীয় সভা, সভার বক্তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই। এই 'নেশ্যন' বা 'ন্যাশন্যাল' কথাটির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন নবগোপাল মিত্র।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করি 'ন্যাশন্যাল সঙ্গীত' রচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়। রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের বীজটি এইভাবেই অঙ্কুরিত হতে থাকে।

জাতীয় মেলায় উদ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টায় ন্যাশন্যাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়[২] স্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল সকালে ও বিকালে, রাজনারায়ণ শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবানুসারে (শিক্ষিত বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব) ন্যাশন্যাল স্কুলে ব্যায়ামচর্চা, অশ্বারোহণ শিক্ষা, উদ্ভিদ-বিদ্যার চর্চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন নবগোপাল মিত্র।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক 'National gathering Institution' এর সংবাদ পাওয়া যায় 'ন্যাশন্যাল পেপারে'।[৩] পাঁচটি বিষয় নিয়ে পাঁচজন ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। তার মধ্যে রাজনারায়ণের বক্তৃতাটি উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তু হল' 'Hindoo Nationality, its vitality and strength, and the means for resuscitating it'.

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 'জাতীয় সভা'র কয়েকটি অধিবেশন হয়। এবং এই কয়েক বছরের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই রাজনারায়ণ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে. জন বীমস্[৪] নামক এক সিভিলিয়ান কর্মচারী ফ্রান্সের 'ফ্রেঞ্চ

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে বলেছেন :—"তাঁর [নবগোপাল মিত্রের] সংবাদপত্রের নাম 'ন্যাশান্যাল পেপার', কুস্তীর আখড়ার নাম 'ন্যাশান্যাল জিমনাসিয়াম', সভার নাম 'ন্যাশান্যাল সোসাইটি', স্কুলের নাম 'ন্যাশান্যাল স্কুল'। স্বদেশবাসীরা তাই আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ন্যাশান্যাল নবগোপাল' বা 'ন্যাশান্যাল মিত্র'।

২. ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ক্যালকাটা 'ট্রেনিং একাডেমি ভবনে' ন্যাশন্যাল স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৮৭২ সালের ১লা এপ্রিল।

৩. দ্রষ্টব্য : *The National Paper*, Nov. 23, 1870, p. 530

৪. বীমস্ সাহেব সম্বন্ধে আত্মচরিতে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "ইনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত। বীমস্ সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী। ইনি ১৮৭১ সালে বাঙ্গলা-ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্ দেশের ফরাসী একাডেমির ন্যায় একটি একাডেমির সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই

একাডেমী'র আদর্শে বাংলা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন রাজনারায়ণ। বক্তৃতাটি সাহিত্য-বিষয়ক। ঐ সময় বক্তৃতাটি নিয়ে পত্র-পত্রিকা ও লোকমুখে খুবই আলোড়ন চলে। রাজনারায়ণের সুহৃদ মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে, 'It is a settler' অর্থাৎ 'বীমস্ সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না।' জাতীয় সভার অন্যতম কর্মী মনোমোহন বসু -স্থাপিত 'মধ্যস্থ' (২ ভাদ্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রশংসাসূচক বিবরণ ছিল এইরূপ: "বিগত ১১ই আগষ্ট রবিবার সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার সময় কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী বিদ্যালয়গৃহে নেশন্যাল সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক রাজনারায়ণ বসু বীমস্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি-সংস্থাপনী সভা' এই প্রসঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ মৌলিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি সুদীর্ঘরূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরব্ধ করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্তৃক বীমস্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয় যে তাঁহার মতের সাহিত্য-রীতি সংস্থাপনী সভা না হইয়া একটি সমালোচনী সভা হইলে ভাল হয়।" রাজনারায়ণের 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'র এটি সূচনামাত্র। 'বঙ্গসুহৃদ' মাসিক পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) 'বঙ্গভাষার নাটক ও সাহিত্য উন্নতি বিষয়ক সভা' শীর্ষকে প্রকাশিত সংবাদটিও সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: "...কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "জাতীয় সভায় বঙ্গভাষার উন্নতি" বিষয়ে একটি সুললিত ও দীর্ঘ বক্তৃতায় সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ে দুইখানি পুস্তকও প্রণয়ন হইয়াছে।"

'জাতীয় সভা'র ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের (১৫ সেপ্টেম্বর) অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ। এই সভায় তিনি "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা"-শীর্ষক এক যুগান্তকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাষা ও সাহিত্যের স্বার্থরক্ষার জন্য মনস্বী

একাডেমির সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদপত্রে ও ছাপান পরিপত্রে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।"

রাজনারায়ণ কর্মব্যস্তও থাকতেন এবং তাঁকে অনেক সময় দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করতে হত। এই মহৎ কর্মসাধনায় সে যুগে তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। সমাজনীতি ও ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার মহান্ ব্রতেও রাজনারায়ণ আগ্রহ ও নিপুণতা -সহকারে কর্মব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই আদর্শগত দ্বন্দ্বের যুগে তাঁর মতো দ্বিতীয় কর্মযোগী বোধ করি আর ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, 'জাতীয় সভা'য় রাজনারায়ণ "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন ;[১] এই প্রবন্ধ পাঠের আর-একটি কাহিনী[২] রাজনারায়ণ বিবৃত করেছেন 'আত্মচরিতে'। তাঁর এই বক্তৃতা একসময় সারা কলকাতাতে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকে আমরা এই আন্দোলনের সংবাদগুলি পাই। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভরতচন্দ্র শিরোমণি (সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার একজন প্রধান সভ্য), পদ্মহাস গোস্বামী নামক আসাম প্রদেশের জনৈক ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক, মাদ্রাজ প্রদেশীয় মসলিপত্তনের অর্জন্নলু নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভৃতি আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উক্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে স্ব-সম্পাদিত পত্রিকায় (*The Bengal Magazine*) একটি মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি হল এই : "…শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চুন দ্বারা হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে।" খ্যাতনামা খ্রীস্টান মিশনারী মারে মিচেল্ এর বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কারো প্রতি

---

১. 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক প্রবন্ধ পাঠ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। 'ন্যাশন্যাল পেপারে'র (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সাল) সংবাদটি থেকে জানা যায় যে. 'জাতীয় সভা'য় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পঠিত হয়েছিল। এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন যে, ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাড়িতে উক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমোক্ত সংবাদটিই যথার্থ বলে মনে হয়। 'আত্মচরিতে' বর্ণিত ঘটনাটি রাজনারায়ণের স্মৃতিবিভ্রমজাত বলেই সন্দেহ থাকে। জীবনের শেষভাগে রচিত বিবরণের (আত্মচরিতের) সব বিষয়ের সঠিক স্থানকাল তিনি বোধকরি স্মরণ করতে পারেন নি।

২. রাজনারায়ণের 'আত্মচরিতে' বর্ণিত (পৃ. ৫৪) কাহিনীটি হল এই—"একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে, হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।"

পক্ষপাতিত্ব না করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় হল 'হিন্দুধর্ম খৃষ্টধর্মের পূর্ব সূচনা'। কেশবচন্দ্র উক্ত বক্তৃতার (হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা) বিপক্ষে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে এবং একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী এর বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন একটি। রাজনারায়ণের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া যে কিরকম হয়েছিল তা বোঝা যায় 'ন্যাশন্যাল পেপার' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র উক্ত বিষয়ক বাদানুবাদে।[১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নূতন ব্রাহ্মদলের (কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের) দুজন ('অবলাবান্ধব'- সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও 'আসাম-মিহির'-সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্তী) রাজনারায়ণের ঐ বক্তৃতার অনুকূল মত প্রকাশ করেছিলেন। ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল এই যে, ইংরেজী এবং উর্দু— দুই ভাষাতেই উক্ত বক্তৃতা অনূদিত হয়েছিল ; এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল থিওসোফিস্ট পত্রিকায় (আত্মচরিতের বিবৃতি অনুসারে উক্ত অনুবাদের প্রকাশকাল হল ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ)।

রাজনারায়ণের এই রচনা স্বদেশ ছাড়া বিদেশের শিক্ষিতসমাজেও আলোড়ন

---

১. ন্যাশন্যাল পেপারে (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সাল) প্রকাশিত সংবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"In his way the Mirror, which noticing the lecture delivered by Baboo Rajnarain Bose at the National Society of which a report appears elsewhere, falls foul upon both the lecture, and the President. It is impossible for a non-Hindoo to appreciate the merits of the lecture. We think the gentlemen above named can well afford to despise the remarks of a Pati Naray (পাতিনেড়ে)।"

'ন্যাশন্যাল পেপারে' ১৮৭২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সংবাদটি হল এই :

"As was anticipated, the lecture on the "Superiority of Hinduism to other prevailing religions," lately delivered by Babu Raj Narain Bose at the National Society under the Presidency of Baboo Debendra Nath Tagore has fallen like a thunder bolt on the heads of all perverted from Hinduism, both Native Christians, and those whom the summarist of our weekly news, facetiously termed the other day Pati Naray. Nor are these men alone thunder-struck. There is a still larger class of our countrymen, sceptical Hindoos who stand equally amazed and struck at it. Their fear knows no bounds. Hitherto they enjoyed practical immunity from all religious obligations. They are now alarmed at the claims of Hinduism to belief."

তুলেছিল। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও লণ্ডনস্থ 'টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা জেমস্ রুট্‌লেজ সাহেব হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের তুলনা করে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে রাজনারায়ণের বক্তৃতার ('হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা') প্রশংসাই করেছিলেন। উক্ত প্রশংসার সারমর্ম 'টাইমস্' পত্রিকায় একসময় প্রকাশিত হয়েছিল। জানা যায় যে, রাজনারায়ণের এই বক্তৃতা থেকেই অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তুলনামূলক ধর্মবিষয়ে (Comparative Religion) সর্বপ্রথম চিন্তা করেন। Sir John Woodroffe -লিখিত *Is India Civilized?* গ্রন্থের সঙ্গে রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সংগতি রয়েছে। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে Woodroffe যা বলেছেন ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ তা-ই অকাট্য যুক্তি ও তথ্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' রচনাটি রাজনারায়ণের কর্মজীবনের এক বিস্ময়কর কীর্তি।

এই মর্মে 'বঙ্গসুহৃদ' মাসিক পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'জাতীয় সভা'র সংবাদটি উল্লেখযোগ্য। "গত ৩১ ভাদ্র রবিবার ট্রেনিং একাডেমি স্কুল ভবনে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশন হয়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রধান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মানসে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্ম চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসনগ্রহণ করেন।··· রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুদিগের প্রাচীন বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে যুক্তি সকলই লইয়া হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেন। প্রথমে ঐ সকল বেদাদির উৎপত্তি ও সংগ্রহকর্ত্তা দগের কতদূর মানসিক দূরদর্শিতা সেইটি সুচারুরূপে দেখান। পরে হিন্দুধর্ম্মের উপরে যে কতগুলি অমূলক অপবাদ দেওয়া হয় সেইগুলি প্রদর্শন ও সঙ্গত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন। তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া অপবাদিত হয়, তাহা রাজনারায়ন বাবু অস্বীকার করিয়া যুক্তি দ্বারা সেই বিষয় ভ্রম নিরাকরণ করেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে আরোপিত বিষয় মাত্রেই তাঁহার দ্বারা প্রদর্শিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। তৎপরে হিন্দুধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত (বিশেষ খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম) তুলনা করিয়া প্রমাণ করেন।"

দীর্ঘদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রাজনারায়ণের রচনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজ ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই একটি কারণ নির্দ্দেশ করেন যে,

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বক্তৃতা একদিকে তদানীন্তন 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র সভাপতি মান্যাগ্রগণ্য রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। অপরদিকে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে খৃষ্টীয় মিশনরি প্রভৃতির হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল। এমন কি, অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত তাঁহার 'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-ভূমিকা' নামক পুস্তকে এই বিবরণের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভীতিভাবের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিশিষ্টসূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই বক্তৃতার পর হইতে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধুয়া উঠিতে লাগিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ আর্য্য ঋষি প্রচারিত স্ব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কোন্ পথে গিয়া পড়িতেন তাহা বলিতে পারি না।"[১]

এই একই বছর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় জাতীয় মেলার একটি সংবাদ[২] প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদটি থেকে জানা যায় যে, রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'-বিষয়ক বক্তৃতা সাধারণে কী বিপুল আগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

উক্ত সভার ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের (২৩ মার্চ) অধিবেশন থেকেই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ ছাড়াও সমাজ-বিষয়ক নানা হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সভাতেই রাজনারায়ণ তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' নামক বক্তৃতা পাঠ করেন। ঐ সভাতেই হাইকোর্টের একটি রায়[৩] নিয়ে নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আলোচনা করেন। রাজনারায়ণ উক্ত

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শক) প্রকাশিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "ব্রাহ্ম-সমাজ ও তাহার কার্য্য' প্রবন্ধ, পৃ. ২৭

২. অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদটি যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু-মেলার ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত হল : "স্রোতের গতি ফিরিয়াছে, এখন হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায়, তাহার প্রতি অনেকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব যখন পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গের কত যে উৎসাহ হয়, তাহা বলা যায় না।"

৩. ব্যাভিচারিণী হিন্দু বিধবাদের পক্ষে স্বামীর বিষয়াধিকার প্রাপ্তির অনুকূলে হাইকোর্ট থেকে রায় দেন।

আলোচনায় বলেন, 'ইউরোপে স্ত্রী-প্রভুত্ব যেমন সমাজভিত্তি, এদেশে সতীত্ব তেমনি আমাদের সমাজভিত্তি ; পুরুষের বীরত্ব জন্য তাঁহাদের যেমন, স্ত্রী-সতীত্ব জন্য আমাদের তেমনি বড়াই।' এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি যে জাতীয় সভার কর্মকর্তাদের পদ পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে স্থায়ী সভাপতি হলেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, আর সহকারী সভাপতি হলেন বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসু। এই মর্মে 'মধ্যস্থ' পত্রিকার (৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সাল) সংবাদটি হল এই— "...রাজনারায়ণ বসু পূর্ব হইতেই সভার প্রতি যথোচিত অনুরাগী ও বিশেষ হিতকারী ছিলেন।"

রাজনারায়ণ 'জাতীয় সভা'য় বাংলা ভাষা সম্পর্কে পর পর যে বক্তৃতা দান করেন তাই-ই পুস্তকাকারে 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' নামে প্রকাশিত হয় ১৮০০ শকের ১৩ বৈশাখ। 'জাতীয় সভা' ব্যতীত রাজনারায়ণ মেদিনীপুরেও ১৭৯৮ শকের ১৯ বৈশাখ ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। উক্ত বক্তৃতাই আবার 'বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভা'র অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল ঐ শকেরই ৪ অগ্রহায়ণ তারিখে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয় সভায় সহ-সভাপতিরূপে উপদেষ্টার কাজও রাজনারায়ণই করেন। যুবকদের ব্যায়ামচর্চায় ও বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহী নবগোপাল মিত্রের সকল প্রচেষ্টায় প্রেরণা জুগিয়েছেন বিশেষভাবে রাজনারায়ণ বসু ও মনোমোহন বসু। জাতীয় মেলায় বহুবার ব্যায়াম-প্রদর্শন অনুষ্ঠানের পর রাজনারায়ণ ব্যায়াম শিক্ষক ও ছাত্রগণের কৃতিত্বের প্রশংসা ক'রে, বক্তৃতা দিয়ে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আবার 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পারিতোষিক-বিতরণ অনুষ্ঠানেও তিনি উৎসাহ-সূচক বক্তৃতা দেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় 'জাতীয় মেলা' প্রাঙ্গণেই। এইভাবে 'জাতীয় সভা'র, 'জাতীয় মেলা'র 'জাতীয় বিদ্যালয়ে'র দ্বারা সমাজের ও দেশের উন্নতি প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না এবং এই প্রচেষ্টার প্রতিটি সূত্রেই জড়িত ছিলেন রাজনারায়ণ।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে পরবর্তী বছরের কর্মকর্তা[১] নিযুক্তি একটি

---

১. মনোনীত সম্ভ্রান্ত অবৈতনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন : "রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি, বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত এম. এ. সম্পাদক, বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়" প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অধিবেশনে মেলায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতা দেন রাজনারায়ণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনারায়ণ তাঁর জীবনের এই কালে সর্বপ্রকার জাতীয় ভাবধারায় প্রবলভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। জাতীয় মেলায় তাঁর কার্যাবলী, জাতীয় সভায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাদি এর যথোপযুক্ত নিদর্শন। 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'মধ্যস্থ', 'অমৃতবাজার', 'ন্যাশন্যাল পেপার' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে এই নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সভার পৌরোহিত্য করেন রাজনারায়ণ। আরো জানা যায় যে, পূর্ব বছরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত, মনোজ্ঞ বক্তৃতাও দিয়েছিলেন তিনি। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মৌলাবক্স[১] সংগীতনৈপুণ্যের জন্য স্বুবর্ণ পদক লাভ করেন জাতীয় সভার উক্ত অধিবেশনে।

১৮৭৫ সালে 'হিন্দুমেলা' ও 'জাতীয় সভা' ব্যতীত উন্নয়নমূলক কয়েকটি সভা-সমিতির সঙ্গেও রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। আবার একালের দু-একটি সভার প্রবর্তকও তিনি। কলেজের ছাত্রদের সাম্বৎসরিক মিলন-অনুষ্ঠানের প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন রাজনারায়ণ। এবং কলকাতায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রথম প্রবর্তনও করেন তিনি। রাজনারায়ণের এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তাঁর সহপাঠী, সুহৃদ্ ও বালেশ্বর জেলার এককালীন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশনাথ রায় কলেজের সমস্ত ছাত্রদের মিলন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। হিন্দু অবথা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয় রাজনারায়ণের উৎসাহে ও জগদীশনাথ রায়ের প্রচেষ্টাতে। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগান-বাড়ি 'মরকত-কুঞ্জে' (Emerald Bower)। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' নামক হিন্দুকলেজের আনুপূর্বিক ও সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস পাঠ করেন।

এই একই বছরে বাংলাদেশের তৎকালীন ছোটোলাট রিচার্ড টেম্পলের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার বেলভেডিয়ার ভবনে গ্রন্থকার-সম্মিলনের একটি মনোজ্ঞ

১. মৌলাবক্স সম্বন্ধে রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখেছেন : "...এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত মৌলাবক্সের গান হয়...আমি সভাপতিরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন !"

অনুষ্ঠানে তদানীন্তনকালের একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকাররূপে রাজনারায়ণও যোগদান করেছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের সমস্ত খ্যাতনামা গ্রন্থকারবৃন্দ এই সম্মিলনীতে আহূত হন; মনোমোহন বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুলাই। অনুষ্ঠানের সকৌতুক বিবরণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণের আত্মচরিতে। বিদেশাগত ইংরেজ জাতির অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যবোধের যে অভাব ছিল, তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন রাজনারায়ণ। এই সম্মিলনীর একমাস পরেই (আগস্ট ১৮৭৫) ছোটোলাট রিচার্ড টেম্পল আর-এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন গ্রন্থকর্তাদের স্বাগত আহ্বান জানিয়ে। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "সেইদিন গরীব গ্রন্থকর্তা ও বড়মানুষ লইয়া এক চমৎকার মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল।" সেদিনের অনুষ্ঠানে রিচার্ড টেম্পলের বৈষম্য-নীতি-শূন্য মনোভাব এবং এ দেশের ধনী-নির্ধন-উভয়শ্রেণীর প্রতি সমদর্শিতা লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ পরম প্রীতিলাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থকার-সম্মেলনের অনুষ্ঠান রিচার্ড টেম্পলের পর একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ছোটোলাট ইডেনের অনুমোদনক্রমে উক্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছিল। ইডেনের সময়ে 'বিলাস-তরণী'তে ভ্রমণের আয়োজন হয়েছিল, এই বিবরণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণের 'আত্মচরিতে'।

১৮০০ শকের ৭ মাঘ 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা'য় রাজনারায়ণের যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উক্ত সভায় তিনি রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প বলতে অনুরুদ্ধ হন। পিতা নন্দকিশোর বসুর কাছে তিনি রামমোহন রায়-বিষয়ক যে গল্পগুলি শুনেছিলেন, তাই-ই উক্ত স্মৃতিসভায় বিবৃত করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮০২ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া দীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রমে রাজনারায়ণ রামমোহনের বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৭৯৫ শকের বৈশাখ মাসে মুদ্রণকার্য শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮০২ শকের জ্যৈষ্ঠতে। বাংলা ও সংস্কৃত সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি' নামে। প্রিয়ছাত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষী ঈশানচন্দ্র বসুর পরিকল্পনানুসারে রাজনারায়ণ এই কর্মের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ছিলেন তাঁর অন্যতম সহযোগী। কাজের প্রথমে তাঁর অর্থাভাব হয়েছিল। বিজ্ঞাপন মারফত অর্থের আবেদনে তা ক্রমে দূরীভূত হয়।

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা

অভিব্যক্ত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্র

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শক ১৭৯৭।

বন্ধুদিগকে তাম্বুলোপহার।

১। পাতি হাঁস যেমন স্বভাবতঃ জলে চরে, সেইরূপ আমাদিগের আত্মারূপ পাতিহাঁস ঈশ্বরে চরে।

২। আমরা ঈশ্বরের নানা কাতুরে ছেলে; একটু দুঃখেই আমরা কাতর হই।

৩। আমাদিগের সকল দুঃখ মঙ্গলেরই কারণ। অন্ধকারে যেমন লোকে ভূত দেখে, আমরা তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে দুঃখ দেখি। ভূতের ভয়েই গেলাম! ভূতের ভয় না ছুটিলে আমরা কখন মানুষ হইতে পারিব না।

৪। পিতা মুখোষ পরিলে যেমন ছেলে ভয় পায়, তেমনি ঈশ্বর দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলে আমরা ভয় পাই। পিতা মুখোষ পরিলে যেমন পিতাই থাকেন, তেমনি পরম পিতা আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলেও সেই পরম পিতাই থাকেন।

৫। দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এচোড়ে-পাকা ছেলে; তত্ত্ব সকল যত দূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক জানিতে চেষ্টা করেন। পারলোকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য্য কেন?

৬। অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দ্বারা রচিত এই শরীর আত্মার নটবহর। এই নটবহর লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

৭। শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের নবজাগরণ যুগের প্রথম এবং প্রধান চিন্তানায়ক ও উদ্যমশীল পুরুষের রচনাগুলি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছিল। কালের হাত থেকে এগুলিকে (অবশ্য রামমোহনের যাবতীয় রচনা নয়। বিজ্ঞাপনে রাজনারায়ণ জানিয়েছেন যে, রামমোহনের অনেক রচনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও, মূল রচনাগুলি অনেক চেষ্টাতেও হস্তগত হয় নি।) রক্ষা করার ব্যবস্থা করা প্রশংসার কাজ সন্দেহ নেই। এর দ্বারা সংকলকের দেশপ্রীতি ও পূর্বসূরীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনারায়ণ চিরদিন জাতির, দেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেছেন মনেপ্রাণে, এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবাও করে গেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কৈশোর থেকেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি যে গভীর স্নেহ-ভালোবাসা ছিল, তা আমরা জানি। আবার দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন-কি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পর্যন্ত রাজনারায়ণের সুনিবিড় হৃদ্যতা সর্বজনবিদিত। কাজেই ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে রাজনারায়ণের সংযোগ থাকা স্বাভাবিক। সেকালে ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে যে কয়েকটি সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা হয় তার প্রত্যেকটির সঙ্গে রাজনারায়ণ যুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহে সাহিত্যিকদের সম্মিলনের জন্য 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভা অনুষ্ঠিত হত। এই সভার বার্ষিক সম্মিলনের সূচনা হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে—১৮৭৪ সালের ১৮ এপ্রিল (৬ বৈশাখ ১২৮১)। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল বলে জানা যায়। তা ছাড়া রাজ-নারায়ণ-সহ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যে কয়েকজন ছিলেন তাঁরা হলেন— রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন সঞ্জীবনী সভা বা হামচুপামুহাফ নামে এক গুপ্ত সভা, সভার কাজ চলত ঠনঠনের এক পোড়ো-বাড়িতে। এই সভার সভাপতি ছিলেন— দেশপ্রেমিক, প্রবীণ রাজনারায়ণ। সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সর্ববিষয়ের নবোত্থান। জাতীয় পোশাক প্রবর্তন, জাতীয় শিল্পবাণিজ্যের কল স্থাপনের প্রথম চেষ্টা উক্ত সভার দ্বারাই হয়। জাতিধর্মনির্বিচারে আহারেরও একটা বিধি নির্ধারিত হয়েছিল উক্ত সভায়।

এই সভা-সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ 'সমাজচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ' অধ্যায়ে বিবৃত রয়েছে।

একসময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' নামে 'বঙ্গসাহিত্য-বিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি বিষয়িণী একটি সমালোচনী সভা' জোড়াসাঁকোর বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সহকারী সভাপতি। যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের অগ্রণীমাত্রই এই সভার সভ্য ছিলেন। রাজনারায়ণ তখন ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। সারস্বত-সমাজের উদ্দেশ্য[1] সাধনে রাজনারায়ণ প্রথমাবধি যত্নবান ছিলেন। যদিও তিনি সম্মিলনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি, কিন্তু প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই রচনাদির দ্বারা তাঁর সংযোগ রক্ষিত হত। ১৮৮২ সালের ১৭ জুলাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ঠাকুরবাড়িতে সভার প্রথম অধিবেশন হয়। উক্ত সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর, কলকাতার 'অ্যালবার্ট-হলে'। এইদিনকার অধিবেশনে তিনজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, খিদিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) মতামত আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে দেওঘর থেকে সারস্বত সমাজের সম্পাদককে লিখিত রাজনারায়ণের পত্রটি (৪ আষাঢ়, ৫৪) উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে রাজনারায়ণের সুস্পষ্ট মতামত পত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা ও সাহিত্য -বিষয়ক সভা-সমিতি ব্যতীত রাজনারায়ণ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতবর্ষীয় সভা' ছিল জমিদার সভা। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা, কর্মী— সকলেই একবাক্যে এর কার্যকারিতা স্বীকার করেছিল। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে। সভার সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগের প্রসঙ্গ সরাসরিভাবে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও,

---

১. "...সভার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম, বঙ্গভাষার অভাব মোচন, দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্ধন। তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্যস্থাপন।" —'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ. ৯১

অনুমান করা যায় তিনিও এর একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর অগ্রজ ভ্রাতাদ্বয়ের (হেমন্তকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ) সহ-যোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য। শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে রাজনারায়ণের হৃদ্যতার কথা তিনি ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই প্রসঙ্গেই মনে হয় 'ইণ্ডিয়ান লীগে'র সঙ্গেও রাজনারায়ণের যোগাযোগ ছিল। ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের প্রায় এক বছর পরে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিতে বলেছেন, "...ভারত সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।" এই সভার সমগ্র কার্যাবলীর সঙ্গে রাজনারায়ণের কী ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ও এর প্রতিটি কাজে তাঁর আন্তরিকতা যে কত গভীর ছিল— সে-বিষয়ে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই রাজনারায়ণকে লিখিত সুরেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়। পত্রটির সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল : "If I have time to-day I will call on the various points raised in your letter. In any case, it is a matter of the greatest satisfaction to us to notice that you take so warm an interest in the infant association."

এই থেকে আরো জানা যায় যে, রাজনারায়ণ ভারত-সভার কার্যাবলীর বিষয় নির্বাচন করে সুরেন্দ্রনাথকে পত্রে জানাতেন। ইতিপূর্বেই ভারতে রাজ-নৈতিক ভাবধারার একটা জোয়ার এসেছিল। 'ভারত-সভা'র উদ্দেশ্য[১] লক্ষ করলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। উক্ত সভার সম্পাদক ছিলেন আনন্দ-মোহন বসু, সহকারী সম্পাদক ছিলেন 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'আর্য্যদর্শনে'র সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সভার সভ্য অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ।

দেশ ও জাতির জন্য একালে রাজনারায়ণের চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন রচনার মধ্যে। 'জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালি জাতি' (১ম ও ২য় ভাগ) ও 'হিন্দুজাতির ঐক্য সাধন' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৮০১ শক থেকে ১৮০২ শকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়।

---

১. দ্রষ্টব্য : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'কংগ্রেস ও বাঙ্গালা', পৃ. ৮২-৮৩

এদিকে কলকাতায় দশ বছর অবস্থানকালে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের জন্য রাজনারায়ণের যে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়, তাতে তাঁর অপটু শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যলাভের আশাতেই তিনি ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ সাঁওতাল পরগনার দেওঘর অঞ্চলে গমন করেন। কিন্তু প্রথম থেকেই স্থায়ী বাসের সংকল্প বোধ হয় রাজনারায়ণের ছিল না। আর মহর্ষিও ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ একজন কর্মীকে দীর্ঘকাল সমাজের সম্পর্ক থেকে দূরে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। রাজনারায়ণের দেওঘরযাত্রার প্রাক্‌কালে মহর্ষি-লিখিত একটি পত্রে[১] প্রকাশিত তাঁর (মহর্ষির) উৎকণ্ঠা ও অহেতুক ভীতিভাব থেকে এই বিষয় জানা যায়। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে মহর্ষি এই আনন্দ থেকে বঞ্চিতই হয়েছিলেন। রাজনারায়ণের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার না হওয়াতে তিনি উক্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের মনস্থ করেন। দেওঘর শহরের সীমানার বাইরে শিশিরকুমার ঘোষের গৃহের অনতিদূরে ডঃ হীরালাল বসুর খোলার বাংলায় (অর্থাৎ খোলার চালওয়ালা মেটে বাড়িতে) ভাড়া থাকতেন রাজনারায়ণ। বাংলোটি ছিল দেওঘর-জোসিডি রোডের উপর। দেওঘরের প্রথমদিনের বিবরণ রাজনারায়ণ দিনলিপিতে এইরূপ লিখেছেন : "২০ আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০। অদ্য এইস্থানে অতি প্রত্যুষে পৌঁছি। বৈকালে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। দেবগৃহে পর্ব্বত ও বনাকীর্ণস্থান কিন্তু এখানে কতকগুলি ভদ্রলোক বিষয়কর্ম্মানুরোধে বাস করেন এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অথবা জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্যও অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়।"

দীর্ঘ বিশ বৎসর রাজনারায়ণ দেওঘরে কাটান। এখানকার দিনগুলি সুখে-দুঃখে, হাসিতে-অশ্রুতে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন -পরিবৃত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। রাজনারায়ণের দেওঘরজীবন আপাতদৃষ্টিতে অবসর জীবন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একালেও তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। কলকাতা থেকে দূরে নিভৃত প্রদেশে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এখানে তিনি রীতিমত পড়াশুনো করেছেন, তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন,

---

১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে পত্রে [২৩ আষাঢ়, ৫০] রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : "...বৈদ্যনাথে তিনমাস থাকিয়া কাশী সারিয়া নূতন স্বাস্থ্য ও নূতন উৎসাহের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আইলে যে, আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইব তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।"
—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৮৭

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন, সর্বোপরি ধর্মচিন্তা ও ধর্মচর্চাতেও নিবিষ্টচিত্ত থাকতেন। রাজনারায়ণের এই সময়কার জীবনের (১৮৮০-১৮৮১ খ্রী) কথা 'দেব-গৃহে দৈনন্দিন লিপি' থেকে জানা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা রাজনারায়ণ প্রায়শই পাঠ করতেন। এই-সমস্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—*Edinborough Review*, *Progress*, *Theosophist*, *Statesman*, *Indian Mirror*, অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত 'সাধারণী', পঞ্চানন্দ ওরফে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'কল্পতরু', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী', যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন', ভারতসভার (Indian Association) মুখপত্র 'বেঙ্গলী', কালীপ্রসন্ন ঘোষ -সম্পাদিত 'বান্ধব' ইত্যাদি; এ ছাড়া 'নবজীবন', 'নব্যভারত', 'প্রচার', 'বঙ্গবাসী', 'আলোচনা'— এই-সমস্ত পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী চার্লস ভয়সীর প্রতিটি রচনা তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ। পর পর কয়েকটি ঘটনায় রাজনারায়ণের চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাঁর চতুর্থা কন্যা লীলাবতীর বিবাহের কথা পাকা হয় এই বছরেই। পাত্র মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা নিবাসী কৃষ্ণকুমার মিত্র। ইনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা। বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠান-সম্পর্কীয় ব্যাপারে পাত্রের মতামত নিয়ে একটু গোলযোগ হয়। কৃষ্ণকুমারের জীবনী-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান অনুসারে বিবাহ দিতে চাহেন, কৃষ্ণকুমার তাহাতে রাজী হন না।" এই নিয়েই রাজনারায়ণের মানসিক দুশ্চিন্তা। দেওঘর থেকে, কৃষ্ণ-কুমারকে লিখিত রাজনারায়ণের পত্র [১] থেকে উভয়ের মতামত জানা যায়। কৃষ্ণকুমারের মতে 'সম্প্রদান রীতি' "অসভ্য" এবং বিবাহে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ "অসভ্য" ও "নীচ"। কৃষ্ণকুমার অনুষ্ঠানের কিছু পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এর উত্তরে রাজনারায়ণ যা লিখেছিলেন, তাতে ব্রাহ্ম হয়েও প্রকৃত হিন্দুর উদারতা, সামঞ্জস্যপ্রিয়তা ও শান্তিকামী মনেরই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমারের মতানুসারে এই বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে[২] রাজনারায়ণ বসু উপস্থিত ছিলেন না, কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন

১. অপ্রকাশিত এই পত্রটি ১১ ফাল্গুন ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতে লিখিত।

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

উমেশচন্দ্র দত্ত। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহে ইহাই প্রথম বিবাহ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সংগীত রচনা করেন[১] এবং সুন্দরীমোহন দাস, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ) প্রভৃতি সংগীত করেন।"[২]

'ভারত-সভা'র সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগাযোগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস। 'ভারত-সভা'র পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দেবত্র-আইন (Religious Endowment Bill) সম্বন্ধে রাজনারায়ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, তাতে বোঝা যায় যে, অসুস্থ, রোগজীর্ণ দেহেও দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাজনারায়ণ কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন। 'দেবত্র-আইন' দ্বারা তৎকালীন ইংরেজ সরকার মোহান্তদের স্বার্থহানি করতে উদ্যত হয়েছিল। এর দ্বারা জনসাধারণের ধর্মীয় অধিকারও ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। এই-সমস্ত কারণেই রাজনারায়ণ দেওঘর থেকে 'ভারত-সভা'র প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের কাছে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ রাজনারায়ণ কোনোদিনই সমর্থন করতেন না। যদিও মোহান্তদের দেবত্র-সম্পত্তি ভোগ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উচ্চ ছিল না। স্বলিখিত 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি' থেকে রাজনারায়ণের অভিমত[৩] জানা যায়।

যথাসময়ে রাজনারায়ণের অনুরোধপত্রের উত্তর[৪] সুরেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের

---

১. বিবাহ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম সংগীত রচনা করেন।

২. 'কৃষ্ণকুমার মিত্রের জীবনী', পৃ. ১৬

৩. "১ জ্যৈষ্ঠ। ব্রাহ্মসম্বত ৫১, শকাব্দা ১৮০২। অদ্য স্কুল-গৃহে কথোপকথনের সময়ে তারকেশ্বরের মহান্তর বিষয় কথা হয়। শঙ্করাচার্য্য যখন গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি কয়েক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তখন অবশ্য তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বরাবর সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে কিন্তু এক্ষণে সেই সন্ন্যাসীগণ বড় বড় বিলাসী ও কুচরিত্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছে। লোকে শ্রদ্ধাবশতঃ সন্ন্যাসীদিগকে ধন দান করে, সেই ধন পাইয়া সন্ন্যাসীরা বিলাসী হয়। ধর্ম্ম ক্রমে কেমন বিকৃতাকার ধারণ করে। আশ্চর্য্য তারকেশ্বরের মহান্ত বাহিরে দেখিতে গেলে সন্ন্যাসীর ন্যায়, গৈরিক বস্ত্র পরিধানকারী ও হবিষ্যাসী, কিন্তু চরিত্র সেরূপ নহে।"
—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', চৈত্র, ১৮০৫ শক, পৃ. ২৩৩

৪. উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"I suppose it would be now useless to consider what step the association

চেষ্টা করেন। রাজনারায়ণ তাতেও আগ্রহশীল ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, তৎকালীন ভারতের বড়োলাট লর্ড রিপন ব্যবস্থাপক সভায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের (Local Self Government) প্রয়োজনের কথা প্রথম উত্থাপন করেন। ভারতের জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রথম রিপনই করেছিলেন।

পৌরসভার কার্যপ্রণালী ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও বৃদ্ধ রাজনারায়ণের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের পত্র থেকে আরো জানা যায় যে, ভারত-সভার পক্ষ থেকে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণের উপায় এবং তার জন্য যে জলনিষ্কাশনের (বা পয়ঃপ্রণালীর) বিধিব্যবস্থা, তাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন করে আবেদন পেশ করা, উপরন্তু পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করা ইত্যাদি সব বিষয়গুলি সম্বন্ধেও উক্ত পত্রে[১] সুরেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের সম্মতি প্রার্থনা করেছিলেন।

'ভারত-সভা'র সঙ্গে রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ সংযোগের সাক্ষ্য বহন করছে উক্ত সভার সেক্রেটারি আনন্দমোহন বসুকে লিখিত একটি পত্র। পত্রটি সাল-তারিখবিহীন। তবু তার আলোচ্য বিষয় থেকে আমরা সময় অনুমান করে নিতে পারি। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ঘটনা নিয়ে শহরে

---

can take in connection with the Religious Endowment Bill, seeing that the Viceroy has already vetoed the proposals of the Leutenant Governor. But my fear is that the blow has only been warded off for the present, but not wholly averted. It seems to me that very much will depend upon the Mohants themselves as to whether the Government will introduce any measure for the control of religious endowments. I hope the Indian Association will not be unworthy of the patronage of the Mohant of Deogarh and of other Mohants."

১. "We are entirely at one with you in thinking that something should be done for the suppression of malarious fever. Our agents will be instructed to form committees which will submit schemes of drainage for the considera-tion of the local authorities. We are going to agitate in right earnest this year for the introduction of the Election system into our municipalities. We hope this agitation meets with your approval."— ১৭ মার্চ ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত সুরেন্দ্রনাথের পত্র।

প্রবল আন্দোলন হয়। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের (৫ মে ১৮৮৩) আদেশ হলে, তাঁর বিচারের ঘটনা নিয়ে রাজনারায়ণ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। জানা যায় যে, বিচারপতি নরিস (Norris) এই মকদ্দমায় হাইকোর্টে শালগ্রাম শিলা আনান এবং হিন্দুর দেবতার প্রতি অশোভন মন্তব্য করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা বিখ্যাত অ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাশ -সম্পাদিত 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় এই ঘটনার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মন্তব্য করেন। ইংরেজ সরকার এই অবমাননায় ক্ষুব্ধ হন। এক বছর পরে (৫ মে ১৮৮৩ তারিখে) সুরেন্দ্রনাথের বিচারের দিন ধার্য হয় এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাঁর কারাবাসের আদেশ হল দু'মাসের। এই ঘটনাতেই 'ভারত-সভা'র পক্ষ থেকে সেদিন রাজনারায়ণ প্রতিবাদ জানান কঠোরভাবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ছাত্রদলও সেদিন প্রবল আন্দোলন তুলেছিল। রাজনারায়ণের মতে সুরেন্দ্রনাথের বিচার হয়েছিল প্রহসনের মতো। পত্রে তিনি লিখেছেন :··· "A mysterious machinery has been set in motion for persecuting those who are so unfortunate as to displease the court···"

এই প্রসঙ্গে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদের প্রকাশক লঙ সাহেবের বিচার-প্রহসনের কথাও রাজনারায়ণ উল্লেখ করেছেন। ঐ বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিল করা এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে আহূত সভায় রামগোপাল ঘোষ যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে রাজনারায়ণ আনন্দমোহন বসুকে লিখেছেন : "Immediate step should therefore be taken to move the Viceroy to allow reference to the Privy Council··· ।"

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে রাজনারায়ণের বিচলিত ভাব বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি জেলখানায় সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন, 'আপনার কারাবাসে আমার চরম দুঃখের বেদনা জানাই। কিন্তু সত্যিই কি খুব দুঃখিত হব ? এরূপ কারাবাস প্রকৃতই গৌরবের। যিনি নিজের দেশকে ভালবাসেন তাঁর পক্ষে এই কারাবরণ অঙ্গের ভূষণ। এই কারাবাসের ভবিষ্যৎ পরিণাম জাতির পক্ষে বড় মূল্যবান।' রাজনারায়ণের এই পত্রখানিতে সুরেন্দ্রনাথ উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি যে কত প্রফুল্লচিত্তে কারাদুঃখ ভোগ করেছিলেন 'সঞ্জীবনী'

পত্রিকায় তার উল্লেখ রয়েছে এবং এর জন্য রাজনারায়ণ আনন্দমোহন বসুর কাছে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে কলকাতার ছাত্রেরা যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছিল, রাজনারায়ণ ছাত্রদের মনোভাবের সঙ্গে প্রবল সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ঐ আচরণকে সমর্থন করতে পারেন নি। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি শ্লাঘ্য মনে করেন। উত্তেজনা যত প্রবলই হোক অনুত্তেজিতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করাই তিনি সংগত মনে করেছেন। ছাত্রদের সম্বন্ধে লিখেছেন: "They should however remember that respect to constitute authority is the main bond of society and should on no occasion be abandoned."

সুরেন্দ্রনাথ জেলে থাকাকালীনই বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবকদল দুইটি বিষয় নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে অগ্রণী হন। একটি হল, প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা— যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, আর-একটি হল, আন্দোলন চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজনানুসারে জাতীয় তহবিল বা National Fund স্থাপন। বলা বাহুল্য, রাজনারায়ণের সম্মতিক্রমেই তহবিলটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর (১৮৮৪-৮৫ সাল) ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে এই জাতীয় তহবিলের আবশ্যকতা জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

জাতীয় তহবিল সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বরাবরই আগ্রহী ছিলেন এবং সময়বিশেষে এ-সম্পর্কে 'ভারত-সভা'র কর্মীবৃন্দকে পরামর্শ দান করেছেন। 'ভারত-সভা'র কাছে এই প্রবীণের সদুপদেশ সব সময়ই কাম্য ছিল। ১৮৮৬ সালে রাজনারায়ণ দেওঘর থেকে সুরেন্দ্রনাথকে (অনারারি সেক্রেটারি) যে পত্রটি (১৯ মার্চ, ১৮৮৬) লিখেছিলেন, তাতে জাতীয় তহবিল সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ পেয়েছে: "...I am of opinion that the National Fund should continue to be in the hands of the Trustees for, if it comes to the hands of Indian Association, the Association, having in view the accomplishment of many schemes which associations naturally have to entertain, would be likely to confound questions not exactly of constitutional agitation with those that are such while if it remains in the hands of

the Trustees, they would devote it exactly to the purposes for which the Trust was created." সম্ভবত ১৮৮৩ সালের জুন মাসে 'ন্যাশন্যাল ফাণ্ড' স্থাপিত হয়।

১৮৮১ সালের পর থেকে রাজনারায়ণের জীবনের কয়েক বছরের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর ডায়ারি[১] থেকে। এই কয়েক বছরে তাঁর চিন্তা, কর্ম, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের কর্তব্যপরায়ণতা ও নিয়ম-নিষ্ঠার পরিচয়ে বিস্মিত হতে হয়। সমসাময়িক প্রতিটি ঘটনার সংবাদ রাজনারায়ণ রাখতেন; এই-সমস্ত বিষয় দেওঘরে আগত বিভিন্ন জনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন, পত্র-পত্রিকাদির মাধ্যমেও মতামত প্রকাশ করেছেন, তাঁর ডায়ারির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যতীত সাঁওতাল পরগনা, মানভূম অঞ্চল, দক্ষিণভারত প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতাল-বিদ্রোহ তথা কৃষক-বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করেছিল; সে-বিষয়ে তিনি কবি প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যাকার শশধর তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন এইসময়ই। সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে এটিও উল্লেখযোগ্য। এই মর্মে রাজনারায়ণ-লিখিত "নূতন ধর্মমত" নামক প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮০৫ শকের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এলান অক্টোভিয়ান হিউমের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়। এই সংবাদও ডায়ারি থেকে পাওয়া যায়। হিউমের প্রতি রাজনারায়ণের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[২] তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা মদনমোহন বসু কখনো কখনো তাঁকে King of Hindustan বলেও অভিহিত করতেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে রাজনারায়ণ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও প্রতিটি অধিবেশনের সংবাদ রাখতেন, বক্তৃতা লিখে পাঠাতেন এবং কয়েকবার প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের

---

১. রাজনারায়ণের অপ্রকাশিত ডায়ারির রচনাকাল ১২৯১ সালের ৪ আষাঢ় মঙ্গলবার থেকে ১২৯৮ সালের ১ ভাদ্র শুক্রবার পর্যন্ত।

২. রাজনারায়ণের ডায়ারির পাতায় এঁর পরিচয় রয়েছে: "১ ভাদ্র ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার (১২৯৫ সাল ১৮৮৮ খ্রীঃ)...A. O. Hume—আশ্চর্য্য লোক। তিনি ভারতবর্ষকে আপনার গৃহ করিয়াছেন। তিনি Indian National Congress-এর প্রাণস্বরূপ। তিনি মদ্য মাংস খান না। তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি।"

প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী মিঃ হিউম ও সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনারায়ণ বিভিন্ন বিষয়ে পত্রাদি মারফত আলাপ-আলোচনাও করতেন।

রাজনারায়ণের ডায়ারিতে ১৮৮৬ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ এই তিন বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে রাজনারায়ণের সঙ্গে দেওঘরের স্মিথ সাহেবের আলোচনা হয়। এই বিষয়ে রাজনারায়ণ ডায়ারিতে লিখেছেন: "দেখিলাম জাতীয় মহাসভা (National Congress)-এর প্রতি তাঁহার বড় রাগ। জাতীয় মহাসভা বলিয়াছেন যে দেশ ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। ইনি বলেন তাহা মিথ্যা কথা। তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার অনেক তর্ক হইল (২৯ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, বুধবার ১২৯৩, ১৮৮৩ খ্রীঃ)।" কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজনারায়ণ বক্তৃতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। গগনচন্দ্র হোম বক্তৃতার খসড়া নকল করে দিয়েছিলেন। অধিবেশনের পর রাজনারায়ণ স্বরচিত *Appeal to the Delegates for the National Congress*— মুদ্রিত করেন।

যথাক্রমে ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে ও প্রয়াগে কংগ্রেসের তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশন হয় এবং সে সংবাদও রাজনারায়ণের ডায়ারি[১] থেকে পাওয়া যায়।

রাজনারায়ণ দেওঘরে থাকতে ছোটোখাটো অথচ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সভা-সমিতি, আলোচনা-চক্র ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক আলাপ-আলোচনার জন্য ১৮৮৪ সালে 'দেওঘর সমিতি' স্থাপিত হয় প্রধানত

১. এই অধিবেশন সম্পর্কে রাজনারায়ণ ডায়ারিতে লেখেন—

"৭ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর. বুধবার— অদ্য দেওঘর নিবাসী দ্বারা মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হই। কিন্তু ক্ষীণতাপ্রযুক্ত তথায় যাইতে অক্ষম হই। কংগ্রেস সম্পাদককে এক পত্র লিখি, তাহাতে একস্থানে লেখা আছে "By humble... only... native can never become great." ভারতবর্ষে Constitutional agitation-এর চরম ফল দরখাস্ত। দরখাস্ত পত্র মিদং ...।" এই বছরের ৬০৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে রাজনারায়ণ একজন ছিলেন। সভাপতি হয়েছিলেন বোম্বাইয়ের বদরুদ্দীন তায়াবজী।

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) প্রয়াগে। কিন্তু এবারেও অসুস্থতা ও বার্ধক্য-বশত রাজনারায়ণ অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি। সেই কারণে যোগীন্দ্রনাথ (রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দেওঘর থেকে রাজনারায়ণের প্রতিনিধি হয়ে 'Indian National Congress'-এ যোগদান করেন, সঙ্গে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র।

রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায়। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও দেওঘর স্কুলের হেডমাস্টার— মাইকেল মধুসূদনের জীবনী-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু। ১৮৮৪ সালের ১১ জানুয়ারি রবিবার সমিতি সংস্থাপন ও নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়। সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় এই বছরেই ৬ মাঘ, (১৮ জানুয়ারি) রবিবারে। সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজনারায়ণ স্বয়ং। সভাপতির আলোচ্য বিষয় ছিল—"সাহিত্যের সংজ্ঞা—সাহিত্য কাহাকে বলে।" দেওঘর-সমিতির দ্বিতীয় অধিবশন হয় ১৩ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) রবিবার। এই সভার কার্যাবলীর বিবরণ রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত হল: "বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ঐক্য সম্পাদনের প্রকৃষ্ট উপায় সকল আলোচিত হয়। সমিতিতে স্থির হইল যে বাঙ্গালী জাতির অনৈক্যের কারণ মানসিক দুর্ব্বলতা এবং তাহার কারণ আবার শারীরিক দুর্ব্বলতা। মেলা, মহাভোজ, মহৎ ব্যক্তির স্মরণার্থ উৎসব এবং দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান ঐক্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।" প্রতি রবিবারে এই সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত ; কিন্তু পরে বোধ করি কোনো কারণবশত অনিয়মিতভাবে চলতে থাকে।

১৮৮৫ সালের ২০ এপ্রিল (৮ বৈশাখ, ১২৯২) সোমবার, দেওঘরে একটি প্রাত্যহিক সান্ধ্যবাসরের উদ্‌বোধন করেন রাজনারায়ণ। এই আসরের নাম ছিল কথোপকথন চক্র (Conversation Circle)। কথোপকথন চক্রের প্রাত্যহিক আসর জমত রাজনারায়ণের সভাপতিত্বে। এই চক্রের সদস্য ছিলেন পাড়ার ও নিজগৃহের যুবকবৃন্দ ; এঁরা সান্ধ্যঅনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করতেন। আসরের প্রধান বক্তা রাজনারায়ণের মনের সজীবতা, অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানার্জনস্পৃহা তাঁর বক্তব্য ও বিষয়বস্তু -নির্বাচনের মধ্যে পরিস্ফুট। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল, "যে যে জাতি একের পর এক পৃথিবীর পুরাবৃত্তে খ্যাতি লাভ করেছে তাদের বৃত্তান্ত।" মাঝে মাঝে দু-চারজনের অনুপস্থিতির জন্য, কোনোদিন-বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এই কথোপকথন-চক্রের[১] সান্ধ্য বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত না। তবে অনিয়মিতভাবে হলেও, দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল এই আসরটি।

---

১. কথোপকথন-চক্রের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির বিষয় ডায়ারি থেকে সংগ্রহ করে উল্লেখ করা হল :—

২ 'মনুষ্য জাতির আহার।' ৩ 'ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী।' ৪ 'ধর্ম ও

এই আসরের অলিখিত সভ্যা ছিলেন স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও এইরূপ সভা-সমিতি, উপাসনাদিতে রাজনারায়ণের সহযোগিতা করতেন। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকাকালীন উপাসনাস্থলে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা ছিল না; তিনি প্রাঙ্গণের একটি গাছতলায় নিজের আসন করে নিতেন। হিন্দু পরিবারের কন্যা হয়েও বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীর ধর্মেই তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল এবং আদর্শ স্বামীর চরিত্র-প্রভাবে তিনি পার্থিব বস্তুর তুচ্ছতা উপলব্ধি করে স্বামীর অভীষ্ট সিদ্ধির পথ ধ'রে ব্রহ্মচিন্তায় নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন। এমন অধ্যাত্মশালিনী মহিলা যথার্থ 'মৈত্রেয়ী' নামেরই যোগ্যা। রাজনারায়ণ-পত্নীকে অনুরূপ আখ্যায় ভূষিতা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী জাগতিক বিষয়ের নশ্বরতা চিন্তা করে স্বামীর কাছে অমৃতত্ব লাভের উপায় জানতে চেয়েছিলেন। রাজনারায়ণের সহধর্মিণী পরম ব্রহ্মের প্রীতিস্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন স্বামীর একান্ত যত্ন ও ঈশ্বর-ভক্তির আতিশয্যে। রাজনারায়ণকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্র[১] থেকে তা বোঝা যায়: "তোমার মৈত্রেয়ীকে আমি আমার কন্যা তুল্য দেখি, সে অতি সুশীলা হইয়াছে শুনিয়া তাহার জন্য এবং তোমার জন্য পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তাহার আত্মা এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে ব্রহ্মপ্রীতি রসেতে আর্দ্র হইলে যে

হিন্দুধর্ম।' ৫ 'হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।' ৬ 'গ্রীকদিগের পৌরাণিক ধর্ম।' ৭ 'গ্রীক পৌরাণিক দেববৃত্ত।' ৮ 'গ্রীক ব্যক্তিগণ।' ৯ 'হিন্দুধর্ম সংস্কার।' ১০ 'ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি।' ১১ 'হিন্দুধর্ম।' ১২ 'খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম।' ১৩ 'খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম।' ১৪ 'ব্রাহ্মধর্মের পুরাবৃত্ত।' ১৫ 'মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানদিগের পুরাবৃত্ত।' ১৬ 'ব্রাহ্মধর্মের পুরাবৃত্ত।' ১৭ 'ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী।' ১৮ 'স্নান (Bathing) ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্নানের প্রণালী।' ১৯ 'গ্রীক পৌরাণিক দেবতত্ত্ব।' ২০ 'ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী।' ২১ 'ভারতবর্ষের ভাষাশিল্প।' ২২ 'ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দল।' ২৩ 'খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়।'* ২৪ 'হিন্দুধর্ম।' ২৫ 'হিন্দুধর্ম।' ২৬ 'চিকিৎসাবিদ্যা।' ২৭ 'ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ভারতবর্ষে আর্যদিগের প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণের উপবীত।' ২৮ 'বাল্যবিবাহ এবং মাংসাহারের ঔচিত্য।' ২৯ 'ভারতবর্ষের ভূগোল।'

* ৭ আষাঢ় ১২৯২ বঙ্গাব্দ: ২০ জুন ১৮৮৫ খ্রীঃ—"অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে Thaker, Shakers, Adomits ইত্যাদি সম্প্রদায়দিগের কথা হয়। Roman Catholic, Protestant, Greek Church প্রভৃতি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের কথা হইয়া তৎপরে ইহাদিগের কথা হয়।"

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩। কলকাতা থেকে ৫ আশ্বিন ১৭৭৬ শকে লিখিত।

তাহার কি শোভা হইবে, সে শোভার সহিত কি কোন শোভার তুলনা হইতে পারে ?" কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে দেবেন্দ্রনাথ আর-একটি পত্রে[১] সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন : "প্রশস্ত সময় পাইলেই তোমার মৈত্রেয়ীকে তুমি উপদেশ দিতে থাকিলে, কালে তিনি অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবিতে পারিবেন।"

অনুমান করা যায় যে নিস্তারিণী দেবী সম-সাময়িককালে প্রকাশিত কাব্য-সাহিত্যেরও অনুরাগী পাঠক ও সমঝদার ছিলের। বিশেষ করে রাজনারায়ণের প্রিয় সুহৃৎ মধুসূদনের রচনাদি প্রকাশ মাত্র তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্র (১৮৬০ সালের ১৫ মে) থেকে এই বিষয় জানা যায়। পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন—

"I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance."[২]

নিস্তারিণী দেবী এসেছিলেন সচ্ছল পরিবার থেকে। অতি-মাত্রায় সুখৈশ্বর্যের মধ্যে পালিতা না হলেও পিতার গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করেন নি কোনোদিন। অন্যদিকে মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের নিয়ে রাজনারায়ণের সংসারে সচ্ছলতা বিশেষ ছিল না। তথাপি রাজনারায়ণ স্ত্রীর প্রহৃষ্ট চিত্ত ব্যতীত অসুখী অন্তরের পরিচয় কোনোদিন পান নি।

নিস্তারিণী দেবী সুদক্ষা, সুগৃহিণী ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ তাঁর সুযোগ্য তিন পুত্র; সুযোগ্যা কন্যা স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমলতা দত্ত, সুকুমারী ঘোষ, লীলাবতী মিত্র ও কবি লজ্জাবতী বসু।[৩] পুত্র-কন্যাদের তিনি মনের মতো করেই মানুষ করেছিলেন। মাতার আদর্শানুসারে তাঁরা প্রতিদিন উষাকালে ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করতেন। মাতৃদেবীর নিকটই তাঁরা শিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়।'

রাজনারায়ণ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকর্মে কেবলমাত্র তাঁর দেওঘর-জীবনের ডায়ারির অংশ ব্যতীত স্ত্রীর প্রসঙ্গ বিশেষ কোথাও উল্লেখ করেন নি। রাজ-

---

১. 'পত্রাবলী', পত্র ৮। ৭ মাঘ ১৭৭৪ শকে লিখিত।

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', (১৮৯৩), অষ্টাদশ পত্র, পৃ. ২৬২

৩. দ্রষ্টব্য : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র, ১৮১৩ শক।

নারায়ণের ডায়ারি থেকে জানা যায় যে তিনি স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত উপাসনায় যোগদান করতেন ; এতদ্ব্যতীত প্রতিটি অতিথি-অভ্যাগতের সমাদরের, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী এবং অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা ও সেবা কিছুরই ত্রুটি করেন নি। দৌহিত্র-দৌহিত্রীরাও (অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, সুকুমার মিত্র, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, কুমুদিনী বসু ও বাসন্তী চক্রবর্তী) তাঁর নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হয়েছিলেন। দিদিমার আদরের কথা দৌহিত্র বারীন্দ্র ঘোষ প্রবীণ বয়সেও ভুলতে পারেন নি। আত্মকথায় লিখেছেন : "মাঝে মাঝে মা আমাদের পাল্কী করে নিয়ে যেতেন দেওঘরে দিদিমার বাড়ী। সেখানে বেহারাদের এহুম্ ওহুম্ রবে আকাশ পথ মুখরিত করে আমরা গিয়ে নামতুম একঝাঁক মামা মাসী মাসতুতো ভাই ও বোনের পালে, কত পিঠে চন্দ্রপুলী সন্দেশ ও লুচির রাজ্যে।··· ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনী নিয়ে ভিড় করে দিদিমা এসে আমাদের পাল্কী থেকে নামিয়ে নিতেন।··· দিদিমার হাতে গড়া একখানা চন্দ্রপুলী পাওয়া আর প্রহার থেকে অব্যাহতি এই মহোচ্ছবের ছিল সব চেয়ে বড় অঙ্গ।"

স্বামী পুত্রকন্যা, আত্মীয়-পরিজন নিয়ে নিস্তারিণী দেবীর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর জীবনে দুঃখ ও শোকের ব্যথা ছিল ; কিন্তু ঈশ্বরগত-প্রাণা মহিলা স্বামীর উপদেশ ও আদর্শানুসারে নিজের চরিত্র এমনভাবে গঠিত করেছিলেন যে, সংসারের সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি থাকতেন ধীর, শান্ত ও অবিচলিত। তাঁর চরিত্র মহনীয়তায় উজ্জ্বল। রাজনারায়ণের তিনি কেবল-মাত্র সহধর্মিণীই ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃতই জীবনসঙ্গিনী।

যা হোক, রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাতেই দেওঘর-গ্রন্থ-সমিতি (Book Club) স্থাপিত হল ১৮৮৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর (২৯ ভাদ্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, রবিবার)। সমাজসেবার কাজেও তিনি কম অগ্রণী ছিলেন না। বৈদ্যনাথে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি সেবানিবাস স্থাপনে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

রাজনারায়ণের দেওঘর-জীবনের মাত্র ছ'বছরে তাঁর গৃহে যে কত বিশিষ্ট, গণ্যমান্য ও খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির আগমন হয়েছিল, তার হিসাব পাওয়া কঠিন। সকলেরই সঙ্গে ছিল রাজনারায়ণের গভীর প্রাণের যোগ। তাঁদের

১. দ্রষ্টব্য : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র, ১৮১৩ শক।

সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তাই কেবলমাত্র নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া গেল।[১]

দেওঘরে বাসকালে রাজনারায়ণের কর্মজীবন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি। তিনি সভা-সমিতি স্থাপন, ধর্মপ্রচার ও জ্ঞানপ্রচারে নানাপ্রকার উদ্যম করেছিলেন। ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন দেওঘরে ছিলেন রাজনারায়ণ তাঁর সঙ্গে বহু বিষয় আলোচনা করতেন। রাজেন্দ্রলালও রাজনারায়ণের রচনার সহায়তা ও সমালোচনা করতেন।[২] রুগ্‌ণ অবস্থায় অবসরজীবনযাপনেও যে তাঁর মননশীলতা সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিল এবং কর্মোদ্যম বিন্দুমাত্র শ্লথ হয় নি, তার বহু পরিচয় ডায়ারি থেকে পাওয়া যায়।

রাজনারায়ণ যখন দেওঘরে তখন কলিকাতা সমাজে হিন্দুধর্মের নবোত্থান নিয়ে প্রবল আন্দোলন হয়। ১৮৮০-৮৪ সালে এই আন্দোলন চরমে ওঠে। ঐতিহাসিকরা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়ের বিচার করেছেন। "১২৯১ সালটা নানা কারণে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয়। ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ (২৫ পৌষ ১২৯০) কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়; তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর। এই ঘটনাটি স্মরণীয়। কারণ, তাঁহার তিরোধানের পর হইতে হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার দেখা দিল; আদি সমাজও কর্মতৎপর হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের যুগপৎ আক্রমণ হইতে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সত্তা ও সত্যকে বজায় রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় সংরক্ষণের স্পৃহা মানুষের মধ্যে স্বভাবতই আসে। প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ ও তাহার মতবাদ সমর্থন করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নবজাতীয়তাকে সুদৃঢ় করিতে উদ্যত হইল।"[৩]

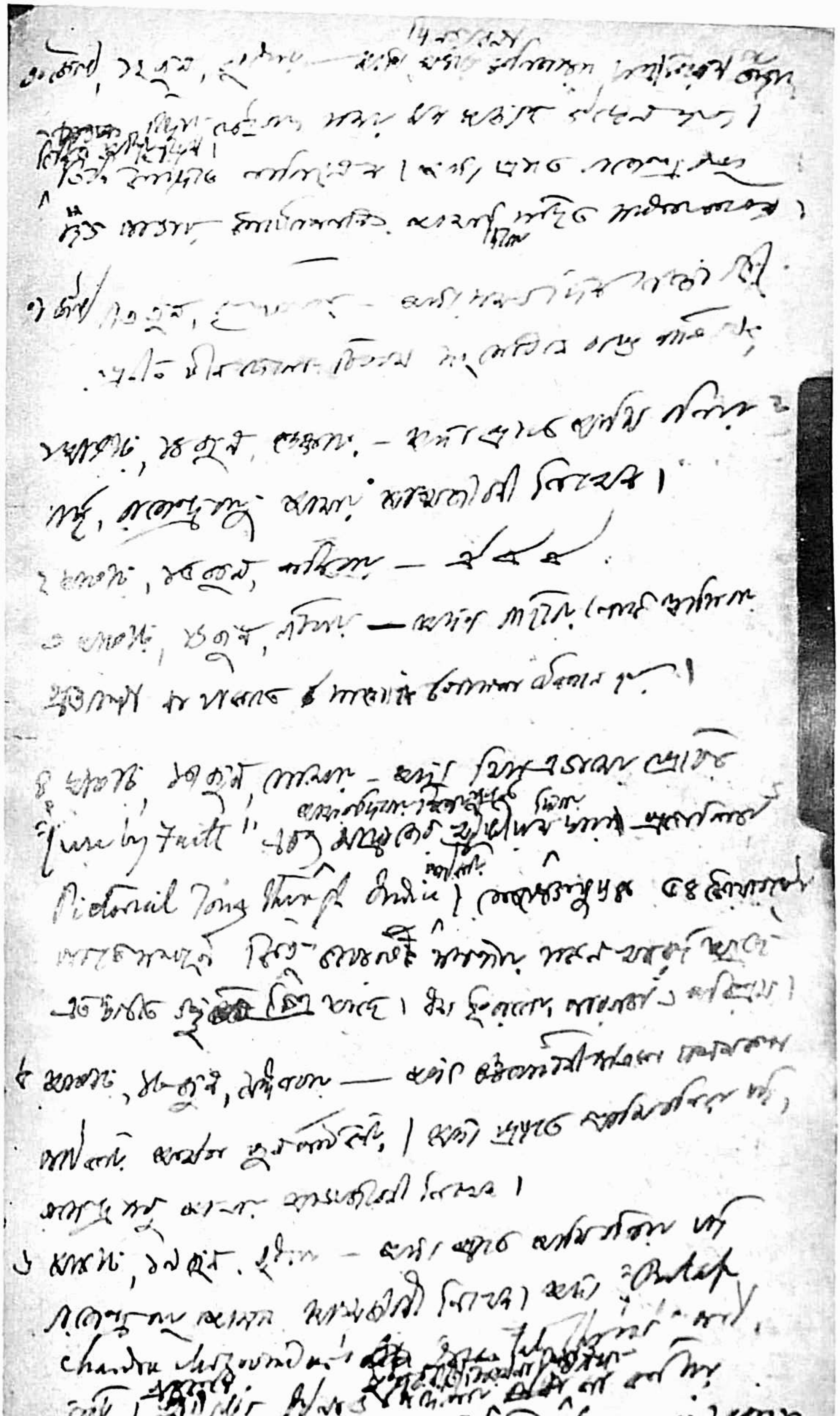
---

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. ডায়ারি থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হল এই: ২ কার্তিক ১৭ অক্টোবর, শনিবার (১২৯২ সাল, ১৮৮৫ খ্রীঃ) "অদ্য প্রাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আমার 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র ইংরাজী অনুবাদের প্রারম্ভ ভাগ সংশোধন করেন।"

"১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে, সোমবার (১২৯৬ সাল, ১৮৮৯ খ্রীঃ)— অদ্য প্রাতে আমি বলিয়া যাই এবং রাজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী লিখেন।" ১৮৮৯ সালের অধিকাংশ সময় রাজনারায়ণের চরিত-কথার প্রতিলিখন করেছেন রাজেন্দ্রলাল।

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ. ১৮৪



ডায়ারির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

রাজনারায়ণ দেওঘরে থেকেও একালে এই-সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি কলকাতায় থাকতে প্রায় দশ-বারো বছর পূর্ব থেকেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই ঘটনাকালে (১৮৭২) তিনি জাতির সম্মুখে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' পুস্তক উপস্থাপিত করেছিলেন। হিন্দু-ধর্মান্দোলনের পাশাপাশি আর-এক আন্দোলনও সমাজে ইতিপূর্বে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি, ব্রাহ্মদের আদর্শের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক সমাজ-নায়কের কাছে বিশেষ দৃষ্টিকটু হয়েছিল। রাজনারায়ণ তাঁর দুটি রচনার ('Adi Brahmo Samaj As a Church' ও 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব') দ্বারা এর প্রতিবাদ করেছিলেন আমরা জানি। সমাজের এই-সমস্ত অশান্তি ও আন্দোলনের প্রতিবাদ-স্পৃহায় নূতন নূতন পত্রিকার সৃষ্টি হতে লাগল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদারমতাবলম্বী ব্রাহ্মদের মুখপত্রস্বরূপ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা (১৮৮১ খ্রী) ও সনাতনপন্থী হিন্দুদের মুখপত্ররূপে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার (১৮৮১ খ্রী) আবির্ভাব হয়েছিল। সর্বতোভাবে জাতীয়তা রক্ষা করতে হিন্দু-সমাজের পক্ষ থেকে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকার (১২৯১ বঙ্গাব্দ) আবির্ভাব হল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সনাতনপন্থীরা হিন্দু-সমাজের পক্ষাবলম্বন করে আবির্ভূত হলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুরু করলেন।[১] তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ফোড়নের জন্য' কলকাতার শিক্ষিত সমাজের তরুণদের অনেকেই (চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ) এই নূতন ব্যাখ্যায় অভিভূত হয়েছিলেন। এর দু'বছর পরেই (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) রাজনারায়ণের মহাহিন্দু-সমিতির পরিকল্পনা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত পরি-

---

১. রাজনারায়ণ এ সম্বন্ধে ডায়ারিতে লিখেছেন—

"১১ আষাঢ়, ২৪ জুন, মঙ্গলবার, ১২৯১ সাল, ১৮৮৪ খ্রীঃ— অদ্য সাধারণী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি বিষয় পত্র লেখা হয়। তর্কচূড়ামণি কলিকাতায় বড় গোলমাল উঠাইয়াছেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত পৌত্তলিক। হিন্দুশাস্ত্রে উভয় সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ আছে স্বীকার করেন না। জাতিভেদের পক্ষেও বিলক্ষণ। এই সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের সময়ে এরূপ হিন্দুয়ানির আটোঁসাটো শোভা পায় না। আমার হিন্দুধর্ম্ম ও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম হইল ভিন্ন। যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সুখের বিষয় বটে। আমি ব্রাহ্ম হইয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। স্বদেশ-প্রেমীর পক্ষে উহা সুখের বিষয় না হইয়া থাকিতে পারে না।"

কল্পনার দ্বারা রাজনারায়ণ হিন্দুজাতির সম্মুখে তাঁর ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবোধের স্বরূপটি তুলে ধরেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মমতের সঙ্গে রাজনারায়ণের ধর্মমতের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। তাঁর স্বলিখিত ডায়ারির অভিমতও এই পার্থক্যের যথেষ্ট প্রমাণ। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে উনিশ শতকের নবম দশকে রাজনারায়ণের সঙ্গে বঙ্কিমেরও মতবিরোধ হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা নিরাকার পরমেশ্বর-উপাসক; নব্য হিন্দুরা তা মেনে নিতে রাজী নন। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একালে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কোনোদিনই সদয় ছিলেন না। কাজেই ধর্ম-ব্যাখ্যাতারূপে আবির্ভূত হয়েই বঙ্কিম ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা করেন। "বঙ্কিম কোমত্-প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শকনিকদের মতের সাহিত গীতার মতের একটা সমন্বয় খাড়া করিয়া বিশেষ একটি মতকে হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন।"[১] নবজীবন (শ্রাবণ ১২৯১) ও প্রচার (শ্রাবণ ১২৯১) পত্রিকায় 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম্ম' শীর্ষকে বঙ্কিমের দুটি প্রবন্ধ থেকে তাঁর ধর্মচিন্তার স্বরূপ বোঝা যায়। রাজনারায়ণও পরবর্তী মাসেই (ভাদ্র) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮০৫ শক) "নূতন ধর্ম্মমত" নামক প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিমের মতের পাল্টা জবাব দেন; তিনি লিখলেন: "ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কোথায় ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ হইবেন তাহা না হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, অথবা কোম্‌তবাদ অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন: সে মত এই যে কোম্‌তের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম।" এইভাবে রাজনারায়ণ উক্ত প্রবন্ধে প্রবল যুক্তিসহকারে বঙ্কিমের নব্যহিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করেন এবং স্পেনসার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত উদ্ধৃত করে ব্রহ্মের স্বরূপ তথা ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও দেওঘরে রাজনারায়ণের লেখনীরও বিরাম ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর *Brahmo Catechism* পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। *Brahmo Catechism*-এর বিষয়বস্তু হল প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মানবের ধর্মজীবনের কর্তব্য, ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য, প্রাতঃকালীন প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, উপাসনামন্ত্র এবং দিনযাপনের নিয়মাবলী ইত্যাদি; এইগুলির

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম (১৩৬৭), পৃ. ১৮৫

রাজনারায়ণ কর্তৃক প্রথমে বাংলাভাষায়[১] রচিত হয়েছিল। রাজনারায়ণের বন্ধুপম শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র বসু উক্ত বাংলা পুস্তিকা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৯০ সালে এলাহাবাদে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ ও ১৮০৭ শকের 'আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ। ১৮০৯ ও ১৮১০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে "ঋষি-জীবন" ও "ব্রাহ্মধর্মের আপদ-বিপদ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। শেষোক্ত প্রবন্ধটি উমেশচন্দ্র দত্তের আহ্বানে সিটি কলেজে প্রদত্ত রাজনারায়ণের বক্তৃতা। এই সংবাদটি তিনি ডায়ারিতেও[২] লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দেওঘরে থাকতে রাজনারায়ণ মধ্যে মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করতেন দুই কারণে; প্রথমত মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মসমাজের কাজে। রাজনারায়ণের শেষজীবনে রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল, 'তাম্বুলোপহার', 'সারধর্ম', 'ব্রহ্মসাধন','বৃদ্ধ হিন্দুর আশা',"জীবনপ্রান্তোপনীতের জীবন",'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত','আমার পশ্চিম ভ্রমণ',"পিতৃভূমি দর্শন" প্রভৃতি।

দেওঘরে যাওয়ার পর রাজনারায়ণের প্রথম রচনা "বৃদ্ধহিন্দুর আশা"। ১৮৮১ সালে এই পুস্তিকার ইংরেজী সংস্করণ *Old Hindu's Hope* সর্ব-প্রথম প্রকাশিত হয়; তিন-চার বছর পরে তাঁর 'মহাহিন্দু-সমিতির প্রস্তাব' বাংলায় অনুবাদিত হয়ে নবজীবন (শ্রাবণ ১২৯৩, জুলাই ১৮৮৬ খ্রী) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই নবজীবন পত্রিকার প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল নীলকৃষ্ণ দেববাহাদুরের অর্থানুকূল্যে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এক মহাজাতীয়তার আদর্শে জাতিকে উদ্দীপিত করার জন্য রাজনারায়ণ মহাহিন্দু-সমিতির পরিকল্পনা জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, "ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকার-বাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।"[৩] রাজ-

---

১. রাজনারায়ণের বাংলা পুস্তক অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

২ ৪ চৈত্র, ১৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার (১২৯৪ সাল, ১৮৮৭ খ্রীঃ) "...রাত্রিতে সিটি কলেজে—"The Rock Ahead" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আপদ বিপদের বিষয়ে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করি। সকলেই এই বক্তৃতা অতিশয় পছন্দ করিলেন। এই সকল আপদ বিপদ এড়াইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মপ্রীতি।"

৩. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৬১

নারায়ণের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার মতো মহাহিন্দু সমিতির প্রস্তাবও শিক্ষিত সমাজে একসময় কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা বোঝা যায় তৎকালীন পত্র-পত্রিকার আলোচনা থেকে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, রাজনারায়ণের উক্ত প্রস্তাব ভারতব্যাপী আন্দোলনের ঝড় তুলেছিল। বোম্বাইয়ের 'নেটিভ ওপিনিয়ন', মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দু', ময়মনসিংহের 'চারু-বার্তা', তদুপরি কলিকাতার একাধিক পত্রিকায় রাজনারায়ণের এই পরিকল্পনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পুনা থেকে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় নবজীবন পত্রিকায় (পৌষ, ১২৯৩) লিখেছিলেন: "পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া ভারতকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ভারতের শুভগ্রহে তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। এক প্রদেশের হিন্দু অন্য প্রদেশের হিন্দুকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেরই একপ্রকার অভাব, সকলেরই একপ্রকার আশা, সকলেরই একপ্রকার উদ্দেশ্য। এক কান্না সকলেই কাঁদিতেছে, এক কষ্টে সকলেই ভুগিতেছে, এক জ্বালায় সকলেই জ্বালাতন। এমন অবস্থায়, ভারতের সমগ্র হিন্দুগণের একত্র হইয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় স্থির করা বিচিত্র নহে।" এই কয়েক পঙ্‌ক্তি উক্ত লেখকের 'মহাহিন্দু সমিতি' নামক সুদীর্ঘ সমালোচনার অন্তর্গত। অনেক সমালোচক কঠোর মন্তব্যের সঙ্গে সহানুভূতিও প্রকাশ করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (৪ অগাস্ট, ১৮৮৯, ডাক সংস্করণ) পত্রিকার মন্তব্যও[১] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু[২] লিখেছিলেন: "ধর্মের নামে সমস্ত হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা সম্ভব কিনা, এ বিষয় লইয়াই বৃদ্ধ হিন্দুর সহিত আমাদিগের মতের বিভিন্নতা, কিন্তু অন্য দুই একটি সামান্য বিষয় ভিন্ন অপর সকল স্থলেই তাঁহার প্রস্তাবে আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহার প্রত্যেক কথায়, বক্তৃতায়,

১. "...Patriotism of the highest type pervades every syllable of the old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do well to consider the practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy of the Aryan Nation. Politicians might profitably pause to inquire whether the realisation of the Old Hindu's hope will retard or advance the cause of the country which the National Congress is pledged to promote."

২. দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, রাজনারায়ণের হিতৈষী বন্ধু।

প্রার্থনায়, গীতে তাঁহার মহা-প্রাণতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তিনি ভারতবর্ষের যে অভাব অনুভব করিয়া এই মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, অনেকেই সে অভাব অনুভব করিতেছেন। শীঘ্রই হউক, অথবা বিলম্বেই হউক, তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। ...আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সফল হউক, এবং ঈশ্বর ও মাতৃভক্তি অঙ্কিত পতাকা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড্ডীয়মান হইতে থাকুক।"[১]

রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে বিদগ্ধপূর্ণ অভিমত প্রকাশ ক'রে একটি পত্র[২] লিখেছিলেন রাজনারায়ণকে। তাঁর প্রবল হিন্দুয়ানি ভাবকে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আর্যামি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন—"আর্যের উপর আপনারও শ্রদ্ধা যেরূপ আমারও সেইরূপ কিন্তু আর্যামিকে আমি তুচ'ক্ষে দেখিতে পারি না।...আর্যামির উপর প্রবীণ ভাবের attitude ধারণ করিলে প্রবীণতার অপব্যয় করা হয়।" দ্বিজেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের মহাহিন্দু-সমিতির পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি। পত্রে তিনি স্বাভিমত[৩] ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর মহাহিন্দু সমিতি ও হিন্দু জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব একত্রে *Old Hindu's Hope or A proposal for the Establishment of A*

---

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু-লিখিত "মহাহিন্দু সমিতি" (সমালোচন), ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'নব্যভারত' পত্রিকায় (পৃ. ২৯০) প্রকাশিত।

২. দ্র. বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ. ৮০১

৩. "Social amelioration আবশ্যক— সুতরাং আপনার বৃদ্ধের আশা as আশা সকলেরই শিরোধার্য। কিন্তু আমার মন আশা মাত্রটিতেই প্রবোধ মানিতেছে না, has it any power to move জনসাধারণ? English education—English Government—এইটেই হচ্ছে the great moving powers. এক ব্যক্তিও যদি আপনার ঐ Social scheme কার্যে পরিণত করে তাহা হইলে বুঝি যে, আপনার আশা শুদ্ধ কেবল আশা মাত্র নহে। এ কালের Motto এই যে, Social amelioration must be according to Reason—not according to precedent, ইহাতে অনেক বিপদ— কিন্তু লোকে ছাড়িতে পারে না, in spite of বিপদ লোকে Reason-এর পক্ষপাতী।... আমার মত এই যে, পূর্বতন আর্য-ব্যাপার পূর্বতন কালেরই জন্য— এখনকার কাল নূতন পরিবর্তনের কাল। ...আমি আপনার acheme-এর কিছুমাত্র বিরোধী নহি, কিন্তু Antiquityকে আপনি যেরূপ আস্কারা দিয়াছেন— আমি আপনার সঙ্গে ততদূর যাইতে পারি না। ধর্মভাব উজ্জীবিত করা শ্রেয়— এ বিষয়ে আমি আপনার সম্পূর্ণ মতানুবর্তী কিন্তু not

Hindu National Congress নামে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখেছেন যে, উক্ত ইংরেজীর সারাংশ (কেবলমাত্র মহাহিন্দু-সমিতির প্রস্তাব) এক সময় মাদ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গরুরের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যা হোক, প্রস্তাব দুটি একত্রে প্রকাশকালে পুস্তকের ভূমিকায় রাজনারায়ণ লেখেন :

"Depending on Brahma or the One True God, the universal object of adoration of all Hindus, from the remotest antiquity and the Sanatana Dharma or Everlasting Religion as Hinduism is called, this pamphlet is issued by the writer in the hope that all Hindus will unite under the banner inscribed with the words 'Iswara 0 Matribhumi', "God and Motherland" and exert their best to promote the improvement of their nation in every respect according to the dictates of their holy religion which admits no such distinction as sacred and profane duties or sacred and profane knowledge and which ordains that every action of life should be considered as a part of religion and be performed with devoutness of mind and an eye to the Supreme."

১৩৫৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (মহাহিন্দু সমিতির প্রস্তাব) পুনরায় মুদ্রিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণের 'সারধর্ম' প্রথমে 'আলোচনা' (১৮০৬-০৭ শক, ১ম খণ্ড) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'সারধর্ম' এবং *The Essential Religion* একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে সারধর্মের গরীয়সীত্ব স্বীকার করেন নি। দেবেন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন যে এর দ্বারা 'ব্রাহ্মধর্মের মূল শিথিল করা

---

because it prevailed ages ago, but because it is in harmony with the development of Human Reason which characterizes the present age. বাচালতা মার্জনা করিবেন।...

পুনঃ— মনে করিবেন না যে, আমি অপেনার বৃদ্ধের আশার গুণগ্রাহী নহি— Every rose has its thorns, আমি কেবল thorny sideটাই দেখাইলাম।"

হয়েছে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত পত্রে[১] রাজনারায়ণকে লিখে জানিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এঁদের মতের পরিবর্তন হয়। এই বিবরণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণের আত্মচরিতে। 'তাম্বুলোপহার' প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ প্রথমে আলোচনা (১৮০৭ শক, ২য় খণ্ড) ও নব্যভারত (বৈশাখ, ১২৯৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি) একটি উৎসবে এটি রাজনারায়ণ-কর্তৃক পঠিত হয়েছিল। জানা যায় যে, ১৮৯০ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বালক-বালিকাদের একটি সম্মেলনে রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিরূপে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় চারশো বালক-বালিকার মধ্যে এই চিরতরুণ বৃদ্ধটি উজ্জ্বল পক্ককেশ-শোভিত মস্তকে এবং মাল্যশোভিত কণ্ঠে সেই কিশোর-সম্মেলনে অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিস্তার করেছিলেন। ঐ উৎসবের আর-একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে, যেখানে বহু পুরুষ-মহিলার বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল। উৎসবানুষ্ঠান ও আহারাদি-অন্তে রাজনারায়ণের লেখা একটি মুদ্রিত লিপি পাঠ করা হয়। তারই নাম তাম্বুলোপহার। দেওঘরে থাকতে রাজনারায়ণ অবিরাম লিখেছেন, একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নাদিও করেছেন। এখানকার শান্ত, নির্জন পরিবেশ জ্ঞানচর্চারই উপযুক্ত ছিল। প্রধানত যে-যে বিষয়ের এবং যে যে লেখকের পুস্তক তিনি পাঠ করতেন, তারও উল্লেখ রয়েছে তাঁর ডায়ারির পৃষ্ঠায়।[২]

---

১. ১৩১৭ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রাকারে একটি কৌতুক গীতিনাট্য রচনা করে রাজনারায়ণের 'সারধর্ম্মে'র উত্তর দেন। চার অঙ্ক বিশিষ্ট এই গীতিনাট্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেকে সারধর্ম-প্রচারকরূপে বর্ণনা করেছেন।

২. রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে সংগৃহীত পুস্তকের একটি তালিকা প্রদত্ত হল—

History of English Literature; Arthur Bailey Thompson's Vtctorian History of England; Hunter's Indian Empire (2nd Edition); History of India, Rome, Italy, England; De La Huc's Travels in Tibet and China; Malcom's Sketches of Persia; Richardson's Selections; Selections from the Grecian Philosophers; John Caird's Introduction to the Philosophy of Religion; Martineau's Types of Etheical Theory; Modern Philosophers—Morley's Life of Burke; Adams Abott's Life of Napoleon; Macaulay's Essay on Warren Hastings; Thackeray's Vanity Fair; St. Augustine's Confessions; Revd. E. Salter's Keshab Chandra; English Idioms—by M. C. Moris, Morley's Men of

রাজনারায়ণ একালেও ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের জন্য চিন্তা করেছেন ও ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সম্পর্কীয় রচনাগুলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরো প্রমাণ রয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৮০৩ শক, ও পৌষ ১৮০৮ শক,) প্রকাশিত দুটি পত্রে। রাজনারায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদককে 'ধর্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়ের' ছয়টি পরিকল্পনা-সমন্বিত পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন উক্ত পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য। উক্ত পরিকল্পনায় তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্মপ্রীতি একাধারে প্রকাশিত হয়েছে। আর-একটি পত্র লিখেছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দুকড়ি ঘোষকে। ব্রাহ্মরা একাধিক দলে বিভক্ত হলেও তাদের ধর্মীয় মত, পথ ও আদর্শ পরস্পর এক হওয়া যে বাঞ্ছনীয় সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রাজনারায়ণ; এবং সৎপরামর্শপ্রার্থী সম্পাদক মহাশয়কে সদুপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন।

জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে রাজনারায়ণের স্বদেশচিন্তার স্ফুরণ হয়েছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র কার্যাবলীর মাধ্যমে। পরিষদের সঙ্গে রাজনারায়ণের সংযোগ ছিল দীর্ঘকালের। তিনি ছিলেন পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় পরিষদ তখন উক্ত নামে পরিচায়িত হত না এবং পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকারও বাংলা নাম ছিল না। *The Bengal Academy of Literature* নামে একসময় এর কার্যাবলী ইংরেজীতে সম্পাদিত হত। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাজনারায়ণ পরিষদের সমস্ত কার্যাবলী ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলাভাষায় প্রচলনে বদ্ধপরিকর হন এবং পরিষদ মারফত উক্ত কর্মপ্রচেষ্টা সম্পাদনে উৎসাহী হয়েছিলেন। পরিষদের ঊনবিংশতম সভার ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ লিওটার্ড। সেক্রেটারি ছিলেন কে. চক্রবর্তী। রাজনারায়ণ দেওঘর থেকে এইসময় 'বঙ্গ-সাহিত্য-ভাষার' সভাপতি মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে পত্রে[১] কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রথমত "পরিষদের কার্য বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য…।" দ্বিতীয়ত, "পরিষদের সেইমত ঘোষণা করা কর্তব্য যে, কোন গভর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার

Letters; Works of Madam Gyan, Robert Falconer, Pope Dryden Shakespeare; Milton, Shelly, Sir Walter Scott; Literary Celebritees; Bengal Annual for 1830, '31, '32; শংকরাচার্যের বিবেকচূড়ামণি; বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি।

করা উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে।" উক্ত পত্রে রাজনারায়ণ আরো জানিয়েছিলেন যে, "ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য সম্পাদিত হইবে...।" পরিষদের পঞ্চম অধিবেশন হয় ৮ আশ্বিন ১৩০১ তারিখে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সভায় রাজনারায়ণ-প্রেরিত প্রস্তাবগুলি পঠিত হয়। ১৩০১ সালের ১৭ ভাদ্র (ব্রাহ্মসম্বত্ ৬৫) দেওঘর থেকে পত্র যোগে প্রেরিত রাজনারায়ণ-কৃত প্রস্তাবগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হল: "পূর্ব-বাঙ্গলার সংবাদপত্রেরা যে সকল বাঙ্গালে প্রয়োগ করিবেন, তাহা পরিষদ এই পত্রিকায় ধরিয়া দিবেন, এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা-লেখকগণ বাঙ্গালা শব্দের পরিবর্তে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহাও ধরিয়া দিবেন। বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতেছি—মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংরাজী শব্দ ইংরাজী অক্ষরে—ইহা ভয়ানক। যে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নয়, তাহার সম্ভবপর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রথম দিয়া, তৎপর বন্ধনীর ভিতর ইংরাজী শব্দ দেওয়া কর্তব্য। এই দুই বিষয়ে অর্থাৎ বাঙ্গালে প্রয়োগ এবং ইংরাজী প্রয়োগ বিষয়ে পরিষদের একেবারে নির্দয় হওয়া কর্তব্য।" এ ছাড়া উক্ত পত্রে রাজনারায়ণ পরিষদকে তার পত্রিকা মারফত 'ভাবী ব্যাকরণ' ও 'ভাবী অভিধান' তৈরির পরিকল্পনা বলে দেন। রাজনারায়ণের অপর এক প্রস্তাব হল পরিষদের একটি কথোপকথন মণ্ডলী (Conversational Group) স্থাপন, সেখানে সভ্যেরা বাংলাভাষায় আলোচনাদি করবেন। পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৯ কার্তিক, রবিবার, ১৩০১ বঙ্গাব্দ) রাজনারায়ণ আর-একটি প্রস্তাব[২] লিখে পাঠান: "...পরিষদের সকল সভ্যেরা আপনাদিগকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিবেন।" রাজনারায়ণ এ কথাও জানিয়েছিলেন যে পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলা পুস্তকাদির সমালোচনা ইংরেজীর

---

১. দেওঘর (বৈদ্যনাথ) থেকে পত্রটি লেখা ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৩ পৌষ তারিখে। দ্র. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ ১৩০১।

২. উল্লিখিত প্রস্তাবটি রাজনারায়ণ পত্রে লিখে পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। মূল পত্রটি ১৩০১ সালের ১৭ কার্তিক দেওঘর থেকে লিখিত।

পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই হবে। বলা বাহুল্য, পরিষদ তাঁর এই প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজনারায়ণের প্রস্তাবানুসারেই পরিষদের কার্যনির্বাহক ভাষা হিসেবে বাংলা সমাদৃত হয়। এই মর্মে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক, ১৩০১ বঙ্গাব্দ) সম্পাদকের বিবৃতিটি[১] উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান 'সাহিত্য-পরিষদের' নামকরণ। সম্ভবত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নাম তাঁরই প্রস্তাবানুযায়ী স্থিরীকৃত হয়।[২] বলা বাহুল্য, এই-সমস্ত অবদানের জন্য, পরিষদের সর্ববিধ উন্নতি-প্রচেষ্টার জন্য পরিষদ এই মনীষীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিল। রাজনারায়ণ কলকাতা থেকে দূরে অবস্থান করলেও, জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত পরিষদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল তাতে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা তাঁর গুণ ও কর্মের যথার্থ সমাদর করা হয়েছে। "তিনি সর্বদাই পরিষদের উন্নতিকল্পে নানা উপদেশ দিতেন। দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, পরিষদ্ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।"

দেওঘরে কর্মমুখর দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে রাজনারায়ণের অবসরকাল না বললেই হয়। অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ফলে শীঘ্রই তাঁর শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। একদিন রাজনারায়ণ প্রাতঃভ্রমণের পর বাড়ি ফিরে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমে দেখা গেল যে তিনি 'এপোপ্লেক্সি' রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আয়ুর্বেদীয়, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি ইত্যাদি সবরকম চিকিৎসাই হয়। তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ব্যতীত মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা নানাভাবে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। অর্ধঅঙ্গ অসাড় অবস্থায় রাজনারায়ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। রোগশয্যায় যাঁরা তাঁর অক্লান্ত সেবা ও যত্ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি ব্যতীত জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দৌহিত্র বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নাম উল্লেখ্য। অবশেষে (১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিন ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) সন্ধ্যা-বেলায় তাঁর অসুস্থতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনের এই শেষ মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন

১. দ্রষ্টব্য : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কার্তিক ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৫-২৬

২. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'সুপ্রভাত' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

তাঁর এক কন্যা। বেদনাকরুণ অন্তরে তিনি লিখেছেন: "মৃত্যুকালে দেখিলাম মহাপুরুষ বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া যেন কাহার আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া গম্ভীর সৌম্য মূর্তিতে রোগশয্যায় শয়ান আছেন। সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোন কষ্ট যন্ত্রণা নাই, যেন বাহিরের সব কোলাহল হইতে হৃদয়কে আনন্দে ডুবাইয়া কি এক অমূল্য রত্ন পাইয়া মহা আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঠিক যেন মহা যোগীর মহা ভাব। এ কি মৃত্যু না যোগ?"[১] সেদিন সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-পরিজন ব্যতীত দেশের প্রতিটি জনচিত্ত গভীর শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। সেই শোকাচ্ছন্ন দেশবাসীর নিদারুণ অন্তর-বেদনা সাময়িক পত্রের[২] পৃষ্ঠায় গভীর মর্মোচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনারায়ণের শেষ ইচ্ছামত তাঁর দেহাবসানের পর পুত্র-কন্যা-পৌত্র-দৌহিত্রাদি মিলে সমবেতভাবে রবীন্দ্রনাথ-রচিত অতি প্রিয় সংগীত দ্বারা সেই অমর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

"মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা
চলো রে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই॥

---

১. "তাঁহার এক কন্যা কর্তৃক প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসু (তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের অসম্পূর্ণ চিত্র)' " পৃ. ১৮

২. "আমাদের এবং সমস্ত বঙ্গদেশের পরম শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রীতিভাজন মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বিগত ২ আশ্বিন সোমবার তাঁহার প্রিয় বঙ্গভূমি অন্ধকার করিয়া তাঁহার প্রাণের পরিজনবর্গকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া এবং দেশবিদেশস্থ অগণ্য বন্ধুবর্গকে হাহুতাশের নিরাশায় আচ্ছন্ন করিয়া নিখিল জগতের জনকজননীর ক্রোড়ে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতধামে সমুত্থান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে আছে যে, "ঈশ্বরভক্তের হৃদয় কি মধুময়, কি কোমল, তাঁদের ধর্ম্মসাধন কি কঠোর" ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্লভ, কিন্তু ঐ দিব্যধাম প্রয়াত মহাত্মাতে আমরা তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন মন সার্থক করিয়াছি ...তাঁহার রোগশোকাক্রান্ত মর্ত্ত্য শরীরের আড়াল হইতে কি যে এক অমূল্য স্বর্গীয় প্রেমময় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত তাহা সহস্র চেষ্টা করিলেও লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। যিনি দুই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সৎসঙ্গের আনন্দ করিয়াছেন তিনি আজীবন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন— তাহা মুখে বলিয়া অন্যকে বুঝানো তাঁহার সাধ্যাতীত। অতএব নবপ্রয়াত মহাত্মার আশ্চর্য্য অমায়িক অকৃত্রিম হৃদয়ের গুণ সকল প্রকাশ করিয়া বলিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৮২১ শক

ডাকো রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই॥
সতত চাহি তাঁরে ভোলো রে আপনারে,
সবারে করো রে আপন।
শান্তি-আহরণে শান্তি-বিতরণে
জীবন করো রে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে
চলো রে সবারে শুনাই,
বলো রে ডেকে বলো 'পিতার ঘরে চলো,
হেথায় শোক তাপ নাই।"

'প্রবাসে দৈবের বশে' এ-দেশের দুরদৃষ্টক্রমে 'জীবতারা' যত খসেছে সেই মৃত্যুঞ্জয় তালিকার একটি উজ্জ্বল নাম রাজনারায়ণ বসু। জীবনের দীর্ঘপথ যে তিনি অতিক্রম করে দেশের সেবা করে গেছেন, সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তার প্রত্যেক পদক্ষেপ ছিল কষ্টিপাথরে মোড়া। আর তার প্রতি পদক্ষেপেই তাঁকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু ব্রাহ্মসমাজের তথা সমগ্র দেশের সংকটকালে তিনি ছিলেন সারথি এবং সংকল্পে অবিচল। তাই তাঁর দৃঢ়, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৎকালীন সমাজ আশ্রয় ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিল। বিচার-বিবেচনায় ও নীতি-নিরূপণে যিনি অখণ্ড ও অভ্রান্ত এক জাতিত্ববোধ বা মহান হিন্দুত্ব সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মূলত সমন্বয়ধর্মী, সাম্যবাদী ও শান্তিকামী। তাঁর প্রতিভা ছিল সংগঠনে, সংঘর্ষে নয়। এই সংগঠনী প্রতিভার আর-একটি দিক হল ব্রাহ্মসমাজের ভিন্নমুখী চিন্তাধারাকে একসূত্রে গাঁথা। উক্ত সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাম্প্রদায়িক বিবদমান, বিরোধী শক্তিগুলিকে যুক্তি এবং ন্যায়ের সীমানায় ধরে রেখে বার বার পরম কল্যাণপথের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক ভারতে বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু রাজনারায়ণ তাঁদের মধ্যেই ছিলেন এক স্বতন্ত্র, প্রখর অথচ স্নিগ্ধ-ব্যক্তিত্বময় বলিষ্ঠ পুরুষ। জাতীয়তাবাদের জীবন্ত প্রতীক এই মহামনীষী ধর্ম ও সমাজ -সংস্কার দ্বারা চিরপুরাতন হিন্দুত্বের মহিমাকেই উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের চরম প্রত্যাশা

'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা জাতিকে তিনি দিয়ে গেছেন স্বরূপের সন্ধান— সমগ্র ভারতব্যাপী এক অখণ্ড অসাম্প্রদায়িক, ভেদ-বুদ্ধিহীন, জাতিগঠনের পথনির্দেশ ; এবং ইঙ্গিত করে গেছেন এক অনাগত যুগের আশু সম্ভাবনার।

দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ

রাজনারায়ণ বলেছেন : "যেমন বন্ধু পাওয়া কঠিন, তেমনি প্রকৃত বন্ধুত্বটি অখণ্ডরূপে চিরকাল রক্ষা করাও কঠিন।" এ-ব্যাপারে রাজনারায়ণ নিজে ছিলেন সৌভাগ্যবান। যখন যাঁদেরই সংস্পর্শে তিনি একবার এসেছেন, তাঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা তিনি পেয়েছেন আজীবন। বন্ধুপ্রীতি ছিল রাজনারায়ণের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। এই গুণেই বয়োজ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর প্রাণের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় আকস্মিকভাবে। উভয়ের এই আকস্মিক যোগাযোগ দেশ ও জাতির পক্ষে শুভফলদায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। রামমোহনের পরে তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার ভার পড়ে দেবেন্দ্রনাথের উপর। তাঁর পূর্ববর্তী সময় থেকেই ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার উৎকট প্রকাশ। এই নির্বীর্য, অনগ্রসর, বিপথগামী হিন্দুজাতির সর্বপ্রকার উন্নতি বিধানে ও দৃষ্টি পরিবর্তনে একালে প্রধানত দেবেন্দ্রনাথই অগ্রসর হয়েছিলেন। দেশ ও জাতির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশের অন্তরায়গুলি দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন গভীর-ভাবে; এবং ব্রাহ্মসমাজ থেকে হিন্দুজাতির সেই অন্তরায়গুলি সর্বতোভাবে দূর করতে তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। কিন্তু মহর্ষি নিজে স্বভাবে ও প্রকৃতিতে ছিলেন অত্যন্ত ধীর, ভাবুক ও ভক্তিভাবাপন্ন ব্যক্তি। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বাধা দূর করতে সক্রিয়ভাবে কর্মোদ্যমী হওয়া, এ বোধকরি কিছুটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গেই আমরা স্মরণ করতে পারি মহর্ষির আত্মজীবনীর কথা। তিনি পৌত্তলিকতা পরিহার করার পর প্রায় প্রতি বছরই দুর্গাপূজার সময় থেকে জগদ্ধাত্রী পুজার সময় পর্যন্ত বিদেশে থাকতেন। যেহেতু তাঁদের পরিবারে তখন একেশ্বর উপাসনা প্রচলিত হয় নি। অথচ এই প্রথা যে তিনি আপন পরিবারের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন, এই মনোভাবাপন্ন পুরুষ তিনি ছিলেন না। কিন্তু একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সংকটের কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।

কাজেই তাঁর নির্দেশানুযায়ী দেশ ও জাতির মন থেকে ধর্ম ও সমাজের ভ্রান্ত চিন্তা দূর করে জাতিকে সত্য, ও ন্যায়ের পথ দেখাবে, ভারতের সনাতন ধর্মাদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে— এমন একজন ভক্তিমান, প্রতিভাবান ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির অভাববোধ দেবেন্দ্রনাথের মনে ছিল। খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে এই সংকটকালে তিনি লাভ করলেন রাজনারায়ণের মতো ধর্মপ্রাণ উৎসাহী উজ্জ্বল-চরিত্র-বিশিষ্ট যুবককে।

সময়টা ছিল ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস। পর পর দুটি শোকের আঘাতে রাজনারায়ণ মুহ্যমান। স্ত্রীর মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে পিতা পরলোকগমন করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাজনারায়ণ পিতৃবন্ধু মহর্ষিদেবের শরণাপন্ন হন। পিতৃবিয়োগ-ব্যথায় তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটে, তদুপরি ধর্মসম্বন্ধে মনের সংশয়ভাব কিছুদিন থেকে অশান্তির কারণ হয়েছিল। উভয়ের প্রথম সাক্ষাতের কথা দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন : "…রাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" চুম্বক দণ্ড যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ দেবেন্দ্রনাথও যেন তাঁর মনের মতো, যোগ্যতম ব্যক্তিকে প্রথম সাক্ষাতেই গ্রহণ করেছিলেন নিবিড়ভাবে। রাজনারায়ণও একজন ধর্মোপদেষ্টা, সাধুচরিত্র, ভক্তিমান পুরুষের সান্নিধ্য লাভ ক'রে ও সেই-সঙ্গে আপনার লক্ষ্য বস্তু লাভের আশা মনে মনে চিন্তা করে নিজেকে অতি সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করেন। বাস্তবিকই প্রথম পরিচয় থেকে রাজনারায়ণের কাছে দেবেন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন দুই-ই —'ওয়ার্ল্ড ম্যান ও গড-ম্যান।' রাজনারায়ণ পরবর্তী সময়ে তাঁর সাংসারিক সুখে-দুঃখে কল্যাণকামী মহর্ষির সহানুভূতি ও উপদেশ সব সময় লাভ করেছেন ; আবার অধ্যাত্মজীবনের সদুপদেশ ও ঈশ্বর-মহিমার বাণী পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছেই। প্রথম দর্শনে রাজনারায়ণের সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব তাঁর স্বউক্তিতেই প্রকাশিত : "তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্মভাব দেখিয়া, দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।" আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ আরো বলেছেন : "তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য।… ধর্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম।"[১]

১. 'আত্মজীবনী' (৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২), পৃ, ৬৯

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনারায়ণকে সেদিন গ্রহণ করলেও তাঁর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রীতিভাব ছিল গভীর। মহর্ষির কাছে রাজনারায়ণ ছিলেন প্রকৃতই পিতৃতুল্য, গুরুর কাছে পুত্রপ্রতিম শিষ্যের মতো। এবং রাজনারায়ণ এই অধ্যাত্ম-ছায়াতলে এসে সমাগত চিত্তে একই সঙ্গে লাভ করলেন শ্রেয়ের সন্ধান ও প্রেয়ের পথ। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল। একজন আটাশ বছরের যুবক, আর-একজন উনিশ বছরের তরুণ। শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কারে একজনের জীবনে যৌবনসূর্যের প্রখরদীপ্তি, অন্যজনের জীবনাকাশে উদীয়মান সূর্যের রক্তিমাভা। কিন্তু উভয়ের মানসিক গঠনের মূলগত ঐক্য ও চিন্তাধারার সমতার ভিত্তিতে ও সর্বোপরি মত ও পথের একতার ভিত্তিতে উভয়ের বন্ধুত্বস্থাপন ও মিলিতভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ সম্ভব হয়েছিল।

সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে লালা হাজারীলালের কাছে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন।"[১] রাজনারায়ণের আধ্যাত্মিক মত ও পথ এতদিন পরে স্থিরীকৃত হল, সেইসঙ্গে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁর মন পরম প্রশান্তিতে পূর্ণ হল।

রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভার কাজে মাসিক বেতনে নিযুক্ত হন। এ হল ১৮৪৬ সালের গোড়ার কথা। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের জন্য উভয়ের কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা এইকাল থেকে। বলা বাহুল্য, তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ তখন দেবেন্দ্রনাথে গৃহেই সম্পন্ন হত। উক্ত সভায় প্রথম দিন আগমনের কথা রাজনারায়ণ আত্মচরিতে স্মরণ করেছেন: "আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'ব্যবস্থা-দর্পণ'-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণবাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণবাবু বক্তৃতা করেন।" রাজনারায়ণের অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশ হয় এই তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান করার পর থেকে মহর্ষির পবিত্র সান্নিধ্যে এসে। রাজনারায়ণকে দিয়ে উপনিষদ্ ভাষান্তরিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বেদান্ত-উপনিষদাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সহজেই সাফল্য লাভ করেছিল।

---

১. 'আত্মজীবনী' (৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২), পৃ. ৬৯

ওঁ

শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী

প্রণাম পূর্ব্বক আমার [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible], আমার
তোমার সহিত এবং [illegible] [illegible]
[illegible] হইতে আর [illegible] [illegible]
[illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] তবে আমাকে
[illegible] করিবে। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

এদিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই রাজনারায়ণ উক্ত ধর্ম এবং সমাজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। বেদ-উপনিষদাদি ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরন্তর শাস্ত্রালোচনার ফলে রাজনারায়ণের মনে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন জাগে এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার-প্রবণতা দেখা দেয়। প্রজ্ঞাবান সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য মহর্ষির কাছে সত্যকাম যোগ্য শিষ্যের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিয়েই রাজনারায়ণ মহর্ষির অনুগামী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের হৃদয়বন্ধন একটি অচ্ছেদ্য ধর্মসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। রাজনারায়ণের সত্যান্বেষী হৃদয় পরমাত্মার মহিমা উপলব্ধিতে ও ধর্মভাবনার উন্নয়নে উন্মুখ হলে দেবেন্দ্র-নাথই সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের জিজ্ঞাসা এইভাবেই প্রশমিত হয়।

শাস্ত্রজ্ঞানে ও অধ্যাত্মবোধে রাজনারায়ণ তরুণ বয়সেই অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাই বয়স ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েও মহর্ষি কনিষ্ঠ রাজনারায়ণের কাছ থেকে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ গ্রহণ করতে কোনোদিন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এ-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। 'মসূরী পর্বত' থেকে ১৭ আশ্বিন, ৫৩ ব্রাহ্মসংবতে মহর্ষি রাজনারায়ণকে লিখে জানালেন : 'ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য। আমরা পরস্পর সহযোগী। আমার ভ্রান্তি হইলে তুমিও তাহা সংশোধন করিতে পার এবং তোমার ভ্রান্তি আমার বোধ হইলে, তাহাও সংশোধন করিবার অধিকার আমার আছে।"[১] উভয়ের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই উভয়ের সমগ্র জীবনব্যাপী কর্ম নির্ধারিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের পত্রোক্তি তার প্রকাশ : "যাহা তোমার মনোগত হইবে তাহা যে আমার মনোগত হইবেক না এমত কখনও নহে।"[২]

একে অন্যের প্রতি এই গভীর প্রত্যয় নিয়ে একদিন ব্রাহ্মসমাজের সুবিশাল কর্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও জাতিকে খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে অগ্রণী হন। উক্ত প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর দেবেন্দ্রনাথ একালে স্থাপন করেন 'হিন্দু হিতার্থী' নামে একটি বিদ্যালয় এবং একই কারণে ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেও প্রয়াসী হলেন তিনি। কিন্তু রাজনারায়ণের কাছে এ-কাজ সমাজের মতে সাময়িক

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৯১

২. তদেব, পত্র ৫২

প্রলেপমাত্র মনে হয়েছিল, এতে সম্পূর্ণ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত বলেই তিনি মনে করেছিলেন। ফলে রাজনারায়ণ সেই নিরাময়-প্রচেষ্টায় অধিক যত্নশীল হলেন। তিনি দেখলেন সমাজস্থ ব্যক্তিমনের পরিবর্তনের জন্য যে ভিন্ন একটি ধর্মের দ্বারা আঘাত দেওয়া হল, সে ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরো চিন্তা করেছিলেন যে, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মপুস্তকের মতো ব্রাহ্ম-ধর্মেরও ধর্মপুস্তক থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। যেহেতু উক্ত পুস্তক পাঠ করে জন-সাধারণ এই ধর্মের স্বরূপ ও আদর্শ অবগত হতে পারবে এবং এইভাবেই ব্রাহ্মধর্মে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আসবে; এবং এই উপায়েই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শেষ পর্যন্ত পরধর্মের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হবে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দু-ধর্মেরই সারসত্য, এ কথাও হিন্দু জনসাধারণের কাছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই রাজনারায়ণ মহর্ষির কাছে একটি বিনীত আবেদন জানান। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইংরেজীতে একটি পত্র লেখেন। পত্রটির বাংলা মর্মানুবাদের[১] কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে রাজনারায়ণের মনোগত অভিপ্রায় জানা যাবে: "আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের উন্নতি ও পুনঃপ্রচার যখন আপনার জীবনের ব্রত তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থকারে মুদ্রিত করুন।"[২] রাজনারায়ণের এই প্রস্তাবের উপযোগিতা দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তারপর থেকে রাজ-নারায়ণের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রত্যহ তাঁর অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন দেবেন্দ্রনাথ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের পরিকল্পনা রাজনারায়ণেরই। রাজনারায়ণের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর। একটি কুড়ি বছরের তরুণের এরূপ অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টি, কল্পনা-শক্তি ও জ্ঞানের পরিসীমা বাস্তবিকই বিস্ময় উদ্রেক করে। আরো প্রশংসার বিষয় এই যে, গ্রন্থের মূলভাব, সমগ্র গ্রন্থটির ভাগ, বিভাগ এবং কোন্ কোন্ ভাগে কী কী শাস্ত্র, পুরাণ, উপ-পুরাণ থেকে বিষয়সমূহ গৃহীত হবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা রাজনারায়ণ করে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্র-

১. বাংলা অনুবাদ রাজনারায়ণ-কৃত।

২. রাজনারায়ণ বসু, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত", 'দাসী' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ৬৪৭

নাথকে। বেদান্ত-উপনিষদাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠের পর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি নির্ণয়ে দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই ছিলেন চিন্তিত। এমন সময়ে রাজনারায়ণের এই মহৎ ইচ্ছা তাঁকে পথের সন্ধান দেয়: "ইহার প্রথমভাগে ব্রাহ্মপ্রতিপাদক শ্লোকসকল থাকিবে। এই সকল শ্লোক কেবল বেদান্তদর্শন হইতে না লইয়া সমস্ত শ্রুতি হইতে সংগ্রহ করা উচিত, কারণ বেদান্তদর্শনকে অন্যান্য হিন্দু দার্শনিকেরা এবং সাকারবাদী অনেক পণ্ডিত ধর্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রুতিকে একান্ত প্রামাণিক বলিয়া ভারতবাসী সমগ্র হিন্দু স্বীকার করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ব্রাহ্মধর্মের মত সকলের সমর্থন জন্য হিন্দু-দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস হইতে ঈশ্বর-বিষয়ক বচনসকল উদ্ধৃত হইবে। ইহার তৃতীয় অর্থাৎ শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুগণের নীতিবিষয়ক শ্লোকসকল সরল তাৎপর্যের সহিত প্রকাশিত হইবে। এই সকল শ্লোক সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আহৃত হইবে এবং এই শ্লোকসমূহ সৌন্দর্যে এবং সারবত্তায় মহাত্মা যীশুখৃষ্টের স্বর্গীয় বচন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হউক ত সমকক্ষ হইবে।"[১]

যাই হোক, উক্ত গ্রন্থ রচনার চেষ্টা তারপর থেকেই চলতে থাকে। অবশেষে ১৮৪৮ সালের একটি শুভদিনে অকস্মাৎ দেবেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের কিছু বচন লিপিবদ্ধ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। এইভাবে সংকলন হতে থাকে; সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি তেরো বছর পরে তাৎপর্যসমেত প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার পূর্বেই 'সংস্কৃত অন্বয়মুখীন টীকাসহ' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০ সালেই। একাধারে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনার ও রাজ-নারায়ণের ধীশক্তির বিচিত্র প্রকাশ এই গ্রন্থখানি। প্রাচীন উপনিষদের ঋষিদের মতো মহর্ষি তাঁর জীবনের সত্যানুভূতিকে সেই ঋষিদেরই ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থটি রচনায় রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের অধিকাংশ তিনি সংশোধন করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত অংশ উল্লিখিত হয়েছে: "রাজনারায়ণ বসু-কৃত সংশোধনে দেবেন্দ্রনাথ এত প্রীত হন যে, অতঃপর প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্য লইয়া প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ করা হয়।" এতদ্ব্যতীত অনেক

---

১. রাজনারায়ণ বসু, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত", 'দাসী' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ৬৪৮

শ্লোকের তাৎপর্যও তাঁরই রচনা। বলা বাহুল্য, রাজনারায়ণ কর্তৃক লিখিত তাৎপর্যই দেবেন্দ্রনাথ সমধিক পছন্দ করতেন ; এবং উক্ত কর্মে তাঁর আস্থা ছিল প্রবল। তাৎপর্য রচনায় রাজনারায়ণ একা ছিলেন না, অক্ষয়কুমার দত্ত ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এ কাজে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। উক্ত বিষয় সম্পর্কে রাজনারায়ণের স্বহস্তলিখিত বিবরণটি এইরূপ : "প্রথম ভাগের তাৎপর্য মহর্ষি, অক্ষয়বাবু ও আমার দ্বারা লিখিত হয়।"[১] রাজনারায়ণের সহযোগিতায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ২৭ পৌষ [১৭৭৫ শক] এক পত্রে জানিয়েছিলেন : "ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য লেখা অতি গুরুতর কর্ম্ম তাহার সন্দেহ কি ? তুমি তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। যদিও তোমার সময় অল্প তথাপি ক্রমে ক্রমে লিখিবে ;—শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অধ্যায় সকলের তাৎপর্য্য অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু অচিরাৎ মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাহার যে যে শ্লোকে যে যেভাব তোমার উদয় হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে।"[২] এইভাবে মহর্ষি পত্রে রাজনারায়ণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ও তাৎপর্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজেও তাৎপর্যের কিছু কিছু রচনা করে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণের কাছে পাঠাতেন ; এবং সেগুলি রাজনারায়ণ-কর্তৃক সংশোধিত ও মন্তব্যপূর্ণ হয়ে আসত। তার প্রমাণ রাজনারায়ণকে লিখিত মহর্ষির এই পত্রটি[৩] : "ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য দেখিয়া তোমার মন হইতে যে সকল মিষ্ট ভাব উঠিয়াছে তাহা তোমাতেই আছে, তাহা আর অন্যত্র আমি প্রাপ্ত হই না। বিশেষতঃ "প্রাণোহ্যেষঃ"[৪] এই শ্রুতিতে যে তাৎপর্য্য অধিক করিয়া দিতে লিখিয়াছ তাহা

---

১. 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত', 'দাসী' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ৬৪৮

২. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩৭

৩. কলকাতা থেকে পত্রটি লিখেছিলেন ৫ আশ্বিন, ১৭৭৪ শকে। দ্র. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩

৪. প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদারং বরিষ্ঠঃ। ৬॥৬॥
—ব্রাহ্মধর্ম্মঃ, তাৎপর্য্য সহিত, ১ম ও ২য় খণ্ড (১০ম সংস্করণ, ১৯৪৯), পৃ. ৭৪

অমূল্য। পরমেশ্বরেতে যাহার এ প্রকার মনের ভাব নাই তাহাকে কি তাঁহার উপাসক বলা যাইতে পারে?" এ হল প্রথম ভাগের কথা।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগও মহর্ষি রাজনারায়ণের পরিকল্পনা অনুসারেই করেছিলেন।..."দ্বিতীয় ভাগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মহাভারত, মহা-নির্বাণ-তন্ত্র এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে নীতি বিষয়ে উপদেশবাক্যসকল গৃহীত হইয়াছে।"[১] উক্ত ভাগ সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লিখিত হয়েছে যে "দ্বিতীয় খণ্ডের বচনসকলের সংকলনে ও তাহার তাৎপর্য রচনায় প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন।" কিন্তু রাজনারায়ণ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, "মনু হইতে সারসংগ্রহ আমি করিয়া দিই।...দ্বিতীয় ভাগের তাৎপর্য্য সকল অনেক দিবস পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দ্বারা লিখিত হয়।"[২] উক্ত গ্রন্থের 'অনুশাসন' নামক দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় রাজনারায়ণের পরিশ্রম ছিল অসাধারণ।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের ষোলটি অধ্যায়ের মোট ছাপ্পান্নটি শ্লোক মনুসংহিতার মূল শ্লোকের মর্মানুবাদ; মর্মানুবাদ করেছিলেন রাজনারায়ণ। এবং দুটি খণ্ডের বেশির ভাগ শ্লোকের তাৎপর্য যে তাঁর দ্বারাই লিখিত, তার প্রমাণ রয়েছে দেবেন্দ্রনাথের উক্তিতে; এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। এদিকে তাৎপর্য রচনাতেও মহর্ষি যে রাজনারায়ণের ওপর কতখানি আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তাও পূর্বোল্লিখিত পত্র থেকেই অনুমান করা যায়। প্রথম উদ্যমে মহর্ষি লিখেছিলেন 'ব্যাখ্যান'। পরে রাজনারায়ণের হাতে পুনর্লিখিত হয়ে 'তাৎপর্য' নামে অভিহিত হয়েছে।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা আছে। রাজনারায়ণের নির্দেশ-মতো দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথম খণ্ডের ষোলোটি অধ্যায়েরই শ্লোকের মূল অংশ গ্রহণ করেছেন উপনিষদ্ থেকে। "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথমভাগে ঈশ্বরের লক্ষণ এবং তাহার সঙ্গে যোগ এবং তাহার উপাসনা বিষয়সকল উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।" অধিকন্তু প্রথম ভাগের (খণ্ডের) নামকরণ করেছেন 'উপনিষদ্' বলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাজনারায়ণের নির্দেশ এখানে

১. "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত", 'দাসী' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ৬৪৮

২. তদেব

অনুসৃত হয় নি। কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যায় 'শ্রুতি' বলতে রাজনারায়ণ মূল উপনিষদ্‌ই বুঝিয়েছেন ; এবং 'বেদান্তদর্শন' বলতে তিনি 'শঙ্করভাষ্যে'র কথাই বলেছেন। 'বেদান্তদর্শন' অপেক্ষা 'শ্রুতি' থেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন রাজনারায়ণ ; এর কারণ পূর্বোল্লিখিত ইংরেজী পত্রের বাংলা অনুবাদেই বিবৃত করেছেন তিনি নিজে। এর প্রচ্ছন্ন কারণ যা আমাদের অনুমিত হয়, তা হল উপনিষদের শঙ্করভাষ্যে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রধানদের আস্থা ছিল না। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগে রাজনারায়ণের নির্দেশ যথাযথ অনুসৃত হয়েছে।

এইভাবে রাজনারায়ণের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাবোধজাত ব্রাহ্মী-উপনিষদ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচিত হয়। ব্রাহ্মধর্মের কৈশোরেই উক্ত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হল উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়।

ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী আন্দোলন বেদের অপৌরুষেয়তাবাদ খণ্ডন নিয়ে ভক্তির পরিবর্তে অক্ষয়কুমারের কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের অবতারণায় দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বেদান্ত অভ্রান্ত কি না, শুধুমাত্র এই প্রশ্নই নয়, বেদান্ত ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হবে কি না— এই বিষয়েও দেবেন্দ্রনাথ একালে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সমাজে এই নিয়ে বাদানুবাদ চলে দীর্ঘদিন। এর জন্য মহর্ষি যেমন প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, তেমনি রাজনারায়ণের সঙ্গে আলোচনা-দিতেও উপকৃত হয়েছেন।

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের পরিপূর্ণ রূপের জন্য মহর্ষি একটির পর একটি বিষয়ের জটিলতা, অস্পষ্টতা ও মতদ্বৈধতা দূর করে নির্দিষ্ট একটি রূপ স্থির করে গেছেন ; এবং এই প্রতিটি বিষয়েই রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁর অন্যতম সহকর্মী। উক্ত ধর্ম ও সমাজের পরবর্তী প্রচেষ্টা কর্ম ও জ্ঞান— এই দুয়ের মধ্যে একটিতে নির্ভরশীল হওয়া। ব্রাহ্মধর্মবীজের দ্বারা মহর্ষি এই সমস্যার সমাধান করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরকে প্রীতি করে তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করে যাওয়া— এই-ই প্রকৃত উপাসনা। সুতরাং উপাসনার নিমিত্ত সংসারকর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। আবার ঈশ্বরকে প্রীতি করতে গেলে মানবের ঈশ্বরস্বরূপ অবগত হওয়া বিধেয়। পরন্তু সে জ্ঞানের ভিত্তি ভক্তিভাবে স্থাপিত হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। অতএব শুধুমাত্র জ্ঞান নয়, শুধুমাত্র কর্ম নয় ; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ভিত্তি হল ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত ভিত্তিভূমি। মহর্ষির পরে রাজনারায়ণও এই তিনটি পথের সমন্বয়ের কথা বারবার বলে গেছেন।

ভগবদ্‌গীতার সারমর্ম[১] ব্যাখ্যাতেও তিনি এই বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং গীতোক্ত এই মর্মকথা তাঁর অন্তরস্বীকৃত সত্য।

দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ উভয়ের পরবর্তী কর্ম ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে সহজ জ্ঞান বা, আত্মপ্রত্যয়ের (Intuition) ও যুক্তির (Reason) উপযোগিতা নির্ধারণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমতাদির দ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করে উভয়ে আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রাজনারায়ণ ধর্মতত্ত্বদীপিকা গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'উপক্রমণিকা' ও 'প্রথম অধ্যায়ে' আত্মপ্রত্যয় (Intuition) ও যুক্তির (Reason) স্বরূপ এবং দুয়ের ভিত্তিতে ঈশ্বরতত্ত্বসংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে মহর্ষির অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হলে তিনি (মহর্ষি) তাঁর অভিমত[২] জানিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও রাজনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরামর্শ ব্যতীত মহর্ষি ধর্মদর্শনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশে যে সাহসী হতেন না, তা রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র থেকেই জানা যায়: "তোমার সহিত অচিরাৎ সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমার দুর্ব্বল লেখনী মনের ভাব প্রকাশ করিতে যথোচিত যত্ন করিয়া এইটুকু নির্গত করিলেন; ইহাতে তোমার নয়ন নিপাত হইলে ইহার পরিশ্রম সার্থক হয় এইমাত্র উৎসাহ।"[৩]

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের কর্ম নিয়ে যখন উভয়ে খুব ব্যস্ত, তখন অকস্মাৎ দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হলে, তিনি অপৌত্তলিকভাবে পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। এর দ্বারা হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার প্রচণ্ড আঘাত দেবেন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই সংকটকালেও তাঁর পাশে ছিলেন পরম সুহৃদ রাজনারায়ণ। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষের[৪] মসীযুদ্ধে তিনি (রাজনারায়ণ) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এইকালে রাজনারায়ণ অবস্থান করছিলেন মেদিনীপুরে।

---

১. ১০ চৈত্র, ২২ মার্চ (১৮৮৮ খ্রীঃ)— তারিখের দিনলিপিতে গীতার সারমর্ম-প্রসঙ্গে বলেছেন "যোগী হইয়া কর্ম করার প্রধান লক্ষণ নিষ্কামভাবে কর্ম করা।...জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য।"

২. দ্রষ্টব্য: প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ১৫

৩. চন্দননগর থেকে ৭ আষাঢ় ১৭৭৭ শকে পত্রটি লিখিত ৪। দ্র. 'পত্রাবলী' পত্র ১৫

৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞাতিপুত্র (প্রসন্নকুমার ঠাকুর) ও রাজনারায়ণের সহপাঠী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 'Justicia' এই ছদ্মনামে পত্রিকা মারফৎ তাঁকে (দেবেন্দ্রনাথকে) শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে আক্রমণ করেছিলেন।

একালের এই-সমস্ত ঘটনা নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। মহর্ষি রাজনারায়ণকে এইসময় যে পত্রগুলি (১৭৮৬ শক, ১২ শ্রাবণ ও ১৭৮১ শক, ৬ ফাল্গুন) লেখেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর ব্যথা-ভারাক্রান্ত অন্তরের পরিচয় ফুটেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁকে সহযোগীরূপে এই দুঃসময়ে কাছে পাওয়ার একান্ত ইচ্ছাও প্রকাশিত হয়েছে : "এইক্ষণে তোমার অভাব কেবল বোধ হইতেছে, এ সময়ে তোমার বিশেষ সাহায্য পাইলে ধর্ম্মের আরও কত প্রাদুর্ভাব হয়। আমরা দুইজনে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে সে প্রকার ধর্ম্ম প্রচারে বল পাওয়া যায় না।" আর একটিতে—"এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া রহিয়াছি।" মহর্ষি যে ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের সকল প্রকার কাজের জন্য রাজনারায়ণের উপর কিরূপ নির্ভরশীল ছিলেন পত্রের ভাষাতেই তা অনুমিত হয়।

একসময় কেশবচন্দ্রের খ্রীস্টভক্তি ও খ্রীস্টধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য লক্ষ্য করে দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত ও হতাশ হয়েছিলেন। পরধর্মের প্রতি এইরূপ অনুরক্তিকে কটাক্ষ করে লেখনী ধারণ করেছিলেন বিদেশীয় একেশ্বরবাদী চার্লস ভয়সী।[১] সেকালে ব্রাহ্মধর্মের মান রক্ষার জন্য দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই উক্ত সমাজের পক্ষ থেকে একমাত্র রাজনারায়ণের লেখনীকেই যোগ্য মনে করেছিলেন। এই মর্মে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ : "তুমি সভাপতি রূপে আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সির উপদেশের সহানুভূতি করিয়া যদি এক পত্র তাঁহাকে লেখ, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মান যে রক্ষা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[২]

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনার সমসাময়িককাল থেকেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আচরণীয় নিয়ম-কানুনগুলি অনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। এই কাজে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন রাজনারায়ণ। প্রধানত মহর্ষির প্রভাবে রাজনারায়ণও চিন্তা করেছিলেন যে, হিন্দু-সমাজমন থেকে

---

১. দ্রষ্টব্য 'রাজনারায়ণ ও শিক্ষিত সমাজ' অধ্যায়।

২. সাল-তারিখবিহীন পত্রটি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'পত্রাবলী'র ৮৮ নং পত্র। দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত পত্রটি থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের সংবাদ পাওয়া যায়। পত্রে দেবেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন : "আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সিকে এই বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যদি এক পত্র লিখেন ত ভাল হয়।"

খ্রীস্টধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের ভাব শিথিল করতে গিয়ে তাঁরা যে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, সেই ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নিয়মাধীন হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মানুষ্ঠান পরস্পর বিপরীতমুখী। ঈশ্বরকে প্রীতি করা উচিত— এ কথা যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে ধর্মজ্ঞ হয় বটে, কিন্তু তাতেই ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা প্রেমসর্বস্বতার শক্তি জেনে মানুষ যখন তার পূজার্চনা করে তখনই প্রকৃত অনুষ্ঠান হয়। অতএব অনুষ্ঠানের মূল থাকে অন্তরেই। মানুষের এই অন্তরভাব একসময় এত উন্নত হয় যে, কেবল তা চিন্তাতে বদ্ধ করেই মানুষ তৃপ্ত হয় না, তা কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায়। জীবনের এই উপলব্ধি-গত সত্যের ভিত্তিতেই ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করতে চাইলেন রাজনারায়ণকে অন্যতম সহায়করূপে গ্রহণ ক'রে।

ক্রমে মহর্ষি-কর্তৃক দীক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন, প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত, উপাসনা-প্রণালী বিধিবদ্ধকরণ ও ব্রহ্মস্তোত্র সংকলন প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত হয়। কারণ, মহর্ষি মনে করতেন 'কোন কার্য্যই বিধিপূর্ব্বক না করলে তাহার কোন ফল হয় না।'[১] মহর্ষি নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের (১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ) পর থেকে সমাজে এই দীক্ষাগ্রহণের নিয়মের প্রথম প্রচলন হয়। এরপর 'ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে বিধিপূর্বক গৃহীত হয়, যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হয়,'— এই-সমস্ত চিন্তা করেই মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন। অবশ্য প্রথম রচিত প্রতিজ্ঞাপত্র বহুবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হওয়ার পর স্থির হয়। রামমোহন-স্থাপিত ব্রহ্মসভায় কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা ছিল বেদপাঠ ও সংস্কৃত গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রের[২] কিঞ্চিৎ সংশোধন করলেন। এবং পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত উপনিষদোক্ত

---

১. 'আত্মজীবনী', ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৩

২. প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রথমে ছিল, "'প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব' এই কথার পরিবর্ত্তে এই হইল যে, 'প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব'।"— 'আত্মজীবনী', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৮-৪৯

দুটি মহাবাক্য এবং স্তোত্রের জন্য মহানির্বাণ তন্ত্রের চারটি শ্লোক মহর্ষি-কর্তৃক একইকালে নির্ধারিত হয়। ব্রাহ্মধর্মের মূলভাবও মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মবীজের দ্বারা প্রকাশ করেন।

ক্রমে ক্রমে এগুলির অনেক পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল ; এবং এই কর্মে রাজনারায়ণ-কৃত প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মহর্ষি প্রহৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে উভয়ের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মরূপে পরিগণিত হয়েছিল ১৮৬০ সালের মধ্যেই।

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের নিয়মকানুন সংস্কারের সমসময়ে আরো কিছু পরিবর্তন সাধনের কথা দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন এবং রাজনারায়ণের সৎ পরামর্শেই যে তিনি এগুলি সম্পাদন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটি হল, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিদিন এক এক সময়ে উপাসনাপাঠ শিক্ষা দেওয়া ; কারণ আচার্য-উপাচার্যের সঙ্গে সাধারণ লোক সংস্কৃতের 'অসম উচ্চারণ' দ্বারা উপাসনাস্থলে ব্যতিক্রম পরিবেশ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় হল, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ। উচ্চধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পাঁচদিন পূর্বে উপাচার্যকে পত্র দ্বারা জানানো এবং তাতে আপনার নাম, ধাম, ঠিকানা, পিতার নাম, বয়স ইত্যাদি উল্লেখ করা এবং তারপর যে-কোনো সমাজে এসে উপাচার্যের উপাদেশানুসারে নিয়মপালনপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করা।

যদিও রাজনারায়ণ এই সময় মেদিনীপুরে থাকতেন তবু দেবেন্দ্রনাথ উক্ত প্রত্যেকটি বিষয় পত্রাদিমারফত রাজনারায়ণের কাছ থেকে জেনে নিতেন। এমন-কি, তত্ত্ববোধিনীতে কোন্‌টি প্রকাশের যোগ্য-অযোগ্য, সে সম্বন্ধেও মহর্ষি রাজনারায়ণের অভিমতের প্রত্যাশা করতেন। এইভাবে রাজ-নারায়ণের পূর্ণ সমর্থনেই দেবেন্দ্রনাথ অভীষ্ট কর্ম সম্পাদন করেছেন ; তার দৃষ্টান্ত রয়েছে দুটি পত্রে— ১৭৮১ শকের ৬ ফাল্গুন কলকাতা থেকে মহর্ষি রাজনারায়ণকে লিখেছেন : "গত সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে যে বক্তৃতা স্তোত্র পঠিত হইয়াছিল তাহা তোমার অবশ্যই মনোনীত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহা যাহাতে সকলের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে প্রচার হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের ইহাই উদ্দেশ্য।"[১] দ্বিতীয় পত্রে লিখলেন : "গত পত্রিকাতে সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় -বিষয়ক প্রস্তাব অবশ্য দেখিয়া থাকিবে। তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের মূল পত্তন কি

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২০

তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তোমার মনোনীত হইয়া থাকিবে।"[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রণয়নেও রাজনারায়ণ ছিলেন মহর্ষির দক্ষিণহস্তস্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের অন্য আচরণবিধি নির্দেশের উদ্দেশ্যে মহর্ষি যে 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' রচনা করেন তাতেও রাজনারায়ণের প্রভূত দান আছে। সামাজিক অনুষ্ঠান-কর্মে ব্রাহ্মদের কী নিয়ম পালন করা উচিত তৎসম্বন্ধে মহর্ষির খুব সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। 'অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে' সেই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই অভিমতাদি গঠনে তরুণ রাজনারায়ণের বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা মহর্ষি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। অপৌত্তলিক ও আদর্শনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হলেও সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে প্রাচীন হিন্দুদের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা তিনি বার বার বলেছেন। রাজনারায়ণ এবং দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই মনে করতেন যে ঈশ্বরবিশ্বাসে ও শাস্ত্রভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম সুবৃহৎ হিন্দুধর্মেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। অতএব ব্রাহ্মদের পক্ষে হিন্দু-পদ্ধতি অবলম্বন করা সমীচীন ও সংগত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মেও এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। তাঁরা মনে করতেন কেবলমাত্র বহুদেবতাবাদ বর্জন ও পৌত্তলিকতা পরিহার করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। পরন্তু রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যপ্রীতি এত প্রখর ছিল যে তিনি ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানগুলিকে পৌত্তলিকতা-বর্জিত অথচ জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করেছিলেন।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে জাতকর্ম, নামকরণ, বিবাহ, উপনয়ন, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি কর্ম দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু অনুষ্ঠানগুলির ভিত্তিতে ও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শানুসারে কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করে নিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে যে পত্র[২] লেখেন, তার মধ্যে সামাজিক পদ্ধতি প্রবর্তন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট: "পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতেও আমরা সম্মত নহি। পূর্ব্বপুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২১। কলকাতা থেকে ২৪ চৈত্র ১৭৮১ শকে লিখিত।

২. তদেব, পত্র ২৯। পত্রটির রচনাকাল ১৩ মাঘ ১৭৮৪ শক।

নির্দ্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। প্রচলিত প্রথাকেই পৌত্তলিকতা বলা [যুক্তি]যুক্ত হয় না।" ঐ একই পত্রে দেবেন্দ্রনাথ আরো জানালেন : "আমরা পূর্ব্বপুরুষের নির্দ্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই গ্রহণ করি..." মহর্ষির উক্তিতে এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে হিন্দু পদ্ধতির বিরুদ্ধতা নয়, স্বীকরণ ও সংস্কারই ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য। তাঁর মতে বিচারাধীন অন্ধ বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকতার সংস্রবশূন্য হলেই হিন্দুরীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। রাজনারায়ণও তাঁর এইপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করেছেন : "আমরা কেবল এইমাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ।"[১]

ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি এই কয়েকটি বিষয়ের নিয়মাবলী উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয়। উভয়ে চিন্তা করেছিলেন যে অনুষ্ঠানগুলি যখন হিন্দুসমাজের পালনীয়, তখন ব্রাহ্মকেও এই-সব পালন করতে হবে ; তবে নূতনভাবে ভাবিত হয়ে, প্রথা বলে নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিলেন তৃতীয়া কন্যার (সুকুমারী) বিবাহ উপলক্ষে। ব্রাহ্ম-বিবাহ পদ্ধতি আইনসম্মত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে বিবাহ বৈধকরণে পাত্র-পাত্রীকে নিরীশ্বরবাদের অঙ্গীকার করতে হত। ব্রাহ্মবিবাহের সাক্ষী একমাত্র জগৎপিতা ঈশ্বর। সেইজন্য রাজনারায়ণের পরামর্শে ব্রাহ্ম বিবাহ-অনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজের সেই অংশগুলি মাত্র গ্রহণ করা হয়েছিল যেগুলি 'বিবেক ও সত্যের অনুমোদিত' এবং পৌত্তলিকতাবর্জিত। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক অংশ বর্জিত হলেও অন্যান্য অংশ গৃহীত হয়েছিল। বিশেষত, হিন্দুবিবাহের সপ্তপদী ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিতে সাদরে অনুমোদিত প্রথা। রাজনারায়ণ লিখেছেন : "এই রীতিটি এরূপ মনাকর্ষক এবং সুন্দর যে সিবিল-বিবাহ পদ্ধতির প্রণেতা অনারেবল্ ফিট্স্ জেম্‌শ ষ্টিফেন সাহেব ইহা ইংরাজ-সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।..."[২] তবে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি আহুতি, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি হিন্দু বিবাহরীতির পৌত্তলিক অংশ বর্জিত হয়েছিল।

---

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৫০

২. "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত", 'দাসী' পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৪, পৃ. ৬৫৩

বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দুপ্রথার 'জামাই-বরণ' অনুষ্ঠানটি রাজনারায়ণ ব্রাহ্মবিবাহ-বিধিতে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তবু মনে সংশয় ছিল যে, মধুপর্ক, আসন, অঙ্গুরী, বস্ত্রাদির দ্বারা জামাতাকেই প্রকৃত অভ্যর্থনা করা বুঝায়— না উক্ত দ্রব্যগুলির পূজা বুঝায়। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের সংশয় নিরসন ক'রে উক্ত প্রথা ব্রাহ্মসমাজে চালু হতে পারে বলে মত[১] প্রকাশ করেন। বিবাহানুষ্ঠানে দাম্পত্যবন্ধনের সাক্ষীরূপে শালগ্রাম শিলাকে রাখাই হিন্দুরীতি ; নিঃসন্দেহে এ রীতি পৌত্তলিক। এবং কোনো ব্রাহ্ম এ-রীতি গ্রহণ করলে মহর্ষি যে রুষ্ট হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী। রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার বিবাহ প্রসঙ্গে হিন্দুরীতি অবলম্বনের প্রশ্ন উঠলে মহর্ষি পত্রে রোষ প্রকাশ করেছিলেন : "…তুমি কেমন করিয়া সম্প্রদান-শালাতে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের স্থানে ক্ষুদ্র অযোগ্য সৃষ্ট বস্তু আনিয়া পবিত্র হৃদয়ে প্রাণ-প্রতিমা স্বর্ণলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন করিবে। ইহা আমার অত্যন্ত শোচনার বিষয় হইয়াছে। … সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে ?…"[২] এইভাবে উভয়ের তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা ও পরিশেষে পরস্পরের অনুমোদনক্রমে ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক অংশ একেবারে বর্জিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রের (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৬) কথা আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি : "তুমি যথার্থ লিখিয়াছ যে, আমারদিগের ক্রিয়াগুলিন সংখ্যায় যত অল্প ও প্রণালী যত আড়ম্বরশূন্য হয়, অথচ মনের ভাবসূচক হয়, ততই ভাল।"[৩] হিন্দুদের মধ্যে জামাইষষ্ঠী পরিবারের পক্ষে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পৌত্তলিকতাবর্জিত এই অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণের আগ্রহকে মহর্ষি সমর্থনই করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : "জামাই ষষ্ঠীতে জামাতাকে আদরের সহিত

---

১. কলকাতা থেকে একটি পত্রে (১৩ মাঘ ১৭৮৪ শক) তিনি লিখেছিলেন :"… ব্রাহ্মবিবাহে বরকে অঙ্গুরী আদি দিয়া অভ্যর্থনা না করিলেই যে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবেক না, এমত নহে। যদি তুমি বরকে অভ্যর্থনা না করিয়া তাহাকে কেবল কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা করিবে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মের আপত্তি নাই।"— প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২৯

২. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২৭। কুমারখালি শিলাইদহ থেকে দেবেন্দ্রনাথ পত্রটি লিখেছিলেন ৩১ ভাদ্র ১৭৮০ শকে।

৩. তদেব, পত্র ৫৯

খাদ্য সামগ্রী দেওয়াতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, ইহাতে মনের প্রীতি-ভাবই প্রকাশ করা হয়। এ প্রণালী রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।"[১] হিন্দু পরিবারের জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে ষষ্ঠী নাম্নী এক শক্তি দেবতার পূজা হয়ে থাকে। পূজার এ পৌত্তলিক অংশ বর্জন করে বাকী অনুষ্ঠানটি রক্ষা করার পক্ষে মহর্ষি ও রাজনারায়ণ উভয়েই সম্মতি দিয়েছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে যে নিয়মগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল, সেগুলি মহর্ষি এবং রাজনারায়ণের জীবন দ্বারা অনুভূত সত্য।

জাতিভেদ প্রথা ও উপবীত ধারণের রীতি সম্বন্ধে মহর্ষি ও রাজনারায়ণের মধ্যে প্রথমে মতপার্থক্য ছিল। এ-সম্পর্কে রাজনারায়ণের অভিমত হল এই যে, "…পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না।… আমরা কেবল এইমাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে…।"[২] কিন্তু যেহেতু উপবীত ধারণ করার সঙ্গে জাতিভেদের প্রশ্ন আসে, সেজন্য মহর্ষি রাজনারায়ণের অভিমত একেবারেই স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল যে ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে এই রীতি বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ উপাচার্যের আসন গ্রহণ করার রীতি ছিল। সেখানকার নিয়ম বজায় রাখা, আবার ব্রাহ্মণ উপাচার্যে যাঁদের আপত্তি তাঁদের মনোরঞ্জন করা না-করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একালে মহর্ষির মানসিক দ্বন্দ্বের অবধি ছিল না। একখানি পত্রে লিখলেন, "ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্মসম্মত নহে।"[৩] অথচ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহর্ষির কাছে দীক্ষা নিয়ে উপবীত ধারণ সম্বন্ধে অভিমত চাইলে মহর্ষি উপবীত ধারণের পক্ষেই মত দিলেন।[৪] রাজনারায়ণ শ্রাদ্ধ ও বিবাহ পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে মহর্ষি খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখলেন: "আপনার অভিপ্রায় মতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের পদ্ধতি পরিবর্তন

---

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, 'পত্রাবলী', পত্র ৫৯। কলকাতা থেকে ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৬ শকে লিখিত।

২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ১৫০

৩. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩৮।—কলকাতা থেকে ৮ মাঘ ১৭৭৫ লিখিত।

৪. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অমৃতলাল সেনগুপ্ত -প্রণীত, 'শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী: সাধনা ও উপদেশ' (৩য় সংস্করণ, ১৩২৭), পৃ. ৬৭-৬৮

করিতে হয়।… কেবল পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলে হয় না, জাতিভেদও উঠাইয়া দিতে হয়।… যদি আপনার মতে শ্রাদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আপনার মতে অবশ্য অন্নপ্রাশনেরও পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়… যদি ব্রাহ্ম-দিগের উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ কোথায় থাকে যে, বিবাহের সময় জাতিভেদ করা যায়।… কেবল পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকা যায় না, তাহা হইলে জাতিভেদও ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।"[১] প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এঁরা উভয়েই সমাজসংস্কারক হলেও ধর্মসংস্কারই ছিল এঁদের প্রাথমিক কর্তব্য।

ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সামাজিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি গঠনের প্রথম অবস্থায় জাতিভেদের প্রশ্ন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের প্রশ্ন, বিবাহানুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিষয় মহর্ষিকে বোধকরি সত্যপথ নির্ধারণে বিচলিত ও সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছিল। এই সময়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত দেবেন্দ্রনাথকে ভ্রম নিরসনে সহায়তা করেছিলেন রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ-প্রতিভার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে ও বন্ধুকৃত্য আজীবন স্মরণ রেখে দেবেন্দ্রনাথ এই গভীর বন্ধু-প্রীতি ও শ্রদ্ধার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। উপনয়ন সংস্কারকে বিশুদ্ধ বৈদিক অনুষ্ঠান-রূপে রাখবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী ব্রাহ্মবালককে গুরুর কাছে নিয়ে আসা হত। রাজনারায়ণ উপনয়ন প্রথা ও উপবীত ধারণের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের আভিজাত্য উপলব্ধির সংস্কারকে বর্জন করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও উপবীত গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হল। বলা বাহুল্য, মহর্ষির পুত্রদ্বয়ের (সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপনয়ন সেই নিয়মানুসারেই হয়েছিল। উপনয়ন সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মতামত পরে হয়তো কিছু পরিবর্তিত হয়। তিনি মনে করেছিলেন যে, যে-কোনো ব্রহ্মোপাসক উপবীত ধারণের অধিকারী। ব্রহ্মবোধে ব্রাহ্মণ্যদেবের উপাসনায় ব্রাহ্মণ্য-বৃত্তির উদ্‌বোধন ঘটে এবং গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ও উপবীত ধারণের অধিকার জন্মে। মনে হয় তিনি মহর্ষিকে এ কথা লিখেছিলেন। নতুবা মহর্ষি এ-প্রশ্ন তুলবেন কেন? তিনি মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে কলকাতা থেকে ১৫ মাঘ, ১৭৭৫ শকে লিখেছিলেন: "ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দেওয়া বড় নূতন কথা লিখিয়াছ। বড় কুতূহলজনক। আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করিতে ব্যগ্র;

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩৮

তুমি ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"[১]

এ প্রসঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানের রীতির কথা মহর্ষি বিশদভাবে বলেছেন। পারিবারিক রীতি বর্জনের উপদেশ তিনি দেন নি। শবদাহান্তে আত্মীয়বর্গ আপন পরিবারের প্রথামত শোকচিহ্ন ধারণ করবে, তবে সংকারের ব্যবস্থাটি অনাড়ম্বর ও ভাবব্যঞ্জক হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু-সংকারে শবের স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও পিণ্ডদানাদি নানা কার্যের নির্দেশ আছে; 'ক্রব্যাদাগ্নয়ে স্বাহাঃ' বলে 'সপ্ত কাষ্ঠ' নিক্ষেপ করতে হয় এবং 'সপ্তবার পরিক্রমা' করে 'উত্তরাস্য' হয়ে মুখাগ্নি করতে হয়। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের নিয়মকে সরল করা হল রাজনারায়ণের পরামর্শে। শবদেহকে গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদন করতে হবে এবং পাদদেশে অগ্নি স্পর্শ করাতে হবে, আর সেই সময়ে অগ্নিপ্রদাতা উত্তরাধিকারী বাজসনেয়সংহিতা থেকে নির্বাচিত একটি মন্ত্র পাঠ করবেন। এই অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যের দিক থেকে সর্বাংশে হিন্দু অনুষ্ঠানের মতো; তবে পদ্ধতি বেশ সরল ও আড়ম্বরশূন্য। রাজনারায়ণের প্রজ্ঞাসম্মত উপদেশে মহর্ষি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানকে বেশ অর্থবহ করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এতদিন ধরে (প্রায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষাপদ্ধতি, উপাসনা ও সাধন প্রণালী, ব্রাহ্মধর্মের ধর্মপুস্তক প্রণয়ন, ব্রাহ্ম-ধর্মসম্প্রদায়গঠন ইত্যাদি কার্য সমাধা হয়। এই-সমস্ত কর্মে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের প্রভূত সাহায্য লাভ করলেও, এই কয়েক বছর তাঁর যে কিরূপ দুশ্চিন্তা ও সংকটের মধ্যে কেটেছে, দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' পাঠে তা জানা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতিতে মহর্ষি ভক্তিধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ এই ব্যাপারেও তাঁর যোগ্য সহায়ক ছিলেন। ১৮৫০ সালের সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে মহর্ষি আর্চবিশপ ফেনেলনের ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ অনুমোদন করেন। উক্ত স্তোত্র বাংলায় অনুবাদ করেন রাজনারায়ণ। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীর সংস্কার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন: "ব্রাহ্মসমাজ সর্বাগ্রে সৃষ্টিকার্যে প্রদর্শিত ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা ব্যাখ্যা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ঈশ্বর প্রেমের বড় ধার ধারিতেন না।... ১৭৭৫ শকাব্দায়

১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৩৯

কোন ব্রাহ্ম[1] তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতাতে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। শুষ্কতার মধ্যে ঈশ্বর প্রীতির সঞ্চার দ্বারা সমাজের মহোপকার সাধিত হইতে লাগিল।"[2] আত্মচরিতে রাজনারায়ণ বলেছেন যে ভক্তিধর্ম প্রবেশ করাবার দাবি তাঁরই। এ-কথাও তিনি বলেছেন যে ফারসী ভাষার জ্ঞানের জন্যই তিনি ঈশ্বর-প্রেমের সরস বক্তৃতা রচনা করতে পেরেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— উভয়ই ভালো ফারসী জানতেন। হাফিজ এবং সাদী উভয়েরই প্রিয় কবি ছিলেন। ফারসী ভাষার মাধ্যমেই উভয়ে সূফী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বাউল বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মে প্রেম ও ভক্তির গভীরতার ভাব যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই-সব সাম্প্রদায়িক পৌত্তলিক ধর্ম দ্বারা আকৃষ্ট হন নি। বিশেষত বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণের রূপককে রাজনারায়ণ পৌত্তলিক মনোভাব -প্রসূত এবং শালীনতার পরিপন্থী মনে করতেন। উপনিষদের একেশ্বরবাদের সঙ্গে সূফীধর্মের মৌলিক সাদৃশ্যই তাঁদের আকর্ষণের প্রধান কারণ। ইসলামের আধ্যাত্মিকতা সূফী মতবাদের ফলে অভিনবত্ব লাভ করে। সূফীরা একেশ্বরবাদী তো বটেই ; তদুপরি তাঁরা অদ্বৈতবাদীদের মতো বিশ্বাস করেন যে বিশ্বব্যাপী একটি মাত্রই অনাদি অনন্ত শক্তি বিরাজিত। তবু তাঁদের সাধন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃত ব্রাহ্মের অবিচল বিশ্বাস 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এবং 'আনন্দরূপমমৃতংযদ্‌বিভাতি'। এই বিশ্বাস সূফীধর্মের উপাসনায় এবং সূফী-কবিদের রচনায় প্রকটিত হয়েছিল বলেই মহর্ষি এবং রাজনারায়ণ সূফীদের মরমীবাদে মোহিত হন। এইভাবে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— এই দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্ম সাধক সূফী কবিদের ভাবরসে নিমজ্জিত হয়ে জ্ঞানমূলক যুক্তি-নিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমরসের অপূর্ব মাধুর্য সঞ্চার করলেন।

সূফীধর্মে ঈশ্বরপ্রেমের যে গভীরতা আছে রাজনারায়ণের ঈশ্বরপ্রীতিও ছিল অনুরূপ গভীর। মহর্ষির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার এও একটি প্রধান কারণ। ঈশ্বরপ্রেম মহর্ষির চিত্ত-সংস্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। আন্তরিকতার ঐক্যে রাজনারায়ণ সহজেই তা বুঝেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর লিওনার্ড সাহেবের কাছে লেখা একখানি পত্রে তিনি মহর্ষি সম্বন্ধে লিখেছেন :

১. রাজনারায়ণ নিজেকেই 'কোন ব্রাহ্ম' বলেছেন।

২. "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত"। দ্রষ্টব্য 'দাসী' পত্রিকা, নভেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ৫৯৮

"I found Debendra Babu as merry as a lark, constantly singing Brahmic songs, and reciting aloud passages from the Upanishads and verses from Hafiz, oftener the latter. Age, infirmity and worldly cares have not been able to damp his spirits. He realizes the sentiment in the Upanishads "Samodate modaniyamhi lavdhva". "Having obtained the cheerer, he is always cheerful." Hafiz says

"Harchand Ke pir O Khastadil O natowan shudam
chu eadetu bakunam jowan shudam"

"Howsoever I am old, sore in heart and feeble when I remember thee, I become young". Debendra Babu's nearsightedness and deafness are increasing. His principal doors of communication with the external world are being fast closed but he is as jovial in the Lord as could be ever."

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হল। কিন্তু রাজনারায়ণের এই অপ্রকাশিত পত্রখানির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে রাজনারায়ণ মহর্ষিকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন এবং কোন্ অনিবার্য বন্ধনে তিনি আজীবন মহর্ষির সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন।

ঐতিহাসিকের উক্তি মেনে নিয়ে বলা যায়, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মকে প্রাণবান করিয়াছিলেন।[১] রাজনারায়ণের এই কর্মোৎসাহ ও মানসিক উদ্দীপনাকে মহর্ষি বারবার জানিয়েছেন প্রাণের গভীর অভিনন্দন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের এত উন্নতি যে আমি দেখিতে পাইব তাহা ত আমার আশা ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে আশার অতীত ফল দেখিতেছি।"[২] লাহোর থেকে ১৭৮৯ শকের ২৪ চৈত্র আর-একটি পত্রে মহর্ষি রাজনারায়ণকে লেখেন: "ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার জীবনের পরিশ্রম, ইহার জন্যে তুমি শরীর দিলে, মন দিলে, তোমার মানমর্য্যাদা যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলে, ইহার পুরস্কার

১. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় ভাগ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৪

২. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৬১। পত্রটির রচনাকাল ২৩ চৈত্র, ১৭৮৬ শক, কলিকাতা।

ঈশ্বরের হস্ত হইতে নিয়ত পাইতেছ এবং অনন্তকাল পাইতে থাকিবে। তোমার হৃদয়ে তাঁহার করুণা তুমি অনুভব করিয়া সকলই সহ্য করিতে পারিতেছ।"[১] মহর্ষি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাজনারায়ণই ব্রাহ্মসমাজের সংকটে একমাত্র সুযোগ্য ত্রাণকর্তা হতে পারেন। রাজনারায়ণ তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের মূল্য দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ প্রথম জীবনে যতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন সবই ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের জন্য এবং প্রায় সবই মহর্ষির অনুমোদন-সাপেক্ষ। কোনো কোনো রচনা সংশোধনের জন্য মহর্ষির নিকট প্রেরিত হত।[২] 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা'—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, 'ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত', 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনায় মহর্ষির প্রচ্ছন্ন প্রভাব স্বভাবতই স্বীকার করতে হয়। 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থ সম্ভবত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচনার ইচ্ছা ছিল রাজনারায়ণের। পরিকল্পনা মহর্ষি-কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়াতে উক্ত পুস্তক দুটি খণ্ডে (ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক ও ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যান) রচনার মনস্থ করেন তিনি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম-দীপিকা অতি আবশ্যক, অতএব ইহা রচনা করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে, তাহার উৎকৃষ্টতার প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার অনেক নির্ভর করিবে।"[৩] এই কথা জানিয়ে মেদিনীপুরে পত্রটি লেখেন ১৭৭৬ শকের ৭ বৈশাখ। 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা'র প্রবন্ধগুলি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথকে। কিন্তু পত্রিকায় স্থানাভাববশত মহর্ষি এটি একেবারেই পুস্তকাকারে মুদ্রণের পরামর্শ দেন।

'ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্তে'র পরিকল্পনাও দেবেন্দ্রনাথের। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে

---

১. 'পত্রাবলী', পত্র ৬৫

২. রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে এই মর্মে ১২৯১ সালের (১৮৮৪ খ্রী) তথ্য দুটি উদ্ধৃত হল :

"১৮ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট, শুক্রবার (১২৯১ সাল, ১৮৮৪ খ্রী)— অদ্য প্রাতে নগেন্দ্র [চট্টোপাধ্যায়?] প্রত্যাগমন করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমি "নবজীবনে"র বিপক্ষে যে প্রস্তাব লিখি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

"১৯ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট, শনিবার— অদ্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় নূতন ধর্ম্মমত বিষয়ক প্রস্তাব সংশোধন করেন।"

৩. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৪০

মহর্ষির এইরূপ নির্দেশ ছিল : "ব্রাহ্ম সমাজের পুরাবৃত্ত তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগ— উপাসনা-প্রণালী স্থাপন, তৃতীয় ভাগ— অনুষ্ঠান প্রচলিত। এই তিন ভাগে প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত সকল কথা লেখা যাইতে পারে। তাহাতে দলাদলি জয় পরাজয়ের কথা না থাকে।"[১] বক্রোটা শেখর থেকে ১২ আশ্বিন, ১৭৯৬ শকে পত্রটি লেখা।

রাজনারায়ণের পুরাবৃত্তের পরিকল্পনাকে দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই অভিনন্দিত করেছিলেন: "এই একটি বড় অভাব ছিল, তাহা ঈশ্বর প্রসাদাৎ তোমার যত্নে মোচন হইল।... ইহা পাঠ করিয়া কত লোকের নূতন উৎসাহ প্রজ্জলিত হইবে, কত লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে শ্রদ্ধা জন্মিবে, কত লোকে অন্য লোককে এই মতে আনিতে প্রবৃত্ত হইবে, কত লোক আত্মাপহরণ দোষ পরিত্যাগ করিবার জন্য, পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব রাখিতে ঘৃণা করিবে।"[২]

রাজনারায়ণ 'সে কাল আর এ কালে'র পরিকল্পনার কথা জানালে মহর্ষি নিজের মত ব্যক্ত করেছিলেন; "এ প্রস্তাব আমোদজনক হইবে তাহার সন্দেহ নাই।"[৩] তা ছাড়া 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'র ইংরেজী অনুবাদ এবং 'Science of Religion' প্রবন্ধ বিলাতে মুদ্রিত করলে ভালো হবে বলে মহর্ষি মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'The Essential Religion' প্রবন্ধটিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করাতে মহর্ষির আপত্তি ছিল। তবে কিছু অংশ বর্জন করে পরে প্রবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশ করেন। এইভাবে সময় বিশেষে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের চিন্তাধারাকে সংস্কার করেছেন নির্মম হস্তে। এমন-কি, তাঁর জীবনের আদর্শস্বরূপ যে কতকগুলি মহাবাক্য ছিল— সময়ের ব্যবধানে তা পরিবর্তিত হলে শুভ-সংবাদ দিয়েছেন মহর্ষিকে। দেওঘর থেকে পত্রে[৪] (১৩ই বৈশাখ, ৫৮ ব্রাহ্মসম্বতে লিখিত) রাজনারায়ণ এই 'মহাবাক্য'-

---

১. 'পত্রাবলী', পত্র ৮৩

২. তদেব, পত্র ৫৬

৩. তদেব, পত্র ৮২

৪. "আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন মহাবাক্যগুলি মাজে মাজে বদলায়। অদ্য হইতে নিম্নলিখিত মহাবাক্যগুলি ধরিয়া থাকিতে মানস করিয়াছি।

(১)

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

গুলি দেবেন্দ্রনাথকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনে এইরূপ মূলমন্ত্রগুলি— তাঁদের আদর্শের মানদণ্ডস্বরূপ। এই পত্রের উত্তরে মহর্ষি লিখেছিলেন। "তোমার দ্বিতীয় মহাবাক্যটি (Thou, O God! hast made us for thyself and the soul finds no rest until it rests in thee) অতি চমৎকার হইয়াছে। এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তুমি এইটি আর কখনো ছাড়িয়া দিও না, ইহা তোমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া দিও, কেননা এমন জিনিস একবার ছাড়িয়া দিলে আর পাইবে না। আমিও তোমার এই মহাবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি।"[১] মেদিনীপুরে 'ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা সভা' স্থাপন করার পূর্বে মহর্ষির অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন রাজনারায়ণ। এতদ্ব্যতীত উক্ত অঞ্চলে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মহর্ষির অনুমোদনক্রমেই। এই ব্যাপারে রাজনারায়ণের উপর ছিল দেবেন্দ্রনাথের গভীর আস্থা: "ব্রহ্মবিদ্যালয় তোমার দ্বারা যেমন উন্নত হইবে, এমত আমি কেশববাবুর দ্বারাও আশা করিতে পারি না।"[২] ১৭৮২ শকের ২৫ মাঘ কলকাতা থেকে পত্রে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন।

বার্ধক্যভারে অবনত মহর্ষি ধর্মব্যাকুলতায় বারবার প্রবীণবন্ধু রাজনারায়ণকে

---

(২)

Thou, O God! hast made us for thyself and
the soul finds no rest until it rests in thee.

[—St. Augustine]

(৩)

অধুনৈব সুখী শান্ত বন্ধমুক্তং ভবিষ্যসি।

(৪)

স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধ্বা

(৫)

সকলত্রো বা বিকলত্রো বা সাধনাঢ্যো বা বিধানাঢ্যো বা
সংসারেঽস্মিন যোজিতচিত্তঃ শোচতি শোচতি শোচত্যেব।
যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক, পৃ. ৩৪

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৯ শক, পৃ. ৩৫

২. প্রিয়নাথ -শাস্ত্রী সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ২৪

আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে; রাজনারায়ণও পবিত্র, মধুর সান্নিধ্য লাভের আশায় প্রতিবারই ছুটে গেছেন মহর্ষির কাছে। উভয়ের শেষ জীবনের কয়েক বছর (১৮৮৪-১৮৮৬ খ্রী পর্যন্ত) এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। মহর্ষি মাঝে মাঝে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, অথবা শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে পাঠাতেন দেওঘরে রাজনারায়ণকে চুঁচুড়ায় আনার জন্যে। ডায়ারিতে[১] রাজনারায়ণ এ-বিষয় নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দেওঘর থেকে ১লা শ্রাবণ রাজনারায়ণ ওখানে গিয়েছিলেন, ছিলেন ৪ঠা ভাদ্র পর্যন্ত।

---

১. ১২৯১ সালে লিখিত রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে জানা যায়: "৩১ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, সোমবার—অদ্য প্রাতে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আমাকে চুঁচুড়ায় লইয়া যাইবার জন্য আইসেন।...

১লা শ্রাবণ, ১৫ জুলাই, মঙ্গলবার—অদ্য দ্বিজেন্দ্রবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে চুঁচুড়ায় আসা যায়।

২ শ্রাবণ, ১৬ জুলাই বুধবার— অদ্য অপরাহ্ণে প্রধান আচার্য্য মহাশয় কথোপকথনের সময় বলিলেন যে ঈশ্বরে স্থিত হইয়া আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, ঈশ্বরে স্থিত হইয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, মৃত্যুর পর ঈশ্বরেই স্থিত হইয়া আমরা পরলোকে অবস্থিতি করিব। আমরা তাহা In him we live, move and have their being— এইরূপ Pantheism বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিলেন যে ঈশ্বর যেমন অনন্ত দেশব্যাপী এবং অনন্তকাল স্থায়ী তেমনি অনন্তরূপে গভীর। তিনি যেমন Protensive ও Extensive তেমনি Intensive. তিনি পরলোক সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিলেন যে ঈশ্বরী কেবল অশরীরী, জীব শরীরী। পরলোকে হাজার উৎকৃষ্ট লোক আমরা চাই না কেন, তবু শরীর থাকিবে তবে দেবলোকে আমরা দিব্য শরীর ধারণ করিব এই মাত্র।

১২ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, শনিবার— ... অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাকে বলেন যে মনুষ্য কালে ঈশ্বরের সমান হইলেও তথাপি তিনি আতপ ও আমরা ছায়া থাকিব যেহেতু তিনি স্রষ্টা ও আমরা সৃষ্ট। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম" বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে এই কথা বলিলেন।

১৪ শ্রাবণ. ২৮ জুলাই, সোমবার— অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে... দেবাসুরের উপাখ্যান পাঠ করেন।

১৭ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই, বৃহস্পতিবার... অপরাহ্ণে প্রধান আচার্য্য মহাশয় Kant দার্শনিকের মত আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

২৩ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট, বুধবার... অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় কথোপকথনের সময় বলেন যে আমাদিগের দরদ্ (দুঃখ) ঠিক যেখানে মনুষ্য সেখানে সহানুভূতি দিতে পারে না, কেবল ঈশ্বর দিতে পারেন।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের অতি সংকটকালে রামমোহনের কর্মকৃতির পর প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের অগ্রগতি। একজনের ভূমিকা প্রবর্তকের, অন্যজনের সংরক্ষক ও সংগঠন-কারের। একজন সৃষ্টি করলেন, অন্যজন করলেন রক্ষার ব্যবস্থা, একজন পথের নির্দেশ দিলেন, অন্যজন সেই পথেরই অন্যতম পথিক হয়ে দেশ ও জাতিকে পথ দেখালেন। বলা যায় রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের আদর্শের সেবকরূপেই সমগ্র জীবন কাজ করে গেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ধর্মজীবনের স্বাধীনতাপ্রিয়তার আদর্শ রাজনারায়ণ লাভ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সর্বমানবের সংস্কারমুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন এবং ধর্মজীবনের স্বাধীনতা বলতে তিনি দেশ কাল ও অবস্থা -নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হবার অধিকার আছে— এ কথা বলেছেন। আমরা দেখব রাজনারায়ণের চিন্তা-ধারাতেও অনুরূপ দুইভাব পরবর্তীকালে কিরূপ কার্যকর হয়েছে। সর্বোপরি রাজনারায়ণের তীব্র জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শ মহর্ষির অনুরূপ ভাবধারার অনুসরণে পরিপুষ্ট হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) মহর্ষি চুঁচুড়ায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজনারায়ণ চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন দর্শন-মানসে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ (১৫ ফাল্গুন থেকে ২২ ফাল্গুন) রাজনারায়ণ মহর্ষির কাছে অবস্থান করেন। তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থার পরিচয় রয়েছে দেওঘর থেকে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিত একটি পত্রে (৩১ জ্যৈষ্ঠ, ৫৮): "বিদায় হইবার সময় তাঁহার পদধূলি লইলাম। সেই সময়ের মনের অবস্থা

---

২৫ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট, শুক্রবার— অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাকে উপনিষদ শিক্ষালয় স্থাপনের কথা বলেন।…

২৮ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট, সোমবার— অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ঋগ্বেদের এই শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করেন "নহি ত দারে নিমিষশ্চে নেমে" তোমা হইতে দূর হইলে এক নিমিষের জন্য আমার কেহ ঈশিতা অথবা অবলম্বন থাকে না।

২৯ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট, মঙ্গলবার— অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় হাফেজের একটি "বয়াৎ" আবৃত্তি করিলেন তাহাতে…

৪ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট, মঙ্গলবার— অদ্য চুঁচুড়া হইতে দেওঘরে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রত্যাগমন করি।"

বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম যে হয়তো তাঁহার সহিত তার ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না— তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায় হায় এ জীবনের guide, philosopher, and friend পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা, ও সুহৃৎ চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?"[১]

সংস্কৃতে আছে: 'অত্যাগসহন, তিনি বন্ধু; যিনি অনুমত, তিনি সুহৃৎ; যিনি একক্রিয়, তিনি মিত্র; যিনি সমপ্রাণ, তিনি সখা।' দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ— এঁরা উভয়েই ছিলেন উভয়ের বন্ধু, সুহৃৎ মিত্র, সখা। এক হৃদয়ে বন্ধুত্বের একাধিক অনুভূতিতে উভয়ের সম্পর্ক ছিল প্রেমগভীর সুন্দর। এঁরা দুজনে দুজনের দর্শনমানসে ব্যাকুল হতেন, ঈশ্বরানুভূতিতে ও ধর্মবিশ্বাসে ভক্তিভাবের ঐক্য বোধ করতেন, দার্শনিক যুক্তি ও সমাজ-সংস্কারচিন্তায় একই অভিমত পোষণ করতেন, সর্বোপরি উভয়ে সমগ্র জীবনব্যাপী ছিলেন একক্রিয়। আমরা জানি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকার্যে এই দুইজনের কর্মশক্তি ছিল সদা সক্রিয়। সুতরাং আদর্শ বন্ধুত্বের এমন আশ্চর্য মিলনমধুর দৃষ্টান্ত বন্ধুত্বের ইতিহাসে বোধ করি বিরল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, "আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সংসার ঘুঁটিয়া দেখিলাম, তোমার সমান আর একটি বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম না।"[২]

বন্ধুত্বের এমন প্রীতি-মধুর সম্পর্ক যেখানে, সেখানেই এমন কথা বলা সম্ভব: "আমি যখন দুঃখে থাকি, তখন তোমার সুখে থাকা সংবাদ পাইলে সে দুঃখের অনেক শান্তি হয় এবং মনে হয়, ভাল, আমি এই পৃথিবীতে যাহার সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সে তো ভাল আছে এবং সুখে আছে।"[৩] স্বার্থশূন্য, বাসনাহীন বন্ধুত্বের অনবদ্য প্রকাশ এই পত্রে। মহর্ষি পত্র লেখার সময়ে রাজনারায়ণকে 'অভিন্নহৃদয়েষু' বলে সম্বোধন করতেন। কখনো বা 'ওগো রাজনারায়ণ বাবু' সম্বোধনে অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব সংসারের স্থূল কর্তব্যের মধ্যেও প্রকাশিত। রাজনারায়ণের অর্থাভাবমোচনে মহর্ষি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর সাংসারিক ব্যয়, চিকিৎসাদির খরচ, এমন-কি, কন্যাদের

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৮০৯ শক, পৃ. ৭৫

২. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৪৬

৩. তদেব, পত্র ৩; কলকাতা থেকে ৫ আশ্বিন ১৭৭৪ শকে লিখিত।

বিবাহাদির খরচপত্র পর্যন্ত—সমস্ত দীর্ঘদিন ধরে বহন করেছেন মহর্ষি। 'পত্রাবলী'তে মুদ্রিত রয়েছে এই সম্পর্কিত একাধিক পত্র। মহর্ষি তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থটি বন্ধুত্বের প্রীতি-উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন রাজনারায়ণকে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত তাঁর উপহারসূচক-বাক্য কয়টি চিরকাল স্মরণ করে রাখবার মতো : "আমার চির সহযোগী মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুকে আমার এই হৃদয় সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান উপহার দিলাম।"[১] রাজনারায়ণও তাঁর *Science of Religion* পুস্তকটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসর্গ করেছেন মহর্ষিকে। তাঁর অকুণ্ঠ ভক্তিভাবের প্রকাশ হয়েছে উৎসর্গের ভাষায়।[২]

হৃদয়বৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে কর্ম—সেখানে প্রেমের উত্তাপ যেমন থাকে, তেমনি থাকে কর্মের উন্মাদনা। দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ—উভয়ের বন্ধুত্ব-প্রীতি উভয়কে করেছিল কর্মোদ্যমী। কর্মের তাগিদেই পরস্পর হয়েছিলেন পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত। মহর্ষির প্রভাবে রাজনারায়ণের অন্তর নিরাসক্ত, অধ্যাত্ম-উন্মুখ, নির্বিকার, আর রাজনারায়ণের প্রভাবে মহর্ষির 'কর্মের কলরব-ক্লান্ত' অন্তর হয়েছিল চিরপ্রশান্ত, আবেগবিমুখ, সংশয়শূন্য।

মহর্ষিকে রাজনারায়ণ যেমন গভীরভাবে জেনেছিলেন, বোধ করি তাঁর পুত্র, শিষ্য অতি আপনার জনেরও তেমন অন্তরঙ্গভাবে জানার সুযোগ হয় নি। রোগশয্যায় বেদনাক্লিষ্ট, অচেতনদেহে চৈতন্যোদয় হলে, মহর্ষি আজীবনের বন্ধু রাজনারায়ণকেই আপনার অতি নিকটে আহ্বান করতেন ; এবং রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ হস্তের মধ্যে রাজনারায়ণের হস্ত ধারণ করে 'প্রিয়তমের স্মরণে অশ্রুবিন্দু' মোচন করতেন। রাজনারায়ণ যথার্থই ছিলেন মহর্ষির 'ধর্ম্মবন্ধু'।

মহর্ষির জীবিতাবস্থায় রাজনারায়ণ এক সাহেবকে পত্রে মহর্ষির সংক্ষিপ্ত-জীবন-বৃত্তান্ত লিখে পাঠান। ইংরেজী জীবনবৃত্তান্তের বাংলা মর্মানুবাদ ১৮৯৫

---

১. রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত।

২. Dedication.

To The Venerable Babu Debendra Nath Tagore,
Chief Minister, Brahmo Samaj,
This Little Treatise
Is Respectfully Dedicated
By
His ever devoted friend and servant
The Author.

সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় (নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে) প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি রাজনারায়ণের প্রাণের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন এই রচনাটি।

বিদ্যাসাগরের কোনো বসওয়েল ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথ একসময় আক্ষেপ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জন্য শিক্ষিতসমাজকেও আজ সেই আক্ষেপ করতে হয়। বসওয়েল লিখেছিলেন জনসনের জীবনী। বসওয়েলের মতো জনসনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা সম্ভবত আর কারো জানবার সুযোগ হয় নি। উত্তরকালে রাজনারায়ণ সেই বসওয়েলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন। যেহেতু 'স্বপনমূরতি' 'গোপনচারী' মহর্ষির অন্তর পরিচয় রাজনারায়ণ ব্যতীত বোধ হয় আর সকলের নিকট ছিল অগোচর। দুর্ভাগ্য মহর্ষির নয়, দুর্ভাগ্য ভবিষ্যৎ দেশের। তাই মহর্ষির পূর্বেই তাঁর পরম সুহৃদ, আজীবন কল্যাণকামী, অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ ইহলোক ত্যাগ করেন।

ধর্মজীবনের উন্মেষ : ধর্ম ও দর্শনচিন্তা

একটি জাতির চিন্তা ও সাধনার বহিঃপ্রকাশ হয় এক-একটি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্য ও কর্মের ভিত্তিতে। বাংলা তথা ভারতের উনবিংশ শতাব্দী এমনই এক বিশেষ যুগ— যে যুগে দেশের সমাজ, সভ্যতা ও সাধনার ধারা মনীষীকল্প ব্যক্তিদের নূতন ভাবধারায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র— এই-সব মহামনীষীদের চিন্তা ও কর্মে উনিশ শতকের ভারত গঠিত। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের অধিবাসীরা মূলত ভক্তি-মার্গের সাধক। নবজাগরণ যুগে ইংরেজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে তাদের অধ্যাত্মচিন্তা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমূলক হয়েছে ; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো ইহলোকসর্বস্ব হয় নি। ভারত অধ্যাত্ম-চিন্তায় ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের সার্থক সমন্বয় করেছে। ভারতের বৈশিষ্ট্য এখানেই। সে বৈশিষ্ট্য রাজনারায়ণের অধ্যাত্ম-চিন্তায়ও প্রকাশিত।

মানুষের মনে কখন কিভাবে যে ধর্মচেতনার উন্মেষ হয় তা বলা যায় না। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই রাজনারায়ণের মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসা জেগেছিল। স্কুলে পড়ার সময় 'ট্রাভেলস অফ্ সাইরাস' গ্রন্থের রূপকাংশ পাঠে তিনি ধর্ম-দেব-দেবী ইত্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। মেধাবী বালক তুলনামূলক-ভাবে বিচার করলেন দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম— হিন্দুধর্মকে। তাঁর মন পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন হল। আসন্ন সরস্বতী পুজোয় চিরাচরিত প্রথা বর্জন করে অনুপস্থিত রইলেন রাজনারায়ণ। পিতা নন্দকিশোর ব্রাহ্ম-ধর্মানুরাগী হলেও আজন্মপোষিত সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি। আধুনিকতার পক্ষপাতিত্বে পুত্রের ভাবী আলোকময় জীবনে আশান্বিত হয়ে 'যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয় তবে বড় ভাল হয়'— এমন বাসনা নন্দ-কিশোরের থাকলেও অপরিণত বয়সেই রাজনারায়ণ স্বীয় ধর্মকে অস্বীকার করায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কেবলমাত্র 'ট্রাভেলস অফ্ সাইরাস' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠেই

যে রাজনারায়ণ পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে সংশয়ী হয়ে উঠেছিলেন তা মনে হয় না ; পাঠ্যজীবনে শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভি. এল. রীজ. সাহেবের সংশয়বাদিতা তাঁর চিত্তে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে। বিশেষ করে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংশয়বাদ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ছাত্রাবস্থায় ক্লাসেই রাজনারায়ণ তাঁর কাছে শুনেছিলেন, 'পরকাল নাই, এবং মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়…।' আরো এক কথা। ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনাদি পাঠ করার মধ্যে দুই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল— জাতিকে সংস্কারমুক্ত করা এবং নিজ নিজ ধর্মমত স্থির করা। রাজনারায়ণ এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণে দার্শনিক হিউমের[১] মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রবল আগ্রহও দেখা গিয়েছিল নবযুগের তরুণদলের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, ইংলণ্ডীয় সমাজে আধুনিক দার্শনিক যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান গুরু ছিলেন ডেভিড হিউম। ডিরোজিওর শিক্ষার আশ্রয়ে তাঁর ছাত্রদের অন্তরেও হিউমের দার্শনিক চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে। এই-ভাবে রাজনারায়ণও ছাত্রজীবনে হিউমের সংশয়বাদের (Scepticism) প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'তে তিনি লিখেছেন— "সংশয়বাদী হইলেই যে লোক মন্দ হয় তাহা নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে Men are better than their creeds or opinion —ব্যক্তিরা তাহাদিগের মত অপেক্ষা ভাল।" দেবগৃহে কোনো এক ব্যক্তির উদ্‌বাহক্রিয়া ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি সংশয় দেখে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

স্কুল-জীবনে রাজনারায়ণের মনে ধর্মচিন্তার এই যে বীজ উপ্ত হয়েছিল কলেজ-জীবনে তাই পাশ্চাত্য দর্শনের জলহাওয়ায় অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। হেয়ার স্কুল থেকে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজে রামমোহনের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভার অফ্ দি প্রিসেপ্টস অফ্ জীসাস' এবং উইলিয়ম ইলারী চ্যানিঙের[২] গ্রন্থ পাঠ করে একদিকে রাজনারায়ণ একেশ্বরবাদী খ্রীস্টানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, আবার অপর দিকে মুসলমান ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীতেও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। কারণ, দুই ধর্মেরই মূল কথা— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

আসলে কৈশোরের প্রবল অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি কুতূহলী করে তুলেছিল।

খ্রীস্টধর্মের প্রতি রাজনারায়ণের প্রবল অনুরাগের পরিচয় রয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের রচনাবলীতে। তিনি বাইবেল থেকে সারসংগ্রহ করে *Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theist's*-নামক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে বাইবেলের ভাবধারার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। বস্তুত সেকালের পটভূমিকায় রাজনারায়ণের খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। উত্তরকালে তিনি এ অনুরাগকে নিছক কৌতুকজনক ব্যাপার বলে লঘু করে দেখেছেন। অথচ রাজনারায়ণের এই খ্রীস্টধর্মানুরক্তি তাঁর ধর্মচিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপই ছিল। কিন্তু রাজনারায়ণের জীবনে ধর্মচিন্তা ছিল ব্যাপক ও গভীর। সুতরাং খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগকে সমপর্যায়ভুক্ত করে বিচার করা যায় না।

মুসলমান ধর্মের প্রতি অনুরাগবশত রাজনারায়ণ মূল পারসী ভাষার কোরান (সেল-এর কোরান) এবং ইংরেজীতে লিখিত নানা গ্রন্থ ('চ্যাপ্টার্স ইন্ গিবন্স রোমান এম্পায়ার এ্যাবাউট ম্যাহোমেড এ্যাণ্ড হিজ সাক্সেসর্স') পাঠ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ধর্মের প্রতি তিনি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাই স্থির করেন। এইভাবে রাজনারায়ণ প্রথম জীবনে একের পর এক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন; কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে কোনো ধর্মেই আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বিশুদ্ধ ধর্মভাব যে-কোনো ধর্মাবলম্বী হয়েই লাভ করা যায়— বোধকরি শেষ পর্যন্ত এই চিন্তা করেই তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত হন। একে অপরিণত বুদ্ধি, তাতে দেশকাল ও সমাজের যা অবস্থা— তার মধ্যে থেকে বালক রাজনারায়ণের পক্ষে ধর্মমত ও পথ অতি সহজেই অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সংশয়বাদের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই মন্তব্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ দেখি রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে— "সংশয়ের বেদনা তখনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিক স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল

পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।”[১] যুগে যুগে দেশে দেশে যে-সমস্ত দার্শনিকের জন্ম হয়েছে, তাঁদের প্রায় সকলেই ধর্মচিন্তার প্রাথমিক অবস্থায় এই ‘সংশয়ের বেদনা’ অনুভব করেছেন। এই বিষয়ে বিদেশী পণ্ডিত ও দার্শনিক কাণ্টের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের প্রাথমিক স্তরের কথা স্মরণ করলে ঐ একই ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারি। ‘সংশয়ের বেদনা’ মুছে ফেলতে কিশোর রাজনারায়ণের সময় লেগেছিল। দুটি প্রচণ্ডতম আঘাতে তাঁর ধর্মচিন্তা সত্য পথের সন্ধান পায়।

স্বল্পকালের ব্যবধানে স্ত্রীর মৃত্যু ও পিতার মৃত্যুশোক রাজনারায়ণের কিশোর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর অনিত্যতা কল্পনা ক'রে তাঁর চিত্ত আধ্যাত্মিক-সত্য-জিজ্ঞাসায় উন্মুখ হয়েছিল। সত্য-সন্ধানী রাজনারায়ণ দেখলেন যে, যিনি খ্রীস্টানের গড, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর ভগবান— তিনিই আবার ব্রাহ্মের ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম— এক, অদ্বিতীয়, অনন্তস্বরূপ। অতএব তিনি চিন্তা করলেন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই চিত্ত নিবিষ্ট করা শ্রেয়; যেহেতু ব্রহ্ম নিরাকার, এবং ব্রাহ্মধর্ম অপৌত্তলিক। অবিলম্বে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। এমত অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের নিবিড় সহানুভূতিতে ও উৎসাহে শীঘ্রই তাঁর এই সংকল্পের সিদ্ধি হয়। রাজনারায়ণ ১৮৪৬ সালের গোড়ার দিকে এক শুভদিনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[২] দীক্ষাগুরু ছিলেন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক লালা

---

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩ (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৫৯) পৃ. ৪৫১

২. রাজনারায়ণের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। রাজনারায়ণ লালা হাজারীলালের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখটি জানা যায় না। তদুপরি বিভিন্ন প্রকার উক্তিতে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আত্মচরিতে রাজনারায়ণ স্বয়ং বলেছেন যে, ‘ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে’। মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে ১৭৬৭ শকে ১৯ বৎসর বয়সে। অথচ ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বলা হল ১৭৬৬ শকে। ‘দাসী’ পত্রিকায় মহর্ষির সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখবার সময় রাজনারায়ণ বলেছেন, “১৭৬৭ শকে চিরস্মরণীয় লালা হাজারীলাল কর্তৃক ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হই।” ১৮১৮ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত “ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে, “১৭৬৬ শকে ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রচারক লালা হাজারীলাল কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।” ১৮৫০ শকের

হাজারীলাল।[১] ইনি ছিলেন ইন্দোরের অধিবাসী। সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমেই ইনি রাজনারায়ণকে দীক্ষা দেন। ধর্মান্তরের কথা রাজনারায়ণ 'আত্মচরিতে' (পৃ. ২৮) লিখেছেন: "যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি।... সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।" ধর্মের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের প্রগতিবাদী, যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পরন্তু তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি একইকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীলতার পরিচয়ও বহন করছে।

রাজনারায়ণ ছিলেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী, ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় রয়েছে ধর্মভাব— আদিতে অন্তে ও মধ্যে। ধর্মের বাণীকে তিনি কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি যথার্থ ধার্মিক পুরুষ, জীবনের সর্বকর্মে ধর্মই যাঁর প্রধান কথা। 'এহ বাহ্য'। এঁদের কাছে 'ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য।' এখানে ধর্মের অর্থ ব্যাপক— জগৎ, জীবন ও ব্রহ্মের প্রতি কর্তব্য সাধনই ধর্ম। ধর্মের সেই ব্যাপকার্থে— গৃহধর্মও ধর্ম, রাজধর্মও ধর্ম, লোকধর্মও ধর্ম, আবার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন— তাও ধর্মেরই অঙ্গীভূত। রাজনারায়ণের উপলব্ধিতে "...of the visible for the invisible. of the finite for the infinite. It may also be other-

---

অগ্রহায়ণ সংখ্যার ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা' প্রবন্ধে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজনারায়ণ বাবু ১৭৬৭ শকে ১৯ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।"

এইভাবে দীক্ষাগ্রহণের কাল নিয়ে সংশয় জেগেছে। মনে হয় ১৭৬৭ শকের একেবারে সূচনায় অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্ভবত রাজনারায়ণের দীক্ষা হয়। এমনও হতে পারে যে ১৮৪৬-এর প্রারম্ভে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ ১৭৬৬ শকের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রাজনারায়ণের পিতার মৃত্যুর পর তিনি মহর্ষির নিকট যান এবং ১৮৪৬ সালের গোড়ার দিকে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর এবং বৈশাখ মাসে দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। এই সিদ্ধান্ত করলে ১৭৬৬ শকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর এবং ১৭৬৭তে দীক্ষাগ্রহণ পর্ব সমাধা হয়েছে বলা যায়। দীক্ষাকালে রাজনারায়ণের বয়স ছিল ১৯ বৎসর ৭ মাস মাত্র।

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

wise defined as the aspiration of the imperfect after the perfect, ever growing, never to be fully satisfied." ।[১]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,'ধর্ম হল এমন এক পরম সত্তায় বিশ্বাস যিনি জগতের অতীত ও উর্ধ্বে সর্বজ্ঞ ও পূর্ণস্বভাব, জগৎ ও জীবাত্মার ওপর যাঁর চরম কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং যাঁর উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল।' *The Science of Religion*— পুস্তকে রাজনারায়ণ আরো বলেছেন, ধর্ম হল কিনা ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরক্তি। এ তাঁর ধর্মচিন্তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক। ধর্মের ব্যাবহারিক দিক প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন, "ধর্ম্ম কেবল বলিবার বস্তু নহে, তাহা করিবার বস্তু।" রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'মানুষের ধর্ম'। তিনি আরো বলেছেন: "সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়।"[২] ভারতবর্ষের এই ধর্মাদর্শ: এই আদর্শ ভারতীয় সমাজের কোনো বিশেষ অংশে প্রাচীর বদ্ধ করে মানুষের জীবনকে পূর্ণতার পথ থেকে বিচ্যুত করে নি। ভগবান বোধিসত্ত্ব নিজে মুক্তি অর্জন করেছিলেন, সর্ব-মুক্তির জন্যই। চৈতন্যদেব 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'। বৈষ্ণবেরা বলেছেন, "মোক্ষবাঞ্চা কৈতব প্রধান", "ফল্গু করি মুক্তি মানি নরকের সম।" এমন-কি, উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনের কর্মেও ধর্মভিত্তিক লোকশ্রেয়ের আদর্শই প্রচারিত হয়েছে। বেদান্তচর্চার সূত্রপাত তিনি করেছিলেন পরম ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের আবেগেই নয়, শতাব্দী-সঞ্চিত জাতীয় মনের তামসিকতা, গতানুগতিকতা, নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বাণী প্রচারের নিমিত্তই। মূলত তিনি ছিলেন কর্মে বিশ্বাসী জ্ঞানমার্গের সাধক; কর্মের তাগিদেই তাঁকে ধর্মভাবের কথা চিন্তা করতে হয়েছে।

রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তা আধ্যাত্মিক অনুভূতিমাত্র নয়, বিশ্বকে বঞ্চিত করে মুক্তি সমাধি তিনি কামনা করেন নি। ধর্মক্ষেত্রে তিনি জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্মের সামঞ্জস্য করে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে গেছেন। অথচ জীবনের গভীরতর বোধের সঙ্গে চিরদিন সংযুক্ত ছিল তাঁর ধর্মবোধ।

---

১. Rajnarain Bose, "The Religion of Love,", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮১৫ শক, পৃ. ১৯৯

২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩ (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৫৯) পৃ. ৩৭৮

এ কথা পূর্বেও বলেছি। "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ"— এই ছিল তাঁর কর্মপথের লক্ষ্য ; জগতের হিতের জন্যই নিজের মুক্তি কাম্য। জগতের হিত কোথায়, না, মানুষের ভিতর দিয়ে ভগবানকে বা নিঃশ্রেয়সকে লাভ করার আকুল আকাঙ্ক্ষা, মানুষের মহিমাই মানুষকে উপলব্ধি করানো— এই ছিল রাজনারায়ণের তথা বাংলার নবযুগের প্রধান লক্ষ্য ও সাধনা।

এই পটভূমিকায় রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তার স্বরূপ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রবক্তারূপে রাজনারায়ণের স্থান বিচার্য। তাঁর ধর্মচিন্তার প্রধান দুটি ধারা— এক ধারায় তিনি ঈশ্বরবাদ (Theism) ও ধর্মের আচরণীয় দিকের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, আর-এক ধারায় আলোচিত হয়েছে ধর্মতত্ত্বের (Theology) বিষয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ঈশ্বরবাদ ধর্মতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তী আলোচনায় প্রথমত ঈশ্বরবাদ ও ধর্মের আচরণীয় বিষয় এবং পরে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মতবাদের সুবিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

রাজনারায়ণ বলেছেন, ব্রহ্মবাদী বা ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়াই ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্ত্র। ঈশ্বরবাদ বা আস্তিক্যবাদের (Theism) স্বরূপ নির্দেশ করে তিনি বলেছেন যে ঈশ্বরবিশ্বাস আমাদের ধর্মজ্ঞান থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন। ভগবান সৎ এবং অনন্ত। তাঁর মধ্যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং বন্ধুত্ব আছে। তিনি মানুষের অতি নিকটবর্তী, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন করে। পরকাল এবং পাপের জন্য শাস্তি ও পুণ্যের জন্য পুরস্কারে যাদের বিশ্বাস আছে, তারাই আস্তিক্যবাদী বা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। প্রজ্ঞা, সামঞ্জস্যবোধ এবং প্রেম ব্রহ্মবাদের মূলসূত্র। রাজনারায়ণের মতে ঈশ্বরবাদের ধারণা এমনই ব্যাপক যে যাঁর যাঁর নিজের ধর্মের মধ্যে থেকেও পূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারেন। ধর্মানুষ্ঠান-ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নিলেই আস্তিক্যবাদী হবার পক্ষে বাধা থাকে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় শ্রেণীর লোকই থাকতে পারে। জাতিভেদও আস্তিক্যবাদের পক্ষে বিঘ্ন নয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী হবার জন্য জাতিধর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। মূলকথা ঈশ্বর-বিশ্বাস। তাঁর মতে যে-কোনো ধর্মাবলম্বী ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে পারেন সত্য এবং সেই অনুসারেই জাতীয় ভাবও অব্যাহত রাখতে পারেন। ধর্মমতে রাজনারায়ণের উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা লক্ষণীয়। পরিশেষে রাজনারায়ণ একটু সতর্ক

করে দিয়ে বলেছেন যে, যে ঈশ্বরবাদী জাতিতে হিন্দু, তিনি যদি যীশুর প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হন, তা হলে ঈশ্বরবাদ প্রচারের কাজে তাঁর পক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে, খ্রীস্টানদের সঙ্গে যোগ দেওয়াই উচিত কাজ হবে। কেননা জনসাধারণ খ্রীস্ট-ভক্তের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করতে পারেন। ধর্মের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ লৌকিকাচার অপেক্ষা মানসিক প্রবণতা ও অনুরাগের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন; তবে লৌকিকাচার একেবারে অস্বীকার করেন নি। পিতা নন্দকিশোরের সঙ্গে রাজনারায়ণের মূল ধর্মমতের পার্থক্য এখানেই।

রাজনারায়ণের ঈশ্বরবাদ প্রচারের অভিমত এই যে ব্রহ্মবাদী বা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে হলে থিওডোর পার্কারের[১] মতো দেশের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করবার দরকার নেই। প্রকৃত ঈশ্বরবাদী জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর ধর্মকে স্বচ্ছন্দে অবলম্বন করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈশ্বরভক্তি প্রকাশের নানা উপায় আছে। সেই উপায়গুলিকে, সেই জাতির বহুলোক অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকে। সেগুলিকে গায়ের জোরে একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়। এক জাতীয় দুইজন ঈশ্বরবিশ্বাসীর মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তা পরস্পরের কাছে দুঃসহ হয় না। তেমনি বিভিন্ন দেশে ঈশ্বরভক্তি প্রকাশের উপায় বিভিন্ন হলেও অসহিষ্ণু হবার কারণ নেই। রাজনারায়ণ তাঁর ঈশ্বরবাদ-সম্পর্কীয় পুস্তক-গুলিতে (*Theistic Toleration and Diffusion of Theism, Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists*)—উপরোক্ত মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান— যে ধর্মাবলম্বীই মানুষ হোক-না-কেন, প্রকৃত ধার্মিক হলে সেই ধর্মমতের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরবাদী হবার পক্ষে বাধা নেই।

রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তার এই অভিনব প্রকাশ উনিশ শতকের বাংলা-দেশের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাকার রামানুজের অনুবর্তী হয়েই রাজনারায়ণ ব্রহ্মবাদী (Theist) হয়েছিলেন। ঈশ্বরবাদ তথা ধর্মের সারকথা রাজনারায়ণ শুনিয়েছেন যে, যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভগবদ্‌বিশ্বাসই ধর্মজীবনের মূল কথা— 'Faith must always be regulated by reason'। তিনি বার বার বলেছেন যে, পৌত্তলিকদের বিশ্বাস কম নয়, কিন্তু তারা যুক্তিহীন। পৌত্তলিকতাকে তিনি পাপ মনে না করে অজ্ঞতাজনিত ভ্রম

১. দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট।

মনে করতেন।[1] আচারপরায়ণ, বিবেকশীল, প্রকৃত ধার্মিক পৌত্তলিককে তিনি নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মের তুলনায় অধিকতর শ্রদ্ধেয় মনে করেন। সুতরাং প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসবশে যাঁরা পৌত্তলিক তাঁরা সর্বথা ঘোরতর পাপী-রূপে ঘৃণিত নন। রাজনারায়ণ এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অন্যতম সমর্থক ছিলেন। অতএব সাকার উপাসনার ক্ষেত্রে যুক্তিহীন বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—'Faith alone is not sufficient to enable a man to arrive at religious blessedness,"[2]

রাজনারায়ণ তাঁর ধর্মচিন্তার রূপায়ণে যেমন ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও মূলকথা বলিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে বিবৃত করেছেন তেমনি উক্ত ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়সংগত দিকগুলিও পর্যালোচনা করেছেন; এবং তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে উপদেশাদি দ্বারা ধর্মীয় ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর পুস্তিকাগুলিতে[3] অবতারবাদ, গুরুকরণ, ব্রাহ্মধর্ম ব্যতীত ভারতীয় ও অভারতীয় অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাবের যথাযথ প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

রাজনারায়ণ বলেন যে, ব্রাহ্মধর্মে অবতারবাদ নেই। ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হন রাজনারায়ণ তা কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন:

---

১. পৌত্তলিকতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ ডায়ারিতে (অপ্রকাশিত) যে মন্তব্য করেছেন, তা উদ্‌ধৃত হল—

"২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, বুধবার (১২৯৫ সাল ইং ১৮৮৮ খ্রীঃ)— অদ্য প্রাতে ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে বেড়াই। বেড়াইবার কালে পৌত্তলিকতা বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। তিনি প্রচলিত পৌত্তলিকতাকে সমর্থ[ন] করিলেন এবং মৃত্যু সময়ে সক্রেটিস্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেন "Crito! I owe a cock to Aesculapius।" আমি বলিলাম যে পৌত্তলিকতা ভ্রম, পাপ নহে তথাপি যাহার পৌত্তলিকতা ভ্রম বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার পক্ষে পুত্তলিকার উপাসন অকর্ত্তব্য ও পাপ। আমি বলিলাম "when a man rises to a high idea of the divinity altho'... it may not be the highest idea which man can form of Him, he should act according to that higher idea. If he do[es] not he should be reckoned as a hypocrite."

২. *Brahmic Advice, Caution and Help*, 1869, p. 8.

৩. রাজনারায়ণ-লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা—(১) Brahmic Questions of the Day—Answered. 1869, (২) Brahmic Advice, Caution and Help, 1869, (৩) ধর্ম্ম-তত্ত্বদীপিকা— ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ব্রহ্মাব্দ ৫৭

"This is a plain and obvious truth which requires no proof that man is man and is not God"[১]—সর্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরের ঐশ্বর্যাবলী সীমাবদ্ধ দেহধারী সৃষ্ট মানবের মধ্যে কিছুতেই প্রকাশিত হতে পারে না। অবতারবাদের স্বীকৃতিকে রাজনারায়ণ ধর্ম ও সমাজ-জীবনে পরম ক্ষতিকর মনে করতেন। তিনি এই অবতারবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে ভগবদ্‌শক্তি থাকলেই মানুষের কৃতকাজ ভগবদ্‌কর্ম বলে বিবেচিত হয় না। এ-সম্পর্কে রাজনারায়ণ আরো বলেছেন, মানুষ পূতচরিত্র বা ধার্মিক হতে পারে কিন্তু ভগবান মানুষের মতো পূতচরিত্র বা ধার্মিক নন। মানুষ গুণান্বিত, কিন্তু ভগবান নির্গুণ। তাই মানুষ ভগবান হয় না। মানুষের প্রকৃতি কিছুটা মিশ্র ধরনের; তার এক অংশ জৈব— বস্তুতান্ত্রিক, আর-এক অংশ আধ্যাত্মিক— পবিত্র। এই থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেই অংশে ভগবদ্‌বিভূতি প্রকট হয়েছে। মানুষ সীমাবদ্ধ সৃষ্ট জীব, কিন্তু ঈশ্বর অজ, নিত্য ও শাশ্বত।

রাজনারায়ণের মতে মানুষের মধ্যে শক্তি, বিজ্ঞতা ও পবিত্রতা আছে; এই গুণগুলি ঐশ্বরিক বলা যেতে পারে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় না যে, মানুষই ভগবান। কেননা ভগবানের শক্তি, বিজ্ঞতা ও পবিত্রতা মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি ও অনন্ত; কিন্তু মানুষ সর্বতোভাবে শান্ত— সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তুলনার প্রশ্ন ওঠে না। এ সম্পর্কে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা যেমন বলেন— 'Man has been created in the image of his maker,' কিন্তু এতে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যে ধারণা প্রকাশ পায়, ব্রাহ্মদের কাছে ঈশ্বর তদপেক্ষা মহত্তর।

রাজনারায়ণ মনে করেন যে ঈশ্বর নরদেহ ধারণ করে লীলা করেন না। কিন্তু কোনো কোনো মানুষের মধ্যে ঐশী শক্তির আংশিক বিকাশ ঘটতে পারে। এ-সম্পর্কে ব্রাহ্মধর্মের স্বীকৃত সত্য রাজনারায়ণের ধারণায় পরিস্ফুট হয়েছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের জন্য রাজনারায়ণ গুরুকরণ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ব্রহ্মই একমাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও মুক্তিদাতা— তিনি আত্মার আত্মা এবং কোনো মধ্যস্থের অপেক্ষা না রেখে তিনিই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। অতএব ব্রাহ্মেরা তাঁকেই গুরু বলে শ্রদ্ধা করবেন, যিনি উপদেষ্টা

১. *Brahmic Questions of the Day—Answered*, 1869. p. 19

মাত্র; যিনি ঈশ্বরলাভের উপদেশ ও প্রেরণা দেন এবং যিনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অভিজ্ঞতর। এ যেমন ব্রাহ্মধর্মের কথা, হিন্দুধর্মেরও তাই! বেদ-উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের মর্মার্থ উপলব্ধি করেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

যে-কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই রাজনারায়ণ ধর্মোন্মত্ততা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন যে, ধর্মোন্মাদনা যুক্তিহীন এবং আবেগ চাঞ্চল্য ক্ষণস্থায়ী; অতএব এর দ্বারা ভক্ত হওয়া যায় না। এইরূপ ধর্মোন্মাদনা মানুষকে মাতাল করে তোলে। মাতাল যেমন বিশুদ্ধ জলের স্বাদ পায় না, তেমনি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি সত্যের উপলব্ধি করতে পারে না। বস্তুত রাজনারায়ণ দেশের কয়েকটি প্রচলিত ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। *Brahmic Questions of the Day— Answered* পুস্তিকায় তার স্পষ্ট প্রকাশ: "Our religion is not a religion of frenzy, like that of the Bauls or the Chaytannas of this country or the howling dervishes of constantinopal. Religious madness is not surely be highest religious state which man can utter."

অতএব রাজনারায়ণের অভিমত এই যে, শান্ত, সংযত অবস্থায় প্রেমোপলব্ধির দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা করতে হবে। কেবলমাত্র তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ করে যার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয়ে শিহরণ জাগে— সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত। যেহেতু "Religion is not a casual blaze of feeling, but life"[১], রাজনারায়ণের অনুভূত সত্য এই যে, ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের মতোই প্রাকৃতিক সর্ববস্তুকেই মনোরম আলোকে উদ্‌ভাসিত করে। এই প্রেমানুভবের জন্যে সাময়িকভাবে ভাবোন্মত্ত হবার প্রয়োজন নেই। স্ত্রী, পুত্র ও সমাজের প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য সমাধান করেও প্রতিমুহূর্তে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ঈশ্বরের মধুর স্পর্শ অনুভব করা যায়। যুক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে রাজনারায়ণ যুক্তি ও বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও প্রশান্তি, ধ্যান ও কর্মের সার্থক সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

এইভাবে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের বিধি-বিধান-আচরণীয় দিকগুলির প্রতি বিবেকশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের জীবনের সকল কর্মে ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদের (Theism) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। জনগণের উপলব্ধ সত্য ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী সামাজিক কর্মবিধি

---

১. *Brahmic Questions of the Day—Answered*, 1869, p. 21.

অবলম্বন না করলে তারা যে ঈশ্বরবাদী— ধর্মানুরাগী হবে না— এই ছিল তাঁর ধারণা।

দার্শনিক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রাজনারায়ণ ধর্মচিন্তার পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মতত্ত্বের (Theology) আলোচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের ও মনুষ্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয়ই সুপরিস্ফুট।

রাজনারায়ণ তাঁর 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অতীন্দ্রিয় দর্শনের সাহায্যে আত্মার আত্মা ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় ; ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর সকলের স্রষ্টা অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয় স্বরূপ ; তিনি নিরাকার পদার্থ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। রাজ-নারায়ণের মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলে তিনি জগৎ সৃষ্টি করে ক্লান্ত হন না। তিনি সদা সক্রিয় পরিচালক। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা ও পূজার দ্বারা তিনি আমাদের প্রতি সদয় ও বিমুগ্ধ হন ; এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করেন। তাঁর সৃষ্ট জগতে প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁর অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণা প্রকাশিত রয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৮৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর 'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি'র ভূতপূর্ব সম্পাদক জি. এস. লিওনার্ডকে লিখিত একটি পত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে রাজনারায়ণের উপলব্ধিগত সত্যেরই প্রকাশ হয়েছে : "Our relationship with God as the soul of the soul is nearer than to us than they,"

ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত হল এই যে ঈশ্বরের অনুশাসনে, নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে জগতের সমস্ত ঘটনা ঘটে। বাহ্যজগৎ এবং মানসিক জগৎ উভয়েই নিয়মের অধীন। কারণ বিনা কার্য হয় না, জগতের আদি কারণ ঈশ্বর। জগতের কাজে ও মানুষের জীবনে ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় স্বতই পরিস্ফুট। রাজনারায়ণের চিন্তাধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তার অনুরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক। তিনি প্রীতির স্বরূপ। তিনি জীবের পিতা-মাতার স্বরূপ, তিনি শুভবুদ্ধি দেন। পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার নির্ধারণ করেন। সর্বোপরি ঈশ্বর মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের মূলকথা হল এই : "কামনা সিদ্ধি জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেমন আবশ্যক,

আত্ম-চেষ্টাও তেমনি আবশ্যক। ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন, যাহারা আপনাদিগকে আপনারা সাহায্য করে। "আত্ম-প্রভাবাৎ দেব-প্রসাদাৎ" অর্থাৎ আত্মচেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সকল কামনা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে, এই জন্য আত্ম-চেষ্টা কর্তব্য; মানুষ ক্ষীণ, এই জন্য ঈশ্বরের সহায়তা আবশ্যক।"[১]

রাজনারায়ণ তাঁর *Science of Religion* পুস্তকে বলেছেন যে ঈশ্বরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে না পারলেও শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে তাঁর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকি। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ ও জীবের অন্তর্নিহিত আত্মা, অতএব সকলের মধ্যে তিনি বিরাজমান। এজন্য কোনো বস্তুই ঈশ্বর থেকে পৃথক ও বিছিন্ন থাকতে পারে না। ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। "He is the support of the universe. In his will things live, move and have their being."[২] রাজনারায়ণের এই মন্তব্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ বা সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সমতুল্য।[৩] উপনিষদেও বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"— প্রাচ্য সর্বেশ্বরবাদিগণের এই মত। এই উভয় মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগৎ ও জীবের অন্তর্বর্তী (Immanent) অর্থাৎ তিনি জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকেন। ঈশ্বরের সত্তা ও বিশ্বের সত্তা অভিন্ন। 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তকে রাজনারায়ণ বলেছেন: "তিনি সকল স্থানে আছেন ও সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন— এ প্রকার সর্ব্বদা উপলব্ধি করিবে। হৃদয়ধামে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তাঁহার সকল কার্য্যে তাঁহার হস্ত দর্শন করিবে।... এইরূপ সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।" অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন যে, পরমেশ্বর সকল বস্তুতেই বিরাজমান। তাকে অবলম্বন করে জীব জগৎ ও জড়জগৎ— সবই স্থিতি করছে। কি ভৌতিক জগৎ, আর কি জীবাত্মা কোনো বস্তুই ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এতএব পরমাত্মা পরমেশ্বরকে অন্তরে আত্মার আত্মারূপে, জীবনের জীবনরূপে, প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করা উচিত। যখন আমরা এ উপলব্ধি করি যে, তিনি আমাদের প্রাণ, মন— সব কিছুরই মূলীভূত এবং তাঁকে আশ্রয় করেই আমরা

---

১. ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা— ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ, ব্রহ্মাব্দ ৫৭), পৃ. ৪২

২: "The Religion of Love", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮১৩ শক, পৃ. ১৯৯

৩. পাশ্চাত্য দেশে স্পিনোজা এই মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক।

জীবিত রয়েছি, তখন তাঁর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা দৃঢ়ীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের প্রীতিও বর্ধিত হয়। "যখন জানিতে পারি যে, তিনি প্রাণের প্রাণ, প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। তিনি আমার এত নিকট যে, আমি আমার তত নিকটে নহি। তিনি আমাদের এত নিকট এইজন্য তিনি আমাদের এতই প্রিয়। তিনি—প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ।"[১] এই মতবাদের অনুবর্তী রাজনারায়ণকে অদ্বৈতবাদী বলা অসমীচীন হয় না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম প্রধানরা ছিলেন মুখ্যত দ্বৈতবাদী। সেইহেতু রাজনারায়ণকে এককথায় অদ্বৈতবাদী বলা যায় কি ? রাজনারায়ণকে একদিক থেকে দ্বৈতবাদী, আবার একদিক্ থেকে অদ্বৈতবাদী বলে ধারণা হয়। ঈশ্বর সগুণ এবং জগৎ ও ঈশ্বরের পৃথক অস্তিত্ব— এই দার্শনিক প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে রাজনারায়ণ দ্বৈতবাদী। আবার ঈশ্বরেই জগৎ স্থিত, সেখানে ঈশ্বর থেকে জগৎ পৃথক নয়— এ এক চিন্তা, আর-এক চিন্তায় জগৎ ঈশ্বরেই বিধৃত। এই ধারণায় ঈশ্বর নির্গুণ এবং সগুণ— উভয়ই। এই অভিমতে রাজনারায়ণের দর্শন-ভাবনা অদ্বৈত এবং বিশিষ্ট; বিশিষ্ট এই যে, ঈশ্বরের নির্গুণত্ব এবং সগুণত্ব— উভয়ই এখানে স্বীকার করা হয়েছে। বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় রামনুজ অনুরূপ দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা। রাজনারায়ণের দর্শনচিন্তা রামানুজের চিন্তারই অনুরূপ। রামানুজ এক স্বতন্ত্র, সর্বব্যাপী, পরম তত্ত্বে বিশ্বাসী, এবং সেই পরম তত্ত্বেই জড় ও জীবের প্রতিষ্ঠার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। রামানুজের এই মতই বিশিষ্টাদ্বৈত নামে পরিচিত। যেহেতু এই মতে 'চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত।' তিনি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব উভয়ই স্বীকার করেন।

ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের উপায় সম্বন্ধে রাজনারায়ণ "The Religion of Love" প্রবন্ধে ও 'ব্রহ্মসাধন'[২] পুস্তকে আলোচনা করেছেন। "The Religion of Love" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের সংস্পর্শ লাভ করতে চিত্ত পরিশুদ্ধ

---

১. মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা (১৭ই কার্তিক, ১৭৮৭ শক) একমেবাদ্বিতীয়ম্— ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৯২ শক, পৃ. ৭

২. রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন যে, Thomas C. Upham প্রণীত *Principles of the Interior or Hidden Life* তাঁর ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছে এবং বিশেষভাবে ব্রহ্মসাধনের পথ বা উপায় নির্ধারণে সাহায্য করেছে। বাস্তবিক, উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (উদাহরণস্বরূপ, Directions to Aid in the attainment of Holiness'. 'of

করা আবশ্যক। যার অন্তর পবিত্র একমাত্র সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। চিত্তশুদ্ধির জন্য আত্মসংযম একান্তভাবে প্রয়োজন। আত্মসংযমের জন্য রাজনারায়ণ যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই "যোগের অর্থ এই নয় যে গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া তপস্যা করা অথবা দুরন্ত শীতকালে সর্ব্বদা জলে মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করা। যোগের প্রকৃত অর্থ হল এই যে, বৈষয়িক কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণ করা।"[১] উনিশ শতকে যোগাভ্যাসের অভিনব উপদেশ দিয়েছেন রাজনারায়ণ। মানব-

---

Disinterested or pure Love, in distinction from Interested Love', 'On the confession of Sin', 'On the Principle of Inward Quiet or stillness', 'Additional Remarks on the State of Interior stillness, 'On the State of Union with God' প্রভৃতি) পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থকারের বহু বক্তব্য রাজনারায়ণ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি হুবহু সব লিপিবদ্ধ করেন নি, তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উক্ত গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। 'Directions to Aid in the Attainment of Holiness' অধ্যায়ে Upham বলেছেন যে, ইহজীবনেই পবিত্রতা বা ঈশ্বর লাভ করা যায় এবং তা করতে হলে ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গ করা এবং তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা একান্তভাবে আবশ্যক। 'Of Pure and Holy Love, in distinction from Self-interested or Selfish Love' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে আপন আত্মার অধিকর্তা হিসেবে ভালবাসতে হবে এবং প্রতিবেশীকেও আত্মবৎ ভালবাসতে হবে 'Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and thy neighbour as thyself'। এই ঈশ্বরপ্রেমই আত্মাকে পবিত্র করে এবং স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়। এই ঈশ্বরপ্রেম হল অনাসক্ত ও বিশুদ্ধ প্রেম, এ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কেউ জগৎ বা সংসারকে ভালবাসে তা কখনও উন্নত ও বিশুদ্ধ প্রেম হতে পারে না। অধিকন্তু, প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেম অফুরন্ত ও ক্রমবর্ধনশীল, অসীম ঈশ্বর ইহার আধার; তাঁর মধ্যে এই প্রেম নিবদ্ধ হলে সার্থকতা লাভ করে। 'On the confession of Sin' অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলেছেন যে, সারা জীবনে আমরা যে পাপ করি তা স্বীকার ও ব্যক্ত করাই যুক্তিসংগত কারণ পাপ অন্যায় ও অশুভ এবং যাহা অন্যায় ও অশুভ তা স্বীকার করতে পারলে আমাদের অন্তঃকরণ আবর্জনামুক্ত ও শুদ্ধ হয়। শেষোক্ত অধ্যায়গুলিতে তিনি বলেছেন যে, আমরা যদি স্থির ও শান্ত মনোভাব গঠন করি, তা হলে অসংলগ্ন ও স্বার্থদুষ্ট কার্যাবলী থেকে মুক্ত হতে পারি। এর দ্বারা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত চিন্তা বা কল্পনা আমাদের কলুষিত করতে পারে না। আমরা বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

১. রাজনারায়ণ বসু, 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব', ১৭৯৬ শক, পৃ. ১১

জীবনে যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে রাজনারায়ণের 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তকে। রাজনারায়ণ স্বদেশের, স্বজাতির, ও স্বধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর আলোচনায় যোগদর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়।

রাজনারায়ণ বলেছেন যে, ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য ঈশ্বরেব নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করতে হবে। সে প্রার্থনা কিরূপ হবে— তাও তিনি বলেছেন, "We should, therefore, pray not so much for external benefits, as for purity of mind, spiritual strength and spiritual light."[১] মানুষ প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং ঈশ্বরত্বের অংশীদার হতে পারে। অতএব প্রেম ব্যতীত ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সংযোগ সম্ভব নয়। প্রেম ও কর্ম একই সঙ্গে মানুষকে ঈশ্বরোপলব্ধির পথে চালিত করে।

রাজনারায়ণের মতে সৌন্দর্যবোধ ঈশ্বরপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য বিদ্যমান। এইজন্য সৌন্দর্যবোধ প্রেমের উদ্রেক করে। দয়া, ন্যায়, প্রভৃতি যাবতীয় সৎগুণের মধ্যেও সৌন্দর্য বিদ্যমান। কাজেই বিশুদ্ধভাবে যাবতীয় সুন্দর বস্তুকে ভালোবাসতে পারলেই ধর্মপালন করা হয়। সুতরাং রাজনারায়ণের মতে— "Live always in an atmosphere of love, for religion is nothing but love."[২] এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ আরো বলেছেন যে, ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধ হতে পারে। তবে স্বার্থদুষ্ট আত্মপ্রেমকে পরিহার করতে হবে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কখনো ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। ঈশ্বরের অভীষ্ট কর্ম করাই ধর্ম। নব জাগরণযুগে রাজনারায়ণ জাতিকে সেই পুরাতন মন্ত্র পুনর্বার শুনিয়েছেন নূতন রূপে।

প্রাচীনকালে প্রায় সমস্ত দার্শনিকই জ্ঞানের সম্ভাবনা (Possibility) বিচার না করে চরমতত্ত্বের (Ultimate Reality) অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রারম্ভিক জ্ঞানের সীমা মেনে না নেওয়ার ফলে নির্বিচারবাদে (Dog-

---

২. "The Religion of Love", Chapter V. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১৪ শক, পৃ. ২৩৯

৩. "The Religion of Love," Chapter XI. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮১৪ শক, পৃ. ২০৩

matism) পরিণত হয় এবং এই নির্বিচারবাদের অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ আমরা পাই সংশয়বাদ (Scepticism) বা রহস্যবাদ (Mysticism)। পরবর্তীকালে জ্ঞানের কারণ ও বিভিন্ন জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে প্রাচীন য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ আলোচনা করে গেছেন। বাংলাদেশের উনিশ শতকের মনীষীকল্প ব্যক্তিবৃন্দ উক্ত দার্শনিকের চিন্তাধারার অনুসরণে জ্ঞানের সম্ভাবনা-বিষয় আলোচনা করেছেন ; রাজনারায়ণও উক্ত বিষয়ে ও চরমতত্ত্বের (Ultimate Reality) অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করেছেন ঐ চিন্তাধারার আলোকেই। অর্থাৎ রাজনারায়ণ যে এ-সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা তাঁর মতামত এবং আলোচনার দ্বারাই বোঝা যায়।

সকল মানুষই বিশ্বাতীত সত্তায় বিশ্বাসী, সকলেই স্বীকার করে যে, এক অলৌকিক শক্তি (Something Super Worldly) বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো ধর্মাবলম্বী পূর্ণ ও পরম আধ্যাত্মিক শক্তিকে সাকাররূপে ধারণা করে, আবার অনেকেই এই অলৌকিক শক্তিকে নিরাকার, অসীম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন হল মানুষ কিরূপে এই অলৌকিক অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে ?

রাজনারায়ণ তাঁর ধার্মিক, যুক্তিনিষ্ঠ ও ঈশ্বরবিশ্বাসী মন নিয়ে উক্ত বিষয়টির সদুত্তর দিয়েছেন সুন্দরভাবে। তাঁর মতে স্বভাবতই কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে মেনে নিতে হয়, নতুবা কোনো বিজ্ঞানই নিছক যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা সত্যকে প্রতিপন্ন করতে পারে না। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। ধর্মীয় সত্যের জ্ঞান আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধি বা যুক্তির (Intellect or Reason) দ্বারা লাভ করতে পারি না। বুদ্ধি বা যুক্তি কেবলমাত্র কার্য-কারণ-পরম্পরাকেই বিশ্লেষণ করে। যুক্তি দ্বারা আমরা একমাত্র খণ্ড জ্ঞান লাভ করতে পারি, প্রকৃত অখণ্ড অসীম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারি না।

রাজনারায়ণের মতে প্রকৃত স্বজ্ঞাই (Intuition) জগতের অতিবাস্তবের জ্ঞান লাভের যথার্থ উপযোগী। চরম সত্তা ঈশ্বরের উপলব্ধির পক্ষে স্বজ্ঞা বা আত্মপ্রত্যয় অপরিহার্য। এই আত্মপ্রত্যয়কেই রাজনারায়ণ আবার অন্যত্র বলেছেন 'সহজ-জ্ঞান'। "সহজ-জ্ঞান মূল জ্ঞান। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা

যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে, তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তন-ভূমি। বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কেবল সহজ-জ্ঞান দ্বারা লাভ করি।"[১]

যুক্তি বা বুদ্ধির চরম পরিণতি সহজ-জ্ঞান বা স্বজ্ঞায়; সেই স্বজ্ঞার মাধ্যমে অখণ্ড ও অসীম জ্ঞান লাভ কৱা যায়। কিন্তু প্রধান কথা সহজ জ্ঞান বা স্বজ্ঞা। এই জ্ঞান স্বয়ং নিরবলম্ব; সহজ-জ্ঞানকে অবলম্বন করেই যুক্তি কল্পনা ও অন্যান্য মনোবৃত্তি কাজ করতে পারে। নিজের এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে রাজনারায়ণ যে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য। "স্বতঃসিদ্ধতা, আদিমত্ব, অবশ্য বিশ্বসনীয়তা এই সকল লক্ষণ থাকাতে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল এক পূর্ণ পদার্থ আছে এই বিশ্বাসকে আত্মপ্রত্যয় বলা যায়। উহা পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয়। পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয়ের এক আকার স্বাভাবিক সংস্কার। এই স্বাভাবিক সংস্কারের প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা অন্ধরূপে কার্য্য করে। যখন বিশেষ বিশেষ পক্ষী যে দেশে বসন্ত বিরাজ করিতেছে সেই সেই দেশের দিকে গমন করে, তখন সেই দেশ কোন্ দেশ অবিজ্ঞাত থাকিয়াও সেই দিকে গমন করে। যখন নব মধুমক্ষিকা প্রথম মধুগর্ভপুষ্পের দিকে গমন করে, তখন মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত থাকিলেও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে গমন করে। মনুষ্যের আত্মা বাহ্য বিষয় কি আত্মাকে সহজ জ্ঞান দ্বারা যে রূপ স্পষ্টরূপে অনুভব করে, ঈশ্বরকে সেরূপ অনুভব করিবার পূর্ব্বে এই অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়াও এই অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রতি নির্ভর জন্য তাঁহার দিকে গমন করে। কুক্কুটি যেমন একখণ্ড খড়িকে ভ্রমবশতঃ আপনার অণ্ড মনে করিয়া তাহাকে উত্তাপ প্রদান করে সেইরূপ মনুষ্য নৈসর্গিক পদার্থসকলকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহাদের উপাসনা করে। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে কৌশলের সাম্যত্ব অনুভব করে তখন একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করে, তখন সে যে সহজ জ্ঞানের দ্বারা পদার্থ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব করে, সেই সহজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকেও স্পষ্ট রূপে অনুভব করে। তখন যে ঈশ্বরকে তাহার আত্মা পূর্ব্বে স্বাভাবিক সংস্কার-বশতঃ অন্ধরূপে অন্বেষণ করিতেছিল সেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।"[২] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে রাজনারায়ণ এ ক্ষেত্রে সহজ-জ্ঞান বা, স্বজ্ঞার উপরই বেশি

---

১. ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক), ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ, ব্রহ্মাব্দ ৫৭, পৃ. ৩

২. তদেব, ১ম অধ্যায়, পৃ. ১৮-১৯

জোর দিয়েছেন। এতদ্‌ব্যতীত রাজনারায়ণ স্বজ্ঞাজাত আত্মপ্রত্যয়ের[১] কথাও বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বজ্ঞাবাদ অতি প্রাচীন মতবাদ। প্রাচীন দার্শনিকদের কাছে সত্য ছিল উপলব্ধিগত ব্যাপার, বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। তাই অভিজ্ঞতাবাদ বা বুদ্ধিবাদের বহু পূর্ব থেকেই তত্ত্বদর্শনে স্বজ্ঞাবাদীদের (Intuitionists) মূল বক্তব্য হল স্বজ্ঞা বা বোধিই প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনারায়ণ স্বজ্ঞার এক নূতন এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ করলেন। তিনি বললেন যে, অলৌকিক ঈশ্বরকে যে স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব তা নিছক সহজাতজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়, তা হল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি (Hyperphysical Intuition বা Intuitive Knowledge)। ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৃশ্যমান বহির্জগতের অভিজ্ঞতা দান করে, অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি অলৌকিক সত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান দান করে, এ ক্ষেত্রে অলৌকিক বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই অনির্দিষ্ট সন্ধানের (পূজা-অর্চনাদির দ্বারা) ফলে জগতের আদি কারণের ইন্দ্রিয়াতীত মিলন সম্ভব হয়। মানবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয় ব'লে জড়দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনো সাহায্য করতে পারে না, এই হল আত্মার সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক সংযোগ।

স্বজ্ঞার উপর রাজনারায়ণ বেশি জোর দিলেও, জ্ঞান বা বুদ্ধিকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর মতে জ্ঞান ও বুদ্ধি ব্যতীত নিছক অনুভূতি শূন্যগর্ভ। চরম সত্তার জ্ঞান যেমন অনুভূতিবেদ্য তেমনি জ্ঞানসাপেক্ষ— এ কথাই রাজনারায়ণ মনে করেন। এ-সম্পর্কে তিনি *A Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj* পুস্তিকায় বলেছেন: "Intuition lays the ground work and the reasoning raises the superstructure of religion." যুক্তি (Reason) বা প্রজ্ঞা দ্বারা যে তথ্য লাভ হয় তা যেমন বিশ্বাসযোগ্য তেমনই স্বজ্ঞা দ্বারা চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় তাও ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য। "As the creeper, though unconsicious of the tree situated near it, instinctively grows in its direction to climate, and twine itself around the same, so the human soul, though

১. আত্মপ্রত্যয়ের রাজনারায়ণ-কৃত ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Intuitive Belief.

ignorant of the unknown God, instinctively seeks after him to descend upon him for support."[১] লতা যেমন অলক্ষিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে সন্নিকটস্থ বৃক্ষের উপর ওঠে এবং বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে, তেমনি মানবাত্মাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সচেতন না হয়েও তাঁরই উপর নির্ভরশীল হয় এবং তাঁকেই আশ্রয় করে জীবন ধারণ করে।

প্রাচ্য দার্শনিকদের মধ্যে স্বজ্ঞাবাদের একজন প্রধান সমর্থক আচার্য শংকরাচার্য। শংকরের মতে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমাদের চরম সত্তার উপলব্ধি হয় না, সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি হয় স্বজ্ঞায়। রামমোহনের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের অনুমানলব্ধ জ্ঞান এই-ই প্রতিপন্ন করে যে, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও সংরক্ষক এবং তিনি আমাদের পূজ্য। এই পূজার মধ্যেই দ্বিত্ব (dualism) বিদ্যমান ; এজন্য পূজার মাধ্যমে পরমসত্তার প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাধি বা অপরোক্ষানুভূতিরূপ উচ্চাঙ্গের আরাধনা দ্বারাই পরম সত্তাকে জানা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, স্বজ্ঞা বা আত্মপ্রত্যয়ের (Intuition) সাহায্যেই ঈশ্বর ও অন্যান্য মৌথিক ধর্মীয় সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। কেশবচন্দ্র এই মতবাদ সমর্থন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ের পূর্বে সহজ জ্ঞান আবশ্যক ; তাঁর মতে এই সহজ জ্ঞান (Common Sense) হল পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহকে জানবার মানুষের সহজাত শক্তি, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধির কোনো সংমিশ্রণ নেই।

বিশ্বের চরম সত্তার জ্ঞানসম্পর্কে ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে রাজনারায়ণের মতপার্থক্য লক্ষণীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য-দার্শনিক— হিউম, লাইবনিজ, কাণ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের মতবাদের সঙ্গে রাজনারায়ণের মতের বহুলাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। হিউম তাঁর *Enquiries concerning Human understanding* গ্রন্থের মধ্যে দুই প্রকার সত্যের উল্লেখ করেছেন— Relation of Ideas and Ideas about matter of fact যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা অভিজ্ঞাতলব্ধ matter of facts বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু Relation of idea স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রামাণ্য, কাজেই সন্দেহাতীত। এগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, এগুলি মৌলিক সত্য। লাইবনিজও তাঁর *Monadology* গ্রন্থের মধ্যে necessary truths এবং contingent

১. Rajnarain Bose, *Hints Shewing the Feasibility of constructing a Science of Religion*, p. 4.

truths-এর মধ্যে প্রভেদের মাধ্যমে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কাণ্ট তাঁর *Critique of Pure Reasoning*-এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধি বা যুক্তির মধ্যে চরম তত্ত্বকে (Ultimate Reality) জানবার অদম্য প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এ সম্যকরূপে চরম তত্ত্বকে অনুধাবন করতে পারে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকে, তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলেই নানারকম স্ববিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর মতে চরম তত্ত্ব মৌলিক সত্য বলে এ যুক্তির দ্বারা অনুভূত হয় না, এ নৈতিক বা ব্যাবহারিক জ্ঞানসাপেক্ষ, অর্থাৎ একমাত্র বিশ্বাস বা প্রতীতির (Practical Reason) দ্বারাই এ স্বীকার্য।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চরম তত্ত্ব বা বিশ্বের আদি কারণের (First cause) বিষয় জানার পক্ষে রাজনারায়ণ জোর দিয়েছেন Hyperphysical Intuition বা ইন্দ্রিয়াতীত স্বজ্ঞার ওপর। অপরপক্ষে কাণ্ট বলেছেন আমাদের Intellectual Intuition যদি সম্ভব হত তা হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেত; কিন্তু স্বজ্ঞা (Intuition) আবশ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Sensuous)। এজন্য এই স্বজ্ঞা আমাদের একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেরই জ্ঞান দান করে। তিনি আরো বলেন যে, Theoretical reason দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয় বটে কিন্তু Practical reason অর্থাৎ ব্যাবহারিক বা নৈতিক যুক্তি আমাদের তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারে এবং এর সাহায্যে আমরা ঈশ্বর, আত্মা এবং জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি।

শেষ পর্যন্ত কাণ্ট জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাপারে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। কাণ্ট তাঁর বিচারবাদে (Criticism) অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির আংশিক অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে দুটি উপাদানের কথা কাণ্ট বলেছেন— একটি উপাদানগত, অপরটি আকারগত। উপাদানগত যে জ্ঞান তা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা-লব্ধ; আর আকারগত জ্ঞান বুদ্ধি-লব্ধ— তা দেশ (space), কাল (time), দ্রব্য (substance), কার্যকারণ সম্বন্ধে (causality), প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক সহজাত বা প্রাক্‌সিদ্ধ (apriori) ধারণা। অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপাদানের এবং সহজাত এই প্রত্যয়ের সংযোগে জ্ঞান গঠিত হয়। কিন্তু কাণ্ট জ্ঞানের দুটি উপাদানকে সমন্বয় করলেও, পারমার্থিক তত্ত্বের কথা অজ্ঞেয়বাদে (agnosticism) শেষ করেছেন।

---

১. দ্রষ্টব্য : Immanual Kant, *Critique of Pure Reason*, (1930), pp. 178-89.

কান্ট যেখানে কেবল অভাব দেখিয়েছেন— পূরণ দেখাতে পারেন নি, রাজনারায়ণ সেখানে অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি প্রথমত 'Hyperphysical Intuition' এবং তার পর 'perceiving faculty'র উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে স্থূল দৃষ্টিতে আমরা জগতের স্থূল বস্তুসমূহ দেখি, আর ঈশ্বর এবং আত্মার দর্শন লাভ করি ইন্দ্রিয়ের অতীত দৃষ্টি দ্বারা : "By means of physieal perception we perceive physical objects. By means of heperphysical perception we perceive soul and God."[১] উপনিষদেও এইভাবে ঈশ্বরদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের (Descartes) চরম-তত্ত্বের (Ultimate Reality) ধারণার সঙ্গে রাজনারায়ণের চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ডেকার্ট তিন প্রকার ধারণার উল্লেখ করেছেন। কতকগুলি ধারণা সহজাত বা জন্মগত (Innate) কতকগুলি ধারণা কল্পনা-প্রসূত ও অবাস্তব, নিছক মনেরই উদ্‌ভাবনমাত্র (Fictitious)। অবশিষ্ট ধারণাসমূহ বহিরাগত অর্থাৎ বহির্জগতের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত (Adventitious)। ধারণাসমূহের মধ্যে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণাই ডেকার্টের মতে, অন্যতম ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হল— কোথা থেকে এই ধারণা উদ্‌ভূত হয়? এই ধারণার কারণ কী? ডেকার্ট বলেন, যেহেতু ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে অসীম, পূর্ণ স্বাধীন সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞানসম্পন্ন সত্তার ভাব নিহিত সে হেতু এই ধারণা বহিরাগত নয়, আবার কল্পনাপ্রসূতও নয়, এ অবশ্যই সহজাত, স্বকীয় আত্মচেতনার মতোই এ স্বতঃপ্রসূত। ডেকার্ট প্রধানত তিন প্রকার যুক্তি উত্থাপন করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তন্মধ্যে দুটি যুক্তির সঙ্গে রাজনারায়ণ-প্রদত্ত মতের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর এই দুটি যুক্তিকে[২] আদিকারণ-বিষয়ক (Causal Argument) আখ্যা দেওয়া হয়।

১. *Hints shewing the Feasibility of constructing a Science of Religion*, p. 6.

২. আদিকারণ-বিষয়ক ডেকার্টের দুটি যুক্তি (Causal Argument) হল এই—

প্রথম যুক্তি— প্রত্যেক কার্যেরই অবশ্যই যথোচিত কারণ থাকবে, কারণ ব্যতীত কোনো কার্যই উৎপন্ন হয় না। আমার মধ্যে যে সম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান তা স্বরূপত কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন একটি কার্য (effect) এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা কার্যত সর্বাধিক পূর্ণ ও অসীম সত্তার ধারণা। সুতরাং এ সুস্পষ্ট যে, কোনো সসীম ও অসম্পূর্ণ কারণ এই অসীম ও পূর্ণ কার্য উৎপন্ন করতে পারে

ডেকার্ট ও রাজনারায়ণের মধ্যে মতের পার্থক্যও আছে। তা হল এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসের ব্যাপারে রাজনারায়ণ আত্মপ্রত্যয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কার্যমূলক যুক্তির (Aposteriori Reasoning) ক্ষীণতা স্বীকার করেছেন। রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন যে, কার্যমূলক যুক্তি দ্বারা এ-ই প্রতিপন্ন হয় যে 'কারণের কারণ, আবার তার কারণ, আবার তার কারণ, এইরূপ কারণের অনন্ত শ্রেণী চলে গেছে'। কিন্তু এতে অনাদি কারণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয় না। রাজনারায়ণ কার্যমূলক যুক্তির ক্ষীণতা দেখিয়ে আরো বলেছেন যে, "পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় ও পুণ্য করিলে তাহাতে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, অতএব ঈশ্বর পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন এবং তিনি নিজে পবিত্র স্বরূপ, এমন প্রমাণীকৃত হয় না। যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পাপী ব্যক্তি সুখ লাভ করিতেছে ও কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছে।"[১] এইভাবে রাজনারায়ণ কার্যমূলক যুক্তির ক্ষীণতার বিষয় বললেও— উক্ত যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয় স্ফূরণে কার্যমূলক যুক্তি আত্ম-প্রত্যয়ের সহায়ক হয়। এ-ব্যাপারে ডেকার্ট যুক্তির উপর সমাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বরূপ রাজনারায়ণ যেভাবে আলোচনা করেছেন, তা দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেলের জ্ঞানোৎপত্তি আলোচনার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই (Dialectic Method) স্মরণ করিয়ে দেয়। হেগেল চিন্তার ক্ষেত্রে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র এই নীতি প্রয়োগ করেছেন। হেগেলের

না। অতএব নিশ্চয় অসীম ও পূর্ণ সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃক আমার মনে এই ধারণা উৎপন্ন বা সঞ্জাত হয়েছে।

দ্বিতীয় যুক্তি— আমার নিজস্ব অসম্পূর্ণতা, বিশেষতঃ আমার অসম্পূর্ণতার জ্ঞান থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ আমি জানি যে, আমি অসম্পূর্ণ এবং আমি এও জানি যে এমন কিছু পূর্ণতা আছে যা আমার মধ্যে অভাব। সুতরাং আমি বস্তুত যা এবং আমি যা হবার যোগ্য— এগুলির জন্য আমি নিশ্চয় অধিকতর পূর্ণ সত্তার ওপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাই যখন চরম পূর্ণ সত্তার ধারণা, তখন এই ধারণাই অসম্পূর্ণ সত্তার আদি কারণ। অতএব ঈশ্বর অবশ্যই অস্তিত্বশীল। দ্রষ্টব্য : Rene Descartes, *A Discourse On Method*, pp. 98-100.

১. ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ (ব্রহ্মাব্দ ৫৭), পৃ. ২৭

চিন্তাধারা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে; প্রথমটি সদর্থক (Thesis), এ অসম্পূর্ণ বলে এর বিপরীত নঞ্‌র্থক ধারণার (Antithesis) উদ্‌ভব ঘটে এবং এই দুই ধারণার সমন্বয়ে (Synthesis) তৃতীয় ধারণার উদ্‌ভব হয়ে থাকে। এইভাবে হেগেলের চিন্তা-পদ্ধতি চরম বা পরম ধারণায় (Absolute Idea) গিয়ে পৌঁচেছে। এবং সেই ধারণা সম্বন্ধে হেগেল বলেন যে, তা শাশ্বত এবং এই ধারণাগুলি আমরা অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পারি না। এ আমাদের সহজাত ধারণা। রাজনারায়ণের চিন্তা-পদ্ধতি পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সমতুল্য। 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থে (পৃ. ১৫) তিনি বলেছেন, "আমরা স্বতন্ত্র নহি, আমরা অপূর্ণ ও পদে পদে আমাদিগের পরতন্ত্রতা অনুভব করি। আমরা নিয়তই যে স্বতন্ত্র-স্বভাব কোন পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতেছি, ইহা না বিশ্বাস করিয়া আমরা কখনই থাকিতে পারি না। আত্মার নির্ভর ভাবের ভিতর শেষ নির্ভরস্থল স্বরূপ অনাদি নিরালম্ব পূর্ণ পদার্থের ভাব ভুক্ত আছে। নির্ভরের ভাব শেষ নির্ভরস্থলের অস্তিত্ব বুঝায়। আমাদের স্বভাব ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব অপূর্ণ, ইহা যেমন আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না; তেমনি কোন পূর্ণ পদার্থের প্রতি আমরা ও বাহ্য পদার্থ সর্ব্বদা নির্ভর করিতেছে, এ বিশ্বাস আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব ঐ প্রত্যয় অবশ্য বিশ্বসনীয়। এ বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না, অতএব তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের ভাব মূলভাব,···অতএব ঐ ভাব আদিম। ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় যেমন অবশ্য বিশ্বসনীয়, স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক তেমনি তাহা সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত।" অপর পক্ষে হেগেল তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, পরমসত্তার মধ্যে জড় ও চেতনার বিরোধিতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে এই নব্য ভাবধারার প্রবর্তয়িতা রাজনারায়ণ যথার্থই যুগচিন্তার অন্যতম ধারক। তাঁর 'ঋষি' আখ্যা এখানেই সার্থক। সত্যদ্রষ্টা তিনি— তাই পরমার্থ চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েও মানবকল্যাণের মহত্তম কর্মে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

উনিশ শতকীয় অধ্যাত্মচিন্তায় রাজনারায়ণের শ্রেষ্ঠ অবদান ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপনের এক অভিনব দৃষ্টান্তের অবতারণা। কেবলমাত্র সহজজ্ঞান (Intuition) ও আত্মপ্রত্যয় (Intuitive Belief) দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হতে পারে না; এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলোক ও শানিত যুক্তিরও প্রয়োজন হয়— এই কথাই প্রচার

করলেন তিনি। রাজনারায়ণের মতে ধর্মের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর উপর আস্থা ঈশ্বরতত্ত্বের প্রথম কথা। রাজনারায়ণের পূর্বে ধর্মের ক্ষেত্রে এইরূপ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর প্রথম প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্ত। রাজনারায়ণও অধ্যাত্ম-বিষয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সংযোগ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয়কুমার যে-সময়ে বেদের অভ্রান্ততা ও প্রার্থনার আবশ্যকতা ইত্যাদি নিয়ে যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় লিপ্ত, রাজনারায়ণও সেইসময় বিজ্ঞান-সম্মত, দার্শনিক আলোচনাপূর্ণ 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' পুস্তক প্রণয়নে অভিনিবিষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার যেমন ছিলেন Scientist, ঐ একই সময়ে Atheist-রূপে আমরা দেখি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। আর এই একই কালে রাজনারায়ণকে আমরা দেখি একাধারে Scientist ও Theist রূপে। এ ক্ষেত্রে কারো চিন্তা-ধারায় অসংগতি প্রমাণ করা যায় না। যুগপ্রয়োজনেই অক্ষয় দত্ত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে Scientist-এর দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েছিলেন ; একই কারণে রাজ-নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছিল Scientist-এর ও Theist-এর ; বিদ্যাসাগরের Atheist হওয়ার হেতু একই। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে Scientist রাজনারায়ণের পরিচয় আমরা পাই তাঁর Science of Religion প্রবন্ধে। ধর্মের বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা সম্ভব কিনা— উক্ত রচনাটিতে সেই বিষয়টির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তিনি। প্রবন্ধটি একসময় জনসমাজে আদৃত হয়েছিল। *Brahmo Public Opinion* (May 30, 1878)-এর মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়।[১] অপর দিকে *Hindu Theist's Brotherly Gift to*

১. "The Science of Religion has a unique interest for all Brahmos. It is, in short, their Theology. Very few Brahmos have, however, sufficiently appreciated its importance or devoted their attention to it. ...We most heartily welcome this little book and hope it will be extensively read by Brahmos. We may be quite proud of it as the author has not simply borrowed from Europeans but derived some of his ideas on the subject from Sanskrit sources. ...Like Geometry, Theology or the Science of Religion is a deductive science. The former begins with a few axioms and definitions, and constructs from them by deductive reasoning the whole body of the science. The latter starts from certain axioms known intuitively and develops by deductive reasoning the truths which are implicitly contained in them."

English Theists, Theistic Toleration and Diffusion of Theism পুস্তিকা দুটিতে Theist রাজনারায়ণের পরিচয় সুস্পষ্ট। রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তা ব্যতীত স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ -কামনার মধ্যেও ছিল ব্রহ্মবাদকে জীবনে প্রধান স্থান দেওয়ার প্রসঙ্গ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মকে এক পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা—এ নিয়ে রাজনারায়ণ আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বলেছেন, বাহ্যবস্তু যেমন আমরা অনুভব করি, ঈশ্বর ও আত্মা তেমনি উপলব্ধ হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, বাহ্য বস্তুর বেলায় জ্ঞানের উপকরণ ইন্দ্রিয়, আর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উপকরণ ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি বা স্বজ্ঞা (Intuition)। বস্তুবিজ্ঞানে যেমন প্রাথমিক জ্ঞান হয়, ঈশ্বরজ্ঞানেও তেমনি, প্রাথমিক প্রত্যয়নির্ভরতা আছে। বিজ্ঞান-নির্ভরতার মতোই এ ক্ষেত্রেও নির্ভরতা থাকায় ধর্মও মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান বলে গণ্য। বস্তু-বিজ্ঞানের জ্ঞান যে পদ্ধতিতে স্বজ্ঞা (Intuition) ও যুক্তি (Reasoning) দ্বারা আহৃত হয়, ধর্মবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য। সুতরাং রাজনারায়ণের মতে "As all other sciences are reliable, so is the science of Religion"[১]—তাই ধর্মজ্ঞানকে (ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে) রাজনারায়ণ ধর্মবিজ্ঞান বা 'Theological Science' বলেছেন।

ধর্মকে বিজ্ঞান আখ্যায় ভূষিত করার স্বপক্ষে রাজনারায়ণের যুক্তিগুলি একে একে উপস্থাপিত করা গেল। ধর্মকে বিজ্ঞান বলাতে অনেকে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, ধর্ম কখনো বিজ্ঞান নয়, কেননা সে নিশ্চিত সত্যের সন্ধান দেয় না। এর উত্তরে রাজনারায়ণ বলেছেন, বিজ্ঞানও অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সে-সব বিচার করে দেখতে গেলে ধর্ম বিজ্ঞানের শ্রেণীতেই পড়ে। তাই তিনি বলেছেন :

As the foundation of all other sciences is a belief in our faculties, so the foundation of the science of Religion is a belief in our faculties."[২]

---

১. *Hints shewing the Feasibility of constructing a Science of Religion*, p. 15.

২. Ibid, p. 15.

কোনো কোনো দার্শনিকের মতে ধর্ম অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ব'লে ধর্মকে বিজ্ঞান বলা যায় না। এর উত্তরে রাজনারায়ণ বলেছেন, মানুষের মন, বুদ্ধি, শক্তি ও ইন্দ্রিয় -গ্রাহ্য নয়— তথাপি তো এগুলি বস্তুবিজ্ঞানের বিষয়। বিন্দু, রেখা এগুলিরও ঠিক পরিমাপ করা যায় না ; বিদ্যুৎশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চুম্বকশক্তি— এই-সব শক্তি ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তবু এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ না জেনেও, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে পারি না।

ধর্ম বিজ্ঞান কিনা— এর স্বপক্ষে রাজনারায়ণ আরো এক যুক্তি স্থাপনা করেছেন। বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা ধর্মের মতভেদের জন্য একে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করতে রাজী নন। রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানেও প্রচুর মতভেদ আছে। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, বাস্তব-জীবনের ভূয়োদর্শন (Observation Experiment) এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যেমন সত্যানুসন্ধান করা হয়, তেমনি ধর্মজগতেও আধ্যাত্মিক সমীক্ষা ও ধার্মিক ব্যক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্যানুসন্ধান করা হয়। তাঁর এই সম্পর্কিত অভিমত উল্লেখযোগ্য :

"...when other sciences can be believed in, the science of Religion can also be believed in. When we believe in the results of the material observation and experiment of natural philosophers why should we not believe in the results of the spiritual observation and experiment of religious men? These results deserve of being systematized into a science by men of science. By accomplishing this task, they will confer upon mankind the greatest boon that has hitherto been conferred upon it by them."[১]

অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে রাজনারায়ণ তাঁর *A Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj* পুস্তিকায় বলেছেন যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ধর্ম যমজ ভগ্নীর মতো। একের ধ্বংসে অপরের ধ্বংস। "True science and true religion are twin sisters and

---

১. *Hints shewing the Feasibility of constructing a Science of Religion*, p. 15

the separation of either from the other is sure to prove the death of both." রাজনারায়ণের মতে যে-ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তি আছে, দার্শনিক সত্য আছে, সে ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করবেই। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র শুধু জড়বস্তুর সত্যেই বিশ্বাসী নয়, অধ্যাত্মদর্শন (Spiritual Philosophy) চর্চায়ও আত্মনিয়োগ করেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের হাত ধরে চলবার পক্ষে ধর্মের যে সুযোগ এসেছে ব্রাহ্মধর্ম তারই দৃষ্টান্ত।

দেখা যাচ্ছে রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তায় Thinking, Feeling, Willing —জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বুদ্ধিবাদ থেকে তাঁর ধর্মচিন্তা শুরু; 'ধৰ্ম্মতত্ত্বদীপিকা'—প্রথম ভাগে তার পরিচয়। ভক্তি-বাদের কথা The Religion of Love প্রবন্ধে, 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তকে কর্ম-যোগের প্রসঙ্গ। রাজনারায়ণের সমসাময়িককালে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথায় ব্যতীত আর কারো চিন্তাধারায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মরূপ— মানব-জীবনের এই ত্রিধারার মিলনের কথা এত স্পষ্টভাবে শোনা যায় নি।

ধর্মের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে জ্ঞান ও ভক্তির, আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধির, প্রীতি ও প্রিয়কার্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। রাজনারায়ণ বলেছেন: "যদ্যপি আমরা বন্ধুর উৎকৃষ্ট গুণ সকল না জানি, তবে তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে ভক্তি করিতে সমর্থ হইব? সেইরূপ আমরা যদি ঈশ্বরের অনন্ত ও অনুপম লক্ষণ সকল জ্ঞান দ্বারা না জানিতে পারি, তবে কি প্রকারে তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে সমর্থ হইব? আবার ওদিকে যদি কেবল তাঁহাকে আমরা জানিলাম ও প্রীতি ভক্তি না করিলাম, তবে তাঁহাকে জানায় কি ফল হইল? প্রীতি ও ভক্তি বিহীন ধৰ্ম্ম— ধৰ্ম্মই নহে। জ্ঞান যদি কর্ণধার না থাকে, তবে সে ভক্তিকে গুরুপূজায় ও অন্যান্য পৌত্তলি-কতায় উপনীত করে আর যদি ধৰ্ম্ম জ্ঞানপ্রধান হয়, তবে সে নীরস ও কঠিনরূপ ধারণ করে, অতএব ব্রাহ্মধৰ্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।"[১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ ধর্মের ক্ষেত্রে যেভাবে জ্ঞান ও ভক্তির পারম্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক John Caird-এর ধারণার[২] সঙ্গে তার বহুলাংশে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

---

১. আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা (১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক) একমেবাদ্বিতীয়ম্— রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (পৃ. ৩৮) ২য় ভাগ থেকে গৃহীত।

২. John Caird তাঁর *An Introduction to the Philosophy of Religion*-এ

রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তা ও তাঁর দার্শনিক অভিমত সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হল। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে তাঁর এই চিন্তা-ধারার বিশেষ মূল্য আছে। তাঁর প্রজ্ঞালোকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূল সুরটি। জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ভূমি কর্ষিত হলে, যুক্তি, ভক্তি ও প্রত্যয়রূপ বারিবিন্দু সিঞ্চন দ্বারা ধর্মের বীজ বপন করলে, যে মহীরুহের অঙ্কুরোদ্‌গম হবে— তাই-ই কালে মানবজীবনকে দান করবে পরিপূর্ণতা-ফল। সে জীবন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান করে লৌকিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক অপূর্ব সংযোগসেতু স্থাপন করবে। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে তর্ক-আলোচনা নয়, ভক্তির আবেগ-উচ্ছলতা নয়, প্রত্যয়ের অন্ধ অনুসরণও নয়, ত্রিবিধের সম্মিলনে সর্বতামসিকতা মুক্ত হয়ে অন্তরে পূর্ণ জ্ঞান জাগ্রত হয়ে উদিত হবে পূর্ণজ্যোতির। মানবজীবনে তাই-ই সত্য, শিব ও সুন্দর। তার দ্বারাই ভগবৎ-বিভূতি উপলব্ধ হবে, তার দ্বারাই মানবের দেবত্ব-অংশ জাগ্রত হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। রাজনারায়ণের আশা ছিল এই ধ্যানে একদিন জাগ্রত হবে অতীত ঐতিহ্যে পূর্ণ অধুনা তমসাবৃত ভারতসংস্কৃতি, ক্লীবত্বপ্রাপ্ত জাতি এই সাধনায় খুঁজে পাবে মুক্তির পথ।

ভারতের লোকোত্তর পুরুষদের জীবনে দেখা যায় নিজের মুক্তি তাঁদের কাম্য নয়, নির্বাণ লাভ তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; যে আনন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি জীবনে হয়, তা লোকশ্রেয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা— এই তাঁদের জীবনের পরম লাভের চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁদের ধর্মকর্মের প্রেরণা, ধর্মচিন্তার

বলেছেন, "To say that man is religious because he is rational, is not the same thing as to say that religion has its seat in the intellectual part of man's nature, as distinguished from the emotional or the active. In truth, the question about which so much has been made, as to what special faculty of division of human consciousness it is to which religion distinctively belongs, —whether, in other words, religion is characteristically a thing of knowledge, or of feeling, or of volition and action,— is one which rests on a false or defective psychology. The spiritual life and consciousness of man can not be broken up...into independent divisions or departments... There is no feeling or volition which does not contain in it implicitly an element of knowledge, nor any kind of knowledge which does not presuppose feeling..."—pp. 152-53.

উৎস এখানেই। তাই ধর্মকে এঁরা দৈনন্দিন জীবনের আচারসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে অনুভূতির আলোক দ্বারা জীবনকর্মে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। সেখানে তাঁদের ধর্মের ভিত্তি হৃদয়বত্তা ; আর ধর্মের দ্বারা যখন সমাজ-মঙ্গলের চিন্তা করেছেন, তখন হৃদয়বত্তার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার অপূর্ব সংযোগে কর্ম-প্রচেষ্টার শুভ সমাপ্তি হয়েছে।

ধর্মচিন্তাকে রাজনারায়ণ জাতীয়তাবোধ বিকাশের পরিপূরকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার মতো দিগ্‌দর্শক স্বরূপ হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্রটি— 'ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।' রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ প্রমুখ উনিশ শতকের মহামনীষীরা মানবকল্যাণ ও জাতীয় উন্নতিবিধানকেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম এবং ঐ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ঈশ্বরের যথার্থ আরাধনার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই এই-সমস্ত মনীষীকল্প ব্যক্তিবর্গ অধ্যাত্ম-চিন্তার ধ্যানলোকে অবস্থান করেও দেশ ও জীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অভ্যুদয়ের চিন্তা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যযুগে ধর্ম এইভাবে আর-একবার জাতীয় চেতনা উদ্‌বোধনে সচেষ্ট হয়েছিল। জাতীয়ভাবে প্রবুদ্ধ হয়েই রাজনারায়ণ ধর্মচর্চা ও দর্শনচিন্তা করেছিলেন।

রাজনারায়ণের জীবনে, চরিত্রে, প্রকৃতিতে তাঁর চিন্তায় ও ধ্যানে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল স্বাদেশিকতা। এই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই রাজনারায়ণের ধর্মান্তর গ্রহণ, এই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচারের আগ্রহ ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষাতেই রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্টতা জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম স্বতন্ত্র কোনো ধর্ম নয়, হিন্দুধর্মের সারনির্যাস ব্রাহ্মধর্মেই নিহিত। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্মেরও তাই। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত হিন্দু-অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মনাম উচ্চারিত হয়, ব্রাহ্মদের অনুষ্ঠানও তদনুরূপ। ব্রহ্মই কেন্দ্রবিন্দু— যার থেকে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়ে, ব্রাহ্মধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনারায়ণের মূল বক্তব্য হল এই :

"As our ideas of Brahma are substantially the same with the Hindoos in general and specially with those of the

writers of the Upanishads, which every Hindoo regards with veneration, we are Hindoos in religious belief."[১]

রাজনারায়ণ মনে করেন যে, ব্রাহ্মদের যখনই ঈশ্বরবিশ্বাসী বলা হয়, তখনই তাঁদের হিন্দুধর্মানুরাগী হিন্দুও বলা যায়। যেহেতু হিন্দু নামের সঙ্গে ব্রাহ্মদের নাম নিবিড়ভাবে যুক্ত, সেহেতু এই ধর্ম ভারতের অতীতের সঙ্গেও যুক্ত, যার দ্বারা দেশপ্রেমিক অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অতীতের কত গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করে। হিন্দুনামের ব্যাপকতা ও উদারতা চিন্তা করে রাজনারায়ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেহেতু "হিন্দু ধর্ম্মের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম মূলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধর্ম্ম তেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে।"[২] ব্রাহ্মধর্ম এই প্রশস্ত ধর্মেরই অঙ্গীভূত। রাজনারায়ণ বার বার এ কথা বলেছেন যে, আনুষ্ঠানিক আচরণের দ্বারা ব্রাহ্মরা হিন্দু হয় নি, ধর্মবিশ্বাসেই তারা হিন্দু। হিন্দুদের যেমন বেদ সর্বস্ব, ব্রাহ্মধর্মেরও তাই। ব্রাহ্মধর্মকে রাজনারায়ণ 'The legitimate result of the highest teaching of the Vedas' বলে স্বীকার করেছেন। দৃষ্টান্তের অবতারণা করে অতঃপর তিনি বলেছেন, নানক-পন্থীরা, বৈষ্ণবেরা, শিবনারায়ণী দল এবং আরো অসংখ্য সম্প্রদায় মতে, পথে শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূল ধর্মবিশ্বাসে যেমন হিন্দু, ব্রাহ্মেরাও তাই। তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "Brahmoism is Hindooism and Brahmos are emphatically Hindoos."[৩] কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন—"Amidsts the thousand mutation of all Hindoo Religious opinion, the essence of Hindooism remains the same."[৪]

হিন্দুধর্মের সারাংশকে রাজনারায়ণ অবিনশ্বর মনে করতেন। বিপ্লবাত্মক উৎসাহে ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণেরা হিন্দুধর্মের নিশ্চিহ্ন হবার কথা বললেও রাজনারায়ণ তা বিশ্বাস করেন নি ; বরং স্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'It is imperishable as the stars of Heaven'। যে ধর্মে ঈশ্বরকে সকল আনন্দ, সকল

১. *Brahmic Questions of the Day— Answered*, 1869, p. 3.

২. হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৭৯৪ শক), পৃ. ২৩

৩. *Brahmic Questions of the Day— Answered*, 1869, p. 3.

৪. Ibid, p. 4.

সুখ এবং সকল মঙ্গল কর্ম বলে জানে, যে ধর্ম আত্মজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে মনে করে, সে ধর্মের কখনোই মৃত্যু নেই। হিন্দুধর্ম সার্বজনীন ব্রহ্মকে অবলম্বন করেছিল বলেই ব্রাহ্মধর্ম সার্বজনীন। নিরাকার পরম ব্রহ্ম, বিপুল বিশ্বের পালনকর্তা, তিনি সমগ্র মানব-সমাজের পরমেশ্বর ; যে ধর্মে ঈশ্বর-বিশ্বাসের এই স্বরূপ— সে ধর্ম উদার ও বিশ্বজনীন। হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের এখানেই নিবিড় যোগ।

উভয় ধর্মের যোগসূত্রটি দেখিয়েই রাজনারায়ণ বলেছেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিমুখ নয়, প্রাচীন হিন্দুধর্মকে সে ভাঙতে আসে নি, বরং বন্ধুভাবে সংশোধন এবং সংস্কার করতে চেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির বিশেষ মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ শঙ্কিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং হিন্দু জাতির স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি চেষ্টিত হন। শিক্ষিত বাঙালীর স্বধর্মে অনাস্থা এবং আরো কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়ের সক্রিয়তা দেখে রাজনারায়ণ হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন। বাঙালী সমাজের শিক্ষিত তরুণদল অপেক্ষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আদর্শ প্রচারের অধিকতর প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে পত্রে[১] লিখেছিলেন : "The ocean of Hindu Society remains the same as beforc, English Educated natives being but as a drop in the ocean, although they may fancy that whole India has been anglicized, and is basking in the sunshine of western knowledge and refinement." সুতরাং শিক্ষিত অথচ অবিশ্বাসী এই দল উপেক্ষণীয়।

কিন্তু উত্তরভারতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি, এবং ভারতের উত্তর প্রদেশে ভারত ধর্ম-মহামণ্ডলের ব্যাপক কার্যাবলী খুব উপেক্ষণীয় নয়। আর্যসমাজের আন্দোলনের রূপটি ছিল সর্বভারতীয়। বেদ-বিশ্বাসী যে-কোনো ব্যক্তিই আর্য-হিন্দু নামে ঐ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী নিজে গুজরাটী

১. ১৮৭৮ সালের ১৫ জুন তারিখে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৫১ শক, পৃ. ১১৮

হয়েও উত্তর ভারতে বিশেষত পঞ্জাবে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও জাতিকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলাই আর্যসমাজী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের জন্য দয়ানন্দ সরস্বতী বেদকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রত্যাদৃষ্ট বলে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। আমেরিকার থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির প্রভাব একসময় ভারতের হিন্দু-সমাজের উপর পড়েছিল। মিসেস অ্যানি বেশান্ত উক্ত সোসাইটির আদর্শ এদেশে প্রচার করেন। মিসেস বেশান্ত প্রতিমাপূজার সমর্থক ছিলেন এবং হিন্দুদের ধর্ম বিশেষ সমর্থন করেছেন এবং প্রশংসাও করেছেন। হিন্দুর সনাতন ধর্মাদর্শ ও শিক্ষানীতি সর্বতোভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেন ভারত ধর্ম-মহামণ্ডল। ব্রাহ্মসমাজের মতো এমন একটি সর্বভারতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এতগুলি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচারের সুযোগ লাভ করেছে এবং স্থানবিশেষে সফলতাও অর্জন করেছে— এই চিন্তা করে রাজনারায়ণ বিস্মিত হয়েছেন। এর কারণ অবশ্য তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর উক্তিই উদ্ধৃত করা হল :

"From this it is evident that the Brahmo movement is a superficial one, and has not penetrated into the very depths of Hindu Society. What is the cause of this ? The cause is we do not know how to move Hindu Society. Hindu Society must be moved in a Hindu way."[১]

এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়েই রাজনারায়ণ সর্বতোভাবে হিন্দুত্বের পুনরুত্থান চেয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তক এই আদর্শের প্রথম প্রচেষ্টা। আচারে-আচরণে, আহারে-বিহারে— দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতিটি কর্মে হিন্দুর ধর্মপ্রাণতা লক্ষ্য করে তিনি হিন্দুত্বের জাগরণে ধর্মকেই আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে "হিন্দু ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধর্ম্মে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।"[২] তা ছাড়া রাজনারায়ণ মনে করতেন যে, "ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা।··· হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে

১. শিবচন্দ্র দেবকে লিখিত রাজনারায়ণের পত্র (১৫ জুন, ১৮৭৮), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০১ শক, পৃ. ১১৮

২. হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা (১৭৯৪ শক), পৃ. ৩৩

তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে।"[১] এই আদর্শের অনুসরণে ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল নীতির ভিত্তিতেই রাজনারায়ণ 'জাতীয়-হিন্দু ব্রহ্মবাদী প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করা সমীচীন মনে করেছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, হিন্দু ব্যতীত কেউ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না, এবং ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ হবে এদের মূল মন্ত্র। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রচার-প্রচেষ্টা নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন :

"We can not convert the whole world at once to Theism. But if our chief sphere of work be a single nation, we have the best chance of succeeding in it."[২] রাজনারায়ণের বিশ্বাস ছিল যে, এইভাবে National Religion[৩] স্বভাবতই একদিন Universal Religion এ পরিণত হবে। এর জন্য আড়ম্বরপূর্ণ পূর্ব-প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর ধর্মান্দোলন ইতিহাসে এর নজীর আছে। রাজনারায়ণ বিশ্বের ধর্মান্দোলন ইতিহাসে সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীস্টের সমকালীন ভক্তেরা ইহুদী নীতি পদ্ধতি মেনে চলতেন। মার্টিন লুথার খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করেন নি। পরন্তু বুদ্ধি এবং বিচার প্রয়োগ দ্বারা সংস্কারমুক্ত করে আদর্শ খ্রীস্টধর্ম তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। হজরত মহম্মদ প্রাচীন আরবের কাবা মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতি বজায় রেখেছিলেন।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মান্দোলন-চেষ্টা রাজনারায়ণকে যেমন সচকিত করেছিল, কলকাতায় হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যামূলক আন্দোলনেও তিনি

---

১. হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, পৃ. ৫৭

২. *The Adi Brahmo Samaj as a Church* (1873), p- 3.

৩. George Galloway তাঁর *The Philosophy of Religion* (p. 109) গ্রন্থে যে তিন প্রকার—(Tribal, National, Universal) Religion-এর কথা বলেছেন, তার মধ্যে National Religion -এর বিশেষ কার্যকরী শক্তির বিষয় লেখকের কথাতেই উদ্‌ধৃত হল : "The growth of the nation involves a widening of man's mental horizon : and the rise of a larger and more complex social order brings about a distinct advance in the personal consciousness. Through interaction with otherselves within a wider social system, man makes progress in individuality and knowledge of himself. One important consequence is that religion transcends the old naturalistic limitations, and gains in ethical character."

তেমনি কৌতূহলী হয়েছিলেন। কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এই সময় (১৮৮৪-৮৫ সালে) হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রবল আন্দোলন হয়। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দুধর্মের নূতন নূতন ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। বলা ব্যাহুল্য, এঁরা সকলেই একমতাবলম্বী ছিলেন না। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অনুগামী ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যা সমর্থন করতেন না; আবার ব্রাহ্মদের মত ও বিশ্বাসেও তাঁর আস্থা ছিল না। ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিম "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" ও "হিন্দুধর্ম"—ত্বটি প্রবন্ধে ধর্মের স্বরূপ ও হিন্দুধর্মের তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় বঙ্কিম একাধারে মনুসংহিতা, মীমাংসাদর্শন, মহাভারতের শ্লোক, কাণ্ট, হেগেল, ফিকটে, মিল, সীলি ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতামত উদ্ধৃত করেন। সীলির কথায় "the substance of Religion is Culture"— এই cultureকেই বঙ্কিম বলেছেন সুখ— 'সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য ও সমুচিত পরিতৃপ্তি'। বঙ্কিমের মতে এই 'সম্পূর্ণ স্ফূর্তি' 'অনুশীলন সাপেক্ষ'। সীলি religionকে আবার habitual and permanent admirationও বলেছেন। বঙ্কিম এর ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তি ব'লে, কিন্তু তাঁর মতে এই ভক্তিই ধর্ম নয়, এ ক্ষেত্রে অগাস্ত কোম্‌তের মতকে তিনি স্বীকার করেছেন— কোম্‌ত বলেছেন: 'Religion in itself expresses the state of perfect unity— which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society'— বঙ্কিম এই উক্তির সমর্থন করে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্মই সুখের কারণ বলে বিবৃত করেছেন, যেহেতু হিন্দুধর্ম উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সেহেতু বঙ্কিম হিন্দুধর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। রাজনারায়ণ বঙ্কিমের এই নূতন ধর্মব্যাখ্যা সমর্থন করেন নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৮০৫ শক) "নূতন ধর্মমত" প্রবন্ধ লিখে তিনি বঙ্কিমের মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। রাজনারায়ণ দার্শনিক স্পেনসারের মতবাদ উল্লেখ করে কোম্‌তের উক্তির অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং বলেছেন: "যদি কোম্‌তের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ হয় তাহা হইলে এমন হিন্দুধর্ম্ম আমরা চাহি না কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কোম্‌তের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ নহে। ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না।" রাজনারায়ণের ধর্মবিশ্বাস হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করেই

গড়ে উঠেছিল। স্পেনসারের দর্শন তাঁর মনোভাবের সমর্থক হয়েছিল মাত্র। স্পেনসার যে চৈতন্যকে 'Existing in himself'[১] বলেছেন রাজনারায়ণ তাঁকেই বলেছেন পরমাত্মা ব্রহ্ম— সেই ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। এইভাবে বঙ্কিমের সঙ্গে একালে মসীযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রাজনারায়ণ। বঙ্কিম-কৃত হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যাকে তিনি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন নি এবং জাতির পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন নি।

যে-হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান রাজনারায়ণ কামনা করেছিলেন সে-হিন্দুধর্ম জড়বাদ বা বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যাযোগ্য বস্তু নয়। তিনি ভারতের বিশেষ সাধন-লব্ধ ব্রহ্মবিশ্বাসী হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ প্রত্যাশা করেছিলেন। এইজন্যই ঐতিহাসিকেরা তাঁকে Hindu Revival-এর প্রথম প্রবর্তয়িতা বলেছেন। তাঁর প্রবর্তিত হিন্দুধর্মান্দোলনের প্রধান উপকরণ ছিল বেদ ও উপনিষদের বাণী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রাজনারায়ণ উপনিষদের চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। উপনিষদ্ ব্যতীত রাজনারায়ণ মহাভারতের বাণীকেও হিন্দুধর্ম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর হবে বলে মনে করেছিলেন। এজন্য তিনি মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেওঘরের সাব-ডিভিসনাল অফিসার এম. এস. জোন্সকে দেখতে দেন এবং পত্রে[২] লেখেন— "It will instead of destroying enhance the reputation of Hinduism.

"You think the work will be a charge of dynamite at the root of Hindooism. As dynamitards will not be able to subvert kingdoms so the unconscious dynamitard the translator, will not be able to subvert Hinduism."

---

১. "...Preserving our gravity, we have simply to recognize the obvious truth that Humanity has no corporate consciousness. Whatever consciousness known to each as existing in himself, is ascribed by him to other beings like himself, and in a measure to inferior beings; and there is not the slightest reason for supposing that there ever was, is now or ever will be, any conscciousness among men save that which exists in them individually. If then, the Great Being who is the author of all these conquests is unconscious, the emotions of veneration and gratitude are absolulcly irrelevant."— রাজনারায়ণ বসু, "নূতন ধর্ম্মমত", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৫ শক, পৃ. ৮৯

২. রাজনারায়ণের এই অপ্রকাশিত পত্রটির রচনাকাল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ।

উনিশ শতকের মহামনীষীদের ধর্মচিন্তা বা ধর্মান্দোলন নিছক আধ্যাত্মিকতা দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েই নয়, ধর্মচিন্তার সঙ্গে স্বতই ছিল জাতিগঠনের আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংস্থাপনের চিন্তা। ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় হিন্দুধর্মের ব্রহ্ম-বাদের ভিত্তিতে এক, অখণ্ড হিন্দুজাতিসংহতিরূপে গড়ে উঠুক— এই ছিল রাজনারায়ণের ঐকান্তিক কামনা। এই একতাবদ্ধ সংহতির রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার কেন্দ্রভূমি রূপে রাজনারায়ণ পরিকল্পনা করেছিলেন হিন্দু জাতীয় কংগ্রেসের। হিন্দু-জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী ধর্মের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। রাজনীতির সঙ্গে এইভাবে ধর্মচিন্তার মিশ্রণ রাজনারায়ণের অসীম জ্ঞানগভীরতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির ফল। ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল সুরটি স্মরণ করেই তিনি এই নব্য-হিন্দুধর্মের (Neo-Hinduism) প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলাদেশের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এই কৃতিত্বের অধিকারী যে রাজনারায়ণ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজনারায়ণ-প্রদত্ত প্রকৃত রাজনীতিবিদের সংজ্ঞায় রাজনারায়ণের নব্য-হিন্দুধর্মের আদর্শেরই প্রতিফলন হয়েছে।

"He is the best politician who doth not bid adieu to religion and morality as soon as he entereth the council-room but introduceth religion and morality into politics under the conviction that righteousness exalteth a nation. As nature gradually improveth the race of man, better and better classes of politicians will appear in the world."[১] বাইবেলির ভঙ্গীতে কথিত এই অংশটুকু সুসমাচারের মতোই মূল্যবান্ এবং রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মচিন্তার অপূর্বসুন্দর সমাহার।

শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি— জীবনের সবক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ ধর্মসাধনের উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর অভিমত এই ছিল যে, "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের মধ্যে প্রভেদ আছে। ধর্ম্মমত অপেক্ষা ধর্ম্মের উপর জোর দেওয়া উচিত। ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।" —'সারধর্ম্ম', পৃ. ১৬-১৭। ঋষিরা ত্রিকালদর্শী, রাজনারায়ণ সেই ঋষিজনোচিত দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে গেছেন। অকুণ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তি ও বিশ্বাস যদি সাধকের লক্ষণ হয়— তবে তিনি যথার্থ সাধক।

১. "The Religion of Love", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮১৪ শক, পৃ. ১৮৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীকল্প ব্যক্তিরা ছিলেন একাধারে জ্ঞানযোগী ও কর্ম-যোগী। তাঁরা সমাজ, সংসার, স্বদেশের হিতাহিত চিন্তা করেছেন এবং সংস্কার-সাধনেও ব্রতী হয়েছেন। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশের জাতি, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য— সব-কিছুর মঙ্গল সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ— সকলেই এই এক কর্মপথের পথিক। সংস্কারক রাজনারায়ণের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলতেন— 'ধর্মচিন্তার পরিবর্তনের জন্য প্রয়াসের প্রয়োজন, কিন্তু সামাজিক ক্রমবিকাশ হবে প্রাকৃতিক নিয়মেই, সহজভাবেই।' রাজনারায়ণ আরো বলেছেন : "অনেক সংস্কার কার্য্য একত্রে জড়াইলে কোনটি সফল না হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মসংস্কার আবশ্যক, তাহার সহিত সমাজ-সংস্কার জড়াইলে ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্য যদি বিফল হয় তবে সেই কঠিন সমাজ-সংস্কারে আপাততঃ প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।"[১] সমাজ-সংস্কারক রাজনারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ দুটি দিকের কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগী এবং সহজ ও বাস্তববাদী (Practical); কর্মের শ্রেষ্ঠতম ফলটি পাওয়ার জন্য সবসময় সহজতম উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাই ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, কোনো ক্ষেত্রেই তিনি বিপ্লব (Revolution) চান নি, চেয়েছেন পরিবর্তন (Evolution)। আর তা চরমপন্থা অবলম্বন করে নয়, ধীরপন্থায়। সমাজের প্রতি কোনোদিন তিনি উদ্যতখড়্গ ছিলেন না, তাঁর সমাজচিন্তার মনটি ছিল শানিত যুক্তির প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত। কোনোরকম গোঁড়ামি, বা রক্ষণশীলতা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে নি। তিনি বলতেন : "Bigotry is irreligion ; Bigotry is odicus in the sight of God."[২]

১. "জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালি জাতি", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০২ শক, পৃ. ১০

২. 'The Religion of Love'', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১৫ শক, পৃ. ৩৬

একইকালে দেখি উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের অন্যতম সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে। তাঁর কর্মে হৃদয়াবেগের সঙ্গে যুক্তির তীব্রতাও স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় রয়েছে তাঁর চিন্তা ও কর্মে। 'বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতশ্রেণীর শেষ আদর্শ' ভূদেবকে কালের বিচারে এককথায় গোঁড়া, রক্ষণশীল বলেই মনে হয়। ভূদেব 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', লিখেছিলেন সত্য কিন্তু তা সমাজের প্রয়োজনের তাগিদেই। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের মনীষীরা প্রধানত নীতিশিক্ষার দায়িত্বই গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের কাছে জীবন-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনা ছিল অভিন্ন। তাই তাঁদের জীবনে সাহিত্যচর্চা ও নীতিশিক্ষাপ্রদান ছিল একে অন্যের পরিপূরক।

সংস্কারক রাজনারায়ণ দেশ ও সমাজের গোড়ার গলদের কথাই চিন্তা করেছিলেন। বাঙালি জাতির শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সর্ববিধ অধঃপতনের কারণ তার জাতিত্বের ত্রুটি। জাতিত্বের ত্রুটির কথা বলতে গিয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেছেন : "এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে ; অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহাদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য্য ক্ষয়ের এক প্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই।"[১] এইভাবে একটি জাতির জীবন অপর একটি জাতির প্রভাবে সর্বপ্রকারে বিপর্যস্ত হয়েছে। এর কারণ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেছেন—"আমাদিগের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই।" মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি থেকে যে কল্যাণকর্মের প্রচেষ্টা তাকেই নামান্তরে রাজনারায়ণ বলেছেন 'ঐক্য'।

রাজনারায়ণের মতে ইংরেজের শাসন ও শিক্ষার ফলে বাঙালীর পরানুকরণ-প্রবৃত্তি জেগেছে ; এবং এই অতি-লোলুপতার ফলেই জাতির জীবনে দেখা দিয়েছে অসংযম ও অসৌজন্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই রাজনারায়ণ চিন্তা করেছেন যে, এ, দেশের 'ছোটো ইংরেজে'র কাজ, 'বড়ো ইংরেজে'র প্রভাবও বাঙালী জাতির জীবনে ও চরিত্রে আছে। 'বড়ো ইংরেজ' যেমন বোঝে যে 'স্বজাতির দেবতাই সর্বজাতির দেবতা', সেইরূপ একদিন বাঙালী জাতিও উপলব্ধি

১. 'সে কাল আর এ কাল' (২য় সংস্করণ, ১৩৬৩), পৃ. ৫১

করেছিল। এইভাবে এদেশে অনেক ক্ষেত্রে তারা মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মেষেরও সহায়ক হয়েছে। রাজনারায়ণ কেবলমাত্র 'ছোটো ইংরেজে'র অশুভ কর্ম-প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করেন নি, এদেশে 'বড়ো ইংরেজে'র কল্যাণকর দাক্ষিণ্যের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। বাঙালী জাতির ব্যক্তিগত চরিত্রের সর্বপ্রকার কলুষতা, মলিনতা সত্ত্বেও দুটি বিষয়ে চরিত্রগত উন্নতি লক্ষ্য করে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন—'এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা।'

সমষ্টিগতভাবে বাঙালী জাতির হীনবীর্যের কথা রাজনারায়ণ বর্ণনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে। তাঁর সমাজচিন্তার আদর্শ তাঁর দেশ-প্রেমের মহৎ উদ্দেশ্যেই নিহিত ছিল। বাঙালীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাদের ব্যক্তিচরিত্রও হয়েছিল কলুষিত। রাজনারায়ণ তাঁর বহু-সমালোচিত পুস্তক 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে এর বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। 'পিতৃ ভক্তির হ্রাস', অত্যধিক মদ্যপানাসক্ত একালের ব্যক্তিচরিত্রের প্রধান দোষ। এতদ্‌ব্যতীত "এক্ষণকার লোকেরা পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে খলতা, অসরলতা", "এক্ষণকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড় প্রবল।" "এক্ষণকার বদান্যতা চাঁদাপুস্তকগত বদান্যতা, আন্তরিক বদান্যতা নহে। কৃতজ্ঞতাধর্ম্মেও এক্ষণকার লোকদিগেকে পূর্ব্বেকার লোক অপেক্ষা হীন দেখা যায়। পূর্ব্বেকার লোক যেমন সরলতাপূর্ব্বক উপকার স্বীকার করিতেন, এক্ষণকার লোকে সেরূপ করে না।" রাজনারায়ণ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহ্রাস, শাস্ত্রচর্চার হ্রাস, পরকালের জন্য ভীতির অভাব-ই ব্যক্তিচরিত্রের অধোগতির কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে "ধর্ম্ম সমাজরক্ষার পত্তনভূমি।" ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার জন্য সমাজ ও দেশের যে কী অবস্থা হয়, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে 'ফরাসী দেশ'।

জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজনারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী পুরুষ। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণ আশা এবং আত্মবিশ্বাসের যে দীপটি প্রজ্বলিত ছিল তা শেষ দিন পর্যন্ত ছিল অনির্বাণ। বেগবান উৎসাহ মানুষের শুভবুদ্ধিকে যে কিরূপ দ্রুত পরিচালিত করে, সে কথা রাজনারায়ণ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বার বার শুনিয়েছেন। রাজনারায়ণের আশা এই যে বাঙালীর বর্তমান অবস্থা যতই হীন হোক, "কিন্তু যখন এই বর্ত্তমান হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এমন আশা করা

যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে।"[১] প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির সমাজচিন্তা গণ্ডীবদ্ধ এক জাতির মধ্যে চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রাজনারায়ণের সমাজচিন্তার আদর্শ আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজনারায়ণ এই আশাই পোষণ করতেন যে, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' বাঙালী একদিন তার লুপ্ত শৌর্যবীর্য ফিরে পাবে, দেশ ও জাতি আবার ধর্মে ও কর্মে মহান হয়ে উঠবে।

প্রগতিবাদী রাজনারায়ণ সমগ্র ভারতের জীবনাদর্শ গঠন করতে চেয়েছেন প্রাচীন সনাতন সমাজব্যবস্থার আদর্শানুসারেই। একসময় ভারতীয় ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল। এই ইতিহাসকে স্বীকার করে নিয়ে রাজনারায়ণ মনে করেন যে, ভারতবর্ষে ধর্মের মধ্যে যেমন একটি শাশ্বত সত্য রয়েছে, ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায়ও তেমনি পরিবর্তনের ব্যাপকতা নেই। 'সমাজ-সংস্কারক' নামক প্রস্তাবগুলিতে রাজনারায়ণ পরিবর্তনের হেতু ও তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধদেব সামাজিক রীতিনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। শংকরাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদ দিয়ে আর্যসমাজকে আলোড়িত করেছিলেন। রামানন্দ, দাদূ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য এঁরা সকলেই হিন্দুসমাজের আচারপদ্ধতি ও নীতিনিয়মের বহু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। রাজনারায়ণও ব্রহ্মবাদ প্রচারের দ্বারা সমাজ-মানসেরই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। পরন্তু উনিশ শতকের বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের এই ভূমিকাই ছিল।

রাজনারায়ণের এই অভিপ্রায় ছিল যে, সমাজ-সংস্কারের মূল প্রেরণা থাকবে ধর্মচেতনায় এবং লক্ষ্য থাকবে স্বাদেশিকতায়। তাঁর 'সমাজ-সংস্কার'-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম প্রস্তাবে তিনি মন্তব্য করেছেন— "যে সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ না থাকে তাহা তত সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্ম যেমন আমাদিগের জীবন পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এমন আর অন্য কিছুই নহে।" এই মন্তব্য করার পর তিনি বিভিন্ন দেশের সমাজ-সংস্কারের মূল নীতিগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্মনেতাদের সামাজিক বিধান রচনার অন্তরালে বিশুদ্ধ ধর্মীয় মনোভাবই বর্তমান ছিল। রাজনারায়ণের সমাজচিন্তার আদর্শ এই ধর্মীয় ভাবধারাতেই উদ্‌বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবের

১. 'সে কাল আর এ কাল' (২য় সংস্করণ, ১৩৬১), পৃ. ৯৫

সূচনায় তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন : "প্রাচীন প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।" রাজনারায়ণের এই-সব অভিমত থেকে এ কথাই স্পষ্ট, যে, তাঁর মনোভাব ছিল প্রাচীন প্রথার অনুগত। প্রাচীন রীতিনীতি ছিল কল্যাণকর, তাকে সমূলে উৎপাটন করলে জাতীয়তা বর্জন করতে হয়। এই কথা চিন্তা করেই রাজনারায়ণের মন কখনোই বিজাতীয় হতে চায় নি। বলা যায়, সমাজসংস্কারের সব ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ তাঁর আর্য-আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন রাজনারায়ণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালী বা যুক্তিবাদ পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেও তিনি য়ুরোপের অনুকরণে সমাজকে রূপায়ণ করতে চান নি। সাংসারিক জীবনে রাজনারায়ণ ছিলেন প্রাচীনতার পক্ষপাতী। "ঋষিজীবন" নামক প্রবন্ধে রাজনারায়ণের সেই গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। ব্রহ্মনিষ্ঠ যে ঋষিরা গার্হস্থ্য ধর্মের মধ্যে বাস করেও সমাজ-কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন, সেই ঋষিদের জীবনধারণ প্রণালীকেই তিনি আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন। প্রাচীন ঋষিরা ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু সংসারবিমুখ ছিলেন না; তাঁরা আত্মমুক্তি কামনায় কখনো জীবনবিমুখ হন নি। রাজনারায়ণের সমাজচিন্তা এই ঋষিদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাজনারায়ণ প্রাচীন রীতির অনুগামী ছিলেন। প্রাচীন ঋষিদের শিষ্যেরা যে 'সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা, বশম্বদতা ও শ্রদ্ধাভক্তি'র পরিচয় দিয়েছে, আধুনিক ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই গুণাবলী দুর্লভ হয়েছে বলে রাজনারায়ণ বেদনা অনুভব করেছেন। ঋষির তপোবনে বা গুরুর গৃহে যে ধর্মভিত্তিক, চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা ছিল, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক— এই মনোভাব তাঁর নানা রচনায় তিনি প্রকাশ করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ঋষিদের জীবনাদর্শের মহিমা সাগ্রহে বর্ণনা করবার পর উপসংহারে বলেছেন, "হায় হায় এই ঋষিবৃন্দ, এই ঋষি-ছাত্রবৃন্দ ভারতবর্ষ হইতে স্বপ্নবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে।" শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বসবাস করে বিদ্যাধ্যয়ন করত এবং এই সময়ে যে তাদের কঠোর নিয়মসমূহ পালন করতে হত— এর সুফল সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেছেন : "এই সকল নিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছেলেবেলা হইতে কষ্ট, সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা, বশম্বদতা,

শ্রদ্ধা, ও ভক্তি অভ্যাস।... এই সকল নিয়ম পালনবশতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষে এত শূর বীর উৎপন্ন হইত।"[১]

রাজনারায়ণের মতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী তৎকালীন সমাজ-জীবনের উপযোগী ছিল। অথচ মেকলের নির্দেশনামা আইনে পরিণত হবার পরই শিক্ষাজগতে আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। ঐতিহাসিকের মন্তব্যে তখনকার এই অবস্থার যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়: "...কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপীয়র সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া *Edgeworth's Tales* সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"[২] হঠাৎ ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে হিন্দুজাতি সদাচারের নীতি বিস্মৃত হয়েছিল, এবং সেইসঙ্গে ইংরেজী সভ্যতার আদব-কায়দায় বিভ্রান্তও হয়েছিল। শিক্ষা বলতে রাজনারায়ণ পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলেন নি, যে শিক্ষায় মানুষের দেহের ও মনের উৎকর্ষ সাধন হয়, এমন শিক্ষাব্যবস্থাই তাঁর কাম্য ছিল।

আশ্রমিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির পর রাজনারায়ণ 'ভট্টাচার্য্যের টোল' ও 'গুরুমশায়ের পাঠশালা'-র শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। ঐ-সমস্ত 'টোল' এবং 'পাঠশালায়' সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত; তদুপরি শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে এখানে একটি নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠত; শিক্ষককুল এখানে ছাত্রদের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। ফলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তি-সমূহের সুষ্ঠু বিকাশ হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন ইংরেজী স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ-সমস্ত টোল ও পাঠশালা এই দেশ থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। এইগুলির আকস্মিক অন্তর্ধানে রাজনারায়ণ অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর সেই আঘাতের উক্তি: "খই অতি শুভ্র পবিত্র লঘুপাক দ্রব্য, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া সাগু তাহার স্থান কেন অধিকার করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"[৩] সহজ-পাচ্য বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন রাজনারায়ণ সমর্থন করতে পারেন নি। অথচ বিদেশীরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণাদির ব্যাপক চর্চা করছে; তাই রাজনারায়ণের এই বেদনা-মিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি: "রাইন নদীতীরে সংস্কৃতের মহা

১. "ঋষিজীবন", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০৯ শক, পৃ. ১১১

২. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', (২য় সংস্করণ ১৯৫৭), পৃ. ১৪২

৩. 'গ্রাম্য উপাখ্যান', ১৯১৪, পৃ. ৫৫

আদর, আর গঙ্গাতীরে যাঁহারা তাহার চর্চ্চা করেন তাঁহাদিগকে অনাহারে কাল যাপন করিতে হয়।”[১]

সমাজের অন্যান্য দিকের প্রতিও রাজনারায়ণের সমান দৃষ্টি ছিল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তিনি গভীর ও আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশের নারীকুলকে ‘আপন ভাগ্য জয়’ করবার অধিকার দান করেছিলেন।[২] উনিশ শতকের বাংলাদেশে চিন্তাশীল, মনস্বী ব্যক্তিগণ পথিকৃৎ রামমোহনের আদর্শই ক্রমে অনুসরণ করেন। পূর্বোক্তরা নারীকে দিলেন নারীত্বের পূর্ণ অধিকার এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন সামাজিক মর্যাদায় ; উত্তরকালের সংস্কারকগণ শিক্ষায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে নারীর জীবনকে করে তুলতে চেয়েছেন সমৃদ্ধ। মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার আলোয় তার জীবন আলোকময় ও প্রাণবন্ত করার পক্ষে কেবলমাত্র তখন রাজনারায়ণের প্রচেষ্টাই ছিল না, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা হয়েছিল ব্যাপক। এই ব্যাপারে কেশবচন্দ্র প্রমুখ প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদল প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত ছিল যে, “…হয় স্ত্রীদিগের রীতিমত শিক্ষা দেও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নাই।”[৩] প্রাচীন সমাজে এদেশীয় স্ত্রীলোকদের দশ-বারো বছর বয়সে, কেবলমাত্র বর্ণপরিচয়, শব্দপরিচয় হওয়ার পরই শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যেত। সমাজের এরূপ রীতি রাজনারায়ণের মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। শিক্ষা মজ্জাগত না হলে, তা স্ত্রীজাতির জীবন ও চরিত্রের আমূল সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হবে না। তাঁর মতে স্ত্রীজাতি গৃহের দীপ্তিস্বরূপ— কাজেই সংসারের সর্বাঙ্গীণ শোভনবস্তু যে নারীদের কাছেই প্রাপ্য— তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গভীরভাবে। অতএব নারীজাতির কাছে রাজনারায়ণের আবেদন ছিল ‘সখের শিল্পচর্চায়’ নয়, ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্মের প্রতি তাঁরা যেন মনোযোগী হন। রাধাকান্তের ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কারের[৪]

---

১. ‘গ্রাম্য উপাখ্যান’, পৃ. ৮৩

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাসাগর জীবনী’, ১৮৯৫, পৃ. ৩১৩

৩. ‘সে কাল আর এ কাল’ (২য় সংস্করণ, ১৩৬৩), পৃ. ৬০

৪. দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৯, ১৩৩৮

বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত হয়ে এদেশীয় স্ত্রীলোকদের বিদ্যালাভ সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, একজন বিদেশীর প্রযত্নে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা এত উন্নত হল, অথচ স্বদেশবাসী এই ব্যাপারে যত্নবান হলেন না।

অতঃপর সমাজে নারীজাতির স্থান কিরূপ হওয়া উচিত, রাজনারায়ণের এই-সম্পর্কীয় অভিমতগুলি "সমাজ-সংস্কার" নামক প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে এবং কয়েকটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

নারীর সতীত্বরক্ষার প্রণালীকে রাজনারায়ণ হিন্দুসমাজের মূল ভিত্তি বলে দাবি জানিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের মতে ভারতীয় সমাজ বিবাহ-প্রথার দ্বারা সুসংবদ্ধ হয়েছে। ঐ প্রথা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত সমাজ গড়ে ওঠে নি ; মানবসমাজ-বিবর্তনের এ-সত্যটি রাজনারায়ণ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা রক্ষাই স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার উপায় বলে তিনি মনে করতেন। এর জন্য বিভিন্নযুগের সমাজ নারীজীবনের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ম-শৃঙ্খলা বেঁধে দিত। ভারতবর্ষে নারীকে 'পূজার্হা' এবং 'গৃহদীপ্তি' বলা সত্ত্বেও সামাজিক নিয়মাবলী স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে, কিঞ্চিৎ কঠোরভাবেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর রাজনারায়ণ বহু য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তির সমর্থনসূচক উক্তির উল্লেখ করে নারীজীবনের নিয়ামক ভারতীয় বিধানগুলির শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন। নারীদের অন্তঃপুর-বাসকে তিনি অবরোধ-প্রথা বলে মনে করেন নি। মুসলমান শাসনকালে অবরোধ-প্রথার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন ভারতে অন্তঃপুরিকারা অন্তঃপুরেই থাকতেন। কিন্তু তাতে তাদের স্বাধীনতার ব্যাঘাত কখনো হয় নি। রাজনারায়ণ স্ত্রীজাতির সেই স্বাধীনতা পছন্দ করেন নি, যে স্বাধীনতায় 'অন্তঃপুরিকারা উন্মার্গগামিনী' হয়ে পড়ে। বস্তুত একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা রাজনারায়ণের কাছে পরম শুভ ফলদায়ক মনে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'Age of Consent Bill' ভারতীয় আইন সভা থেকে পাস হয়। ঐ সময় এই বিলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রভূত আন্দোলন হয়েছিল। মালাবারি নামক পারস্যদেশীয় একজন কবি ও সমাজ-সংস্কারক সোৎসাহে এই বিলের সমর্থন করেছিলেন ; আর এর

প্রতিবাদ করেছিলেন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সমাজনেতা বালগঙ্গাধর টিলক। রাণাডে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃবর্গ এই বিলের সমর্থন করায় 'সহবাস সম্মতি'র বয়স নারীর পক্ষে দশ থেকে বারোতে স্থির হয়। হিন্দু-সমাজের প্রবল বিরোধিতাকে ভারত সরকার অগ্রাহ্য করেছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বাস্তব-সম্মত দৃষ্টি নিয়ে এই বিলের বিচার করে *Indian Mirror* পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, হিন্দুদের গর্ভাধান অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা-সৃষ্টিকারী এই বিল পাস করায় ভারত-সরকার ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছেন। "We as reformers have no right to act intolerantly towards that belief. Nor has the Government which is pledged to a policy of religious neutrality." তাঁর এই উক্তিতে বাস্তব বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। রাজনারায়ণ বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি তিনি উদারপন্থী ছিলেন বলে তেরো বছরের গর্ভাধান-সংস্কার মেনে নিয়েছিলেন; উক্ত পত্রের ভাষায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আরো লিখেছেন: "Individually I am not an advocate of early marriage below the age of fourteen, but I make the above recommendation keeping in view the religious interest of the Hindu community at large." আইন পাস হলে সমাজে যে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে, তাও তিনি বাস্তববুদ্ধির আলোকে অনুধাবন করেছিলেন। ঐ পত্রেই তিনি সম্পাদককে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন: "The age of consent Bill if passed in its present form will it is feared lead to giving false information against a neighbour with whom a man may be on terms of enemity, summoning of Hindu ladies to Court and the medical Examination of Girls, the very idea of which is shocking to the Hindu mind."— সরকারের এই আইনকে রাজনারায়ণ কিছু ভিন্নভাবে বিধিবদ্ধ করার কথা জানিয়েছিলেন; মনীষা ও বাস্তববুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল বলেই বিষয়টি নিয়ে কূটতর্কের একটি সহজ সমাধান তিনি নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। বস্তুত 'Age of Consent Bill' 'Sarda Act'-এর মতোই আইন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, কার্যক্ষেত্রে খুব বেশি প্রযুক্ত হয় নি।

য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণে রাজনারায়ণ কোর্টশিপ প্রথা পছন্দ করতেন না। Mr. Heard-কে লিখিত একটি পত্রে (April 4. 1894) তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। *The Wages of Sin* নামক একখানি সামাজিক উপন্যাস পাঠ করে স্বদেশপ্রাণ রাজনারায়ণ উভয় দেশের সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ করে ভারতীয় সমাজের কল্যাণ সাধন কিভাবে হবে— তা চিন্তা করেছেন। উক্ত উপন্যাসখানি পাঠ করে আধুনিক সভ্যতাভিমানী, বাস্তববাদী য়ুরোপীয় সমাজব্যবস্থার প্রতি রাজনারায়ণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটিতে উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবাদ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতীয় সমাজে বিবাহ প্রথা ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসার ভাবও এক সময় তাঁর মনে জেগেছিল। ঐ পত্রে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "I object to the custom of courtship before Marriage." তিনি এ কথাও বলেছিলেন— "English men will do well to revive the custom of early marriage ।"

এইভাবে নারীজাতির প্রতি রাজনারায়ণের সহানুভূতি বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত হয়েছে। তিনি সমাজের বিপথগামী হীন ব্যবসায়লিপ্ত নারীদের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে *National Paper*-এ প্রকাশিত "Hindoo Female Modesty" শীর্ষক একটি পত্রে। পত্রটি ১৮৬৯ সালের ২১ এপ্রিল উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে 'বৃদ্ধ হিন্দু'র জবানীতে লিখিত। সরকার-কর্তৃক ১৮৬৪ সালের ১৬নং আইন প্রযুক্ত হওয়ায় রাজনারায়ণ সরকারকে অজস্র সাধুবাদ জানান; এবং অচিরে শুভপরিণতি লক্ষ্য করে তিনি যথার্থ আনন্দলাভ করেছিলেন।

অতঃপর সরকারের কাছে রাজনারায়ণের আবেদন ছিল যে, সরকার যেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে এই-সব ভাগ্যহতাদের কথা বিবেচনা করেন। তাই সম্পাদকের উদ্দেশ্যে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন : "...it is not my province or aim to discuss the question whether a prostitute can be called a necessary member of society or whether she is absolutely wanted to meet the demands of society. But as long as all Governments in all countries are to sanction her existence, so long [a] certain regard ought to be paid to

her feelings, if she has any. As a human being never mind for the extreme deviation on her part from the path of virtue, she is entitled to a share, though small, of our benevolence and sympathy. Are not the poor women more sinned against than sinning ? Are not the male portion of the community to be more blamed than the poor wretches themselves, who are either direct or indirect victims of lust or neglect ? What preventive measures have been adopted to stop one from neglecting his wife ? And what exposure or adequate punishments are inflicted upon those monsters in the human shape, who taking advantage of female helplessness, launch, many a neglected wife and widow in the endless sea of misery." রাজনারায়ণের দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লিখিত ঐ পত্রের অন্যত্র মুদ্রিত অনুরোধবাণীর মধ্যে। অতঃপর রাজনারায়ণ করুণভাবে আবেদন করেছেন— "Now Mr. Editor considering the above state of things is it not rational to suppose that a prostitute is more an object of pity than hatred ?"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্যক্তি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এইরূপ সদ্‌যুক্তিপূর্ণ ও সহৃদয় মন্তব্য করতে পারেন, তাঁকে রক্ষণশীল বা পিউরিটান বলা যুক্তিসংগত নয়। কি ধর্মচিন্তা, কি সমাজ-সংস্কার কোনো ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণের গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর কর্মপথে অবধারিত সত্য ছিল যে, 'When life is better than dogma, be not bigotted'।

সমাজে জাতিভেদ-প্রথা রাজনারায়ণ সমর্থন করেছেন। 'সমাজ-সংস্কার' সম্বন্ধে লিখিত দুটি প্রস্তাবে রাজনারায়ণ জাতিভেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। যুক্তিবাদী রাজনারায়ণ জাতিভেদকে লোকস্থিতির উপযোগী সাময়িক নিয়ম বলে মনে করতেন। 'প্রকৃত ধর্মের নিকট জাতি-বিভেদ নাই'— এইরূপ উক্তি তিনি প্রবন্ধে, পত্রাদিতে বারবার করেছেন। সমগ্র সমাজের কর্ম যেমন যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত, তেমনি সমাজে সমাজরক্ষার প্রয়োজনেই জাতিভেদ অনিবার্য। তবে জাতিকে বিভক্ত

করার পদ্ধতি স্বতন্ত্র ধরনের হতে পারে। রাজনারায়ণ বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় সমাজে বংশানুগত জাতিভেদ থাকায় প্রতিভাবান, বিদ্বান, ত্যাগশীল, ক্ষমাপরায়ণ শ্রেণীর সুদীর্ঘ প্রবাহ সম্ভব হয়েছিল। য়ুরোপের কোনো কোনো মনীষী সমাজে বুদ্ধিমান মানুষদের একটি শ্রেণী গঠন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষের জাতিভেদ মূলত ঐরূপ একটি মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই তিনি মনে করেন।

তথাপি এই কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থাকে বিচক্ষণ রাজনারায়ণ দোষশূন্য মনে করেন নি। উচ্চবর্ণ ব্যক্তি জ্ঞানহীন ও দুশ্চরিত্র হলে শুধু বর্ণের গুণে সম্মান পাবে, সমাজে এরূপ ব্যবস্থা কখনোই থাকা উচিত নয়। রাজনারায়ণ দ্বিধাহীন, স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদিগের এপ্রকার সামাজিক নিয়ম হওয়া উচিত যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞ সদ্বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকেই আমরা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান করিব, অন্য প্রকার ব্রাহ্মণকে কেবল ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বলিয়া আমরা সেরূপ সম্মান করিব না।"[১] রাজনারায়ণের মন যে কত যুক্তিপ্রবণ এবং বিচারনিষ্ঠ ছিল, তা বোঝা যায় জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁর আর-একটি স্পষ্ট অভিমতে। জাতিভেদের পদ্ধতি বংশানুগত না রেখে ধর্ম এবং সচ্চারিত্রের ভিত্তিতে রাখাই উচিত বলে রাজনারায়ণ মত প্রকাশ করেছিলেন।

বিবাহে সংকর-প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন রাজনারায়ণ। তাঁর মত ছিল যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিলোম-প্রণালী নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু অনুলোম প্রথার প্রচলন ছিল; অর্থাৎ একজন উচ্চবর্ণের পুরুষ, একজন নীচ জাতীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারত। এর দ্বারা সমাজে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। রাজনারায়ণের ইচ্ছা, এই প্রথা আমাদের সমাজে পুনরায় প্রচলিত হোক। তবে উচ্চ জাতীয় পুরুষের সম্পূর্ণ সম্মতি অনুসারে এই কার্য সিদ্ধ হবে, অসম্মতিতে বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী তিনি নন। রাজনারায়ণ মনে করেন যে, এই প্রচেষ্টার শুভফলের দ্বারা দেশ অবশ্যই উপকৃত হবে, জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হবে, শারীরিক বলবীর্যে বাঙালী বলীয়ান হবে। 'শারীরিক বল পঞ্জাবী গুণ' ও 'বুদ্ধিপ্রাখর্য্য প্রভৃতি বঙ্গীয়গুণ'—উভয়ের সম্মিলনে উভয় দেশেরই শুভফলের সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অসবর্ণ বিবাহ রীতিতেও রাজনারায়ণ একেবারে চরমপন্থী ছিলেন না। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত

১. "সমাজ-সংস্কার", 'বিবিধ প্রবন্ধ', পৃ. ১১৮

দ্বিতীয়বার সবিস্তারে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়েছিলেন দুটি বালবিধবার সঙ্গে; এবং এর জন্য তাঁকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল— সেই দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে আদর্শ হয়ে আছে। সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়, অসত্য দূরীকরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালিয়ে তিনি নিজ অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কোনোদিন অনুসন্ধান করেন নি। এ-বিষয়ে তিনি গুরু ও বন্ধু সদৃশ মহর্ষির উপদেশ সারাজীবন মনে রেখেছিলেন।

রাজনারায়ণ বিদেশ গমন পছন্দ করতেন না। এতে তাঁর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রকাশিত হয় নি। তাঁর ধারণা ছিল, বাঙালী ছেলেরা বিলেত থেকে ফিরে এসে আচার-আচরণে সাহেব হবার চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেছেন: "বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারো সঙ্গে পোশাকে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীদিগকে বিভূষিত করিবেন, না একেবারে সমাজ ছাড়া হয়ে বসলেন।"[১] ইংরেজরা এই দেশী সাহেবদের ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। রাজনারায়ণ এদের বলেছেন 'অনুকরণ-কারী শাখামৃগ'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থে "হনুমদ্বাবুসংবাদ" নামক রসরচনায় এদের নিয়ে প্রচুর কৌতুক করেছেন। আবার রাজনারায়ণের 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তক প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় পৌষ ১২৮১ বঙ্গাব্দ, "অনুকরণ" শীর্ষকে একটি প্রবন্ধ লিখে লেখকের মনোভাব সমর্থন করেন। এই রচনায় বঙ্কিম যুক্তি উপস্থাপন করে সর্বাংশে মানুষের অনুকরণ-প্রবৃত্তির উৎকর্ষের কথাই বলেছেন।

রাজনারায়ণের সমাজদর্শনের কেন্দ্রে ছিল গভীর মানবপ্রীতি তথা জনগণের সর্বৈব মুক্তির চিন্তা: তাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ থেকেই এই ভাবনার উৎসারণ। প্রধানত এই কারণেই তিনি ধর্মগত, জাতিগত সমস্ত বিভেদ-বৈষম্য বিদূরিত করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুসরণে সর্ববিধ বিরোধের ঊর্দ্ধে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সমাজবদ্ধ জাতির সমাজবোধের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধেরও স্ফুরণ হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে একটি জাতীয়ভাব এবং সমাজের মধ্যে তা বিকীর্ণ হয়ে মানুষকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। রাজনারায়ণের মধ্যে

---

১. 'সে কাল আর এ কাল' (২য় সংস্করণ, ১৩৬৩), পৃ. ৭২

জাতীয়তাবোধের অনুভূতি এমন প্রগাঢ় ছিল যে তাঁর সমস্ত কর্মজীবন এই ভাবের আবেগ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাঙালীর জীবনে জাতীয়ভাব সুদূর অতীত কাল থেকেই সঞ্চারিত ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদরূপে এই ভাব কার্যকর হয় ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে— এমন-কি, তার পূর্বেও দেশের প্রতি গভীর মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী যুবকদের মনে জাতীয়তাবোধের যে অনুভূতি জেগেছিল, তা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বাঙালী জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থেকে প্রাচীন গৌরবের কথা তেমন তীব্রভাবে স্মরণ করে নি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ার পর থেকেই স্বজাতির গৌরববোধ এবং জাত্যাভিমানের উন্মেষ ঘটে। রাজা রামমোহন রায় জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করবার জন্য হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব জাতির সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। 'আত্মীয় সভা', 'অ্যাংলোহিন্দু স্কুল' ও 'ব্রহ্মসভাকে' কেন্দ্র করে তিনি বাঙালী জাতিকে আত্মসমীক্ষণের সুযোগ দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদল ইংরেজী সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু এঁরাই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাঙালীকে স্বদেশ সম্বন্ধে অবহিত করে তোলেন; এবং সমগ্র জাতির মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এই মহৎ কর্মে রাজনারায়ণ ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের মহতী প্রচেষ্টায় রাজনারায়ণের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হিন্দুকলেজের শিক্ষা তাঁর মনে বিজাতীয় ভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। আত্মচরিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলেছেন। বাঙালীয়ানা তথা হিন্দুয়ানি যে তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি তা নির্দেশ করে তিনি বলেছেন, "আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙালীতর; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।"

রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে জাতির জীবনে স্বদেশচর্চার বৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করতে হয়। স্বদেশচর্চার প্রাথমিক স্তরে প্রায়ই 'জাতীবৈর' মনোভাব দেখা যায়। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। জাতীয়তাবোধের যাঁরা উদ্গাতা, তাঁদের চরিত্রেও জাতি-বৈর ভাবের লক্ষণ দেখা যায়। 'সাধারণী' (১১ কার্তিক ১২৮০) পত্রিকায়

প্রকাশিত "জাতি-বৈর" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজবিরুদ্ধতার হেতু নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন : "মানুষের স্বভাবই এমত নহে যে, বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয়।" এই প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ জাতির গৌরব এবং ভারতবাসীর প্রাচীন গৌরবের কথা বলেছেন। তারপর মন্তব্য করেছেন : "এই জাতিবৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল। যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব— ততদিন জাতিবৈরের সমতার সম্ভাবনা নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি জাতীয়তাবোধের একটি মূলসূত্র। বঙ্কিমপূর্ব যুগেই রাজনারায়ণের মধ্যে 'জাতি-বৈর' ভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি জাতিকে পূর্বগৌরব সম্বন্ধে সচেতন, বর্তমান হীনাবস্থা সম্বন্ধে অবহিত এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।

রাজনারায়ণের শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রেরণাস্থল ছিল রামমোহন এবং কর্মোদ্দীপনার ক্ষেত্র হয়েছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের আদর্শটি একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল। সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতো রাজনারায়ণেরও স্বদেশপ্রেমের আবেগ জেগেছিল; স্বদেশচেতনার অগ্নি অতি অল্প বয়সেই তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছিল। এই চেতনা রামমোহন, পিতা নন্দকিশোর এবং উপদেষ্টা-বন্ধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশচেতনার 'খরজ্যোতি' ও 'দহনপ্রবণতা' তাঁর কর্মে ও রচনাবলীতে প্রকাশিত হয়ে অনির্বাণ দীপশিখার মতো বাঙালীর জাতীয় জীবনকে পথ দেখিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, এ-কথাও বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী দেশপ্রেমের জোয়ারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার— সকলেই অবগাহন করেছেন। তাঁরা তাঁদের রচনাদির দ্বারা দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করে গেছেন। বস্তুত একালে যেন তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। তবে তাঁদের সঙ্গে রাজনারায়ণের আদর্শের স্বাতন্ত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরো এক কথা, নূতন প্রতিষ্ঠিত সভা ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ও প্রচার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে হয় নি। ১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', ১৮৬০ সালে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য', তারও পরে নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ',

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতায় জাতীয়তাবোধের পূর্ণ প্রকাশ। প্রাক্-কংগ্রেস যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'রও স্থাপনাকাল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু এই-সমস্ত ঘটনার অনেক পূর্বে ১৮৪৬ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রাজনারায়ণের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবোধের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। কলেজে ছাত্রাবস্থায় যা প্রকাশোন্মুখ হয়েছিল, এখন তা হল স্পষ্টতর, গভীরতর। রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'ক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা', 'পদতলের ভূমির উপর শ্রদ্ধা থাকা চাই' বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে আমরা দেখি, শুধুমাত্র স্বদেশ নয়, স্বজাতি ও স্বধর্মে পর্যন্ত রাজনারায়ণের কিরূপ প্রবল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন: "...শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্য বিবিধ কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন।"[১]

খ্রীস্টধর্মের প্রতি হিন্দুজাতির আকর্ষণ লক্ষ্য করে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মতো রাজনারায়ণও দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। তিনিও হিন্দুজাতির চরিত্রগত বিশেষ প্রবণতার বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন। প্রজ্ঞাবোধ ও দূরদৃষ্টিবলে ধর্মের দ্বারা জাতির হৃদয়ে আঘাত দেওয়ার কথা রাজনারায়ণ উপায়স্বরূপ মনে করেছিলেন। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করতেন যে, হিন্দুজাতির মতো ধর্মপরায়ণ ও ভাবপ্রবণ জাতি বোধকরি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই সম্পর্কিত আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মানুসারে আহার করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে পান করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বেড়ায়, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নিদ্রা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কোন পত্র লিখিতে গেলে ঈশ্বরের নামে পত্র আরম্ভ করে। হিন্দু কোনখানে যাইতে হইলে, ঈশ্বরের নাম করিয়া বেরোয়।"[২] অতএব রাজনারায়ণ চিন্তা করেছিলেন যে, এই জাতির জাতীয়তাবোধ জাগাতে হলে স্বধর্মে শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। এবং সেজন্যই হিন্দুজাতির ধর্মের মহিমা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তদুপরি হিন্দুধর্মের সার সত্য অবলম্বনে যদি পৃথকভাবে একটি ধর্মের প্রচলন ও প্রচার হয়, তা সমগ্র হিন্দু জাতির এক জাতিত্ববোধ উদ্‌বোধনের অধিকতর সহায়ক হবে; এবং এইভাবেই জাতির ধর্মীয় ভ্রান্তি

১. "বিবিধ প্রসঙ্গ", প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪, পৃ. ১১৬

২. 'বৃদ্ধহিন্দুর আশা' (২য় সংস্করণ, ১২৯৯), ভূমিকা, পৃ. ।০

বিদূরিত হয়ে ধর্মগত ঐক্য স্থাপিত হবে ও সেই ঐক্যেই একদিন গড়ে উঠবে ভারতীয় অখণ্ড রাষ্ট্রের বনিয়াদ। বস্তুত রাজনারায়ণের প্রথম লক্ষ্য ছিল হিন্দুজাতির ধর্মসংশয় দূর করা, আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনা ও তাকে জাতিত্বে প্রতিষ্ঠা করার দিকে। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' রচনার মধ্যে রাজনারায়ণের প্রবল স্বধর্মপ্রীতি ও মহৎ উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন হয়েছে।[১] হিন্দুজাতি স্বধর্মের যে, দোষত্রুটিবশত খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাদের আকর্ষণের কারণ দেখিয়েছেন, রাজনারায়ণ প্রভূত পাণ্ডিত্য ও মনীষাবলে উক্ত অভি-যোগগুলি শাস্ত্রগ্রন্থাদির দৃষ্টান্তসহযোগে খণ্ডন করেছেন এবং এইগুলিকে 'হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ে কতকগুলি অমূলক প্রবাদ' বলে মন্তব্য করেছেন। সর্বোপরি সকল ধর্মের সার সত্য ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মের মধ্যেই নিহিত এ কথাও দৃঢ়কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন। উক্ত রচনায় রাজনারায়ণ হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধির বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: "ধর্ম্মের নিমিত্ত হিন্দুদিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না।" এই প্রবল স্বধর্মনিষ্ঠা, জাতিপ্রীতি ও সর্বোপরি দেশপ্রেমবশতই রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও 'হিন্দু' উপাধি কোনোদিন বর্জন করেন নি। আজীবন তিনি নিজেকে পরিচায়িত করেছেন 'বৃদ্ধ হিন্দু' বলে। পত্র-পত্রিকা-পুস্তকে তাঁর এই পরিচয় তাঁর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। যদিও এই বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের আদর্শেরই অনুসরণ করেছিলেন, তথাপি জাতিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বধর্মের মহিমা উপলব্ধি করা এবং জনগণকে তার গৌরব অনুভব করাবার সক্রিয় ও প্রবল প্রচেষ্টা প্রধানত রাজনারায়ণই করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িককালে এবং তার পরবর্তীসময়ে অনেক চিন্তাশীল মনীষী জাতির আত্মমর্যাদাবোধ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে ইতিহাস আমাদের জানা আছে। স্বধর্মের মহিমাকীর্তনে সেযুগে ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই মুখর হয়েছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং প্রবল আগ্রহ নিয়ে জাতীয় মহিমাকে উদ্ভাসিত করার কৃতিত্বের দাবি একমাত্র রাজনারায়ণেরই। ১৮৫৮ সালে হেয়ার স্মৃতিসভার বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "হিন্দু নাম অতি

---

১. জাতির জাতীয়চেতনা উদ্‌বোধনের জন্য ধর্মীয় চিন্তার পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রাজনারায়ণ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। ন্যাশানাল পেপারে (জুন, ১৮৭০) এই মর্মে প্রকাশিত সংবাদটি জাতির যুগোপযোগী প্রয়োজন সংসাধন করেছে:

"A national religious movement is highly needed, embracing all the different sects and creeds existing in Hindoosthan and discarding none."

মনোরম শব্দ। হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে ?" রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধ এত গভীর ছিল যে, স্বধর্মের নামোচ্চারণেই তিনি ভারতের কোন সুপ্রাচীন কাল থেকে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতার আনন্দ অনুভব করেছেন। ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি রাজনারায়ণের প্রবল শ্রদ্ধা এবং তাঁর দেশপ্রেমের তীব্রতা অনুভব করা যায় পরবর্তী উদ্‌ধৃতির দ্বারা: "As the name of Hindoo connects us intimately with the present so does it link us to the past of India to which every patriot turns his fondly musing eyes endeared as it is to him by a thousand glorious reminiscences".[১] এক সময় রমেশচন্দ্র দত্তকে লিখিত একটি পত্রে[২] রাজনারায়ণের অনুরূপ হিন্দুপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।[৩] রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্ররূপে কোনোদিন চিন্তা করেন নি। তিনি মনে করতেন যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম, পবিত্রতম রূপ ; হিন্দুধর্মের সত্যরূপ (True Hinduism) ব্রাহ্মধর্মে নিহিত আছে। "হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।"[৪] রাজনারায়ণ এইভাবে তাঁর বিভিন্ন রচনায় অতি প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা জাতির স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন।

স্বদেশপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন ঐতিহ্য-প্রীতি ও ইতিহাস-জিজ্ঞাসা। দেশের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ থেকেই এই দুই ভাব প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই মনে জাগে। স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিরই আত্মমর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ হয়। জাতি হিসেবে সে অন্য জাতি অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নয়। বীরত্বে, শৌর্যে বাঙালী জাতি তার সমকালীন অন্য জাতির ঈর্ষার পাত্র হয়েছে। বাঙালী

---

১. *Brahmic Questions of the Day— Answered*, p. 3

২. রাজনারায়ণের এই অপ্রকাশিত পত্রটির রচনাকাল ১৮৯০ সালের ২২ জুলাই।

৩. "...I am a Hindu like yourself. I pride myself in the name. I do not consider Brahmoism to be different from Hinduism. I consider Brahmoism to be only the highest developed form of Hinduism. I am fired with indignation...when I see religionists classified in this way ;—Christians, Mahomedans, Brahmos, Hindus as if Brahmoism is different from Hinduism."

৪. 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৭৯৪ শক), পৃ. ৪৯

জাতির অতীতের অনেক কাহিনীই গৌরবোজ্জ্বল। রাজনারায়ণ বার বার স্মরণ করেছেন সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেনের বীরত্ব কাহিনী, রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহল অভিযান, চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী, দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজাদের কীর্তিকাহিনী। জন্মভূমির প্রতি সম্ভ্রমবোধেই রাজনারায়ণ জাতির কীর্তিবিশ্রুত ঐতিহ্যনিদর্শন জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি উপনিষদ্ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন, মহাভারতে বর্ণিত জাতির সভ্যতা ও শৌর্য-বীর্যের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য মহাভারতের নির্বাচিত অংশের ইংরেজী অনুবাদের[১] সূচনা করেছিলেন। এমন-কি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনায় স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক যে-সমস্ত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকাদি রচিত হয়েছে, রাজনারায়ণ জাতিকে অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করতে সেগুলির ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। রাজনারায়ণ-কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের অন্তরালে একই উদ্দেশ্য ছিল। অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় ইংরেজী ভাষা-ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী লেখাই পছন্দ করতেন এবং হিন্দুজাতীয়তার নিন্দুকেরা ইংরেজীনবীশ ছিলেন। তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাজনারায়ণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের জাতীয় চৈতন্য উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' সংস্থাপনের প্রস্তাবগুলিতে রাজনারায়ণের এইরূপ মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "এই প্রস্তাব লেখক তাঁহার সময়ে ইংরেজানু-করণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন এবং মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও শিক্ষিতদিগকে ইংরাজীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।"[২] অতএব রাজনারায়ণের এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, ইংরেজী ভাষার রচনাসমূহ পাঠ করে ক্রমে জাতির ঐতিহ্যজ্ঞান স্পষ্ট হবে, আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে এবং তার পর জাতি ক্রমে স্বদেশভাষায় রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। "স্বদেশের ভাষানুশীলন"

১. পরিশিষ্ট: দ্রষ্টব্য

২. "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব", 'বিবিধ প্রবন্ধ', পৃ. ৮০

নামক প্রবন্ধ রচনা করে রাজনারায়ণ দেশভাষার ব্যাপক চর্চার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনারায়ণের এই আকাঙ্ক্ষাই বলবতী ছিল যে, ইংরেজী-ভাষায় পঠন-পাঠন হোক, ইংরেজী সাহিত্যের রীতিমত অনুশীলন হোক, তবু "বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবে, সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে, ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক।"[১]

জাতীয় ঐতিহ্যে বাঙালী জাতিকে সচেতন করতে রাজনারায়ণের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তিনি 'রামের জন্মবৃত্তান্ত' রচনা করে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে 'নরচন্দ্রমা' রামের কীর্তিকথা ঘোষণা করেছেন, 'সে কাল আর এ কাল' রচনা করে এ-কালের তুলনায় সেকালের শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনা করে স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার সূত্র দেখিয়েছেন; অতঃপর বৈদিক ঋষিদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি গভীর অনুরাগ ও উক্ত প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন "ঋষি জীবন" প্রবন্ধে এবং "গীতা মাহাত্ম্য" রচনা করে কর্মবিমুখ বাঙালীকে কর্মমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

রাজনারায়ণ মনে-প্রাণে আশা করেছিলেন যে, দেশের অতীত কীর্তিগাথা অনুধ্যানের দ্বারা বাঙালী জাতি যেমন জাগরিত হবে, তেমনি বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস কাহিনী জাতির জাতীয়তাবোধ জাগরণে সহায়ক হবে। রাজনারায়ণ বলেছেন: "শ্রমস্বীকার ও তত্ত্বানুসন্ধান-পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই তমসাচ্ছন্ন অতীতকালের বৃত্তান্ত সকল উদ্ধার করিতে হইবে। বঙ্গদেশের অপরিজ্ঞাত পুরাবৃত্তের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির গৌরবজনক অনেকানেক ঘটনা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে।"[২] তখন বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা খুব প্রসারিত হয় নি। ডফের মারাঠা ইতিহাস এবং টডের রাজস্থান গ্রন্থে ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। Asiatic Society থেকে স্বদেশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছিল— এই সময় রাজনারায়ণ প্রবল আগ্রহে বিদ্যা ও অপরিমেয় অনুরাগে জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সন্ধানী হয়েছিলেন। পুরাবৃত্তকার হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর জন্মাবধি। ইংরেজী বিদ্যাভিমানীরা ঐতিহ্য-সচেতন নয় বলে তিনি কত দুঃখ প্রকাশ

---

১. "স্বদেশীয় ভাষানুশীলন", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক, পৃ. ৭৫

২. "জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ ১৮০২ শক, পৃ. ১৪

করেছেন: "নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থর্নওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্ত কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে?"[১] ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রচেষ্টায় 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' প্রকাশিত হলে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক রচনাদির সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ-ইতিহাস চর্চারও সূত্রপাত হয়। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উক্ত পত্রিকায় প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি গবেষণা ও অনুসন্ধান চলতে থাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তথা এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে। কিন্তু তারও পূর্ব থেকে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' ও 'এশিয়াটিক জার্নাল' তাঁর মনে স্বদেশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের ক্ষীণ ইচ্ছা জাগিয়েছিল। এই কর্মধারার অনুবর্তনে রাজনারায়ণ কর্মোৎসাহী হয়েছিলেন। অধিকন্তু 'ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষের' বিদেশীয় ইতিহাসের প্রতি প্রবল অনুগত্য ও স্বদেশীয় ইতিহাস জানার উদ্যমহীনতায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, স্বদেশীয় যুবকদের লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ-কর্তৃক প্রদত্ত আক্ষেপবাণীগুলিতে এ বিষয়ে লক্ষণীয়। সমসাময়িককালে বঙ্কিম এই চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই বাঙালীর ইতিহাস চাই বলে আবেদন জানিয়েছিলেন।

এই অভিলাষ রাজনারায়ণের প্রবল ছিল বলেই তিনি 'আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার' 'আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত' ইত্যাদি প্রবন্ধ রচনা করে প্রাচীন আর্যজাতির সঙ্গে হিন্দুজাতির ঐক্য, তাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের আদর্শ, তাদের ভাষা-তাত্ত্বিক বিবরণ ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আবার "মিসর দেশ" নামক প্রবন্ধ রচনা করে অন্যজাতির জীবনাদর্শ স্বজাতির সামনে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন। মূলত বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে "History of the Primitive Aryans" নামক প্রবন্ধ রচনা করে পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, আর্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস পুরাণের মধ্যেই নিহিত আছে।

জাতি-প্রতিষ্ঠার মূলে মাতৃভাষার কার্যকারিতার কথা রাজনারায়ণ অপরিণত বয়সেই গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার স্মরণার্থ সভার (১৮৪৮ খ্রী) বক্তৃতাটিই তার উপযুক্ত প্রমাণ। অতঃপর রাজনারায়ণ ইংল্যাণ্ড,

---

১. ১৭৭০ শকের শ্রাবণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৃ. ৬৯) প্রকাশিত হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত বক্তৃতা।

ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী, মিসর প্রভৃতি দেশের দেশবাসীর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও উন্নতি-প্রচেষ্টার আলোচনা করে এই আশাই পোষণ করেছিলেন যে, "ইহা কি সুখের চিন্তা? যদি এই মহাত্মাদের ন্যায় আমরা আত্ম-ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্মসন্তোষ লব্ধ হইবে...।"[১] শেলিং, হেগেল প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের সঙ্গে রাজনারায়ণ জাতীয়তাবোধ জাগরণে ভাষার অপরিহার্য শক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা উচ্ছেদ হয়ে বাংলা ভাষা প্রচলিত হোক— এমন কথা তিনি কখনো বলেন নি। দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁর কাম্য হলেও, প্রথমাবধি এই চিন্তাই তিনি করেছেন যে, "যদিও সর্ব্ববিবেচনাতে দেশভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে।"[২]

রাজনারায়ণের এই জাতীয় চিন্তার মূল সূত্র ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে। ইংরেজী শিক্ষিত, জাতীয়তাবাদী বাঙালী মনীষীবৃন্দ শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর আধিপত্যকে অপ্রীতিকর বলে বিবেচনা করেছিলেন। তবে ইংরেজী শিক্ষাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বহু রচনায় স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সে যুগের ইংরেজী ভাষাশিল্পের দক্ষ ব্যক্তি মনস্বী রাজনারায়ণ ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতিকে বাঙালী ছাত্রের শিক্ষার অনুপযোগী বলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় মন্তব্য করেছেন: "ইংরাজীর ন্যায় শ্রুতিকটু ভাষা আমাদিগকে পড়িতে হয়, ইহা সুখদায়ক কার্য্য বলা যাইতে পারে না।... ইংরাজী উচ্চারণের এত গোলমাল হে ইংরাজী শিক্ষার্থীদিগের আত্মহত্যা করিতে হচ্ছা হয়। পূর্ব্বজন্মের অনেক পাপ না থাকিলে আমাদিগকে এরূপ ভাষা পাঠ করিতে বাধ্য হইতে হইত না।"[৩] তাঁর মতে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ ব্যয়িত হয়; অথচ তাতেও ভাষা 'হৃদ্গত' হয় না, কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক

---

১. ১৭৭০ শকের শ্রাবণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৃ ৭১) প্রকাশিত ডেভিড হেয়ার স্মরণার্থ সভার বক্তৃতা।

২. তদেব

৩. 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৯১৪), পৃ. ৫৭-৫৮

শক্তিরই বৃথা অপচয়। এই দিকটি চিন্তা করে রাজনারায়ণ যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ: "বাঙ্গালী সচরাচর হদ্দ চল্লিশ বৎসর বাঁচে। তাহার অর্দ্ধেক জীবন যদি একটা বিদেশী ভাষা শিখিতে গেল, তবে আর কি হইল। আমাদিগের মাতৃভাষা যদি সেরূপ সম্পন্নশালিনী হইত, তাহা হইলে এই বিশ বৎসরে কেবল সেই ভাষার পুস্তক পাঠ করিলে, আমরা কতই শিখিতাম তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।"[১] রাজনারায়ণের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথ 'শ্রুতিকটুত্বে'র কথা বলেন নি বটে, কিন্তু "ইংরাজী ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা"— এ কথা দৃঢ়কণ্ঠে বলে দেখিয়েছেন, শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস ইংরিজী ভাষায় এমন বিশিষ্ট যে, বাঙালী ছেলের প্রাণ এবং মন কোনোটাই আকৃষ্ট হয় না। রাজনারায়ণ উদাহরণ আহৃত করে বাংলাদেশের সাধারণ জিনিসের প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দগুলির অর্থবোধের ত্রুটি দেখিয়েছেন। সে-সময় দেশে যে সংস্কৃতের চর্চা ছিল না, আদর ছিল না, বাংলা ভাষার চর্চা এমন-কি, শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না— এইজন্য রাজনারায়ণ কতবার দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি এর পরিণাম চিন্তা করে হতাশ হয়েছেন। যেহেতু "জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না।"[২] এই কারণেই রাজনারায়ণ "স্বদেশীয় ভাষানুশীলন" প্রবন্ধে বাঙালীর সম্মিলিত অনুষ্ঠানে দেশভাষার ব্যাপক প্রচলনের জন্য ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে পারি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে, পরিষদের কথোপকথন-মণ্ডলীতে, এমন-কি, পরিষদের সমস্ত কাজে বাংলা ভাষা চালু হয়েছিল রাজনারায়ণের একান্ত যত্ন ও উদ্যমে।

"জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি", নামক প্রবন্ধদ্বয়ে রাজনারায়ণ জাতিগঠনের বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নয়টি বিশেষ উপাদান দ্বারা একটি মানবগোষ্ঠী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সেই উপাদানগুলি হল এই: দেশ, শারীরিক লক্ষণ, মানসিক ও নৈতিক গুণ, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, অতীত পুরাবৃত্ত

১. 'গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ৮৩

২. "স্বদেশীয় ভাষানুশীলন", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৭৯৮ শক, পৃ. ১২৬

ইত্যাদি। বাঙালীজাতির পক্ষে জাতিগঠনের এই উপাদানগুলিকে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা যে খুব সহজ— এ কথা তিনি বুঝেছিলেন বলেই জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য বাঙালীজাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন বার বার। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিম পাশ্চাত্য দেশের nationality'র প্রসঙ্গে ইংরেজ জাতির স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, "ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।" ইংরেজ জাতির নেশন্ বা জাতি গঠনের মূলমন্ত্র ইংরেজ চরিত্র ও ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে রাজনারায়ণ তাঁর আত্মজীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবোধ ইংরেজ জাতির Patriotism-এরই সমতুল্য। তাঁর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা যেমন প্রখর ছিল, স্বজাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তেমনি প্রবল। তাঁর চরিত্রের এই দিকটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করতে হয়। "রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism -এর বার আনা বিলাতী, চার আনা দেশী।"[১] রাজনারায়ণের সংগঠনাত্মক কার্যগুলির মধ্যে এর পূর্ণ পরিচয় রয়েছে।

রাজনারায়ণ তাঁর ছুটি অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করতে ছুটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম কথা, হিন্দুজাতিকে জাতিত্বে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতব্যাপী অখণ্ড জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা। উদ্দেশ্যে পৌঁছবার উপায়ও তিনি অবম্বলন করেছিলেন— প্রথমত চিন্তার দ্বারা অর্থাৎ লেখনীমুখে, দ্বিতীয়ত সাংগঠনিক কর্মের দ্বারা। তাঁর প্রচেষ্টার কথা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে, উভয় পন্থারই তুল্যমূল্য স্বীকার করতে হয়। তবে স্বদেশহিতৈষী রাজনারায়ণের সমধিক খ্যাতি ও কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে তাঁর সংগঠনমূলক কর্মের মধ্যে। দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলেই, শিক্ষকতার মহৎ কর্ম ব্যতীত জীবনে অন্য কোনো কর্ম তিনি পেশারূপে গ্রহণ করেন নি। দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করেই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন: "মেদিনীপুরে এই সুরাপান-নিবারণীসভার জন্য আমার যত পীড়ন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্য তত হয় নাই।" রাজনারায়ণ কর্তৃক দেশপ্রীতি প্রচারের সক্রিয় অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন হয় এই সভার দ্বারা।

---

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত. 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩), পৃ. ২৯৮

তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় সক্রিয় অনুষ্ঠান হল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী, সভা। রাজনারায়ণ কর্তৃক রচিত এই কার্যবিবরণী থেকে একটি অনুষ্ঠান-পত্র প্রস্তুত হয়। কার্য বিবরণীতে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিফলনরূপ কয়েকটি প্রস্তাব লিখে রাজনারায়ণ তুলে ধরেন জাতির সম্মুখে। তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য : "অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চিরনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ইতিমধ্যেই একদল যুবক হিন্দুসমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন হইতে এবং হিন্দু নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কার সকল জাতীয় আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা সংস্থাপন করুন।" রাজনারায়ণের দেশ ও জাতি -প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে এখানে। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, এই সভা হবে সম্পূর্ণ 'স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান'। দেশের শিল্প (চারুশিল্প ও সংগীত শিল্প), স্বাস্থ্য (ব্যায়ামাগার ও চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা), ও শিক্ষা (বাংলা ও সংস্কৃতের চর্চা) -সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনা দেশ ও জাতিগঠনের কাজে সহায়ক হয়েছিল। ঐতিহাসিকের উক্তি সর্বৈব সত্য : "ইংরেজ শাসকজাতি বলিয়া তাহাদের ভালমন্দ সব কিছু গ্রহণ করিবার যে একটি অত্যধিক আগ্রহ শিক্ষিত সমাজে লক্ষিত হইতেছিল এই সভা হইল তাহার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ।"[১] আবার ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা ও তার অধীনে জাতীয়সভা স্থাপনের মূলে ছিল রাজনারায়ণের প্রেরণা ও পরিকল্পনা। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখি যে, হিন্দু মেলাই সক্রিয় দেশপ্রীতি প্রচারের প্রথম প্রতিষ্ঠান। সভাপতিরূপে এবং নবগোপাল মিত্রের সহকর্মী রূপে রাজনারায়ণ

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ', ১৩৫৩, পৃ. ১৩৭

-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শেষ অবধি (সম্ভবত ১৮৮০ সালে হিন্দুমেলা বিলুপ্ত হয়)। দেশ ও জাতির প্রধানত ত্রিবিধ উন্নতির অঙ্গীকার করেছিলেন হিন্দু-মেলা ও জাতীয় সভার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাগণ— আত্মিক (Spiritual) বৌদ্ধিক (Intellectual) ও মানসিক (Emotional)— জাতির দৈহিক, মানসিক ও সর্ববিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা এখানে চলত; এবং প্রতিটি বিষয়েই রাজনারায়ণের উৎসাহ ও সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের প্রবল উদ্দীপনা কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর জীবনের বিশেষ দিকটি কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিই এড়িয়ে যায় নি। অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন: ("রাজনারায়ণ রাজনীতি-ব্যবসায়ী ছিলেন না, টাউন হলে বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় বক্তৃতা দিয়াই তাঁহার স্বাধীনতা-উদ্দীপনা জুড়াইয়া যাইত না। তিনি ব্যাকুল ছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের জন্য।"[১]) সেই ব্যাকুলতাবশত জাতীয় সভার পর রাজনারায়ণকে 'সঞ্জীবনী' নামে এক গুপ্তসভার অধ্যক্ষরূপে দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইটালী এবং জার্মানীর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, কাভুর ও বিস্মার্কের আদর্শে এদেশের যুবকগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই যুবকদলের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, বালক রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। তাঁরা ইটালীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের 'কার্বোনারি'র (গুপ্তসভা) অনুকরণে গুপ্তসভা স্থাপনে উদ্যোগী হন। 'সঞ্জীবনী সভা' (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ) তারই সাক্ষ্য।

এই সভার নামকরণ থেকেই তার সভ্যগণের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়। দেশব্যাপী জীবন-সঞ্চারের মন্ত্র বিতরণের ব্রতই ছিল সভ্যদের। এমন-কি, সাংকেতিক ভাষায় সভার নামকরণ হয়েছিল হামচূপামূহাফ্।[২] ঠনঠনের একটা পোড়ো বাড়িতে ছিল সভার কার্যালয়। "চিরতরুণ চিরবৃদ্ধ, রাজ-

---

১. সুকুমার সেন, ভূমিকা, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' (২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ) পৃ. ১৪

২. "সঞ্জীবনী সভা কর্তৃক ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ধার কৌশল নিম্নে লিখিত হইল:—

আকার স্থানে অকার, অকার স্থানে আকার, ই স্থানে উ, ঈ স্থানে ঊ, উ স্থানে ই, ঊ স্থানে ঈ, এ স্থানে ঐ, ঐ স্থানে এ, ও স্থানে ঔ, ঔ স্থানে ও। ক খ গ ঘ স্থানে যথাক্রমে গ ঘ ক খ, চ ছ জ ঝ স্থানে যথাক্রমে জ ঝ চ ছ, ট ঠ ড ঢ স্থানে যথাক্রমে ড ঢ ট ঠ, ত থ দ ধ স্থানে যথাক্রমে দ ধ ত থ, প ফ ব ভ স্থানে যথাক্রমে ব ভ প ফ, শ ষ স স্থানে হ,

নারায়ণ" ছিলেন এর অধ্যক্ষপদে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এই সভার বর্ণনা আছে।[১] আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তাকাগার থেকে আনা লালরেশমে জড়ানো একখানা বেদমন্ত্রের পুথি, এবং একটি তরবারিও থাকত। আর টেবিলের দুপাশে থাকত দুটি মড়ার মাথার খুলি, তার চক্ষুকোটরে জলত দুটি মোমবাতি। রাজনারায়ণের চরিত্রে ক্ষাত্রভাব ছিল অতি প্রবল। তরবারি তারই প্রতীক। দেশ উদ্ধারের কাজে 'ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান ও ক্ষাত্র শক্তি' দুয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই সভার কার্যাবলীর কথা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সুস্পষ্ট: "সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল।··· আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার। দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না।"[২] দীক্ষা-কালীন অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় পরিস্ফুট: "দীক্ষাকালে, নব-দীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ এক অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।" পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভের স্পন্দন হল এই। এর জন্য অফুরন্ত জীবনীশক্তির উৎস সন্ধানের এই উন্মাদনাপূর্ণ অজ্ঞাত শিহরণ। অতঃপর জানা যায় যে, ভাবী সভ্যরা তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা নিজের বক্ষঃস্থল ছিন্ন ক'রে সেই রক্তে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতেন।[৩]

দেশোদ্ধারের ব্রত অতি সুকঠিন। শুধু মাত্র অনুপ্রেরণায় নয়, কর্মে, নিষ্ঠায় পবিত্রতায় সাধনায় তা যথার্থ রূপলাভ করে। রাজনারায়ণের সুগভীর দেশপ্রীতি তাঁর চিন্তার এই দিকটিতে বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেছিল। তারই পরিচয় রয়েছে 'সঞ্জীবনী সভা'র দীক্ষানুষ্ঠানের মধ্যে। তপস্যা, ত্যাগ,

---

হ স্থানে স, র স্থানে ল, ল স্থানে র, ম স্থানে ন, ন স্থানে ম। যথা ঃ—

স ন্ জী ব নী স ভা

হা ম্ চু পা মৃ হা ফ্"

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', ১৩২৬, পৃ. ১৬৭

১. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', ১৩২৬, পৃ. :৬৭

২. দ্রষ্টব্য: 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫৪), পৃ. ৯৮

৩. দ্রষ্টব্য: Bipinchandra Pal, *Memories of My Life and Times.*

সংযমে যেমন ইষ্ট লাভ হয়, তেমনি দেশোদ্ধারের কর্মকে শুদ্ধাচারে ব্রতরূপে গ্রহণ করলে দেশমুক্তির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়। উনিশ শতকের সপ্তম দশকের নবজাগ্রতপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিকগণের কাছে দেশপ্রীতিই ছিল ইষ্টপ্রেম, স্বদেশ-চিন্তাই ছিল ইষ্ট আরাধনা। বলা যায়, এই মন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্গাতা রাজনারায়ণ। তদানীন্তন স্বদেশপ্রেমিকদের নিকট তিনি ছিলেন গুরুস্থানীয়। লাল পট্টবস্ত্র পরিধান দেশপ্রেমের প্রজ্বলিত উৎসাহাগ্নি স্বরূপ, নব-দীক্ষার্থীর চিত্তে এই প্রেমাগ্নি প্রজ্বলনের ব্রত এবং মন্ত্র দুইই তাঁর ছিল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গলায় তাঁর সুর ছিল না ; সুর থাকা না-থাকার দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। দেশপ্রেমের ডাকে মিলিতকণ্ঠে সকলের সঙ্গে গান ধরতেন। দেশাত্মবোধক গান তাঁর এমনই প্রিয় ছিল। "দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত…।"[১] নবদীক্ষার্থীর অন্তরে রাজনারায়ণ এই তেজের সঞ্চার করে দিতেন। (জীবনস্মৃতি পাঠেই জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা' জাতীয়তা-মন্ত্রের গুরু রাজনারায়ণের কাছেই লাভ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ তাঁর স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হন নি বটে, কিন্তু বিপ্লবের মূল আদর্শ প্রোথিত ছিল এই গুপ্ত সভাতেই। সঞ্জীবনী সভার কার্যকলাপ থেকে বুঝতে পারি যে, এঁদের সকলেরই মনে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত ছিল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কোনো কাজের মধ্যে তা প্রকাশের উন্মাদনা তখন জাগে নি।) (মূলত রামমোহন থেকে আরম্ভ করে একাল পর্যন্ত (প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি) দেশসেবক অনেকেই ইংরেজ-বিতাড়ন মনে-প্রাণে আশা করেন নি। ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও কোনো প্রয়োজন হয় নি। যথোচিত অধিকার বজায় রাখতে ও ন্যায্য প্রাপ্যের জন্যই দেশ-বাসীর মনে ইংরেজ-শাসনের প্রতি বিদ্রোহ ভাব জেগেছিল।) রাজনারায়ণের কথাতেই এই বিষয় আরো স্পষ্ট হয়। ('সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে তিনি বলেছেন : "এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না।")

১. 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫৪), পৃ. ১০১

রাজনারায়ণের মনে তখন থেকে বিদ্রোহ ভাব জেগেছিল বলেই এবং এই ক্ষাত্রভাব ও স্বদেশচেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল থাকার জন্যই বোধকরি তিনি হিংস্র জন্তু ও অসাধু লোকের সঙ্গে ইংরেজকে সমগোত্রীয় করে দেখতেন। রাজনারায়ণের এই গভীর স্বদেশপ্রীতি লক্ষ্য করেই 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে 'মহারাজনৈতিক' (মহাস্বদেশপ্রেমিকই বলতে চেয়েছেন) আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পিতার (গঙ্গাচরণ সরকার) কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "কেবল দুইটি বিষয় ছাড়া, পিতার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। অন্ধকার, ভূত, সাপ, বাঘ, ইংরেজ, চোর, ডাকাত"। রাজনারায়ণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে অক্ষয় সরকারের নিকট তাঁর পিতার গল্প শুনছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বললেন : "বাহবা beautiful beautiful— সাপ, বাঘ, ইংরেজ চোর, ডাকাত— beautiful"— অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে তাঁর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদের মর্ম বোঝেন নি, পরে বুঝলেন যে, 'রাজনারায়ণবাবু মহারাজ-নৈতিক ঐ যে ইংরাজকে সাপ, বাঘ, চোর, ডাকাতের মাঝে ফেলিয়া এক তালিকা (category) মধ্যে পুরিয়াছি,— তাহাতেই তাহার মহা আনন্দ হইয়াছে।"[১] বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিটিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রাজ-নারায়ণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তিনি বলেছেন : "রাজনারায়ণবাবুর ক্ষাত্রভাবটা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। যখন রাজনারায়ণবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে, শরীরটাও খুব বলিষ্ঠ এমন নহে, তখন সেই বয়সে, সেই শরীর লইয়া, আমার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'আমি বেশিদিন বাঁচিব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারিতাম ত এ জন্মটা সার্থক বলিয়া মনে করিব।'[২]

রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের আদর্শ ছিল উদার, বিস্তৃত ও মহান্। কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ভৌগোলিক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা তাঁর স্বদেশচেতনা কোনোদিন আচ্ছন্ন হয় নি। ভারতব্যাপী এক অখণ্ড হিন্দু-জাতীয়-সংহতি গড়ে তোলার উচ্চ আদর্শেই রাজনারায়ণ তাঁর

---

১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৬৪৯-৫০

২. বিপিনচন্দ্র পাল, 'নবযুগের বাংলা' (২য় সংস্করণ), পৃ. ১৩৫

চিন্তার পরিধিকে বঙ্গকেন্দ্রিক, প্রাদেশিক, সর্বোপরি হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে সচেতনভাবেই আবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের আদর্শের সমতুল্য ছিল দেশপ্রেম প্রচারের আদর্শ। সর্ববিষয়ে জাতীয়ভাব অবলম্বন করে স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করার চিন্তা তিনিই প্রথমে করেছিলেন। এবং এইভাবে স্বভাবতই তা প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করবে এই তাঁর আশা ছিল। আদর্শকে অস্বাভাবিক বড়ো করে অযথা শক্তির অপব্যয় করা তিনি সংগত মনে করেন নি কোনোদিন। বোধকরি উনিশ শতকের মূল সুরই ছিল তাই। মতে-পথে পার্থক্য সকলের ছিল, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। "রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব, মাইকেল, কেশব সেন, বিবেকানন্দ— পরস্পরে কত প্রভেদ। কিন্তু একটা জায়গায় সকলেই এক, সকলেই ভারতনাবিক।"[১]

প্রথমাবধি রাজনারায়ণ হিন্দুজাতীয়তা তথা হিন্দুত্বের গণ্ডী কেন অতিক্রম করার চেষ্টা করেন নি, তার কারণ অতি গূঢ়। এক কথায় বলা যায় যে, যে-কারণে তিনি জাতীয়-পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মের সাররূপে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার করতে চেয়েছিলেন, সেই কারণেই তিনি বৃহৎ-জাতীয়-সংহতি গঠন করতে স্বধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। স্বধর্মে বিমুখ ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হিন্দুধর্মে আস্থাবান করবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশবিমুখ জাতির জাতীয়-চৈতন্য পুনর্জাগরণের জন্য অনুরূপভাবে জাতীয় ভাবই অবলম্বন করেছিলেন তিনি। রাজনারায়ণের মনে আরো এক আশঙ্কা ছিল, যে জন্য তিনি হিন্দুত্বকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে লিখিত একটি পত্রে (১৫ জুন, ১৮৭৮) তা বোঝা যাবে : "I think you ought to decide soon whether you should adopt a strictly Hindu mode of propagation, for if you do not adopt it at once, the Arya Samajes bid fair to outstrip the Brahmo Samajes as has been the case at Monghyr and elsewhere. The Arya Samajes should not be allowed to do so as the Brahmo Dharma has a greater claim to the veneration and love of the people, than they, being the Sara Dharma according to their

১. প্রমথনাথ বিশী, 'চিত্র ও চরিত্র' (১ম সংস্করণ), পৃ. ৬৫

own admission."[১] উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী -প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজকে[২] রাজনারায়ণ হিন্দুধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপক্ষরূপেই দেখেছিলেন। আর্য-সমাজের ধর্মপ্রচার এবং তাতে সহজেই জাতিকে আকৃষ্ট হতে দেখে তিনি বোধকরি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, অপর দিকে আর্যসমাজ-কর্তৃক বেদান্তধর্মের প্রচার দেখে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দুজাতীয়তার বিলুপ্তি তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। এই-সমস্ত কারণেই জাতীয়তাবোধ উদ্-বোধনে রাজনারায়ণের প্রাদেশিকতার আদর্শ তাঁর স্বদেশচেতনারই আর-এক দিক বলা যায়। প্রাদেশিক ভাব ও বিশ্বজনীন আদর্শ— দুইই ছিল মহাহিন্দু-সমিতির আদর্শের অঙ্গীভূত আর এই প্রাদেশিকতা থেকেই তাঁর ভারতবোধ তথা বিশ্বমানবিকতাবোধ জেগেছিল। রাজনারায়ণের উক্তিই এর যথার্থ প্রমাণ : "আমি বিশ্বজনীনতা বড় ভালবাসি, কিন্তু যে বিশ্বজনীনতা আমাকে আমার স্বদেশকে ভুলাইয়া দেয় তাহা আমি অস্বস্থতা জ্ঞান করি।"[৩] এই বিশ্বজনীনতার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রাজনারায়ণ জাতীয় ঐক্যসাধনের অপরিহার্যতা ও একই কালে এর অন্তরায়গুলির কথাও চিন্তা করেছেন : "ভারতবর্ষস্থ সকল জাতির বর্তমান অবস্থা সকল বিষয়ে প্রায় একই রূপ, তথাপি তাহাদের মধ্যে ঐক্য নাই ইহা জাতিগত মঙ্গলের পক্ষে একটি মহান অন্তরায়।··· যদি পরস্পরের মধ্যে সেই ঐক্যই না রহিল তাহা হইলে ইহার উন্নত হইবার আশা কোথায়।"[৪] এই ঐক্যবোধকেই মিল্ বলেছেন Common Sympathies।

---

১. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আশ্বিন ১৮০১

২. উত্তর ভারতে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। রাজনীতির বাইরে ধর্মকে ভিত্তি করে আত্মসাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাঁরা জাতির হৃতগৌরব ও জাতীয়তাবোধ পুনর্জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁদেরই একজন। ইনি ইংরেজী অনভিজ্ঞ, যোগীপুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় ইনি বক্তৃতাদি করেছিলেন ও পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে স্বীয় মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এঁর মতে বেদ অভ্রান্ত, মনুষ্যসমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজন আছে। একসময় লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশসেবীগণ দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও জাতির সর্বৈব মঙ্গল ও মুক্তির চিন্তায় কর্মতৎপর হয়েছিলেন।

বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ -প্রকাশিত 'ভারতকোষ' প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৩৬২ এবং চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০-২১

৩. "প্রতিবাদের উত্তর", 'দাসী', মার্চ ১৮৯৬, পৃ. ১৬৩

৪. "হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক, পৃ. ৩৩

তিনি বলেছেন : "A portion of mankind may be said to constitute a Nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and any others— which make them co-operate with each other more willingly than with other people, desire to be under the same government, and desire that it should be governed by themselves or a portion of themselves exclusively."[১]

জাতীয় ঐক্য সংসাধনের উপায়রূপে রাজনারায়ণ 'ধর্মের একতা'র উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু রাজনারায়ণের চিন্তায় "মত স্বতন্ত্র হইলেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই সাম্প্রদায়িক ভাব উচ্ছেদ করিয়া একটি সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই সাধারণ হিন্দুধর্ম।"[২] এই একেশ্বর ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনারায়ণ ভারতব্যাপী এক জাতীয়তার মহান্ পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্মের আদর্শের কথা ও হিন্দুজাতির ধর্মপ্রবণতার কথা তিনি যে কখনোই বিস্মৃত হন নি তা বলাই বাহুল্য। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকার ভূমিকায় রাজনারায়ণ বলেছেন : "হিন্দুদিগের উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা করিতে গেলে তাহা ধর্ম্মমূলক করা চাই, যেহেতু হিন্দুরা অতি ধর্ম্মপরায়ণ জাতি।" রাজনারায়ণ অনুভব করেন যে ব্রহ্মবাদের মূল কথা হল, জাতি বর্ণ ধর্ম -নির্বিশেষে স্বতন্ত্র মত ও পথ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত ব্রহ্মবাদী একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তিতে অখণ্ড জাতীয় ঐক্যে মিলিত হবে। এই মহামিলনের স্থানরূপেই রাজনারায়ণ 'মহাহিন্দু-সমিতি' সংস্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন।

নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মহাহিন্দু-সমিতির পরিকল্পনা রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের চরম প্রকাশ। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'য় ভারতব্যাপী যে অখণ্ড ঐক্যের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন, তা মূলত ভারতীয় জাতি-সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই। রাজনারায়ণ চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় সর্বজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে 'মহাহিন্দু-সমিতি'তে সাম্প্রদায়িক কোনোরূপ

---

১. জন স্টুয়ার্ট মিল, *Utilitarianism— Liberty Representative Government*, (1964), P. 359-360.

২. "হিন্দুজাতির ঐক্য সাধন", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক, পৃ. ৩৪

বিভেদবৈষম্য থাকবে না, কেবলমাত্র সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর ভেদ থাকবে। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা, এবং সাধারণত হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহাসমিতির উদ্দেশ্য।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতির কতকগুলি আদর্শের কথাও রাজনারায়ণ উল্লেখ করেছেন।

রাজনারায়ণের 'মহাহিন্দু-সমিতি'র উদার বিস্তৃত আদর্শের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ উজ্জীবনের পন্থাগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পরিকল্পিত সমিতির পতাকাচিহ্ন হবে ঈশ্বর ও মাতৃভূমি। এবং পতাকায় পদ্ম-চিত্রের সঙ্গে 'সনাতন ধর্মের জয়' কথাটি লিখিত থাকবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পদ্মপুষ্পের অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা রাজনারায়ণের স্মৃতিতে ছিল। এইভাবে উক্ত সমিতির সাজ-সজ্জা, বিধি-নিয়ম— সবই রাজনারায়ণের গভীর স্বদেশপ্রেম দ্বারা সঞ্জীবিত ছিল।

ভারতের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত মহাহিন্দু-সমিতির শাখাসমিতিগুলির জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা প্রচলনের কথাও তিনি একালে চিন্তা করেছিলেন। রাজনারায়ণ ভাষা-সমস্যার সমাধানের যে ইঙ্গিতটি সে-যুগে দিয়েছিলেন আধুনিককালে ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তদপেক্ষা নূতন কোনো পরিকল্পনা উদ্‌ভাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে তিনি হিন্দী ভাষায় ভাববিনিময় অনুমোদন করেছিলেন। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ ব্যতীত অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্য্যসাধন জন্য হিন্দি শিখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শিখেন ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে।"[১] উক্ত সমিতির অধিবেশনে ভাষা সম্বন্ধে তিনি ইংরেজী বর্জন এবং মাতৃভাষা অনুশীলনের প্রবল উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি এমন কথা বলেছেন যে, যখন যে অঞ্চলে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে তখন 'সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য'।

মহাহিন্দুসমিতির যে একটি বিরাট পরিকল্পনা তিনি জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা উদ্ধৃতি-যোগ্য : "ভারতবর্ষে সাধারণত যে সকল সভা আছে, তাহার সকলেরই

১. 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', ২য় সংস্করণ, ১২৯৯, পৃ. ২৩

উদ্দেশ্য, হয় রাজনৈতিক আন্দোলন, না হয় সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষা। যে সকল সভা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের দুই একটি কথা বলিবার আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা যে দেশের অপরিসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের লোক রাজনীতি যে কি, তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য না হইলে এই সকল আন্দোলন দ্বারা দেশে সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী মঙ্গল কখনও সংসাধিত হইতে পারে না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, ভারত সভা, পুনা সার্ব্বজনীন সভা, এ সকলেরই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং ইহাদিগের দ্বারা আন্দোলনও যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছে। কিন্তু কেবল আন্দোলন লইয়া চিরদিন থাকিলেও চলিবে না, আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের প্রয়োজন। আমাদিগের শাসনকর্ত্তাগণ যদি বুঝিতে পারেন যে, আন্দোলনই আমাদিগের স্বদেশপ্রেমের চরম সীমা, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে তদুপযুক্ত ব্যবহারই করিবেন। কিন্তু যদি আমরা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আমরা কেবলই বক্তৃতা করিতে অথবা সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতে নিপুণ নহি, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রেও অগ্রসর, তাহা হইলেই তাঁহারা আমাদিগকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন, এবং আমাদিগের আন্দোলনের সারবত্তা আছে বুঝিয়া আমাদিগের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে সঙ্কুচিত হইবেন। মহাহিন্দু সমিতির প্রধান লক্ষ্য, কার্য্য।"[১] রাজনারায়ণের এই চিন্তা নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যান্য ধর্মসভাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।[২]

হিন্দুমেলার অবলুপ্তির পর এবং উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের ভারতব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টার পাশেই 'মহাহিন্দু সমিতি' স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রাজনারায়ণ যে যে কারণে গভীর-ভাবে অনুভব করেছিলেন, অনুরূপ কারণেই তিনি 'হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস' স্থাপনের উপযোগিতাও উপলব্ধি করেছিলেন। মহাহিন্দু-সমিতি ও তার পরবর্তী সময়ে হিন্দু-জাতীয়-কংগ্রেস স্থাপনের প্রস্তাবের মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যের স্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ব্যাপকভাবে দেশচর্চার জন্য 'হিন্দুমেলা'র পর 'জাতীয়সভা' সংস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। 'জাতীয়

---

১. "মহাহিন্দু সমিতি (সমালোচন)", 'নব্যভারত', আশ্বিন ১২৯৩, পৃ. ২৮৪

২. দ্রষ্টব্য : রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৬৩

সভা'র কার্যাবলীর দ্বারা সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের সূচনা হওয়ার পরও রাজনারায়ণ 'হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস' করার প্রস্তাব করেছিলেন।[১] এর দ্বারা তিনি একটি উদ্দেশ্য সংসাধনের কথা চিন্তা করেছিলেন: "From the advantages, that would result from the establisment of a Hindu Congress, one would clearly see the difference between Indian Congress and Hindu Congress, and would hesitate to call the former a Hindu Congress."[২] জাতির স্বাজাত্যাভিমান পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টার প্রাথমিক অবস্থায় রাজনারায়ণ তাঁর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম এবং রাজনীতির আন্দোলন থেকে বিরত থাকার উপদেশই দিয়েছিলেন। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র প্রস্তাবটি[৩] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিশুদ্ধ ধর্মালোচনার ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ। ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতির সর্ববিধ উন্নতি প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য রাজনারায়ণের মহাহিন্দু সমিতির পরিকল্পনা। বিশুদ্ধ রাজনীতি আলোচনার প্রতিষ্ঠান ভারত সভা। রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনার ক্ষেত্ররূপে রাজনারায়ণ কর্তৃক 'হিন্দু জাতীয় কংগ্রেসে'র সূচনা। সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু-জাতীয়-ঐক্য স্থাপনের এইরূপ গভীর চিন্তা রাজনারায়ণ ব্যতীত তাঁর পূর্বে বা পরে বোধকরি আর কেউ করেন নি। মোট এগারোটি পরিকল্পনা[৪] -সংবলিত এই আবেদনে রাজনারায়ণের সুগভীর দেশাত্মবোধের

---

১. এই প্রস্তাব *Old Hindu's Hope or A Proposal for the Establishment of A Hindu, National Congress* নামক পুস্তকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার পর উক্ত সালেরই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮, রবিবার) সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

২. 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮) পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র।

৩. জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার একটি প্রস্তাবে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন: "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মে অনেক সারবান বিষয় আছে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অত্যাচার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় গৌরবেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়দ্বয় সংসাধন জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা অনাবশ্যক। ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।"—"শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব", 'বিবিধ প্রবন্ধ'।

৪. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

পূর্ণ প্রকাশ। পরিকল্পনার কয়েকটিতে জাতিহিসেবে মর্যাদালাভের ও অধিকারবোধের সুদৃঢ় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

দেশপ্রেমের আদর্শকে রাজনারায়ণ আজীবন সমুন্নত রেখেছিলেন। দেওঘরের বিশ বছরের জীবনে তিনি কখনো সক্রিয়ভাবে কখনো বা পত্র-প্রবন্ধাদির দ্বারাও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তিনি দেশ ও জাতি -সম্পর্কিত আলোচনাদিতে রীতিমত অংশ গ্রহণ করতেন। দেওঘরে-আগত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর আলোচনার অংশ বিশেষ তাঁর অপ্রকাশিত ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত হল—

"...অদ্য প্রাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত 'what constitutes a nation'—এই বিষয়ে তর্ক হয়। তিনি বলেন যে একরাজা অথবা এক রাজতন্ত্রের অধীনে থাকা জাতীয়তার একমাত্র কারণ। আমি বলি যে ভাষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় জাতীয়তার কারণ।" —শনিবার ৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ : ১৯ নভেম্বর, ১৮৮৭

সন্ধ্যার সময় গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কথা হয়। রাজনারায়ণ বলেন: "বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ··· দাঁড়াইয়াছে। বাটীতে ও বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ধুতি ও কুর্তিতে সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাতের সময় চোগা, চাপকান ও পাগড়ি।" —শুক্রবার ৩ পৌষ, ১২৯৩ : ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

"কংগ্রেস সম্পাদককে এক পত্র লিখি···। আমি এই সকল কারখানা করিতে বলি। (১) Technical Schools (২) Agricultural Banks. (৩) Joint Stock Companies (৪) মেঞ্চেষ্টার বস্ত্র ব্যবহার পরিত্যাগ (৫) গ্রাম্য পঞ্চায়েত স্থাপন ইত্যাদি।" —বুধবার ৭ পৌষ, ১২৯৪ : ২১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭

"অদ্য বৈকালে শিশিরবাবু আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে কংগ্রেস বিষয়ে W. C. Banerjee বিলাতে কেবল Radical দলের সাহায্য লইতেছেন, ভাল করিতেছেন না। এই বিষয়ে দলের হওয়া উচিত হয় না। দল নির্ব্বিশেষে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।" —শুক্রবার ১৬ ভাদ্র, ১২৯৫ : ৩১ আগষ্ট, ১৮৮৮

জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই রাজনারায়ণ এক সময় দেওঘরে একটি 'ভ্রাতৃ-

সমাজ' স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন। যার নিয়ম ছিল, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এই সমাজের সদস্যভুক্ত হতে পারবেন। রাজনারায়ণ আরো একটি নিয়ম করেছিলেন : "...ভ্রাতৃসমাজের সভ্যদিগের একটি শৃঙ্খল ও তাহার উপরে "ভ্রাতৃভাব" এই শব্দ অঙ্কিত অঙ্গুরীয় ধারণ করিবার প্রস্তাব করি।" (—ডায়ারি : সোমবার ১৮ ফাল্গুন, ১ মার্চ)। দেশের প্রাচীন বীর শক্তিশালী উন্নতচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির কথা স্মরণ করে রাজনারায়ণ দেশপ্রেমের গভীর ভাব অনুভব করতেন। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় তাঁর কৃত 'আর্য্যনামাবলী' তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(স্বদেশপ্রেমের এমন একটি প্রজ্বলিত ব্যক্তিত্ব বোধকরি সর্বকালে সর্বদেশেই বিরল। তাঁর জীবনের ছোটোখাটো অসংখ্য ঘটনায় দেশপ্রেমের প্রকাশ হয়েছে। জনশ্রুতির মতো ছড়ানো এই কাহিনীগুলি জাতির জীবনে চিরদিন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জোগাবে।) দেশাত্মবোধক সংগীত শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন।[১] স্বপ্নে নীলাচলের সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বজননীকে উদাত্তস্বরে আহ্বান জানাতেন। স্বপ্নভঙ্গের পর উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে করতে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করতেন।[২]

(রাজনারায়ণ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। বলা বাহুল্য, সে মন্ত্রের সাধন তিনি করেছেন আজীবন এবং সে মন্ত্র

---

১. ইং ১৮৯৩ সালের একটি ঘটনা। কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হয় লাহোরে। রাজনারায়ণ তখন দেওঘরেই অবস্থান করছেন। একদিন তাঁর এক দৌহিত্রী (লীলাবতী মিত্রের কন্যা বাসন্তী চক্রবর্তী) গান করেছিলেন—

"পর দীপমালা, নগরে নগরে ;
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ;"

রাজনারায়ণ গানটি শুনে বললেন, "ও গান গাসনে—সব কথা মনে হয়, শরীর দিয়ে আগুন বাহির হয়—মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। "গাসনে গাসনে।" —লীলাবতী মিত্র, "স্বর্গগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু", 'অন্তঃপুর' পত্রিকা, মাঘ ১৩০৬।

২. একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি নীলাচলে গিয়াছেন। সম্মুখে এক বৃহৎ পর্ব্বত। তাহার নীচেই সমুদ্র। তিনি সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন : —"আমার যে জগৎ মাতা তিনি কি এখানে ?" সেই সুন্দর স্থানে দাঁড়াইয়া, "আমার জগৎ মাতা কোথায়," বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আত্মীয়দিগের নিকট বলিবার সময় রাজনারায়ণবাবু হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইল।" —"স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু", 'প্রদীপ', চৈত্র ১৩০৬, পৃ. ১১

তাঁর কালসীমা উত্তরণ করে গেছে। 'বলাকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

বোধকরি, রাজনারায়ণের বাণীও সুদূর নয়, অনতিদূর যুগান্তরেই অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের মধ্যে অস্ফুটভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। জাতীয়তা-উদ্‌বোধন যজ্ঞের হোতারূপে যে মন্ত্র রাজনারায়ণ উচ্চারণ করেন, বৈপ্লবিক কর্মে ও দার্শনিক জিজ্ঞাসায় শ্রীঅরবিন্দ তাকে পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন।[১] রাজনারায়ণের স্বদেশচিন্তায় ভারতীয় হিন্দুত্বের যে মহান আদর্শ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানে ও কর্মে সেই আদর্শেরই মহিমান্বিত প্রকাশ দেখা গিয়েছে। এই দুই মহামনীষী প্রত্যক্ষভাবে রাজনারায়ণের চিন্তা ও কর্মধারার অনুসরণ হয়তো করেন নি, কিন্তু রাজনারায়ণের মনে অস্ফুটভাবে যে ভাব অঙ্কুরিত হয়, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বদেশপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তারই মহীরুহ রূপ প্রকাশিত হয়েছে বলে অনুমান করা অসংগত কল্পনামাত্র নয়।

১. "As some people called him [Nabagopal Mitra] the father of Nationalism, Rajnarayan humerously styled himself as the grandfather of Nationalism. He could not foresee at that time that he would deserve that title literally because of the momentous part played by his daughter's sons, Sri Aurobindo and Barindra Kumar in the history of the freedom movement of the country". —Bimanbehari Majumdar. *Militant Nitionalism in India*, 1966, p. 7.

সাহিত্যে রাজনারায়ণ

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে রাজনারায়ণের বিস্ময়কর পারদর্শিতা লক্ষ্য করেই দেবেন্দ্রনাথ একসময় তাঁকে 'ইংরাজী খাঁ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেও ইংরেজীয়ানার মধ্যে তিনি কোনো-ক্রমেই মিশে যেতে পারেন নি কোনোদিন। সুগভীর ঈশ্বরপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েই রাজনারায়ণের লেখনী ধারণ। প্রয়োজনের প্রেরণায় দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করতে হয়েছিল; কিন্তু সেই প্রয়োজনের রচনাই পরবর্তী কালে বঙ্গীয় সারস্বত-সাধনার গৌরব অর্জন করেছে। রাজনারায়ণের বাংলা সাহিত্যানুরাগ ও বাংলাভাষায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে দেশের প্রয়োজনে লেখনী ধারণ করেছিলেন রামমোহন; বিদ্যাসাগরও সমকালীন যুগের চাহিদা উপলব্ধি করেই রচনাকর্মে মনোনিয়োগ করেছিলেন। রাজনারায়ণ সমাজের তৎ-কালোপযোগী প্রয়োজনে তাঁর চিন্তাধারাকে পরিচালিত করেছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর রচনার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

বাংলাসাহিত্যে রাজনারায়ণের আবির্ভাবকালে গদ্য রীতির প্রয়োগবিজ্ঞান উন্নত হলেও গদ্য রচনা পুরোপুরি সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে নি। তাঁর সাহিত্য-কৃতিকে পরবর্তীকালে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজনারায়ণের বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য: "রাজনারায়ণবাবুর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। ...তিনি যখন এই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত—"এই ভাষায় কি আছে যে তুমি এই ভাষায় সেবা করিবে?" উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি ত এমন ভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে

যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহে শুনিয়াছিলেন।"[১] মাত্র উনিশ-কুড়ি বছরের একটি নবীন তরুণ গভীর দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলা সাহিত্য উন্নত না হলে বাঙালী জাতির উন্নতি হবে না। রাজনারায়ণের সাহিত্য-কৃতির এ হল এক দিক।

সাহিত্যে রচনার পরিমাণ হিসেব করে সাহিত্যের-ইতিহাসে রাজনারায়ণের নাম লিখিত হয় নি। (উনিশ শতকের একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরূপে তাঁকে সম্মানিত করা না যেতে পারে, কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বক্তা, চিন্তাশীল সাহিত্যোপদেষ্টা, রসিক সমালোচক ও সর্বোপরি সাহিত্য-গুরুরূপে বাংলা সাহিত্যে রাজনারায়ণ চিরস্মরণীয়।) তাঁর সমকালে বয়োকনিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, পত্রিকা-সম্পাদক, পরিচিত, অপরিচিত, গুণী, কৃতী ব্যক্তিবর্গ— প্রত্যেকেই তাঁর সূক্ষ্ম, শিল্পসম্মত মন্তব্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। রাজনারায়ণের সমালোচনার উপর তাঁদের আস্থা ছিল প্রগাঢ়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, উইলসন সাহেব, জি. এস. লিওনার্ড, মিস কোলেট প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ ও মহিলাবৃন্দ। অখ্যাতদের তালিকা সুদীর্ঘ না হলেও সমদীর্ঘ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য-প্রণেতা মধুসূদনও এই 'Old Boy'-এবং 'the great Midnapore School Master'-এর মন্তব্যের আশায় উন্মুখ হতেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য লিখে মধুসূদন রাজনারায়ণের কাছে 'Aristotlean letter' প্রত্যাশা করেছিলেন। যেহেতু সাহিত্য-সমালোচকরূপে মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে এরিস্টটল্‌-এর মতো প্রাজ্ঞ মনে করতেন। মধুসূদনের ভাষায় রাজনারায়ণের মতামত তিনি একখানি পত্রে স্পষ্টই বলেছেন—"There is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore pedagogue." ···I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of art than is at all common in this land of the sun."

---

১. "বিবিধ প্রসঙ্গ", প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪।

রাজনারায়ণের ইংরেজী এবং বাংলা রচনার পরিমাণ কিছু কম নয়। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনায় তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এতদ্‌ব্যতীত উপন্যাস রচনার অসম্পূর্ণ চেষ্টাও তিনি একদা করেছিলেন। রাজনারায়ণের ধর্ম ও তত্ত্বালোচনার অধিকাংশ পুস্তিকাকারে (Pamphlet) প্রকাশিত হয়েছিল। এইজন্য রচনাক্ষেত্রে একসময় তিনি সুপরিচিত ছিলেন Pamphleteer রূপে।

রাজনারায়ণের রচনাবলীর শ্রেণীবিভাগ করে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয় ও ভাবানুযায়ী তাঁর রচনাগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—

১. বস্তুনিষ্ঠ রচনা ২. সাহিত্যসমালোচনামূলক রচনা ৩. আত্মনিষ্ঠ রচনা

তাঁর বস্তুনিষ্ঠ রচনাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। তিনি কখনো উপদেষ্টার বেদী থেকে ভক্তমণ্ডলীকে ধর্মকথা শুনিয়েছেন, কখনো নিজে ইতিহাসরসে অবগাহন করেছেন, দেশবাসীকেও কখনো বা সচেতন করেছেন স্বদেশ ও স্বজাতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিকথার দ্বারা। পুরাবৃত্ত রচনার কারণ-স্বরূপ তিনি বলেছেন : "ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত তাহা পুরাকালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়।"[১] বেত্রদণ্ড হস্তে সমাজ-শাসকের কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু সহৃদয়, পরম হিতৈষীরূপে সমাজের অসংগতিগুলির প্রতি সব সময় তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন। কয়েকটি রচনায় সমকালীন যুগের বিবরণ ও ইতিহাসনিষ্ঠা তাঁর গভীর স্বদেশ-প্রীতির পরিচয়ই বহন করছে। তাঁর প্রবন্ধগুলির মূলকথা অতীতের প্রতি অনুরাগ, বর্তমানের প্রতি আস্থা এবং সুগভীর দেশ ও জাতিপ্রেমে ভবিষ্যৎ-গৌরবের স্বপ্ন।

রাজনারায়ণের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রকাশ : ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত (১৭৮২ শক), আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার (তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৮৭ শক), মিসর দেশ (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৭৯৭ শক), বাংলাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা (প্রকাশ ১৯৩৫ সম্বৎ) আদিম আর্যদিগের পুরাবৃত্ত—১ম ও ২য় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ও আশ্বিন ১৮১৭ শক), পৌরাণিক ভূগোল—(বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত) (শ্রাবণ ১৮১৭ শক), রামের জন্মবৃত্তান্ত (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭০৯ শক),

১. "ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৭৮২ শক, পৃ. ১৫৩

History of the Primitive Aryans of Central Asia and the Earliest Indo-Aryans based chiefly on the Puranas especially the Vishnu Purana (১৮১৫, ১৮৪২ শক), হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬ খ্রী), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত—১ম ও ২য় (দাসী পত্রিকা, ১৮৯৫ খ্রী), সেকালের কথা, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাসনা ও দীক্ষাপদ্ধতি (প্রবাসী, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)।

'ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত' রাজনারায়ণ-রচিত ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রামমোহনের পূর্ববর্তী দেশের অবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর তত্ত্ববোধিনী সভার কাল পর্যন্ত এই পুরাবৃত্তে বিবৃত করেছেন। রামমোহনের জন্মস্থান ও কাল নির্ণয় করে ধর্ম ও সমাজ -জীবনে তাঁর দানের কথা ইতিহাস-সম্মত দৃষ্টিতে আবেগবিহীন, সরল ভাষায় লিখেছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, কাল, সভার কার্যবিবরণ এবং তারই সঙ্গে ধর্মসভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। রামমোহনের পর ব্রাহ্মসমাজের জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রচেষ্টা, অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্ন ও পরিশ্রমের কথা রাজনারায়ণের লেখনী-নিঃসৃত সুন্দর বর্ণনায় প্রকাশিত। রাজনারায়ণ ইতিহাসের স্থলে বাস্তব বর্ণনায়ও সরস, কবিত্বপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করেছেন: "যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটি তারকাও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্বে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল।"[১] আবার "সেনাপতির জয়লাভের ন্যায়, অথবা রাজপুরুষদিগের সর্বত্র ঘোষিত কার্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে···।"[২]

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস লেখার প্রবল বাসনা রাজনারায়ণের ছিল। মহর্ষি তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত তিনটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রাজনারায়ণের এই প্রয়াসের নিদর্শন। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের তদানীন্তন কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথের কার্যাবলী, ধর্মজীবনের বিবরণ, ও রচনাবলীর পরিচয় রাজনারায়ণ অপক্ষপাত দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ

১. "ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন, ১৭৮২ শক, পৃ. ১৪৩

২. তদেব

ঠাকুরের কথা, রঙ্গপরিহাস, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কথা এবং ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের কর্মের মূল্য ভূমিকায় বিষয় রাজনারায়ণের বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে।

● রাজনারায়ণের পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ দিক প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের তাৎকালীন প্রবন্ধ 'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার' বক্তৃতা-প্রবন্ধে। এ-সম্বন্ধে 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'তে লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল :

"৩০ চৈত্র। ব্রাহ্মসংবৎ ৪০। অদ্য সন্ধ্যার পর স্কুল গৃহে "আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার" বিষয়ে বক্তৃতা করি। এই বক্তৃতাতে ইউরোপবাসী জাতিদিগের পুরাণের সাদৃশ্য, তাহাদিগের রীতিনীতি, উৎসব ও ধর্মক্রিয়ার সাদৃশ্য, এমন কি নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া আমি প্রমাণ করি যে আর্যজাতি এককালে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও তাহারা সকল স্থানে সমস্বভাবাপন্ন ছিল।" উক্ত প্রবন্ধে বিদেশী পণ্ডিতদের প্রশংসা গবেষণার আলোকে আর্য হিন্দুজাতির অতীত গৌরবের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় তিনি আবিষ্কার করেছেন। প্রবীণ এই প্রবন্ধে রাজনারায়ণ ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়কর বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, জর্মন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়, ইংরাজী ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষাসকল এক আদিম ভাষা হইতে ও যে সকল জাতির মধ্যে সেই সকল ভাষা প্রচলিত আছে কিম্বা ছিল সেই সকল জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বটি অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহলজনক।" আর্যজাতির ভাষাগত ঐক্যটি রাজনারায়ণ এই প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ অবিকৃত অবস্থাতেই পারস্য ভাষার সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করছে। যেমন, পারস্য 'পেদর', সংস্কৃতে 'পিতৃ', মাদর্—মাতৃ, দোখতর্—দুহিতৃ, ব্রাদর্—ভ্রাতৃ, দামাদ্—জামাতৃ, যোয়ান্—যুবন্। এমন অসংখ্য শব্দের দৃষ্টান্ত তুলে রাজনারায়ণ প্রাচীন পারস্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের শব্দগত ঐক্য দেখিয়েছেন। এছাড়া বহু ইংরেজী এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করে বিদগ্ধ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনি ভাষা-সাদৃশ্যের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিম পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুরাণের সত্য সন্ধান করেছেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করে বাংলার প্রবন্ধ-

সাহিত্যে বিদ্যাবিস্তার ও সভ্যতা এনেছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণের প্রবন্ধটি বঙ্কিমের পূর্বে লিখিত হওয়ায় এবং বিষয়ের গুরুত্বে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ইতিহাসবুদ্ধির স্বচ্ছতায়, স্বদেশপ্রীতির রমণীয়তায়, বিদগ্ধ পাঠকসমাজকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে।

প্রবন্ধের উপসংহারে রাজনারায়ণ একজন ইংরেজ লেখকের অভিমতানুসারে ইংরেজ জাতির সঙ্গে ভারতীয় জাতির নিকটতম সম্বন্ধের কথা বলেছেন। রাজনারায়ণ য়ুরোপীয় আর্যজাতির সঙ্গে হিন্দু আর্যের বংশগত সম্পর্ক স্বীকার করেছেন।

রাজনারায়ণের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীর মতোই ছিল। 'আর্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার' আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্য এশিয়া ও ইরানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদের মিল দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। একেশ্বরবাদ বা ঈশ্বরবাদের অনুকূল উপকরণের সন্ধান দিয়েছেন। 'মিশর দেশ' প্রবন্ধটি সাময়িক বিবরণের মতো মনে হয় বটে, কিন্তু ঐ প্রবন্ধের মধ্যে মিশরসম্বন্ধীয় পুরাতত্ত্ব, অধিবাসীদের জীবনাদর্শ, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়েই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। মিশরের সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতা বলে রাজনারায়ণ স্বীকার করেছেন। গ্রীক সভ্যতার তুলনায় মিশরের সভ্যতা প্রাচীনতর, এই দেশের রীতিনীতি ও ধর্ম অনেক উন্নততর ছিল। রাজনারায়ণ, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য দেখেছেন। মিশরের অসাইরিস দেবতা ভারতীয় শিবের অনুরূপ আর দেবী আইসিস ভারতীয় দুর্গাদেবীর মতো। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ছিল খুব, প্রাচীন মিশরেও পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। মিশরের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীনকালে বড়ো রকম পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে তার কিছু বিবরণ রাজনারায়ণ সংগ্রহ করেছেন। মিশর দেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পরের অবস্থা সম্পর্কে রাজনারায়ণ লিখেছেন: "প্রাচীন মিশরবাসীরা এই সময়ে একটি কুমারীকে শোভন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নদে নিক্ষেপ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে এইরূপ একটি কুমারী নীল নদকে অর্পণ না করিলে যথেষ্ট প্লাবন হইবে না।" এই নিষ্ঠুর প্রথার উল্লেখ করে ইঙ্গিতে পৌরাণিক হিন্দুদের নানাবিধ কুপ্রথাকেই রাজনারায়ণ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মিশর-সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধটি অতি

উৎকৃষ্ট। এতে পাণ্ডিত্যের দীপ্তি আছে, কিন্তু গুরুভার নেই। তথ্যের কৌতূহল আছে, কিন্তু কূটতার্কিক জটিলতা নেই। সাধারণ পাঠকের কাছে, প্রাচীন ও বর্তমান মিশরকে তিনি কৌতূহলোদ্দীপক করতে পেরেছেন।

প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে রাজনারায়ণের গবেষণাত্মক আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতীয় পুরাণ কাহিনী ভিত্তি করে অনৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন॥ এই সম্বন্ধে রচিত পুস্তকটি হল: *History of the Primitive Aryans of Central Asia and the Earliest Indo-Aryans based chiefly on the Purans especially the Vishnu Purana.* বাংলায় রচিত 'আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত'[১] নামক দুটি প্রস্তাব রচনা করেন।

বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে রাজনারায়ণ ভারতীয় পুরাণের মধ্যে থেকে ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন॥ ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, হিন্দু পুরাণকে তিনি অবিশ্বাস্য গাল-গল্প, উপদেশাত্মক আখ্যান ও রূপক-পরিপূর্ণ বলে মনে করেন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, পুরাণগুলিতে বিশেষত বিষ্ণুপুরাণে আদি আর্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় রূপকাতিশয্যে ও সেই যুগের বর্ণনার রীতি অনুসারে পুরাণ কাহিনীর উপর অবিশ্বাস্য অলৌকিকতার প্রলেপ লেগেছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সত্যোদ্ঘাটন করলে ইতিহাসের স্পষ্টতা ধরা পড়বে।

রাজনারায়ণ সুচিন্তিত প্রণালীতে, নিপুণ যুক্তিবিন্যাসে পুরাণকাহিনীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন: পুরাণের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করবার জন্য য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদদের অভিমত বিচার করেছেন। তিনি ইংরেজ-কর্তৃক ভারতবিজয়ের ঐতিহাসিক সত্যকে পৌরাণিক কল্পনায় গ্রথিত করে চমৎকার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন॥ দিল্লীর রাজা কালযবনের রাজ্যে একদল ছদ্মবেশী রাক্ষস এসে নানাপ্রকার মায়ার খেলা দেখিয়ে কালযবনের হাত থেকে রাজ্যটি কেড়ে নিল। পুরাণের ভঙ্গীতে যে গল্পটি রাজনারায়ণ কল্পনা করেছেন, সেই গল্পটি পড়লে যেমন পুরাণ কাহিনীর অবাস্তবতা ও কল্পনাপ্রবণতার স্বাদ পাওয়া যাবে, তেমনি ইতিহাসের এক পরম সত্যের সন্ধান উদ্ঘাটিত হবে।

---

১. প্রবন্ধটির ভূমিকা মূল ইংরেজীতে এবং প্রবন্ধভুক্ত দুটি অধ্যায়ের প্রথমটি মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত, অপরটি (২য় খণ্ড বা প্রস্তাব) বাংলায় রচিত॥

কিন্তু ইতিহাসের ঐ কাহিনী মাত্র সেদিনের, আর পুরাণকাহিনীর কাল-নিরূপণ প্রায় অসাধ্য। কারণ তার সত্যতা আজ পর্যন্ত স্থির হয় নি। কাজেই পুরাণকাহিনী কতটা ইতিহাস, আর কতটা রূপক— তা বিবেচ্য। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত-সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন: "রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ, হিন্দুধর্ম ও চর্য্যার প্রধান গ্রন্থ। বেদ উপনিষদ আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্য্যার ভিত্তি স্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, যে শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কায়া বলিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র হইতেছে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ।" কাজেই পুরাণ হিন্দু-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস; শুধু তাই নয়, তা সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বিবয়ের কথা এবং তা রূপকাকারে বিবৃত। এ সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব যাহা, তাহা ইতিহাস ও পুরাণের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত।" তিনি আরো বলেছেন: "বহু শতাব্দী ধরিয়া একটি বিশাল জাতির সমগ্র জীবনের প্রতীকস্বরূপ পুরাণ উপেক্ষণীয় নহে।" বর্তমান পণ্ডিতগণের মতে পুরাণকথা প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের কথা; লৌকিক-সত্যকে অলৌকিক রূপকাবরণে বলা হয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সত্যের ভিত্তি আছে বলে রাজনারায়ণের স্থির বিশ্বাস— এ কথা পূর্বেই বলেছি। এই সত্যের ভিত্তিতেই তিনি বিষ্ণুপুরাণকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের রূপ-কল্পনা করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি য়ুরোপীয় বিখ্যাত কবি, পুরাবৃত্তলেখক ও রাজনীতিজ্ঞ সার ওয়াল্টার র‍্যালের (Sir Walter Raleigh) সমকক্ষ বলা যায়। র‍্যালে কারারুদ্ধ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। র‍্যালের মতে, ইতিহাসের সত্যের মধ্যে কল্পনারও সংমিশ্রণ থাকে। ইতিহাস সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত রাজনারায়ণও পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন: "পুরাবৃত্তলেখক ও গাঁজা-খোর। পুরাবৃত্ত বিশেষতঃ প্রাচীনকালের পুরাবৃত্তের চৌদ্দ আনা গাঁজা ও দুই আনা প্রকৃত পদার্থ। ইংরাজী কবি লর্ড বায়রন বলেছেন, 'That grand liar history'— সেই প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী যাহাকে পুরাবৃত্ত বলা যায়।"[১] "History of the Primitive Aryans…" প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বলেছেন—

---

১. 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৯১৪), পৃ. ২৫

"The Vishnu Purana being more Ancient than any other, marking its language, we made it the principal basis of our history." এখানে History অর্থে তিনি সর্বাংশে সত্য বোঝেন নি, বুঝেছেন সম্ভাব্য সত্যকে, যে সত্য র‍্যালে, গীবন (Gibbon) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা উদ্ধার করেছেন এবং যে সত্য রূপক ও বর্ণ-বাহুল্য বর্জন করলে পুরাণকাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। "পৌরাণিক ভূগোল" নামক প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত ভূগোল বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ কিছু মন্তব্য করেন নি। সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গীতে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর— এই সাতটি দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিচয় নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত-বন-জঙ্গলাদির বিবরণ পুরাণের বর্ণনানুসারে লিখে গেছেন। বস্তুত 'পৌরাণিক ভূগোল' যে উদ্ভট কল্পনা নয়, খেয়াল খুশির গল্পমাত্র নয়, বস্তুভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সুপ্রাচীন আলোচনা— এ বিশ্বাস রাজনারায়ণের ছিল।

রাজনারায়ণের প্রাচীনতা নিয়ে বর্তমানকালের ঐতিহাসিক ও গবেষকবৃন্দ নানা তথ্য, প্রমাণ, যুক্তিসহকারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আজ থেকে বহু বছর পূর্বেই রাজনারায়ণ এইরূপ রচনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। "রামের জন্মবৃত্তান্ত" প্রবন্ধে রামায়ণের রচনাকাল, শ্লোকের উৎপত্তির কথা বলে তার পর তিনি রামের জন্ম পর্যন্ত প্রতিটি সর্গের বিচারমূলক সমালোচনা করেছেন : সংস্কৃতভাষায় রাজনারায়ণের তেমন দখল ছিল না বলে তিনি যৌবনকালে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন ; কিন্তু উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করলে, সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির রচনা বলে মনে হয় না— বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ কিরূপ গভীর অভিনিবেশসহকারে তিনি পাঠ করেছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিষয়ের প্রামাণিকতা নির্ধারণে দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি বাল্মীকি রামায়ণের একাধিক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। রামায়ণকে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বলেই মেনে নিয়েছেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যে রচনাগুলি[১] একসময় বিভিন্ন সভায় পাঠ

---

১. হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত বক্তৃতা—(শ্রাবণ, ১৭৭০ শক) ; মেদিনীপুর বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৮ শক) ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন' (কার্তিক,

করেছিলেন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, তার দ্বারা তাঁর গভীর বাস্তববুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনারায়ণের প্রবন্ধগুলির প্রধান গুণ রচনারীতির সারল্য, বক্তব্যের পরিমিতিবোধ এবং প্রকাশের সংহত সৌন্দর্য।

১৮৪৮ সালের ১লা জুন হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত বাংলার ভাষাসম্পর্কীয় রচনায় রাজনারায়ণ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। একদিকে দেশভাষার প্রতি জনগণের উদাসীনতার লজ্জাকর কাহিনী, অপরদিকে দেশে কোন্ ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত— তার সুনিপুণ আলোচনা করেছেন দৃষ্টান্ত সহযোগে। এই বক্তৃতায় রাজনারায়ণ, ভক্তিবিনম্রচিত্তে হেয়ারের গুণকীর্তন করেন নি, পরন্তু যে আদর্শ ও কর্মে হেয়ার-এর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, সেই বিষয়ই আলোচনা করেছেন: "ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে।"— ইংরেজী ভাষার পক্ষে এদেশের কৃতবিদ্য এক গোষ্ঠীর এরূপ মনোভাবের প্রতি রাজনারায়ণ তীব্র আক্রমণ করেছেন এই প্রবন্ধে। তিনি গ্রীক, রোমান, মিশর, ফ্রান্স, স্পেন, সীরিয় প্রভৃতি দেশের বিষয় উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে উক্ত দেশসমূহে বিজিত জাতির অধিকার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে তাদের ভাষাও লুপ্ত হয়েছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও কখনোই হতে পারে না। রাজনারায়ণ এ কথা মনে করতেন। তিনি বলেছেন যে, স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে দেশভাষারই চলন রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন। জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় সমস্যামূলক দিকটির বিষয় এত স্পষ্টভাবে ও সরলভাবে ইতিপূর্বে বোধকরি আর কেউ প্রকাশ করেন নি।

'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন' নামক প্রবন্ধ দুটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (—প্রথমটি ১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টি ১৭৯৮ শক, কার্তিক) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধে'।

'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে লেখক দেশের লোকের দৃষ্টি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। দেশভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হোক—

১৭৯৮ শক), জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি—১ম ও ২য় প্রস্তাব (চৈত্র, বৈশাখ, ১৮০১ ও ১৮০২ শক) হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন (জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক), ঋষি জীবন (আশ্বিন, ১৮০৯ শক)

এই ছিল রাজনারায়ণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ইংরেজী ভাষা পঠনপাঠনের প্রতি স্বদেশবাসীর অতি আগ্রহের সঙ্গে 'বাঙ্গালীর সভাতে' তদানীন্তন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষার মান এবং গঠনসৌষ্ঠবের উন্নতির জন্য ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের কাছে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন রাজনারায়ণ।

'অনুবীক্ষণ'[১] পত্রিকায় প্রকাশিত "চিকিৎসা" রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধের' অন্তর্গত। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও জ্ঞানগভীরতা দেখে অবাক হতে হয়। এই প্রবন্ধে তিনি অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, হাইজিনিজ্‌ম, এবং সাইকোপ্যাথি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। আমাদের ভারতীয় আয়ুর্বেদ এবং আরবীয় 'হেকিমী চিকিৎসা' সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। আলোচনার সূচনায় তিনি বলেছেন, "আমরা ভরসা করি কোন অসাধারণ, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার মতের সমন্বয় সাধিত হইয়া উহার বিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা এই প্রস্তাবে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার মতের সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া তাহাদিগের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার মানস করি।"

এই প্রবন্ধ পাঠে রাজনারায়ণের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে হৃদয়ের ঔদার্য ও মানবহিতৈষণা উপলব্ধ হয়।

'বিবিধ প্রবন্ধে' 'সমাজ-সংস্কার' নামে তিনটি প্রস্তাব আছে। প্রস্তাব তিনটি প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৭৯৭ শক) প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র তিনটি প্রস্তাব, তিনটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রস্তাবে রাজ-রাজনারায়ণ জগতের পরিবর্তনশীলতা, অনিত্যতা স্বীকার করে নিয়েই লোকসমাজের এবং বিশেষ হিন্দুসমাজের পরিবর্তনের কথাই বলেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে রাজনারায়ণ জাতিভেদ প্রথা, উক্ত প্রথার দোষ-গুণ এবং দোষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তাঁর মতামত যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় প্রস্তাবটিতে তিনি 'স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার প্রণালী" সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

---

১. হরিশচন্দ্র শর্মা-সম্পাদিত : প্রকাশ শ্রাবণ ১২৮২

সামাজিক বিষয় নিয়ে লিখিত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র আর-একটি প্রবন্ধ হল "জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন"— ১৭৯৬ শকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (আষাঢ়) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকা উচিত কি না, থাকলে কিভাবে থাকবে, যাঁরা উক্ত প্রথার বিন্দুমাত্র প্রচলন চান না— যাঁরা একেবারে উচ্ছেদ করতে চান, যাঁরা কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে চান তাঁদের প্রত্যেকের যুক্তি ও মতামত ইত্যাদি বিষয়ে রাজনারায়ণ অতি সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে রাজনারায়ণ অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় জাতিভেদের মূল কথাগুলি শিক্ষিত সমাজে উপস্থাপিত করেছেন।

রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র আর-একটি মূল্যবান প্রবন্ধ "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব", এইটি রাজনারায়ণের একটি ইংরেজী পুস্তিকার (১৭৮৮ শক) বাংলা অনুবাদ। বিবিধ প্রবন্ধের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে—"Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal."[১] আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য আমার পরমপ্রিয় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।" রাজনারায়ণের উপরি-উক্ত প্রবন্ধগুলির সাহিত্যগুণ অপেক্ষা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লক্ষণীয়।

১৮৭৮ সালে রচিত রাজনারায়ণের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা' নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। বহুপঠিত ও বহুআলোচিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস। এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছিল দুখানি— হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি-চরিত' (১৮৬৯ খ্রী); এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১ খ্রী)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস

১. দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগল, 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত', ১৩৭৫, পৃ. ৯১-১১১

রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগরের ; তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক' প্রস্তাব (১৮৫৩ খ্রী) এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'র 'বিজ্ঞাপনে' রাজনারায়ণ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' ও লং সাহেব সংকলিত *Descriptive Catalogue of Bengalee Books*-এর ঋণ স্বীকার করেছেন।

এই নাতিহ্রস্ব পুস্তকটির প্রথম বিশেষত্ব রাজনারায়ণের পরিমিত প্রকাশ-ভঙ্গী। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুস্তকটি পাঠ করতে পাঠকের কৌতূহল ও মনোযোগ অটুট থাকে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, এটি বিগতকালের রচয়িতার ও রচনার একটি শুষ্ক, দীর্ঘ, সন-তারিখ-কণ্টকাকীর্ণ তালিকা মাত্র নয়। তৃতীয়ত, বাক্যনৈপুণ্যে গ্রন্থে বর্ণিত রচনা ও রচয়িতার পরিচয় পাঠকের কাছে অতি সহজলভ্য হয়েছে ; চতুর্থত, দু-এক স্থানে সূক্ষ্ম পরিহাস-রসিকতা ও বিদেশী সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় রচয়িতা ইতিহাসকথার নিছক বিবৃতিমূলক বিষয়বস্তুকে সরস ও সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। ছোটো ছোটো বাক্যে, সাধু গদ্যে পুস্তকটি রচিত।

সূচনায় রাজনারায়ণ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে নিজের জ্ঞান ও বিবেকসম্মত মন্তব্যে তিনি বলেছেন : "ভাষার কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।"

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার মুখবন্ধে রাজনারায়ণ চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবি এবং মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদিকবি', কিছু বাংলায় ও কিছু মৈথিলী হিন্দীতে তাঁর রচনা। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতির সমসাময়িক-কালের বঙ্গবাসী কবি চণ্ডীদাস। রাজনারায়ণের বিশ্বাস চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের নান্নুর গ্রামে।

চৈতন্যের সমসাময়িককালে পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ স্বল্পকথায় সে বিষয় উল্লেখ করেছেন। আধুনিককালের কবিদের মধ্যে তিনি বিহারীলালকে 'দুঃখের কবি' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

বাংলাভাষার অদ্বিতীয় কবিপ্রতিভার অধিকারী মুকুন্দরাম— রাজনারায়ণ এইরূপ দাবিই করেছেন। তিনি মনে করেন যে ভারতচন্দ্রে অনেক অনুকরণ ও অনুসরণ আছে।

রামমোহনের আলোচনায় তিনি বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকের বিষয় উল্লেখ করে তাঁকে সর্বশেষে অভিহিত করেছেন 'স্ত্রীজাতির উকীল' ব'লে; তিনি বলেছেন: "...রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিনী মোয়াক্কেলদিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না।" গদ্যযুগের আলোচনায় রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরকে 'বাঙ্গালা ভাষার জন্‌সন্' বলেছেন।

'পদ্য-বিভাগে' রাজনারায়ণ 'মাইকেল মধুসূদনরূপ সূর্য উদয়ের পূর্বে' 'দেশের বর্তমান কালের প্রধান কবি' হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন রঙ্গলালকে। মধুসূদন-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য উদ্‌ধৃতিযোগ্য: "তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়।" রাজনারায়ণের লঘু, সরস মন সমালোচকের ও ঐতিহাসিকের পদে সমাসীন থেকেও স্বভাবধর্ম পরিত্যাগ করতে পারে নি—"ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।"—কবি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার সম্বন্ধে এমন সরস মন্তব্য তিনি এই গ্রন্থে বহুবার করেছেন।

আধুনিক গীতিকাব্য রচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে রাজনারায়ণ সম্মান জানিয়েছেন রামপ্রসাদ সেনের পরমার্থ সংগীতগুলিকে। একদা তাঁর ধর্মপ্রাণ হৃদয়কে এগুলি যে কিভাবে আকৃষ্ট করত, তা তাঁর ভাষাতেই বোঝা যায়: "যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাত-ভিখারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না।" অতঃপর লেখক রাম বসুর বিরহ-সংগীত, দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সার্বজনীন উপভোগ্যতা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সংগীতের স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক ভাব প্রভৃতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন: "এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে; আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।"

'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পুস্তকে ঐতিহাসিক রাজনারায়ণের কয়েকটি মন্তব্য মনে রাখবার মতো। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, গঙ্গার উৎপত্তি যেমন 'বিষ্ণুপদ' থেকে তেমনি বাংলা কবিতার সৃষ্টি 'হরিপদভক্তি' থেকে। 'কালীপ্রসন্ন সিংহের নকসাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়।' 'সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার আপনার মনোমত দুই গ্রন্থ সংশোধন করতে গিয়ে গরীব কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের দফা খেয়েছেন।' দুটি পত্রিকা-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেছেন : "প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা-পরিষ্কারক জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরে হণ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেইরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত।" এইভাবে ঘরোয়া কথার ভঙ্গীতে রাজনারায়ণ তথ্যবহুল, গুরুভার ইতিহাসকথাকে সহজ, আকর্ষণীয় মনোরম করে তুলেছেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিকের সতর্ক প্রহরারত দৃষ্টি চোখে পড়ে না, রসরচয়িতার গভীর প্রাণোচ্ছল অন্তরটি এবং রসগ্রাহী সমালোচকের হৃদয়টি পাঠকদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাজনারায়ণ-রচিত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' ইতিহাসমূলক, বিষয়নিষ্ঠ রচনা। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৭৯৭ শক। একদা রাজনারায়ণ যে বিদ্যায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায় সেই বিদ্যামন্দিরেরই উদ্ভব কাল থেকে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন এবং গভীর আনন্দ প্রকাশ করে রাজনারায়ণ তাঁর ভাষণের মুখবন্ধে বলেছেন : "অদ্য কি আনন্দের দিন? সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি।"

ইতিহাসের বর্ণবৈচিত্র্যহীন তথ্যবিবরণের মধ্যে রাজনারায়ণ কবিত্বের সঞ্চার করেছেন হিন্দুকলেজের উৎপত্তির সঙ্গে নদীর উৎপত্তিস্থানের বর্ণনা ক'রে : "নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পর্ব্বতস্থিত ক্ষুদ্র প্রস্রবণ তেমনি যে জ্ঞানালোক হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি স্থান হিন্দুকলেজ।"

অতঃপর রাজনারায়ণ হিন্দুকলেজ স্থাপনের পূর্ববর্তীকালে এদেশে-স্থাপিত কয়েকটি মিশনারী স্কুলের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্বে

হেয়ার স্কুলের সূচনা। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আনুপূর্বিক বিবরণের মধ্যে হেয়ারের প্রচেষ্টা, রামমোহনের নির্লিপ্ততা, কলেজ-কমিটির বিবরণ, কলেজ সংস্থাপনকালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ,[১] শিক্ষককুলের বিবরণ, উক্ত কলেজের খ্যাতিমান ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত আছে। হিন্দু কলেজ প্রথমে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, মহাবিদ্যালয়— ও হিন্দু কলেজ এই তিন নামে অভিহিত হত। এখানে বর্ণমালা পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতে লর্ড ডালহৌসী একে Dame's School বা বুড়ীর পাঠশালা বলতেন, ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কী কারণে হিন্দু কলেজ অংশত কিছুটা বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অতঃপর হিন্দুস্কুল স্থাপিত হয়— এই সব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ পৃথক পৃথক বিবরণ দিয়েছেন রাজনারায়ণ।

সবশেষে শিক্ষককুলের ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে শ্রদ্ধা, সতীর্থ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্রণে প্রীতির সঙ্গে সৌহার্দ্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট বলা যায়।

('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' ইতিবৃত্তমূলক রচনা; কোনো এক বিদেশী ব্যক্তিকে লিখিত ইংরেজী পত্রের বাংলা মর্মানুবাদ। এখানে রাজনারায়ণ মহর্ষির জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। প্রথমটিতে মহর্ষির জন্মকাল, বাল্যশিক্ষা, রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযোগ, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে, বঙ্গবিদ্যালয়-প্রসঙ্গ, হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়, মফঃস্বলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, দ্বারকানাথের মৃত্যু, প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক লালা হাজারীলালের কথা, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-বক্তৃতার ভাব পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় লেখকের নিরপেক্ষ দৃষ্টির বিচারে সুন্দর ইতিকথার রূপ পরিগ্রহ করেছে।) দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে রয়েছে গ্রন্থ-সভা, উক্ত সভার সদস্যবৃন্দের পরিচয়, লেখকের (রাজনারায়ণের) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বৃত্তান্ত, মহর্ষিকে লিখিত পত্রের বিবরণ, অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতার তাৎপর্য, তাঁর লিখিত 'ধর্মতত্ত্ববিবেক' প্রবন্ধের কথা, মহর্ষির হিমালয় গমন, ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার অধিবেশন, সমাজের ট্রাস্টি নিয়োগ, তত্ত্ববোধিনী সভার বিলুপ্তি, অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ, মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' পুস্তক প্রকাশ, 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' রচনা, ব্রাহ্মসমাজের নামকরণের বিবরণ ও

১. ভাষণের প্রধান কথাটি হল এই: "যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-প্রণালী ; রাজনারায়ণের বর্ণনাগুণে বিষয়গুলি ইতিহাসের যথার্থ মর্যাদা লাভ করেছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন : "বলিতে কি এই প্রবন্ধ তাঁহার [মহর্ষির] জীবনবৃত্তের কঙ্কালমাত্র।" কিন্তু পাঠক এই কঙ্কালে রক্ত-মাংসবিশিষ্ট প্রাণবন্ত মানুষের রূপই দর্শন করেন। মহর্ষির ঊনআশি বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজনারায়ণের এই রচনা। সাধু গদ্যে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ দুটি লিখিত।

"জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে রাজনারায়ণের উদার, সম্প্রদায়বিমুক্ত, ভেদবুদ্ধিহীন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ; যথার্থ জাতিরূপে পরিগণিত হওয়ার মুখ্য ও গৌণ উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-ভঙ্গীতে বিচার ও আলোচনা করে দেখিয়েছেন। নিছক সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, ছিল লোকশিক্ষার প্রচেষ্টা। এই প্রবন্ধ রচনার প্রায় সমসাময়িক কালে অনুরূপ বিষয়ে বঙ্কিমের একাধিক প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বঙ্কিমের রচনার বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গী, শিল্পসৌষ্ঠব, তাঁর রচনাকে করেছে অধিকতর সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ। রচনারীতির অনুরূপ কলাকৌশল রাজনারায়ণের লেখায় না থাকলেও, সরল ও প্রাঞ্জল রচনার গুণে বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ে অতি সহজেই মুদ্রিত হয়।

জাতীয় শিক্ষকরূপে রাজনারায়ণের লেখনীপ্রসূত আর-একটি প্রবন্ধ 'হিন্দু জাতির ঐক্যসাধন'। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য লক্ষ্য করে, সমগ্র ভারতব্যাপী জাতিগত কল্যাণাদর্শের অন্তরায়ের কথা চিন্তা করে স্বদেশহিতৈষী রাজনারায়ণ বেদনা অনুভব করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ ধর্মের একতা, রাজনৈতিক অবস্থার একতা, পরস্পরের দোষে ক্ষমা ও পরস্পরের গুণে শ্লাঘা, পারস্পরিক সাহায্যে সামাজিক অথবা চরিত্রগত অভাবমোচন, ভারতীয় সমবর্ণের মধ্যে বিবাহরীতির প্রচলন প্রভৃতি পাঁচটি উপায় অবলম্বনের কথা বলেছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে রাজনারায়ণ অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন : "ভারতবর্ষের হিন্দুজাতিগণ একমন একপ্রাণ হইলে তাঁহাদিগের আর প্রতিস্পর্দ্ধী কে হইতে পারে ?"

বিদগ্ধ, ঋষিতুল্য রাজনারায়ণের সুগভীর চিন্তাপ্রসূত, নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধগুলির অন্যতম "ঋষি-জীবনে" তিনি নূতন ভঙ্গীতে ধর্মচিন্তা সমাজব্যবস্থা ও নীতি-শিক্ষার পুরাতন চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত করেছেন।

"ঋষি-জীবন"-এ বাস্তবিকই তিনি প্রাচীন ভারতের ঋষিদের জীবনযাত্রা-

প্রণালী বর্ণনা করেছেন। সাধারণের ধারণায় ঋষিকুল বনবাসী, বল্কলধারী, তপস্যা ও ধ্যানে মগ্ন, আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, উচ্চমার্গের সাধক। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়নে বিপুল জ্ঞানার্জনে রাজনারায়ণ বনবাসী ঋষিগণের জীবনযাত্রার অন্তরালে সামাজিক জীবন সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও বর্তমান সমাজজীবনে তার পুনরুজ্জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা "ঋষিজীবন" প্রবন্ধের ভাবে ও ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আধুনিক ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি কটাক্ষ আছে। জাতিগঠনের কাজে নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাশীল শিক্ষার্থীর যে কত বেশি প্রয়োজন— তা উপলব্ধি করেই ঋষি রাজনারায়ণ আর্যজীবনের তপোবনশিক্ষার ঐতিহাসিক চিত্রকে 'ঋষিজীবন' নামক প্রবন্ধে পরিচ্ছন্ন রূপ দান করেছেন। প্রবন্ধটির অন্যত্র তিনি একটি সংক্ষিপ্ত নাটকে নয় জন ঋষির কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ঋষিদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর তাৎপর্য নাট্যসংলাপে প্রকাশ করেছেন। ঋষিরা কৃষিবিদ্যা, অশ্বপালন প্রভৃতি লৌকিক বিষয়েও সমান পারদর্শী ছিলেন; এবং সমাজরক্ষণকেই পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে করতেন— এ কথা প্রতিপাদনই রাজনারায়ণের উদ্দেশ্য।

রাজনারায়ণের 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। আসলে এটি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা। আত্মচরিতে তিনি বলেছেন যে, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের পরিশ্রমান্তে অবসর-বিনোদনের জন্য বক্তৃতাটি লেখা। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, অক্ষয়কুমার দত্তের প্রস্তাবানুসারে তিনি ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জাতীয় সভায় একটি বক্তৃতা দেন। ঈশানচন্দ্র বসু বক্তৃতাটির নোট রেখেছিলেন। সেই নোট থেকেই প্রবন্ধটির উৎপত্তি। বক্তৃতাটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, রাজনারায়ণের নামই একসময় 'সে কাল এ কাল' হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক দুশো টাকা ব্যয়ে নিজের পাঠের জন্য বক্তৃতাটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'সাধারণী' পত্রিকা রাজনারায়ণের মনোভাবকে সম্বর্ধনা জানায়।

১২৮১ সালের কার্তিক মাসের 'সাধারণী' পত্রিকা নিম্নলিখিত মর্মে সমালোচন শীর্ষকের রচনাটি প্রকাশ করেছিল: "কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, যে, আর সে "সেকাল" নাই। দেশমধ্যে সাহেবিয়ানা প্রচার জন্য আর তত লাফালাফি নাই, মোহ অমাবস্যায় হিন্দু সমাজ নদে যে 'বান' ডাকিয়াছিল,

এখন ক্রমে তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। জলভরা বটে কিন্তু জোয়ার থমথমে। এমনকি বোধহয় পূর্ব্ববৎ একটু ভাটার টানও হইয়া থাকিবে। হিন্দুয়ানীর স্রোত এতদিন যে অনন্ত সাগরাভিমুখে প্রধাবিত ছিল, এখন আবার বোধ হয় সেই দিকেই অল্প অল্প যাইতেছে। স্রোত যে অল্প অল্প ফিরিয়াছে তাহার নিদর্শন আমরা আজি কালি নিত্য প্রাপ্ত হইতেছি। সমালোচ্য গ্রন্থ…সেই স্বভাব গতির নিদর্শন মাত্র। রাজনারায়ণবাবু যেমন ভাটা পড়িতেছে অমনি নৌকা খুলিয়া দিয়াছেন।…"

১২৮১ সালের কার্তিক সংখ্যায় ঐ পত্রিকা রাজনারায়ণের কল্যাণ কামনা করে বক্তৃতাটির উপসংহার ভাগ সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করেছিল। এ-থেকে বোঝা যায় যে, সমসাময়িককালে এই বক্তৃতা শিক্ষিত সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। চার বছরের মধ্যেই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল— তৎকালে এটি কম কথা নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের দ্বারাও গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৩৭৩) পুস্তকে বলেছেন: "সেকাল আর একাল (১৮৭৪) বিশেষ উপাদেয় নিবন্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সমাজে প্রাচীন-নবীনের টানাপোড়েন শুরু হইয়াছে তখনকার দিনের কিছু সুন্দর চিত্র ইহাতে ধৃত আছে। রচনাভঙ্গিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত— সাধু ও কথ্যরীতির সুসমঞ্জস মিলনে ভাষা অত্যন্ত উপভোগ্য।"

'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে রাজনারায়ণ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব-কালকে 'সেকাল' বলেছেন, আর তার পরবর্তী কালকে বলেছেন 'একাল'। ইংরেজ শাসনের প্রথমাংশে বাঙালীর জীবনযাত্রা কী ছিল, শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল, তার একটি সুন্দর কৌতুক-চিত্র তিনি এঁকেছেন। ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় জীবনে তার কী পরিণতি হয়েছে, তারও একটি বাস্তব রসসমৃদ্ধ চিত্র রচনাটিতে অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে রচনাটি একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ; এবং এর উদ্দেশ্যও সমাজসংস্কার। কিন্তু রচনার গুণে এবং আগাগোড়া সুস্নিগ্ধ কৌতুকরসের প্রলেপে তিনি রচনাটির প্রাবন্ধিক শুষ্কতা অবলীলাক্রমে অপনোদন করেছেন। সেকালের সাহেবদের কল্যাণকারিতা ও জনপ্রিয়তা দেখাবার জন্য তৎকালপ্রচলিত একটি শ্লোকের উল্লেখ কৌতুকাবহ। শ্লোকটি 'পঞ্চকন্যা' শ্লোকের ব্যঙ্গানুকৃতি—

"হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশকম্।"

বাঙালীদের পরিচয় দেবার সময় তিনি গুরুমহাশয়, আখন্‌জী, ভট্টাচার্য ও বুনো রামনাথের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঙ্গে নীতিশিক্ষার যে অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়।

সেকালের বর্ণনায়, একালের চেয়ে সেকালের প্রতি রাজনারায়ণ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। সেকালের বিবরণের মধ্যেই ইংরেজী শেখার চেষ্টা ও ইংরেজানুগত্যের মধ্যে বাঙালী-চরিত্রে অধঃপতনের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল— তাও তিনি দেখিয়েছেন। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গল' যে উচ্ছৃঙ্খল ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে লেখক সেকাল প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেছেন।

'একালে'র আলোচনায় লেখক প্রতি পদে 'সেকালে'র সঙ্গে একালের তুলনা করেছেন। শারীরিক বলবীর্যে একাল, সেকালের তুলনায় নিকৃষ্ট। বিদ্যাশিক্ষায় একালে পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হলেও যে যথার্থ শিক্ষা হচ্ছে না— এটাই তাঁর অভিমত। সংস্কৃত ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে রাজনারায়ণ মন্তব্য করেছেন: "সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা যথার্থ বিদ্যা উপার্জ্জন যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না।" অশুদ্ধ ইংরেজী এবং বাংলামিশ্র ইংরেজী ব্যবহারের কয়েকটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়ে রাজনারায়ণ একালের শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি ও ব্যর্থতার প্রতি বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থখানি জাতি-গঠনের মৌলিক উপকরণে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেগুলি তিক্ত নির্দেশ নয়, বিদ্রূপ-কণ্টকিত গালিবর্ষণও নয়, ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের বিষবাষ্পও এতে নেই। স্নিগ্ধ কৌতুকরস-নিষিক্ত উপন্যাস-সুলভ কাহিনী-কৌতূহল জাগ্রত রেখে তিনি একটি যুগচিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের' দুই বৎসর পূর্বে এই জাতীয় রচনার মধ্যে রাজনারায়ণ যে রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। আবেগহীন, মন্থর ভঙ্গীতে তিনি তাঁর বক্তব্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণতি দিয়েছেন। রচনাটি একাধারে ইতিহাস, উপদেশাত্মক প্রবন্ধ ও রসসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

১২৮১ বঙ্গাব্দের 'দর্শক' পত্রিকায় প্রথম খণ্ডের অগ্রহায়ণ, পৌষ দুটি সংখ্যায়

'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের বিশদ সমালোচনা প্রকাশিত হলে চিন্তাশীল বাঙালীদের মধ্যে আত্মসমীক্ষণের একটা উৎসাহ জাগে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গ-দর্শনে'র পৌষ সংখ্যায় পর পর দুটি প্রবন্ধে রাজনারায়ণের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়। চিন্তাপ্রণালীর গভীরতায় এবং প্রকাশের সৌন্দর্যে গ্রন্থখানি তৎকালীন চিন্তাশীল বাঙালীকে সচকিত করে তুলেছিল।

(পরবর্তী বস্তুনিষ্ঠ রচনার মধ্যে রাজনারায়ণের আত্মচরিতের ভ্রমণকাহিনী-গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখি রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে (বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ রচনা) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র আত্মচরিতে সন্নিবিষ্ট ভ্রমণকাহিনীগুলিরই আলোচনা করা হচ্ছে; আত্মকথার অংশ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

'আত্মচরিতে' মোট পাঁচবারের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। একটি কাহিনী ব্যতীত সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি একই সময়ে রচিত। গ্রাম্য উপাখ্যানের আর-এক অংশ "চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত।" এই কাহিনীটি রাজনারায়ণের আত্মচরিতেও সংযোজিত হয়েছিল। "চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত" 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'র সঙ্গে 'সুরভি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার রচনাকাল সম্ভবত 'আত্মচরিত' রচনার কয়েক বছর পূর্বে ১৮৮৪-'৮৫ সালে। 'আত্মচরিতে'র রচনাকাল ১৮৮৯ সাল।)

রাজনারায়ণের ভ্রমণ-পিপাসার মূলে ছিল প্রধানত ইতিহাসের তথ্য-অনুসন্ধান স্পৃহা। ইতিপূর্বে তাঁর ছাত্রজীবনে আমরা লক্ষ্য করেছি ইতিহাস-পাঠের প্রতি প্রবল আগ্রহ, কলেজ-জীবনে 'Historian' বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল 'পুরাবৃত্ত বিষয়ক' লেখক হওয়ার।

"চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত" ও "পিতৃভূমি কনোজ দর্শন"-এর কাহিনীর মধ্যে রাজনারায়ণের কল্পনাপ্রবণ রোম্যান্টিক মনের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। দুটি কাহিনীতেই দেখা যায় অতীতের ঐশ্বর্যদীপ্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিসৌরভ তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনকে এক মুহূর্তেই অতীতবিহারী করে তুলেছে। গৌড়ের কোতোয়ালি দরজায় উপস্থিত হয়ে প্রাচীরের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে, প্রাচীরে উৎকীর্ণ কোরানের কয়েকটি বাণী লক্ষ্য করে রাজনারায়ণের মন স্বল্প সময়ের মধ্যেই কল্পনার রসলোকে উন্নীত হয়েছিল। ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি বলেছেন, "আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম

যে, বাদশাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" গৌড়ের এই ধ্বংসাবশেষেরই একপাশে একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ ছিল, রাজার জ্যোতির্বেত্তারা তার চূড়ায় উঠে রাত্রিতে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। রাজনারায়ণের অতীতচারী রোম্যান্টিক কবিমন ক্ষণকালের মধ্যে ইন্দ্রিয়সচেতন জগৎ অতিক্রম করে গেল। তিনি কল্পনার চোখে "উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজ-জ্যোতির্বেত্তা"দের যেন নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত দেখতে পেলেন। পিতৃভূমি কনোজ পরিভ্রমণে গিয়েও তাঁর মন কল্পনার রসলোকে উন্নীত হয়েছিল। উক্ত অঞ্চলে ভ্রমণকালে বঙ্গদেশে কায়স্থকুলের প্রথম বসবাসের ইতিহাস স্মরণে আসতেই তিনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন: 'উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোযানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ কেহ হস্তীযানে, কেহ অশ্বযানে, কেহ কেহ অন্যযানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন…।" তাঁর মনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল এক রোম্যান্টিক কবিস্বপ্ন। তাই কনোজ ভ্রমণকালে তার শ্রীহীন দশা দেখে, জয়চাঁদ-সংযুক্তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত, উৎসব-মুখরিত কনোজের কথা স্মরণ করে তাঁর মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'খণ্ডগিরি, 'কণারক' প্রভৃতি প্রবন্ধে অনুরূপ চিন্তাধারারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রমণকাহিনীতে তার সৌন্দর্যপ্রিয়তা, জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল, সূক্ষ্ম, সুন্দর, নির্মল পরিহাসের আলোকদীপ্তি স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত। যে দৃশ্যগুলি তিনি দেখেছিলেন, তার বর্ণনায় একাধারে কবিহৃদয়ের মাধুর্য ও চিত্রশিল্পীর কলানৈপুণ্য যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ একটি ঘটনার বর্ণনাও রাজনারায়ণের লেখনীতে কত রসপূর্ণ, বাস্তবানুগ হতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত হল: "আমরা মুর্শিদাবাদের ঘাটে নোঙ্গর করিয়াছি, এমন সময় নবাবের মাল বোঝাই করা একটি লম্বোদর ভড় কৃষ্ণাঙ্গী লোটাসের উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়।" উক্তিটি খুবই সামান্য, কিন্তু 'লম্বোদর' ও 'কৃষ্ণাঙ্গী'—মাত্র এই দুটি বিশেষণ দ্বারা নিষ্প্রাণ ঘটনাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর-একটি কাহিনীবর্ণনাতেও তাঁর ভাষার সরসতায় ও সরলতায় বাস্তব রসরোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে: "অল্পে অল্পে উত্তর পশ্চিম কোণে প্রগাঢ় কালো

মেঘের সঞ্চার হইল। উভয় পিনেস ও নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, দুএর গুণ জড়াইয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবু তখন বোটের ছাতের উপর উপবিষ্ট। এমন সময়ে ভয়ানক বাতাস উঠিল। পিনেসের জোরে বোট কাত হইতে লাগিল। জল উঠিতে দুই কি তিন ইঞ্চি বাকি ছিল। "কাতান কোথায়। কাতান কোথায়।" এই শব্দ পড়িয়া গেল। কাতান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লগি দিয়া গুণ ছাড়াইবার চেষ্টা করাতে লগি দেবেন্দ্রবাবুর নাকের উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে তাঁহার নাক কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল।" এক নিশ্বাসে বর্ণনাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব ও বর্ণনায় বাস্তবতার প্রকাশটি সহজেই অনুভূত হয়।

'চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ' বৃত্তান্তটিতে রাজনারায়ণের ঈশ্বরবিশ্বাসী, দার্শনিক মনের পরিচয়। রাজমহলের নবাবী কীর্তি, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ইতিহাসের মহাকাল-লাঞ্ছিত এই ধূলিমুষ্টি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। কাপ্টেন রিচার্ডসনের লেখা একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করে মানুষের অস্থায়ী কীর্তি এবং জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্যও করেছেন: 'মানুষের কীর্তি কি অস্থায়ী।' দার্শনিক রাজনারায়ণের ব্যক্তি-আত্মার সার্থক প্রতিফলন এখানেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ বর্ণনার সরস ভঙ্গী এবং চিত্ররচনার অনুপম কারুকৃতি। কবেকার দেখা কোন্ দৃশ্যটি একটি অনুভূতিপ্রবণ তরুণ মনে একসময় যে কী মৃদু, সূক্ষ্ম আলোড়ন এনেছিল, স্মৃতিযোগে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে সরস রচনার সাবলীল প্রবাহে স্থাপন করা অনন্যসাধারণ কবিকৃতি সন্দেহ নেই। বর্ষাকালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌকাভ্রমণের বৃত্তান্তে রাজনারায়ণ লিখেছেন: "পিনেস বাতাস উঠিবার পূর্বে উভয় গুণ ও পালে চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল ভরে পেট ফুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সম্মুখে যাইতে লাগিল। গুণ কাটিয়া দেওয়াতে আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের তীর উভয় বরাবর হইল, আমরা তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময়ে একটি ছোট ডিঙ্গী আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল।"

উক্ত ভ্রমণকাহিনী বর্ণনায় রাজনারায়ণ আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিতে নাটকীয় চমৎকারিত্বের সঙ্গে গল্পের স্বাদ সংযুক্ত করেছেন। অথচ এখানে ঘটনার

ঘনঘটাও নেই, পাত্রপাত্রীর ভিড়ও নেই। সর্বোপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে পিতার মৃত্যুসংবাদে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বর্ণনায় রাজনারায়ণ ছোটো গল্পের পরিণতির ইঙ্গিত-মধুরতা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। "পলতাতে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। রাত্রি থাকিতে দেবেন্দ্রবাবু কলিকাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেসে বংশবাটীর চন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিলাম।" এখানে 'শেষ হ'য়ে হইল না শেষ'— ছোটোগল্পের এই লক্ষণটি ব্যাখানে ও ব্যঞ্জনার মাধুর্যে উজ্জল।

সবশেষে দেখা যায়, ধর্মপ্রাণ, দার্শনিক রাজনারায়ণের গুরুগম্ভীর মনের আড়ালে ছিল একটি সুস্নিগ্ধ, কৌতুকপূর্ণ, সরস মন। সেখানে যতই শোক, দুঃখ, আঘাতের চিহ্ন থাক্, রসিক মন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আনন্দের উপাদান সংগ্রহ করেছিল। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্য রামগোপাল ঘোষ তাঁর দলবলসহ হাতীর পিঠে রওনা হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের ভ্রমণের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাকে স্নিগ্ধ কৌতুকের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যায়: "তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন— কোট ও পেন্টুলন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফরফর করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়া-ছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি শায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন।"

আসাম-যাত্রাকালে ক্যাপ্টেন হিক্‌লে সাহেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভ্রমণ-বৃত্তান্তটিতে যে পরিহাসরসিকতা করেছেন, তাতেও প্রসন্ন আনন্দবোধের সঙ্গে কাহিনীকারের বেদনাবিধৌত নির্লিপ্ত হাসির রেশটুকু ফুটে উঠেছে। ভ্রমণের সময় যে সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং তুচ্ছ বিষয়ের উপর কৌতূহলী আগ্রহ থাকলে পরে রচনা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, রাজনারায়ণের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির মধ্যে তার ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হয় না। সর্বোপরি রাজনারায়ণ-বিরচিত এই স্বল্পায়তনবিশিষ্ট ভ্রমণকাহিনীগুলি পাঠে বোঝা যায় যে, দর্শনবেত্তা এই ধার্মিক মানুষটির হৃদয়ান্তরালে বাস করত একটি নিত্যকালের কবি-শিল্পী।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অর্বাচীন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' যার সূচনা হয়েছিল, বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে' তার পরিণতি, আর রবীন্দ্রনাথের কালে তার সমৃদ্ধি। উনিশ শতকে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে যখন বঙ্কিমের মতো

সাহিত্য-রসিকের আবির্ভাব হয় নি, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মতো সমালোচকদের সাহিত্যসমালোচনা প্রকাশিত হয় নি, তখন বাংলা সাহিত্যে বিচারকের পদে একচ্ছত্র সম্রাটরূপে সমাসীন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের রসগ্রাহী অন্তর, অনুভূতিপ্রবণ মনকে বারবার সমাদর জানিয়েছিলেন মধুসূদন। সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়ে মধুসূদন একদা লিখেছিলেন :

"Ask Rajendra. Many have said "O, that Rajnarain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book[১] warmly. He is right !" "[২] মধুসূদন আরো লিখেছিলেন : "Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city is a sure guarantee of the future fate of the poem."[৩]

সমালোচনা এক হিসেবে নূতন সৃষ্টি। কোনো বিদেশী সমালোচকের কথায় 'Creation within a creation'; রাজনারায়ণকৃত সমালোচনাগুলি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আর-এক দিক। এগুলিতে তাঁর সাহিত্যকৃতির এক বিশেষ দিকের অভিব্যক্তি, বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ।

রাজনারায়ণের প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা "মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন"। সমালোচনাটি বিবিধ প্রবন্ধে[৪] স্থান পেয়েছে। রাজনারায়ণ তাঁর 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'-তেও 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিশদ আলোচনা করেছেন। রাজনারায়ণের সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করা গেল : "আপনারা ক্রমিক বাছিবেন ত খাবেন কখন, কেবল যদি কবিতার দোষগুণ বাছিবেন

১. 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', (১৮৯৩), পৃ. ২৬৮

৩. তদেব, পৃ ২৫৯

৪. 'বিবিধ প্রবন্ধে'র ভূমিকায় রাজনারায়ণ লিখেছেন : "মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিকুল গৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে তাহাকে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি তাহাও উমেশবাবুর দ্বারা অনুবাদিত হইয়া এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।"

তবে কবিতা উপভোগ করিবেন কখন। যেমন রামধনুর কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিলে রামধনুর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না, তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কবিতার কেবল দোষগুণ বিচার করিলে কবিতা উপভোগ করা যায় না।"[১]

রাজনারায়ণের অসাধারণ প্রজ্ঞা, মনীষা, রসগ্রাহিতা, ও নিরপেক্ষ বিচার-প্রবণতার উপর গভীর আস্থা থাকায় মধুসূদন প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই রাজনারায়ণকে প্রেরণ করতেন তাঁর মতামতের আশায়। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রায় প্রতিটি সর্গের পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন রাজনারায়ণের শিল্পসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য। রাজনারায়ণকে লিখিত একাধিক পত্রে এ-বিষয়ে জানা যায়:

"I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ'— you must tell me what you think of it."···

"I have finished the first Book of Meghnada··· I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press."···

"Last evening I got a copy of the new Meghnada forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore Pedagogue."

"Your critique would make any man proud."[২]

রাজনারায়ণ ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। সাহিত্য-বিচারে তাঁর আলংকারিক জ্ঞান ও পরিমিতিবোধ ছিল অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যেকটি সর্গের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর সামঞ্জস্য বিচার করেছেন, গুণগুলিকে উজ্জ্বলভাবে দেখিয়েছেন, দোষগুলিকেও অবিদ্বিষ্ট মনোভাব নিয়ে অঙ্গুলিসংকেতে নির্দেশ

১. 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৯১৪), পৃ. ১৭

২. দ্র. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১৮৯৩)। পৃ ২৬১, ২৭০, ৩৮৮

করেছেন। রাজনারায়ণ ছিলেন প্রকৃতই নিরপেক্ষ সমালোচক। সমালোচনা-ক্ষেত্রে একমাত্র রসবুদ্ধি দ্বারাই তিনি পরিচালিত হতেন; 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' পুস্তকে মধুসূদনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষ-গুণ বিচারের সময় বন্ধুতা ভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নয়।" যে-কোনো সমালোচনার ক্ষেত্রেই আদর্শনিষ্ঠ রাজ-নারায়ণ এই ঔচিত্যবোধ দ্বারা নিজের চিত্তশাসন ও লেখনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। মধুসূদনকে তিনি 'দোষেগুণে কবি' বলেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের গুণের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন: "বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়ারূপ জনয়িতা ও ইউরোপরূপ জনয়িতৃর সন্তান-স্বরূপ।" মেঘনাদবধ কাব্যের মূল বীজ এসেছে প্রাচ্য জাতীয়ভাবের অনুপ্রেরণায়, কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ কলাকৌশল য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে। মধুসূদনের বাক্‌প্রণালীর সূক্ষ্ম বিচার করেছিলেন রাজনারায়ণ। "বরজে সজারু পশি বারুইর যথা"—এই উপমাটিকে সমালোচক হোমারের যোগ্য মনে করেন। বস্তুতপক্ষে হোমারের যোগ্য উপমা বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। রাক্ষসপুরীর বর্ণনায় লঙ্কাকে 'অশ্রুবিন্দু মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি'—এরূপ বলায় সমালোচক তেমন খুশি হন নি, এই চিত্রকল্পকে হিব্রু চিত্র বলে উপেক্ষা করেছেন। চতুর্থ সর্গে বাল্মীকি-বন্দনাকে সমালোচক অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছেন, করুণ রস সৃষ্টিতে মধুসূদনের অসাধারণ দক্ষতার কথা। সমসাময়িক কাব্য-সমালোচনায় রাজনারায়ণের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী এবং বিচার-প্রণালী ছিল বিশ্লেষণাত্মক। মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় এই গুণটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অশোভন শব্দপ্রয়োগ, উপমা, রূপক প্রয়োগের আধিক্য, অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগের মধুসূদনীয় উৎসাহ রাজনারায়ণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে বিভিন্ন কবিদের সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্যে লেখক বিচারমূলক সমালোচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই সমালোচনাটিতে প্রতিটি সর্গের ভাবাবেগ ও ঘটনাচিত্র এমন-কি, শব্দপ্রয়োগ-কৌশলও নিপুণভাবে বিচার করেছেন রাজনারায়ণ। ফলে মধুসূদন-সাহিত্য-সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মেঘনাদবধ কাব্যকে তিনি First poem in the language রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ দেখিয়েছেন।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যেরও দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন রাজনারায়ণ। কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (মে, ১৮৬০) হওয়ার পূর্বে দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' প্রকাশিত হয়। সেদিন রাজ-নারায়ণ প্রমুখ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানান। রাজনারায়ণ-কৃত 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের সুদীর্ঘ সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকায় ১৮৬১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

তিলোত্তমা প্রকাশিত না হতেই রাজনারায়ণের অভিমত জানবার জন্য মধুসূদনের আগ্রহের অবধি ছিল না। একাধিক পত্রে তিনি তাঁর সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের কবিকে রাজনারায়ণ অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি মধুসূদনের এই সাহিত্যরচনাকে নিখুঁত, নির্দোষ বলেন নি, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য বলেছেন। শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমরত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজনারায়ণ বলেছেন: "True poetry, therefore, will last on the earth as long as, to quote Valmiki, "rivers and mountains will last," for it is something ethereal, it is ambrosia, the food of the gods, and whoever partakes of the same raises himself "Above the smoke and stir of this dim spot, which men call earth." There cannot be slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet."[১]

এইভাবে মধুসূদনকে 'True Poet' বলে অভিহিত করে রাজনারায়ণ তিলোত্তমার জন্মকালে অমরত্বের যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা হয় নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন মধুসূদনের বিস্ময়কর কীর্তি: "He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind."[২] অমিত্রাক্ষরের সার্থকতা সম্বন্ধে তৎকালীন মনীষীদের অনেকেই দ্বিধা ও সন্দেহের ভাব পোষণ করতেন। কিন্তু রাজনারায়ণ 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র

১. *The Modern Review*, June, 1936, P. 657

২. Ibid.

প্রতিটি সর্গকে বিশ্লেষণ করে ভাবের সঙ্গে ভাষার ও ছন্দের অপূর্ব সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য প্রদর্শন করেছেন। মধুসূদন পাশ্চাত্য কবিদের অনুকরণ করলেও, স্বকীয় বিস্ময়কর প্রতিভার আলোকে, ঘটনা ও চরিত্রকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহায়তায় জীবন্তরূপ দিতে পেরেছিলেন। ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে বিস্ময়কর অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করতে না পারলেও মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য যে 'Masterpiece' রচনা—তা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সমালোচক রাজনারায়ণ।

তবে উক্ত কাব্যে শব্দগত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, অতিরিক্ত শৃঙ্গাররসাত্মক উপমাপ্রয়োগ, একই চিত্রকল্পের পুনরুক্তি ত্রুটিগুলি রাজনারায়ণ নির্দেশ করেছেন। মূল কাহিনীর অহিন্দুসুলভ বৈশিষ্ট্য তাঁর নিকট প্রশংসনীয় মনে হয় নি। তিনি নিরপেক্ষ বিচারকের মতো গুণকীর্তনের সঙ্গে দোষদর্শনেও বিরত হন নি। কিন্তু শেষে বলেছেন, "But all these faults are amply redeemed by its manifold beauties. The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendor of his diction, charm us in every page of the poem."

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮০৫ শকের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত রাজ-নারায়ণের "নূতন ধর্মমত" নামক প্রবন্ধটি সাহিত্যসমালোচনামূলক নয়; বঙ্কিমের ধর্মমতের প্রতিবাদ করে লেখা এই প্রবন্ধ। সমালোচক রাজ-নারায়ণের বিচারপ্রবণ, বিশ্লেষণপন্থী মনটি উক্ত আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের একটি আদর্শায়িত রূপের প্রতি তাঁর যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে তাঁর যে বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, পাশ্চাত্য জড়বাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের আলোকে হিন্দুধর্মের বিচার যে তিনি কোনোক্রমেই সমর্থন করতেন না, তা উক্ত সমালোচনায় প্রকাশ করেছেন আবেগবর্জিত, সর্বপ্রকার গোঁড়ামিশূন্য, নিরপেক্ষ-দৃষ্টির অনুলেপনে।

রাজনারায়ণের সাহিত্য-সমালোচনামূলক আর-একটি রচনা হল 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি';—"প্রত্যুত্তর" শীর্ষকে ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমালোচক রাজনারায়ণের রসদৃষ্টি ও বিশ্লেষণক্ষমতার প্রতি তৎকালীন সাহিত্যসেবীদের প্রভূত আস্থার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, এবং মধুসূদনের ক্ষেত্রে তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। রাজনারায়ণের চিঠিপত্র ও ডায়ারি থেকে জানা যায় যে 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে সম্পাদককে চিঠি লিখতেন। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের দুটি সংখ্যার (আষাঢ় ও শ্রাবণ) ও ১২৮৮ সালের একটি সংখ্যার (ফাল্গুন) সমালোচনা করে তিনি পত্র লেখেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে; 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে সমালোচকের নাম মুদ্রিত দেখা যায় না— রাজনারায়ণের অপ্রকাশিত ডায়ারির উল্লেখ থেকে অনুমান, উক্ত বিভাগটির দায়িত্ব ছিল রাজনারায়ণের উপর :

২২ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর, শনিবার (১২৯১ সাল ১৮৮৪ খ্রী) : "অদ্য "ভারতী" সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে বর্ত্তমান মাসের "ভারতী"র সমালোচনা পাঠাই, স্বর্ণকুমারী দেবী আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা।"

২৪ পৌষ, ৭ জানুয়ারি, বুধবার (১২৯২ সাল ১৮৮৫ খ্রী) : "অদ্য মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীকে ভারতীর সমালোচনা পাঠান হয়।"

৩০ চৈত্র, ১১ মার্চ শনিবার (১২৯২ সাল ১৮৮৫ খ্রী) "অদ্য মাতা স্বর্ণকুমারীকে এই মাসের ভারতীর সমালোচনা পাঠাই।"

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে, বৃহস্পতিবার (১২৯৩ সাল ১৮৮৫ খ্রী) : "ভারতী ও বালক প্রথম সংখ্যার সমালোচনা করিয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে পাঠাই।"

১২৮৯ সালের 'ভারতী'র প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে পত্রে তাঁর অভিমত জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি জানিয়েছিলেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল : " "বসন্ত রায়" অতি উত্তম লেখা হইয়াছে। "বসন্ত রায়" বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি তাহা এই প্রস্তাবে সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পুরাতন কবির কবিতা অবিশুদ্ধ প্রেমের ভাব দ্বারা কলুষিত। বর্ত্তমান সময়ের কবিতা এবিষয়ে অনেক ভাল বলিতে হইবে। "দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" শিরস্ক প্রস্তাবের প্রণেতা যাহা বলুন না কেন, এবিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের কবিতা অনেক ভাল তাহার আর সন্দেহ নাই। এরপর "বৌঠাকুরাণীর হাটের" প্রত্যেক পংক্তিতে কবিত্বভাব না থাকুক কিন্তু ঘটনায় কবিত্ব বিলক্ষণ আছে। তাহা মনের নানাভাবকে গভীররূপে আন্দোলিত করে।" পত্রটি রচিত হয়েছিল দেওঘরে ৭ ভাদ্র '৫৩ ব্রহ্মাব্দে। প্রয়োজনবোধে তিনি হয়তো আত্মপরিচয় গোপন রেখে ভারতী পত্রে

প্রকাশ্য সমালোচনায় ব্রতী হতেন। ভারতীর ১২৮৯ ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীরঃ' স্বাক্ষরিত 'প্রত্যুত্তর' নামক একটি রচনা আছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় "দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" শিরোনামায় পর পর দুইটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লেখক আত্মগোপন করে সম্ভবত নামের আদ্যক্ষর 'শ্রীঅঃ' লেখেন। অনুমান হয়, ইনি তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এরই প্রত্যুত্তরে শ্রীরঃ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধটি রাজনারায়ণের নামের আন্ত্যবর্ণ ধরে নিয়ে তাঁরই রচনা মনে করা স্বাভাবিক। তা ছাড়া 'প্রত্যুত্তরে'র মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রিয়তা অথচ সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টি, নূতন যুগের অভ্যাগমকে সাদর সম্বর্ধনা, এবং ভাষার দৃঢ়তা, বক্তব্যের বাঁধুনী, বিচারের সূক্ষ্মতা, পদে পদে রাজনারায়ণকেই স্মরণ করায়।

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" প্রবন্ধে লেখক 'শ্রীঅঃ' ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ আমাদের দেশের স্বভাবকবিদের কাব্যসৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাঙালীর মর্মস্থলকে অকৃত্রিমভাবে উদ্‌ঘাটিত করাই দেশজ প্রাচীন কবিদের কৃতিত্বের হেতু বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। জাতীয় ঐতিহ্যে অনুরাগী রাজনারায়ণও এই অংশের সমর্থন করেছেন: প্রস্তাবটিকে 'সুরচিত' ও লেখককে 'সুনিপুণ'ও বলেছেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ যে রচনাটি এক-দেশদর্শী হয়েছে। লেখক আধুনিক কবির প্রতি সুবিচার করেন নি। প্রত্যুত্তরে রাজনারায়ণ আধুনিক কবিদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। মূল প্রবন্ধের লেখক আধুনিক কবিতাকে দেশকালপাত্রের বহির্ভূত কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে রাজনারায়ণ দেশকালপাত্রের দোহাইটিকে অন্তঃসারশূন্য প্রতিপন্ন করেছেন। মূল প্রবন্ধলেখক ইংরেজ-অনুকরণে পরিবর্তিত যুগের ভঙ্গীতে প্রবন্ধটি লিখেছেন। লেখকের যুক্তির দ্বারাই প্রত্যুত্তরে তাঁকে কোণঠাসা করা হয়েছে। রাজনারায়ণের তর্কশক্তির এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে, সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েও সাহিত্যের মধ্যে যে একটি নিত্যকালের রস আছে, তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সমাজের এই ঠিকা-চাকরদের চাকরী করা কবিদের পোষায় না।" সামাজিক নীতি-নিয়মকে ইনি ঠিকা-চাকর বলেছেন। কেননা সমাজের নিয়ম-নীতি নিত্যপরিবর্তনশীল। প্রবন্ধের উপসংহারে প্রাচীন, আধুনিক নির্বিশেষে সাহিত্যের মহিমা উপলব্ধিই রাজনারায়ণের রসদৃষ্টির একটি সমুজ্জ্বল পরিচয়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক) প্রকাশিত "বাল্মীকির অক্ষয় কীর্তি" ("ব্রহ্মাবর্তে গঙ্গাতীরে সীতা পরিহার নামক স্থানের নিকটে বন্ধুগণের প্রতি উক্ত") নামক প্রবন্ধটি আসলে বাল্মীকির রামায়ণেরই চমৎকার সমালোচনা। আমরা জানি যে রাজনারায়ণ ধর্মমতে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন। অবতারবাদে তাঁর আস্থা ছিল না। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাণকাহিনীতে তাঁর অনুরাগ ও আগ্রহের সীমা ছিল না। মধুসূদন নিজেকে 'Jolly Christian Youth' মনে করতেন, অথচ হিন্দুপুরাণের প্রতি ছিল তাঁর ব্যাকুল আগ্রহ। রাজনারায়ণের মনোভাব তার চেয়েও গভীরতর, কেননা শুধু সাহিত্যসৌন্দর্যের স্পৃহাই নয়, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগও তাঁর পুরাণপ্রিয়তার কারণ। তিনি পুরাণকাহিনীর প্রসঙ্গ তুলে, জাতীয় অনুভূতির আলোকে আপন মনোভাব প্রকাশ করবার সুযোগ নিতেন। "বাল্মীকির অক্ষয় কীর্তি" রচনাটিও তাঁর এই অনুভবের ফল। ব্রহ্মাবর্তে বেড়াতে গিয়ে তিনি এক বন্ধু-সমাবেশে মহাকবি বাল্মীকির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

"বাল্মীকির অক্ষয় কীর্তি" রাজনারায়ণের মতে অবতার-মাহাত্ম্যের বর্ণনা নয়, বাস্তব জীবন অবলম্বনে অপূর্ব কাব্য-কথা। রামচন্দ্রকে তিনি কখনো নারায়ণের অবতার বলেন নি। তিনি রামকে দোষে-গুণে জড়িত, অসাধারণ গুণসম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপেই বিচার করেছেন। রামচন্দ্রের ঈশ্বর-ভক্তি শৌর্যবীর্যের প্রশংসা তিনি করেছেন। কিন্তু বলেছেন যে, রাম-চরিত্রের প্রধান দোষ খ্যাতিপ্রিয়তা। ভারতীয় সমাজজীবনের একটি বিশুদ্ধ রূপ রামায়ণকাব্যে আছে বলেই বাল্মীকির খ্যাতি কোনোকালেই লোপ পাবে না রামায়ণ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের এরূপ অভিমত তাঁর ইতিহাসজ্ঞান ও সাহিত্যরস-বোধের পরিচায়ক।

'নব্যভারত' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্তে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি রাজনারায়ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, "জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য" নামক প্রবন্ধ লিখে (চৈত্র ১২৯৪), রাজনারায়ণকে এর প্রতিবাদ করতে হয়। অথচ রাজনারায়ণ অক্ষয়কুমারকে প্রখর যুক্তিবলে অজ্ঞেয়তাবাদী-রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। রাজনারায়ণের এই যুক্তির দার্শনিক ভিত্তি ছিল। এদিকে বিদ্যানিধিমশায় অক্ষয়কুমারকে পরম ভক্তরূপে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টাকে রাজনারায়ণ অভিনন্দন না জানিয়ে জীবনবৃত্ত

লেখকের দৌরাত্ম্য বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিমূলক কার্যসমূহে অক্ষয়কুমারের কোনো কৃতিত্ব ছিল— তাও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে, অক্ষয়বাবু ছিলেন বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদী[১]; তাঁর মতে "নাস্তিকতার খুব কাছাকাছি। এক ডিগ্রী কম মাত্র। নাস্তিকতা যদি ঊনপঞ্চাশ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ আটচল্লিশ।"[২] নাস্তিকতার জন্য ঊনপঞ্চাশ উল্লেখ করার তাৎপর্যটুকু লক্ষণীয়। নাস্তিকের প্রতি ঈশ্বর-বিশ্বাসী রাজনারায়ণের শ্রদ্ধা ছিল না। তবু এ-প্রবন্ধে তিনি অক্ষয়-কুমারের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা দেখান নি। বিদ্যানিধির প্রবন্ধটি যে কেবল স্তুতির ভাষণ, মহৎ জীবনের বৃত্তান্ত নয়, তাই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্যানিধির বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। এই সামান্য প্রবন্ধেও রাজনারায়ণের যুক্তির অকাট্যতা, নিজের অভিমত প্রকাশে নির্ভীক অকপটতা, এবং আবেগহীন সৌজন্যপ্রকাশ প্রবন্ধটিকে উপভোগ্য করেছে। সে যুগে প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ-গুলি কুরুচিতে ও কটূক্তিতে পূর্ণ থাকত। এই প্রবন্ধে লেখকের শালীনতা ও সংযম খুবই প্রশংসনীয়।

রাজনারায়ণের অনেকগুলি রচনায় তন্ময় ভাবুকতার এবং নিবিড় রস-বোধের পরিচয় আছে। ধর্মব্যাখ্যাতা, সমাজ-সংগঠক রাজনারায়ণের অন্তর্লোকে যে কল্পনাপ্রবণ কবিমন ছিল, কয়েকটি রচনার মধ্যে তা ফুটে উঠেছে।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অন্তর্গত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা Personal Essay জাতীয় রচনার প্রথম স্রষ্টা হিসেবে আমরা সাহিত্যসভায় রাজনারায়ণের নাম উপস্থাপন করতে পারি। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকে এতাবৎ কাল পর্যন্ত এই সম্মানের অধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র; রাজনারায়ণের রচনার যথেষ্ট প্রচার না থাকায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই উক্ত সম্মানে ভূষিত করে এসেছি। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তে'র প্রকাশকাল ১৮৭৫ সাল। আর রাজনারায়ণের "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" প্রবন্ধ এবং "আশ্চর্য স্বপ্ন", "জেঠামো" নামক দুটি রস-

---

১. অজ্ঞেয়তাবাদী বলতে রাজনারায়ণ কী বুঝতেন তা তাঁর কথাতেই উদ্‌ধৃত করা হল: "অজ্ঞেয়তাবাদী তাঁহাকে বলা যায়, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাঁহার শক্তি, করুণা প্রভৃতি কোন গুণ আছে এরূপ বিশ্বাস করেন না। যথা হিউম, হার্বট স্পেনসর প্রভৃতি।"

২. "জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য", 'নব্যভারত', চৈত্র ১২৯৪, পৃ. ৬৫৪

প্রবন্ধের প্রকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র পূর্বে। "আশ্চর্য স্বপ্ন" এবং "জেঠামো" প্রবন্ধ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত ক্ষণস্থায়ী পত্রিকার প্রকাশকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ। বঙ্কিমের রচনা সাধারণ পাঠকদের গোচরে আসার পূর্বে রাজনারায়ণ এই জাতীয় রসরচনায় উদ্‌যোগী হন। এমন-কি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হওয়ার ন'বছর পূর্বে এই প্রবন্ধটি রচিত।[১]

'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রাজনারায়ণ লিখেছেন : " 'আত্মীয়-সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' এডিসনের স্পেক্‌টেটরের প্রথম দুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়া লিখিত।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যে রস-প্রবন্ধকাররূপে খ্যাত ছিলেন এডিসন ও স্টীল; আঠারো শতকের প্রথম ভাগে এঁদের কৌতুক-রসসিঞ্চিত, ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি প্রকাশিত হত 'ট্যাট্‌লার' (১৭০৯) ও 'স্পেকটেটর' (১৭১১) পত্রিকায়। এডিসন ও স্টীলের রচনাগুলি একত্রে সংকলিত (১৮৭৭) হয়েছিল *Essays from the Spectator* নামে। স্পেক্‌টেটরের— "The Spectator's Introduction" এবং "The Spectator's Club" প্রবন্ধ দুটি অবলম্বনেই রাজনারায়ণের 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' লিখিত।

Addison বর্ণনা করেছেন তাঁর সহকর্মী বন্ধুবর্গের বৃত্তান্ত। সেই আদর্শেই আত্মীয় সভার সভ্যদের বৃত্তান্ত বর্ণনায় রাজনারায়ণ উৎসাহী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে আত্মীয়-সভা নামটি অনেকদিন থেকেই চলে আসছে— রামমোহনের 'আত্মীয় সভা', অক্ষয়কুমার দত্ত -স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' ইত্যাদি নামের আদর্শ ছিল তাঁর সামনে।

রাজনারায়ণের এই দীর্ঘ রচনাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম আত্ম-বিবরণমূলক, দ্বিতীয় 'আত্মীয় সভা'র অন্যান্য সভ্যদের পরিচয়। আত্মবিবরণ অংশে বাল্যকালের কথা, পিতৃপরিচয়, পিতার মৃত্যু, দেশভ্রমণের কাহিনী প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রতিটি অংশের সঙ্গে এডিসনের রচনার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। আত্মবিবরণ দিতে গিয়ে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "এই আত্মীয় সভার সদস্যদিগের বিবরণ করিতে গিয়া প্রথমে আমার নিজের বিবরণ করিব। তাহা হইলে দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ লেখক কে, ইহা জানিতে পাঠকবর্গের স্বভাবতঃ যেরূপ কৌতুহল হইয়া

১. 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' ১২৬৩ বঙ্গাব্দে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

থাকে, সে কৌতূহল চরিতার্থ করা হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়সভার একজন সদস্যের বিবরণ করা হইবে। লেখক দীর্ঘ-নাসিক কি খর্ব্ব-নাসিক, তিনি হ্রস্ব-কায় বা দীর্ঘ-কায়, তিনি যুবক অথবা বৃদ্ধ, তিনি গম্ভীর-স্বভাব অথবা লঘু-স্বভাব, এই-সকল বিষয় অবগত হওয়া, পাঠকবর্গ গ্রন্থের দোষগুণবিচার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন, অতএব সেই কৌতূহল অগ্রে চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।" এই অংশটির সঙ্গে এডিসনের রচনার হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১] এডিসন তাঁর The Spectator's Introduction-এর প্রথমেই লিখেছেন : "I have observed that a reader seldom peruses a book with pleasure, till he knows whether the writer of it be a black or a fair man, of a mild or choleric disposition, married or a bachelor, with other particulars of the like nature that conduce very much to the right understanding of an author. To gratify this curiosity which is so natural in a reader I design this paper and my next as prefatory discourses to my following writings and shall give some account in them of the several persons that are engaged in this work. As the chief trouble of compiling, digesting and correcting will fall to my share, I must do myself the justice to open the work with my own history"— March 1, 1711. প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, রাজনারায়ণের প্রবন্ধটি এডিসনের রচনার সম্পূর্ণ অনুকরণ নয়, এডিসনের রচনার ছাচে তাঁর নিজের ভাব ও ভাবনা উপস্থাপন করে একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক রচনা।

রচনাকালের প্রভূত ব্যবধান সত্ত্বেও রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' (১৮৮৯ খ্রী), 'সে কাল আর এ কাল' (১৮৭৪ খ্রী), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৫ খ্রী) ইত্যাদি পুস্তকের সঙ্গে "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" (১৮৪৬ খ্রী) প্রবন্ধের বর্ণনা অংশের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য অংশে 'সে কাল আর এ কাল' এবং 'আত্মচরিত'

---

১. অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য উভয় লেখকের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য দেখিয়ে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১০-১৭) "একটি দুর্লভ রচনা" প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থ দুটির উপরেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঐ দুখানি গ্রন্থের পূর্বাভাস-স্বরূপ "আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" রচনাটিকে গ্রহণ করা যায়।

'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে' রাজনারায়ণ লিখেছেন: "অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই নবাব ও ইংরাজ সরকারে ভাল ভাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে তালুক মুলুক হইতে পারিত, কিন্তু কোটা নির্ম্মাণ না করিয়া, স্ত্রীকে স্বর্ণ অলঙ্কার না দিয়া ও তালুক ক্রয় না করিয়া বস্ত্র ও স্বীয় গৃহিণীদিগের প্রস্তুত রাশীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন বহুসংখ্যক লোককে প্রত্যহ বিতরণ করা বাটীর রীতি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহাতে কেবল বাটীর কর্ত্তা ঘৃত ভক্ষণ না করিয়া সকল ভোক্তারাই তাহা ভক্ষণ করিতে পায়, এই জন্য অন্ন প্রস্তুত হইলে সেই উষ্ণ অন্নরাশির উপরে একেবারে অধিক পরিমাণে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইত।" 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে ও 'আত্মচরিতে' ঠিক অনুরূপ বিষয়ই রয়েছে, তবে রচনাভঙ্গী স্বতন্ত্র।

(তুলনীয় 'আত্মচরিতে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ:

"রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণদানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। একটি খড়ো বাড়ী (সেকালে কোটাবাড়ী করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈঁচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুইবেলা একশত পাত পড়িত। পিতামহী ঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্ত্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য প্রস্তুত রাশীকৃত উষ্ণ অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দিতেন।"

তুলনীয় 'সে কাল আর এ কাল'— "সেকালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত। সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করান হইত।"

এই গেল 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে'র প্রথম অংশের কথা। দ্বিতীয় অংশে সভ্যদিগের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। *Essays from the Spectator* গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধে Club-এর সভ্যদের বৃত্তান্ত আছে। দুটি

স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখে রাজনারায়ণ একই প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে দুই বিষয়ের আলোচনা করেছেন। 'Spectator's Club'-এর সভ্য-সংখ্যা ছয়, রাজনারায়ণের আত্মীয়সভার সভ্য-সংখ্যা সাত। Spectator-এ বর্ণিত চরিত্র সার্ রজার ডি কভারলি, সার্ এণ্ড্রু ফ্রিপোর্ট, উইল হনিকম্ব, ক্যাপটেন সেন্‌ট্রি ও একজন ধর্মযাজক। আর আত্মীয় সভার সভ্যদের মধ্যে প্রথম সভ্য অভয়চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় দীনদয়াল ঘোষ, তৃতীয় বণিকনাথ মিত্র, চতুর্থ জনের নাম ঋজুহৃদয়, পঞ্চম হলেন সরস্বতী ন্যায়ভূষণ, ষষ্ঠ রসময় দে, সপ্তম সভ্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন, নামকরণ করেন নি। যেমন Spectator's Club-এর শেষ সদস্য ধর্মযাজকের নাম নেই।

আত্মীয়সভার প্রত্যেকটি চরিত্র স্পেকটেটর-ক্লাবের সভ্য ও বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজের অতি-পরিচিত, কৃতী ব্যক্তিদের চরিত্র-আদর্শানুসারে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু Spectator-এ বর্ণিত চরিত্রগুলির মতো এগুলি Typical চরিত্র নয়, এদের প্রত্যেকের কর্মবহুল জীবনের কথা দোষে-গুণে, সুখে-দুঃখে এক-একটি পূর্ণ সজীব মানুষরূপে চিত্রিত হয়েছে। অন্য চরিত্রের আদর্শ অনুসরণ ব্যতিরেকে এদের স্বতন্ত্র মূল্য, স্বতন্ত্র রস-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করা যায়।

প্রথম সভ্য অভয়চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র রূপায়ণে রামগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ শিকদারের চরিত্রের স্পষ্ট ছাপ। উভয়েই ছিলেন হিন্দুকলেজের ছাত্র। অপর দিকে প্রথম সভ্য সার্ রজার ডি কভারলি চরিত্র 'typical country gentleman'-এর।

দ্বিতীয় সভ্য দীনদয়াল ঘোষের সঙ্গে স্পেকটেটর ক্লাবের কোনো সভ্যের চরিত্রের আগাগোড়া সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনারায়ণ-কর্তৃক দীনদয়াল চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনায় খানিকটা সার্ রজার ডি কভারলির ছায়া, ও কিছুটা রাধাকান্ত দেবের, কিছুটা রাজনারায়ণের পিতামহ রামসুন্দর বসুর চরিত্র ও কার্যকলাপের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজনারায়ণের বর্ণনায় আছে—

"দীনদয়াল বাবুর পিতার পরলোকের পর তাঁহার বাটীতে কোন উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে কোন নিকটস্থ জমিদারের পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালবিধবা পরমাসুন্দরী কন্যা তথায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দুইজনে পরস্পর দর্শনে ও তৎপরে পরস্পরের গুণ শ্রবণে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-রসের সঞ্চার হইয়াছিল। সে কন্যাটি বড় সুপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে

প্রত্যাগমন করিয়া দেশের নিদারুণ রীতি জন্য আপনার প্রিয়তমের সহিত মিলনের অসম্ভাবনা দেখিয়া সেই অবধি কাহারো সহিত বাক্যালাপ করা পরিত্যাগ করিলেন ও ছয়মাস পরে এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের অস্তের ন্যায় মানবদৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি দীনদয়াল বাবু বিবাহ করিবার মানস পরিত্যাগ করিলেন।"— "আত্মীয় সভার সভ্য-দিগের বৃত্তান্ত"।

অনুরূপ বর্ণনা এডিসনের রচনাতেও: "It is said he keeps himself bachelor by reason he was crossed in love by a perverse beautiful widow of the next country to him. Before this disappointment Sir Roger was what you call a fine gentleman. But being ill used by the above mentioned widow, he was very serious for a year and a half."—The Spectator's Club.

"আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে" বর্ণিত দীনদয়ালের পরিচয়ের কোনো কোনো অংশ রাধাকান্ত দেবকেই স্মরণ করায়।— "দীনদয়াল বাবুর বাটীতে এক বালিকা বিদ্যালয় আছে। তাঁহার ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আজ চারি পুরুষ হইল চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী এই খ্যাতি দক্ষিণদেশে অনেকদিন অবধি প্রচারিত আছে। পূর্ব্বে তাঁহার বাটীস্থ বালিকাবিদ্যালয়ে কেবল বাটীর বালিকারা পড়িত, এক্ষণে তাহাতে গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোকের কন্যা পড়িয়া থাকে।"

এণ্ড্রু ফ্রিপোর্ট -চরিত্রের অনুসরণ রয়েছে রাজনারায়ণ-বর্ণিত বণিকনাথ মিত্রের চরিত্রে। প্রকৃতপক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্রের চরিত্র অবলম্বনেই রাজনারায়ণ উক্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বণিকনাথ মিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা প্যারীচাঁদ মিত্রকেই স্মরণ করায়।

আত্মীয়সভার চতুর্থ সভ্য ঋজুহৃদয়ের সঙ্গে এডিসন-বর্ণিত কোনো চরিত্রের স্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, পরন্তু এই চরিত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের ছায়া আছে। তবে Captain Sentry সম্বন্ধে Spectator-এর বর্ণনায় যে অকপট সারল্যের কথা আছে ঋজুহৃদয়ের সঙ্গে সেই জায়গায় কিছু মিল। Captain Sentry পদোন্নতি করতে পারেন নি, তাঁর গুণাবলীকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন নি, কিন্তু সেজন্য তাঁর

কোনো ক্ষোভ ছিল না। তিনি সামান্য ভূসম্পত্তি নিয়েই খুশি ছিলেন। রাজনারায়ণ-অঙ্কিত ঋজুহৃদয়বাবুর চরিত্রের মূল গঠন অনেকটা এইরকম। প্যারীচরণ সরকার, 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'র রামনিধি তর্কবাগীশ প্রমুখ কয়েকটি চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেই ঋজুহৃদয়ের কল্পনা।

আত্মীয় সভার ষষ্ঠ সভ্য রসময় দে চরিত্রের পটভূমিকায় খুব ঈষৎভাবে হলেও দুই চরিত্রের প্রভাব— উইল হনিকম্ব ও রজার ডি কভারলি। এতদ্‌ব্যতীত কিছুটা ঈশ্বরগুপ্তের, কিছুটা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের, কিছুটা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রমিশ্রণে গঠিত হয়েছে।[১]

আত্মীয় সভার শেষ ও সপ্তম সভ্যের কোনো নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলেছি এডিসনের পত্রিকায়ও ধর্মযাজকের নাম পাওয়া যায় না। যা হোক, এই নামবিহীন ব্যক্তির (আত্মীয় সভার সপ্তম সভ্য) মধ্যে আমরা দুজনকে খুঁজে পাই— কেশবচন্দ্র সেন[২] ও রামতনু লাহিড়ী। শেষোক্ত ব্যক্তির চরিত্র-বর্ণনার মিল রয়েছে 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' পুস্তকের বর্ণনার সঙ্গে।

"Spectator's Club" প্রবন্ধের সমাপ্তি-পঙ্‌ক্তি These are my ordinary companions, অনুরূপভাবে রাজনারায়ণ শেষ করেছেন এই বলে: 'ইহারাই আমার বিশেষ মিত্র।'

পাশ্চাত্য প্রবন্ধকারদের অনুসরণে লিখিত হলেও, রাজনারায়ণের রচনাটিতে

---

১. উইল হনিকম্ব এবং রজার ডি কভারলি সম্বন্ধে The Spectator's Club প্রবন্ধে বলা হয়েছে—

"He knows the history of every mode and can inform you from which of the French king's wenches our wives and daughters had this manner of curling their hair, that way of placing their hoods; whose fraility was covered by such a sort of petticoat and whose vanity to shew her foot made that part of the dress so short in such a year; in a word all his conversation and knowledge has been in the female world."

রজার ডি কভারলি সম্পর্কে লেখা হয়েছে—

"His great grandfather was inventor of the famous country dance which is called after him."

২ কেশবচন্দ্র সেন-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে লিখেছেন: "তিনি সেই একমাত্র নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, পরমেশ্বর পরায়ণ ও তাঁহার চিন্তাতে সর্ব্বদা নিমগ্ন। ঈশ্বর-

বিষয়বিন্যাসের সঙ্গে প্রবন্ধের গাম্ভীর্য ও চরিত্রগুলির বর্ণনা-নৈপুণ্যে রচয়িতার জীবনদৃষ্টির অতি গভীর অভিজ্ঞতা ভাষায় সমুজ্জ্বল।

পরবর্তী আলোচনার বিষয় রাজনারায়ণের বক্তৃতাবলী; এগুলি ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়, অতএব আত্মনিষ্ঠ রচনার পর্যায়ভুক্ত। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত (২৯ শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক) বক্তৃতা।

বাংলা ভাষায় ধর্মতত্ত্বের আলোচনা প্রবর্তিত হয় ব্রাহ্মগণের দ্বারা, এবং বাংলা ভাষায় বক্তৃতাদিরও প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ সূচনার প্রথম থেকে (রামমোহনের 'ব্রহ্মসভা'র সময় থেকে) প্রদত্ত বক্তৃতাদি প্রধানত জ্ঞানমূলক, গুরুগম্ভীর ভাষায় রচিত; কিন্তু ব্রহ্মের প্রেমসত্তার ভাব সরস, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রথম ফুটিয়ে তোলেন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ।

রাজনারায়ণের বক্তৃতা পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের বক্তৃতাগুলির বিভাগীকরণ লক্ষ করলে লেখকের রচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বোঝা যায়। মোট ছ'টি ভাগে ষোলোটি বক্তৃতা সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিষয়ানুসারে প্রথম সাতটি 'ঈশ্বরোপাসনা ও চরিত্র সংশোধনের কর্তব্যতা' শীর্ষকে, দ্বিতীয় ভাগে 'সংসারের অনিত্যতা' শীর্ষকে দুটি, 'তিতিক্ষা ও সন্তোষ' ভাগে তিনটি, 'পবিত্র সুখের মহত কারণ' এবং 'জীবাত্মার খেদ ও আশা'— এই দুই ভাগে দুটি বক্তৃতা সন্নিবেশিত হয়েছে। সব শেষে দুটি বক্তৃতা—একটি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্ত'[১] ও অপরটি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ'। এই দুটি বক্তৃতা একত্রে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত' নামে পরে (৩য় সংস্করণ ১৮৭১) পুস্তিকাকারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের[২] বক্তৃতাগুলি ১৭৬৮ শক থেকে

বিষয়ক-গ্রন্থ সর্ব্বদা নির্জনে পাঠ করিয়া থাকেন, বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বরানন্দ রসপান তাঁহার একমাত্র কার্য্য।...তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কর্ম্ম জ্ঞান করেন। কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া তিনি তদ্গত-প্রাণ ও তন্মনস্ক।...শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন কার্য্যে তিনি পরম মান্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান সহযোগী।...তিনি বিষয়কর্ম্ম করিলে একজন অতি বিষয়-নিপুণ-ব্যক্তি হইতে পারিতেন ও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়া থাকেন যে কি কারণে বলিতে পারি না, সেদিকে আমার মন যায় না।"

১. 'সংবাদ-ভাস্কর' পত্রিকায় ১২৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত।

২. একমেবাদ্বিতীয়ম্—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা—১ম ভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৭৮৩ শক, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৮৩ শক।

১৭৮২ শক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কলকাতা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য রচিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন : "এই সকল বক্তৃতা দ্বারা একটি ব্যক্তিরও যদি ধর্মে মতি ও ঈশ্বরের শ্রদ্ধা উৎপন্ন বা বর্ধিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ এলাহাবাদ থেকে চারুচন্দ্র মিত্র[১] প্রকাশ করেন ১৭৯২ শকে। দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত বক্তৃতাই ধর্মমূলক, উপদেশাত্মক। 'ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও চরিত্রসংশোধনের কর্তব্যতা' শিরোনামায় পাঁচটি বক্তৃতা ; এবং 'অমৃত-নিকেতনে যাত্রা', 'জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য', 'বিদ্যাদিগের স্তব' 'শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মস্তোত্র,' 'মাতৃশ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা'—এই শিরোনামাগুলিতে একটি করে বক্তৃতা সংযুক্ত হয়েছে, এতদ্‌ব্যতীত 'ধর্মসংস্কার' নামক দুটি বক্তৃতা এবং 'বসন্তকূজন' শিরোনামার বক্তৃতাবলীতে রাজনারায়ণের ঈশ্বরগতপ্রাণের প্রকাশ হয়েছে সহজ, সরল ভাষায়। ১৭৮৬ শক থেকে ১৮০৭ শকের বিভিন্ন সময়ে এইগুলি রচিত হয়েছিল। বক্তৃতাগুলির শিরোনামা নির্বাচনের মধ্যেও রাজনারায়ণের ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঙ্গে কল্পনাপ্রবণ কবি-মনের স্বরূপটি বোঝা যায়। মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে প্রদত্ত উপাসনাকালীন প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিকে একত্র করে কোকিলের কাকলি কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুত বসন্তকাল যেমন পিককণ্ঠধ্বনিকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে তেমনি বাসন্তী প্রকৃতির মনোরম শোভা ঈশ্বরভক্তের কণ্ঠে অপার্থিব প্রেমের বাণী ফুটিয়ে তুলেছে।

১৭৮৬ শক থেকে ১৮০১ শকের বিভিন্ন সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনারায়ণের আরো কয়েকটি বক্তৃতা পাওয়া যায়। এগুলির কোনোটি আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত, কোনোটি মেদিনীপুর গোপগিরিতে অনুষ্ঠিত উপাসনা সভার 'স্তুতি ও প্রার্থনা'।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বক্তৃতাগুলির সবই প্রায় (দু-একটি ব্যতীত) ধর্ম এবং উপদেশ-মূলক। রাজনারায়ণ একমেবাদ্বিতীয়ম মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিরীশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিকদের চিন্তার অসারতা পরিস্ফুট করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এই-সব বক্তৃতায় যুক্তি ও তত্ত্ব আহরণ করেছেন। একসময় দীক্ষিত ব্রাহ্মদের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সঞ্চারের জন্যই বক্তৃতাগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

---

১. রাজনারায়ন বসুর সুহৃদ নীলকমল মিত্রের পুত্র।

বক্তৃতাগুলির কোনো-কোনোটিতে রাজনারায়ণের জীবনদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে দেখা যায় :

"অনিত্য বস্তুর প্রতি মোহান্ধপ্রেম অনেক যন্ত্রণাদায়ক, কারণ অনিত্য বস্তুর কোন স্থিরতা নাই। অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র ; অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার ; অদ্য অভিনব বিকশিত পুষ্পতুল্য লাবণ্যযুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ ; অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা ; অদ্য পুণ্যবতী রূপবতী, গুণবতী, প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহবাসে সুখেতে দ্রব হওয়া, কল্য তাহার লোকান্তর গমনে কেবল মনে তাহার প্রতিমামাত্র হইল, ইহাতে হৃদয়কে বিদীর্ণ করা ; হায় হায় কিছুই স্থির নাই।" (কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯ চৈত্র, ১৭৬৮ শক)

ধর্মতত্ত্ব ও সদাচারকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন সমসাময়িক প্রবন্ধগুলির মূল বিষয়। বক্তৃতার ভাষায় রাজনারায়ণের ব্যক্তিহৃদয় প্রতিফলিত হওয়ায় তা সাহিত্যের কোঠায় উন্নীত হতে পেরেছে। বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে যে, তত্ত্বকথার সঙ্গে রাজনারায়ণের প্রাণের গভীর ভগবদ্‌ভক্তি অন্তরের সবটুকু আবেগ যেন মথিত করে উৎসারিত হয়েছে :

"হে পুণ্য তোমার নির্ধূত সৌন্দর্য্য যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছে, সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই, এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, ততই তাঁহার যে রূপ সুখের বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত।" (কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৯ পৌষ ১৭৬৮ শক)। এইভাবে আরো একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যায় যে একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ উপাসনাগৃহে, বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও রাজনারায়ণের ভাষণগুলির মধ্যে একটি নির্বিশেষ মহিমা আছে। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, অনুভূতির গাঢ়তা, প্রত্যয়নিষ্ঠ মানসিকতা, সর্বোপরি উদার, রসিক প্রাণোচ্ছলতা বক্তৃতাগুলির বিষয়বিন্যাসে এবং ভাব প্রকাশে বারবার স্ফুরিত হয়েছে।

রাজনারায়ণের আধ্যাত্মিক উপদেশাত্মক রচনা 'তাম্বুলোপহারে'র দুটি

সংখ্যা পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। "নববর্ষ উপলক্ষে বন্ধুদিগকে তাম্বুলোপহার" নামে 'নব্যভারত' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল প্রথমটি। দ্বিতীয় সংখ্যা "দেবগৃহে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ" (১৭ অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০) নামে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যাটি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে ১৮৯০ সালে পঠিত হয়।

'তাম্বুলোপহার' (প্রথম সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের আকারে সংক্ষিপ্ত নীতি-উপদেশ। সাঁইত্রিশটি মূল্যবান উক্তির অতি সুন্দর সংকলন। সরল সংলাপের ভাষায়, গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাম্বুলোপহারের উক্তিগুলি সহজ, সরল ও পরম উপভোগ্য। তত্ত্বকথাকে সরস করে পরিবেশন করা হয়েছে।

'তাম্বুলোপহার' নামকরণের মধ্যে রাজনারায়ণ বোধকরি কোনো গভীরতর অর্থ ব্যঞ্জনা করেছেন। প্রথমত, ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত উৎসবগুলিকে বিরাট আধ্যাত্মিক ভোজপর্বরূপে কল্পনা করে সভান্তে যে উপদেশগুলি প্রদান করেছেন তার হিতকরতা এবং সুখকরতা তাম্বুলের সঙ্গেই তুলনীয়। দ্বিতীয়ত প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে 'তাম্বুলোপহার' সম্মান ও দায়িত্ব অর্পণের এক প্রতীক অনুষ্ঠান। বংশগৌরব বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে তাম্বুল উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা করা হত। রাজকর্মচারীদের কোনো কঠিন দায়িত্বে নিযুক্ত করলে, রাজা অনুরূপভাবে তাদের তাম্বুলোপহার দিতেন। সেই উপহার গ্রহণ করার তাৎপর্য ছিল। উক্ত ব্যক্তি প্রাণপণে সে দায়িত্ব পালন করবেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের হাতে ধর্মোপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী উপহার প্রদান করে রাজনারায়ণ তাঁদের ধর্মজীবনের কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

উনিশ-সংখ্যক উপদেশে রাজনারায়ণ বলেছেন, "দুঃখকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, যে সুখী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়, সে সুখী হয় যেহেতু আনন্দই আত্মার প্রকৃতি।" সাতাশ-সংখ্যক উপদেশে বলেছেন: "ভালোর বেলাটি তুমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে লইবে, আর মন্দের বেলাটি লইবে না! কি ঈশ্বরপ্রেম, গো!" এইরকম বহু মূল্যবান উপদেশ বাংলাভাষার সহজাত মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন হৃদয়ানুভূতির গভীর প্রশান্তি আছে, অপর দিকে আছে দায়িত্ব গ্রহণের কঠিন প্রতিজ্ঞা।

'তাম্বুলোপহার' দ্বিতীয় সংখ্যাটির স্বল্পপরিসরেই দুটি বিভাগ— প্রথম অংশ, ধর্মসাধন; দ্বিতীয় অংশ, সংক্ষিপ্ত বাক্য। এই-সমস্ত উপদেশের মধ্যেও তিনি

ধর্মসাধনের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বেশ সরল ভাষায় বলেছেন : ১. ঝেড়ে ফেলা সাধন, ২. পদাঘাত সাধন, ৩. কূর্ম্ম ব্যবহার সাধন, ৪. তলিয়ে যাওয়া সাধন, ৫. হাঁপাই ছোড়া সাধন প্রভৃতি ভগবৎ-সাধনার কয়েকটি পদ্ধতির কথা রাজনারায়ণ খুব ঘরোয়া ভাবে প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ-ভাবে কয়েকটি সাধনপদ্ধতির কথা তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর "The Religion of Love" প্রবন্ধে। গভীর অধ্যাত্মদর্শনকে ভাষার সরল-সৌন্দর্যে স্বরভিযুক্ত করে সাধারণ মানুষের উপভোগ্য করে তোলার ক্ষমতায় রাজনারায়ণ সে যুগে পাঠকসমাজকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, 'কথামৃত' (১৮৭৯ খ্রী) গ্রন্থে পরমহংসদেবের অপূর্ব কথাগুলি যেরূপ লৌকিক রসে নিষিক্ত অথচ আধ্যাত্মিক মহিমায় উজ্জ্বল সর্বশাস্ত্র ও দর্শনের পরম নিষ্কর্ষরূপে প্রকাশিত হয়েছে, রাজনারায়ণের 'তাম্বুলোপহার' কথামৃতের সমসাময়িককালে রচিত অনুরূপ রচনা।

১৩০১ বঙ্গাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরি কর্তৃক আহূত বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাংলাসাহিত্যে 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যে'র প্রবর্তয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য এ কথা আংশিক সত্য সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের জোগান দিয়েছেন কবিওয়ালারা ; তারও পরে ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় হাস্যরস ছিল ; এমন-কি ঈশ্বরগুপ্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে, প্রহসনে হাস্যকৌতুক রয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম-পূর্ব এই রচনাগুলির কৌতুকরস উচ্চভাবযুক্ত, কুরুচিমুক্ত ছিল না, এগুলি ছিল নিছক ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। এতৎ-সত্ত্বেও বঙ্কিমের পূর্বেই হাস্যরসের সংযমশুচিতা, রুচিশীলতা প্রকাশ পেয়েছে রাজনারায়ণ বসুর লেখনীতে।

রাজনারায়ণ কৌতুকরসস্নিগ্ধ রচনার সহায়তায় কখনো কখনো সমাজ-জীবনের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। বঙ্কিম যেমন "বড়বাজার", "মনুষ্যফল", প্রভৃতি রূপক প্রবন্ধে সামাজিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যঙ্গভঙ্গীতে, রাজনারায়ণ তেমনি দেশের একদল অকালপক্ব, বিদ্যাভিমানী সমাজ ও ধর্মসংস্কারকদের উৎকট ক্রিয়াকলাপকে "জেঠামো"[১] নামক প্রবন্ধে প্রতিফলিত করেছেন অনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায়। জাতীয় ঐতিহ্যের যারা বিরোধী, বাঙালীর গৌরবে যারা আস্থাহীন, তাদেরও তিনি 'জেঠা' বলেছেন। এই-সব 'জেঠারা' রাজ-

১ রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্গত। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

নারায়ণের ভাষায় "হাওয়ার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।" এই শ্রেণীর 'জেঠারা' বলেন যে "বাল্মীকি হোমরের চুরি করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতা প্রণেতা বাইবেল হইতে ভাব লইয়া গীতা রচনা করিয়াছেন।" রাজনারায়ণ তাঁর সমসাময়িককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান, সমাজ-সংস্কারকের বক্তৃতা যে কত অন্তঃসারশূন্য, তা ব্যঙ্গকৌতুকের সহায়তায় বুঝিয়েছেন। উপযুক্ত জ্ঞান ও যথাযোগ্য কর্মের অধিকার ব্যতীত অর্থাৎ সাধনা না করে যারা কার্যে লিপ্ত হয় তিনি তাদের 'জেঠা' বলছেন। এরা 'অকালপক্ক' ও 'আত্মম্ভরী'। ইংরেজী সভ্যতা বিস্তারের কুফল সমাজজীবনের রন্ধ্রপথে ছড়িয়ে পড়ার বেদনাই রাজনারায়ণ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অথচ সে ব্যঙ্গে হুল নেই, আছে রম্যতা। আধুনিক কালে অনেক রচনা 'রম্য রচনা' হিসাবে সমাদৃত। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং রাজনারায়ণের 'জেঠামি'তে রচনাশিল্পের যে বৈশিষ্ট্য, তা সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীর সূচনা করেছে।

রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র রচনাগুলির মধ্যে ব্যক্তি রাজনারায়ণের পরিচয় সুপরিস্ফুট। "আশ্চর্য্য স্বপ্ন"[১] নামক প্রবন্ধে তাঁর প্রবল স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতার জন্য সূক্ষ্ম বেদনাবোধ এবং শিক্ষিত বাঙালী কর্তৃক হাস্যকর অনুকরণ-প্রবৃত্তির জন্য বেদনামিশ্রিত কৌতুকবোধ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ দ্বারা বিজিত বঙ্গদেশের জাতীয়তাহীনতার সম্ভাবনাকে উৎকটরূপে দেখানোর জন্য লেখক একটি আশ্চর্য স্বপ্নের পরিকল্পনা করেছেন। বাঙালীর অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত কল্পনা করে বাঙালী কর্তৃক বিজিত ইংলণ্ডের একটি কৌতুকচিত্র উক্ত প্রবন্ধে চিত্রিত করেছেন। লেখকের পরিহাসপ্রবণ, কৌতুকরসাশ্রিত মনটির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে অক্সফোর্ডের অধ্যাপকগোষ্ঠীর চিত্রকল্পনায়। বিখ্যাত অধ্যাপকের "তসরের জোড় পরিধান পূর্ব্বক টিকি রাখিয়া শম্বুকের নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন।" এ চিত্রটি বস্তুত কৌতুককর। বাংলাদেশের অধ্যাপকেরা 'কোট প্যান্টুলন, হ্যাট পরে মুখে চুরট নিয়ে' অধ্যাপনাবৃত্তি করেন, রাজনারায়ণের রুচিতে তা ভালো লাগত না। সেই ভালো-না-লাগাকে এই আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শনের মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ-অধীনে বাঙালীরা যে-সমস্ত জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল, তারই হাস্যকরুণ দিক উদ্ঘাটন করা রাজনারায়ণের লক্ষ্য

১ 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছিল। বঙ্কিমের কমলাকান্তের কলমে যে রসের উৎসার ঘটেছে, সেই রসের পরিবেশন রাজনারায়ণের প্রবন্ধে হয় নি বটে, তবু এই স্বদেশপ্রেমিক, রহস্যপ্রিয় মানুষটি বাঙালীর দ্বারা বিজিত ইংলণ্ডের এক হাস্যকর রূপ কল্পনা করে অপূর্ব সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সে কল্পনা সাহিত্যের দরবারে সসম্মানে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

রাজনারায়ণের মনস্বিতায় যে দীপ্ত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসবোধের সার্থক সমন্বয় হয়েছিল, তার বহু পরিচয় রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। 'আশ্চর্য স্বপ্ন-দর্শনই' হোক, 'জেঠামো' নামক ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ বা ভ্রমণকালীন কোনো ঘটনা-বর্ণনাই হোক, তাঁর পরিহাসকুশলতা, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের নিপুণ প্রয়োগচাতুর্য বাংলাসাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনা তাঁর পূর্বসূরী রাজনারায়ণকেই বার বার স্মরণ করায়। 'জেঠামো' প্রবন্ধে রাজনারায়ণ রূপক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু প্রবন্ধটিতে বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, এবং তৎকালীন অবস্থা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের কবিসমালোচক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-সংস্কারকগণ যে একসময় বিরূপ বিকৃতরুচিসম্পন্ন ছিলেন এবং বাংলাদেশের সমাজজীবনে যে-দুর্গতির সূচনা হয়েছিল, স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর সেই অনুভূতি সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশিত। সাহিত্যিক কলাকৌশল এতে নেই বটে, কিন্তু প্রাঞ্জলতায় প্রবন্ধটি সহজবোধ্য ও উপভোগ্য।

ধর্মপ্রাণ দার্শনিকপ্রবর রাজনারায়ণ জীবনে একবার মাত্র উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন। তার স্বাক্ষর রয়েছে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (অগ্রহায়ণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায়। 'অমৃতাঙ্কুর' নামক একটি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকায়। উপন্যাসটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে প্রথম পরিচ্ছেদ দেখে মনে হয়, একটি রোম্যান্টিক প্রণয়কথার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রাজনারায়ণের মনে ছিল। উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, সমসাময়িক সমাজ-জীবনে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি ঘনীভূত হয়, তারই রূপায়ণ রাজনারায়ণের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই: নায়কের নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনাঢ্যের পুত্র, স্বাস্থ্যবান পৌরুষব্যঞ্জক তার মূর্তি, দ্বাবিংশ বৎসরের সুশিক্ষিত যুবা। সে

বিবাহিত; স্ত্রী ষোড়শী, শ্যামাঙ্গী, সুন্দরী। প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখা গেল নায়কের পারিবারিক জীবনে বড়ো অশান্তি; তার বৃদ্ধ পিতা একটি তরুণীকে বিবাহ করে সংসারটিকে এমন বিষতিক্ত করে তুলেছেন যাতে যুবকের পক্ষে পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব হয়েছে। শুধু এইটুকু মাত্রই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত। কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায় যে; উপন্যাস-রচনায় মনোযোগী হলে রাজনারায়ণ অকৃতকার্য হতেন না। চরিত্র-রচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে। ঘটনার জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে কাহিনীকৌতূহল জাগ্রত করার কৌশলও অবলম্বিত হয়েছে। উপন্যাসের যে ধর্ম বাস্তবমুখিতা তারও লক্ষণ সূচিত। চরিত্র-চিত্রণে বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে' এবং 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'ও। তিনি ছিলেন যথার্থ গল্পশিল্পী। কিন্তু ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সর্বোপরি জাতীয়জীবন-সমস্যা নিয়ে প্রবল কর্মব্যস্ততার জন্যই সম্ভবত কথাসাহিত্য রচনার দিকে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় নি।

রাজনারায়ণের আত্মচরিতে মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ১৮২৬ সালে জন্মসময় থেকে রচনার শুরু ও ১৮৭৫ সালের ৩০শে জুলাই বেলভেডিয়ার ভবনে তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্নর সার্ রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক আমন্ত্রিত সান্ধ্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান এবং ঐ বছরের পরবর্তী মাসে উক্ত গভর্নর কর্তৃক আয়োজিত নদীবক্ষে বিলাস-তরণীতে আনন্দানুষ্ঠানের বর্ণনার দ্বারা আত্মচরিতে সমাপ্তির রেখা টানা হয়েছে। তিনি জীবিত ছিলেন আরো চব্বিশ বছর; তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ সালে। আত্মচরিতের প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)।

আত্মচরিতের রচনা দেওঘরে অসুস্থ শরীরে অবসর জীবন যাপন করবার সময়েই। রাজনারায়ণ জীবনের কথা বলে যেতেন, আর তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তা অনুলেখন করতেন; এইভাবেই 'আত্মচরিত' লিপিবদ্ধ হয়েছিল। রাজনারায়ণের ডায়ারিতেই এর উল্লেখ আছে।[১]

১. ডায়ারিতে আত্মচরিত রচনার তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে, শনিবার (১২৯৬ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৯ খ্রী), রাজনারায়ণ লিখেছেন; "অদ্য প্রাতে আমি বলিয়া যায় তদনুসারে রাজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী লিখেন।" তারপর ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে থেকে অনিয়মিতভাবে লেখা চলতে থাকে ২০ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট— মাত্র তিনমাস। ডায়ারিতে এরপর আত্মচরিত রচনার উল্লেখ আর পাওয়া যায় না।

আত্মচরিতে বর্ণিত রাজনারায়ণের নির্দিষ্ট জীবনকাল এবং আত্মচরিত রচনাকালে তাঁর বয়ঃসীমা এই দুয়ের দুস্তর ব্যবধানের কথা আগেই বলা হয়েছে। দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করে এসে অতীতের দিকে তিনি ফিরে তাকিয়েছেন। তাঁর সে দৃষ্টিতে ছিল আবেগহীনতা। বিগত জীবনের কৃত, অকৃত, কর্তব্য, অকর্তব্য, ভালো মন্দ— সব-কিছুরই যথাযথ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। মিথ্যা প্রশংসার আশায় জীবনের অসংযত কর্মের কথা গোপন করার চেষ্টা তিনি বিন্দুমাত্রও করেন নি। জীবনে যা তিনি দেখেছেন, কালের বিচিত্র গতিতে যা ঘটেছে, তদুপরি কত মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতা— এই সবই দীর্ঘদিন সঞ্চিত ছিল তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায়। বোধকরি কর্মজীবনের কোলাহলের মধ্যে স্মৃতির বন্ধদুয়ার অর্গলমুক্ত করে অভিজ্ঞতার রসসমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সন্তরণ করবার অবসর তাঁর হয় নি। তাই জীবনের দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পর প্রশান্ত, অচঞ্চল মনে স্তূপীকৃত সেই পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেছিলেন সুদূরে, নির্জনে। রাজনারায়ণের আত্মচরিতের মূল্য এখানেই—'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা।')

('আত্মচরিতে'র তিনটি বিভাগ— জন্ম ও বংশ-বৃত্তান্ত; শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা; এবং কর্মজীবন। প্রথম অংশে জন্ম-কাল-প্রসঙ্গ, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহীঠাকুরাণীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেশ কাল ও তাঁদের পরিবার পরিবেশের বর্ণনা এক-একটি আলেখ্যস্বরূপ হয়েছে।

'শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা' অংশে নিজ শিক্ষা-জীবনের সঙ্গে সেকালের কলকাতা-সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা করেছেন। ভাবাবেগে সত্যের অপলাপ কোথাও করেন নি, আত্মম্ভরিতাকেও প্রশ্রয় দেন নি।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ইতিবৃত্তের দিক্ থেকেও 'আত্মচরিতে'র মূল্য নিতান্ত কম নয়। উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের ভূমিকা, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মীরূপে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা, তাঁর রচনা থেকে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রেরণা, ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের অসংগতির দিকগুলি নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও রাজনারায়ণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, মেদিনীপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের রূপ প্রভৃতি বর্ণনাগুলি তাঁর ঘটনাবহুল জীবনধারা ও একই সঙ্গে যুগচিন্তা পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আত্মচরিত রচনার সঙ্গে তুলনা করলে বলা যেতে পারে এই 'আত্মচরিত'টি সাধারণ জীবনী-জাতীয় গ্রন্থ নয়, সাধারণ জীবনীসাহিত্যের মতো একটি বিশেষ সমাজপরিবেশে, জীবনে সংঘটিত ঘটনার বিবৃতিমাত্র দিয়েই তিনি আত্মকথা লেখেন নি, অথবা তিনি তাঁর সামাজিক বা কবিকর্মের কৈফিয়ৎ রচনাও করেন নি। মহর্ষির আত্ম-জীবনী তাঁর অন্তরস্থ আত্মার উদ্‌বোধনের ইতিহাস। এতে সমসাময়িক কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখই নয়, অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষধারাকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনী রচনার লক্ষ্য। বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীতে 'পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণমাত্র লিপিবদ্ধ আছে।' রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে তাঁর বাল্যকালের বিবরণ, চিত্র-ধর্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেই বর্ণিত। পরিণত বয়সে তিনি দূর থেকে স্মৃতিযোগে জীবনকে দেখেছিলেন ; এইখানে রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেখায় দ্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শিল্পী। কবিত্ববিকাশের দিকে লক্ষ রেখে শিল্পী নির্বাচন করেছিলেন ঘটনাকে। রাজনারায়ণ সেরূপ করেন নি। তিনিও স্মৃতিযোগে জীবনকে দেখেছেন, কিন্তু রচনা করেছেন 'চরিত'। একটি ব্যক্তিচরিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, পরিবেশ একটি ব্যক্তির আত্মাকে কিরূপ প্রভাবিত করে এবং সেই আত্মা আত্মশক্তিতে নির্ভর ক'রে একটি ব্যক্তি-আত্মাকে প্রভাবিত ক'রে থাকে এবং সেই আত্মা কিভাবে নিজের ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট চরিত্রে রূপান্তরিত হয়, রাজনারায়ণ তাঁর নিজের কাহিনী বর্ণনায় সেই আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্যেই আত্মচরিতখানি সাধারণ জীবনীগ্রন্থের তুলনায় স্বতন্ত্র। নিজ জীবনের দর্পণের মধ্যে তিনি অপূর্ব কৌশলে প্রতিফলিত করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালের সমগ্র বাংলাদেশের জীবনচিত্রকে। তৎকালীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক চিন্তা, দার্শনিক উপলব্ধি এবং সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, এমন কোনো বিষয় নেই— যা লেখক নিজের জীবনকথার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেন নি। তৎকালীন শিক্ষিতসমাজের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কালংকার প্রভৃতি

অন্যতম) প্রসঙ্গ আত্মচরিতে স্থান পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকের মতো নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি যুগ-জীবনের পরিচয় ও তাৎপর্য 'আত্মচরিত' গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবু ইতিহাস-কথার শুষ্কতা ও তথ্যনির্ভরতা এখানে প্রকাশিত হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনচাঞ্চল্য ব্যক্তিহৃদয়ে যে স্পন্দন জাগিয়েছিল তারও পরিচয় আত্মচরিতের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে অনুভব করা যায়। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা, দার্শনিকের প্রজ্ঞা, ধার্মিকের বিশ্বাস এবং সাহিত্যিকের রসোপলব্ধি আত্মচরিতের মধ্যে একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষক যেমন উনিশ শতকের মধ্যভাগকে পর্যালোচনা করবার জন্য আত্মচরিতের শরণাপন্ন হতে পারেন, তেমনি রসলিপ্সু পাঠক ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আলোকে উদ্ভাসিত শিক্ষিত বাঙালীর মনস্তত্ত্বের রহস্যভেদের আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত করতে পারেন। তিনি যেন একখানি সুচিত্রিত, বাঁধাই করা আলেখ্যে সমসাময়িক নব্য বাঙালীর বাস্তব চিত্র রেখে গেছেন। তাতে যুগের দর্শনও ঘটে, যুগদ্রষ্টার স্বরূপ সন্ধানও হয়। তথ্য-তাৎপর্যের বিচারে এবং রসানুকূলতার মানদণ্ডে রাজনারায়ণের আত্মচরিত তৎকালোপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ।

রাজনারায়ণের পরিণত বয়সের লেখনী জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেদ-উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে প্রমত্ত হয় নি। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় হালকা রসের প্রবন্ধ রচনায় আগ্রহশীল হয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। একটি রচনার নাম "জীবন-প্রান্তোপনীতের জীবন"—১২৯৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নামকরণেই লেখকের বক্তব্যের তাৎপর্য পরিস্ফুট। জীবনপ্রান্তে উপনীত হয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে রাজনারায়ন পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। বিগতকালের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, ভাবীকালকে "অস্পষ্ট দৃশ্য অপচ্ছায়া" বলে পরিহার করেছেন, বর্তমানকে "প্রবঞ্চক" জ্ঞান করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন : "… না বলিতে বলিতে অতীত হইয়া যায়।" অতীতচারী রাজনারায়ণ ফিরে যেতে চেয়েছেন শৈশবজীবনে— "সর্ব্বদা বাল্যকালের জন্য এবং পুনরায় বালক হইবার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি।"

> "Oh ! would I were a boy again,
> When life seemed formed of Sunny years."

তিনি আরো বলেছেন : "বাল্যকালে প্রভাকর যেমন দেখাইত তেমন আর

দেখায় না, সুধাকর যেমন সুধাময় ঠেকিত তেমন আর ঠেকে না, বায়ু যেমন সে সময় গায়ে মধু ঢালিত সেরূপ আর ঢালে না,··· বর্ত্তমান কিছুই আর ভাল লাগে না।" অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে'র একাকীত্বের বেদনা স্মরণ করায়।

বর্তমানের প্রতি বীতরাগবশতই লেখক সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন :

"চল্লিশ বৎসরের নীচের লোকের সহিত আর বাক্যালাপ মাত্র করিব না।"

"বাল্যকালে যে বাটীর যে ঘরে অধিকাংশ সময় কাটাইয়া ছিলাম, সেই ঘরে সর্ব্বদা থাকিব।"

"··· চল্লিশ বৎসরের বয়ঃক্রমের আগে লোকে আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহাই কেবল রাখিয়া দিব ···।"

"চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের আগে··· যে সকল পুস্তক পড়িয়াছিলাম তাহাই কেবল পুনঃ পুনঃ পড়িব ···।"

জীবনপ্রান্তে উপনীত লেখক এই প্রবন্ধে জীবনের গভীর মর্মকথা প্রকাশ করেছেন কৌতুকচ্ছলে—"আমি আমাদের দেশের সমস্ত বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে একটী কলেজের ছাত্র জ্ঞান করি। সেই কলেজের নাম বৃদ্ধ মানুষের কলেজ।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৮১৬ শক) পর পর প্রকাশিত হয়েছিল রাজনারায়ণের দুটি প্রবন্ধ "গোলাপ পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার্চ্চনা" এবং "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোক্তি"। রাজনারায়ণের ভক্তিভাববিহ্বল চিত্তের কবিত্বময় প্রকাশ উক্ত প্রবন্ধদুটিতে বিদ্যমান। একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মনোহারিণী সৌন্দর্য দর্শনে রাজনারায়ণের ভাবতন্ময় হৃদয় মুহূর্তের জন্য বাস্তব জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে অন্তরের অনুভূতিতে গোলাপকে কত বিভিন্ন রূপে দেখেছে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এই ছোটো প্রবন্ধটি রাজনারায়ণের ভাবকবিত্বময়তার একটি উজ্জ্বল মুক্তাস্বরূপ। দার্শনিকের মনীষা ও কবির সূক্ষ্ম সুকুমার কল্পনার কিরূপ স্ফুরণ হয়েছে এখানে তার দৃষ্টান্তরূপে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল : "হে গোলাপ! পরম সাধিকা তুমি, তুমি আমার আগে আগে চলিয়া সেই প্রেমময়ের নিকট আমাকে লইয়া যাও। তোমাকে যেমন আমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছি কবে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যকে, সেই জ্যোতির জ্যোতিকে, সেইরূপ দেখিতে পাইব! সেই দিনের জন্য আমি ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছি।" রাজনারায়ণের সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমের আবেগ সুফী মরমীয়া সাধকদের অনুরূপ। রুমি ও

হাফেজের কবিতা তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। সুতরাং এই দুইজন কবির বাগ্‌ভঙ্গী ও হৃদয়াবেগ অনুক্রমিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। গোলাপ হিন্দু-সংস্কারে অভারতীয় পুষ্পরূপে পূজার্চনায় ব্যবহৃত হয় না। গোলাপকে হিন্দু-কবিরা বিলাসের উপকরণ বলে গণ্য করতেন; কিন্তু সুফী কবিদের কাছে এই গোলাপ ছিল ঈশ্বর-প্রেমিকের মনের মতো সুন্দর ও পবিত্র। বুলবুল পাখির অতি প্রিয় এই ফুলটিকে প্রণয়ীর প্রেমাকুল চিত্তের সঙ্গে তুলনা করে সুফী সাধকেরা খুশি হতেন; এবং সেইসঙ্গে আকাশে চাঁদের সৌন্দর্যকেও পরম সুন্দর ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে গণ্য করতেন। রাজনারায়ণের কবিত্বপূর্ণ এই দুইটি রচনার মধ্যে গোলাপ ও চাঁদের প্রসঙ্গ প্রেমিক কবি সুফী সাধকদের স্মরণ করায়।

"ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোক্তি" প্রবন্ধটিতে রাজনারায়ণের ভক্তিভাবের প্রকাশ। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ এবং ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী (Immanent) এবং বহির্বর্তী (Transcendent)— বিশ্বজগতে ঈশ্বরের এই অভিব্যক্তির বর্ণনা করেছেন রাজনারায়ণ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়। জ্ঞানময় ঈশ্বরের সাধনা তিনি করেন নি— প্রেমময়, সৌন্দর্যময়কে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। বৈষ্ণবেরা যেমন সূক্ষ্ম ও মধুরভাবের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে গণ্য করেন, রাজনারায়ণের সাধনায়ও তারই ইঙ্গিত: "সমস্ত জীবন তোমাকে হৃদয়-মন্দিরে রাখিয়া তোমাকে যত্নে পূজা করিব। তোমাকে প্রণয়-অঞ্জলি দিব, তোমাকে প্রণয় আরতি করিব, প্রেমের চামর লইয়া তোমাকে বীজন করিব।" ভগবানকে 'প্রিয়তম' সম্বোধন করে তিনি বলেছেন: "তুমি আমার সখা। তুমি আমার আত্মার আত্মা। এমন নিকটতম প্রিয়তম আর কে আছে?···তাই বলি হে প্রিয়তম! এসো,··· প্রেমময়। প্রেমের ডোরে সুদৃঢ় বন্ধনে আমাকে বাঁধো।" সুফী কবিতায় নায়িকার মুখে যে ভাষা, বৈষ্ণব কাব্যে রাধার যে আকূতি— রাজনারায়ণের এই প্রবন্ধেও সেই ভাষারই মূর্ছনা শোনা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধ এই মনীষীর অন্তরের অন্তস্তলে প্রেম ও ভক্তির যে অফুরন্ত নির্ঝর লুকিয়েছিল এই প্রবন্ধগুলি তারই উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর জন্মভূমি বোড়াল গ্রামের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় দিনগুলির বর্ণনা করেছেন 'গ্রাম্য উপাখ্যানে'। "সূচনা", "বাদল গ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ", "গ্রামবাসীদের পরিচয়" ও "বহুদিবস পরে পৈতৃক বাটী দেখিয়া রামনারায়ণ বাবুর মনের ভাবোচ্ছ্বাস"— এই চারটি অংশে বিভক্ত 'গ্রাম্য উপাখ্যান' একটি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়

রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর ; কিন্তু তার বহু পূর্বেই ১২৯০ সালে যোগীন্দ্রনাথ বসু (রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র)-সম্পাদিত 'সুরভি' পত্রিকায় রচনাটির প্রথম প্রকাশ।

উক্ত পুস্তকে রাজনারায়ণ লিখেছেন তাঁর গ্রামের কথা। যে গ্রামে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, যে গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিলেন বহু বছর আগে ; কিন্তু তার স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেন নি— এই-সমস্ত বিবরণ থাকলেও গ্রন্থখানি ইতিহাস নয়, পুরাবৃত্ত নয়, জীবনচরিতও নয় ; গ্রন্থখানি একটি উপাখ্যান।

সাধারণ প্রাবন্ধিক রীতিতে এটি রচিত নয়, এতে রীতিমত গল্প বলার ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। লেখক এখানে নিজেই বলেছেন যে সাদা কথার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'ছেঁদো কথা', যে কথা থেকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে মূল বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ফরাসী রাজনীতিবিদ টেলি রাঁ মন্তব্য করেছেন, ভাষার কারুকলা শুধু মনের ভাব গোপন করবার জন্য। রাজনারায়ণ মনের ভাব ঠিক গোপন করতে নয়, একটু রহস্যের আবরণ দিয়ে ব্যঞ্জিত করবার জন্য ছেঁদো কথা অর্থাৎ রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাই গ্রামের বোড়াল নামের স্থলে হয়েছে 'বাদল', নন্দকিশোর হয়েছেন 'আনন্দকিশোর', আর লেখক নিজে হয়েছেন 'রামনারায়ণ'। এরকম আরো অনেক চরিত্র ও ঘটনাকে নামের রকমফের করে তিনি উপাখ্যানের অবাস্তবতার রহস্য সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য অর্থাৎ নিজের জন্মভূমিকে নিয়ে স্বপ্ন-কল্পনার ও স্মৃতিচারণার অপূর্ব আনন্দবেদনা রচনাটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সুস্পষ্ট-ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। গ্রামের পথঘাটের বিবরণ তিনি দিয়েছেন, ঐ গ্রামকে ঘিরে যে ঐতিহাসিক জনশ্রুতি রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন ; তাঁর পরিবারের ও গ্রামের মানুষগুলিরও যেন জীবন্ত রূপ লেখনী-তুলিকায় নিপুণ-ভাবে এঁকেছেন। বাদল গ্রামের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি তিনি অনুধ্যান করেছেন, বাল্যে দেখা দীঘিটি অনেক স্মৃতির সুরভিমণ্ডিত হয়ে তাঁর চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত ও একই সময়ে অনাড়ম্বর, সরল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি নির্মল কৌতুকের স্নিগ্ধ প্রলেপে বিবরণাত্মক তথ্যপ্রসঙ্গ রসরচনার মর্যাদা পেয়েছে। গ্রামের কথাকে উপাখ্যান-রসে নিষিক্ত করে রাজনারায়ণ রহস্যময় পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছেন।

'গ্রাম্য-উপাখ্যানে' মোট পনেরোটি চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। বর্ণনায় একটা বিশেষত্ব সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্রগুলির কোনোটি

ছাঁচে ঢালা নয়, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমাজেই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে'র মধ্যে চরিত্র-বর্ণনায় অ্যাডিসন ও স্টীলের প্রভাব সুস্পষ্ট। চরিত্রগুলি আকর্ষণীয় হলেও, অনেকটা কৃত্রিম। কিন্তু গ্রাম্য-উপাখ্যানের আনাচে-কানাচে রামসুন্দর-শুকদেবের দল যে ঘোরাফেরা করেছেন, তাঁদের প্রতিফলন অনেকটাই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা -প্রসূত। রাজনারায়ণ ঔপন্যাসিক ছিলেন না, কিন্তু বাস্তবধর্মী উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের কৌশলটি তাঁর আয়ত্তে ছিল। 'গ্রাম্য-উপাখ্যান' তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চরিত্রালোচনার তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই শিরোনামায় লেখক একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন: 'Come like shadows so depart.' ("ছায়াসম এস ছায়াসম যাও")। পুরনোদিনের সেই বিচিত্র মানুষগুলি যাদের তিনি দেখেছেন অথবা প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের কাছে যাদের বিবরণ শুনেছেন— তাঁর মনোদর্পণে চলমান চিত্রপরম্পরার মতো প্রতিফলিত হয়েছে সেই চরিত্রগুলি; সেই চিত্রপরম্পরায় তৎকালীন সমাজ পরিবেশেরও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। দয়ারাম বসুর জীবনকথা তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত; আরো ভালো দৃষ্টান্ত ঘোষ-পরিবারের বিবরণ। দয়ারাম বসু দেওয়ানি করতেন, ইংরেজ-আমলের দেওয়ানিগিরি কী জাতীয় চাকরি তাতে যে "তাহারা বিলক্ষণ একহাত মারিতেন", এ-বিষয়টি বেশ বোঝা যায় রাজনারায়ণের বিবরণ থেকে। তিনি বসু-বংশের দয়ারাম বসুর জীবনকথার সঙ্গে শুনেছিলেন দেওয়ানির জাঁকজমক, চূড়ান্ত অমিতব্যয়িতা ও বিলাসপ্রবণতা; আর নয়ানচাঁদ বসুকেও এই বংশেরই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই লেখকের মনে ভেসে উঠেছিল একটা যুগচিত্র। দয়ারাম ও নয়ানচাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর রাজনারায়ণের মন্তব্যটি চমৎকার: "দয়ারাম বসুর বংশোদ্ভব ব্যক্তি কেরাণীগিরি করিবেন ইহা অসম্ভব। কোথায় সাত ভাই দেওয়ান, কোথায় মাথায় ফ্যাটা বাঁধিয়া আফিস মাস্টার সাহেবের লাথি খাওয়া। পৃথিবীর গতিকই এইরূপ!" ঘোষ বংশের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতেই একদিকে যেমন সেকালের বর্ণাঢ্য চিত্র, অপর দিকে তেমনি একালের সমস্যাকণ্টকিত, আদর্শহীন মানুষের চিত্র। বাদল গ্রামের ঘোষ-পরিবারেরাও বংশানুক্রমে ঢাকায় দেওয়ানি করতেন, তদুপরি নরনারায়ণ ঘোষ লটারীতে লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল "রাধানাথ ঘোষজা মহাশয় তাঁহার পিতার বিষয় অপরিমিত ব্যয় দ্বারা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।" এই জাতীয় অনেকগুলি চিত্র সেকালের সমাজ-

ব্যবস্থা, পারিবারিক রীতিনীতি, সমাজের নৈতিক আদর্শ, নানা প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা রাজনারায়ণ বিচিত্র মানুষদের মেলা সৃষ্টি করেছেন। কথার জাল বুনে এই-সব মানুষদের এক-একটি সজীব, সুস্পষ্ট চিত্রাঙ্কণে রাজনারায়ণের কল্পনাবিলাসী শিল্পীসত্তার অদ্ভুত বিকাশ।

রাজনারায়ণের সাহিত্যরচনার ত্রিবিধ শক্তিসৌন্দর্য এই উপাখ্যানে সমন্বিত হয়েছে। 'গ্রাম্য উপাখ্যান'টির বিশেষত্ব এখানে। 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে'র চরিত্রাঙ্কণী শক্তি, আত্মচরিত গ্রন্থে প্রকাশিত জীবনের মর্মোদ্ঘাটনের শক্তি, এবং 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকের ঘটনাবর্ণনা ও তার উপস্থাপনা-শক্তি যেন একই সঙ্গে 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' সংহত রূপ পেয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রবর্ণনা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে লেখকের প্রগাঢ় উপলব্ধির ইঙ্গিত আছে। সমাজজীবনের মধ্য থেকে অসংখ্য খণ্ড চিত্রের অন্তরালে একটি অখণ্ড ঐক্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন জ্ঞানবান দার্শনিক এবং কল্পনারসিক কবি। গ্রাম্য-উপাখ্যানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এই সামগ্রিকতা লক্ষ করা যায়। ঘটনাগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রকৃত সত্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে প্রসঙ্গক্রমে নানা কৌতুকপূর্ণ গল্পের অবতারণার দ্বারা বিদগ্ধ পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি করেছেন রাজনারায়ণ। ঘটনাবর্ণনা অংশে লেখক অনেকটা ইতিহাসাশ্রয়ী, কিন্তু উপস্থাপনায় গল্পরসের কৌতূহল বজায় রেখেছেন। বাদল গ্রামের ঘোষেদের সঙ সাজার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ বৈদিক সঙ সেজে বালক হয়েছিলেন। কালী নামক একটি ছেলে মেয়ের সাজ পরে লোক ভুলিয়েছিল। এগুলি ঘটনা, কিন্তু লেখকের কল্পনা-প্রবণ, রসিকমনের স্পর্শে তা শুধু বিবৃতিমাত্র হয়ে থাকে নি, কৌতূহলকেও জাগ্রত করেছে।

'গ্রাম্য-উপাখ্যানে'র চরিত্রাংশ, কাহিনী-অংশ এবং বর্ণনাকৌশল রাজ-নারায়ণের উচ্চতর প্রতিভার চিহ্ন বহন করে। তিনি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও অসাধারণত্ব আবিষ্কার করবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ঘোষবংশের বিবরণ দিতে গিয়ে তারাচাঁদ ঘোষকে অতি সাধারণ মানুষ বলেছেন। ক্যানিংহামের ভাষায়, এমন মানুষ যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং "Ate, Drank, and Slept, talked politics and died."—এইরূপ জীবনকে রাজনারায়ণ অসাধারণ বলেন নি। বরং 'বাজারিয়া' দলের নেতা শিবচন্দ্র ঘোষের মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব ছিল। লোকটি কৃশকায় কিন্তু অতিবুদ্ধিমান, অসাধারণ

শক্তিশালী, এবং পাপকর্মে অরুচি নেই। ইনি 'আইভানহো' উপন্যাসের পাদ্রীর মতো একাধারে যোগী ও লেঠেল। শিবচন্দ্রের এই অসাধারণত্ব আবিষ্কার করে লেখক বলেছেন, কোনো পুরাবৃত্তকার যে এদের অমরতা দিতে পারেন, এ কথা এরা কখনো কল্পনাও করে নি। কিন্তু গ্রাম্য উপাখ্যানে এরা ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে যে কত রহস্য লুকিয়ে থাকে রামনিধি ঘোষের চরিত্রচিত্রণ উপলক্ষে রাজনারায়ণ তার উল্লেখ করেছেন। বায়ুরোগের শারীরিক ও মানসিক কারণ দেখিয়েও তিনি এরই মধ্যে মানুষের প্রতিভার উদ্‌বোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান ও পাগলের সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে। রাজনারায়ণ কৌতুকছলে বায়ুরোগের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, উপলক্ষরূপে নিয়েছিলেন রামনিধি ঘোষের চরিত্র। গ্রাম্য উপাখ্যানে মিতব্যয়ী, অমিতব্যয়ী, সৎকর্মা, নিষ্কর্মা, কুকর্মা, বহুবিধ মানুষের চরিত্রবর্ণনাকে উপলক্ষ করে রাজনারায়ণের সূক্ষ্ম দৃষ্টির অবিস্মরণীয় প্রকাশ।

বাদল গ্রামের বসু বংশের পরিচয় প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণেরই বংশপরিচয়। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিবেশ রচনায় যেমন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রারম্ভিক বর্ণনা থাকে, শুকদেব বসুর চরিত্রবর্ণনা প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্বকাহিনীর আস্বাদরসের সেই বৈচিত্র্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ঘটনা-বর্ণনার কৌশলে। শুকদেব বসুর বৃত্তান্তটি উপস্থাপন করেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা প্রতিষ্ঠার ও বাদল গ্রামের অধিবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাসের পটভূমিকায়। অথচ এ তাঁর চাক্ষুষ ঘটনা নয়, শোনা কথামাত্র। বসুবংশের পূর্ব-পুরুষদের চরিত্রাঙ্কণে তিনি ঘটনা-বর্ণনার এমন কৌশল উদ্‌ভাবন করেছেন, যার দ্বারা নিজের অনুভূতির এবং মননশীলতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ঢাকায় চাকরি করতেন রামপ্রসাদ বসু। একসময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকাই কাপড়ের বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করতে চেয়েছিল। এই উপলক্ষে রাজনারায়ণ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের সর্বনাশের বেদনা প্রকাশ করেছেন; এবং নিজেদের বংশের পূর্বপুরুষ ইংরেজ জাতির অপকর্মের সহায়ক ছিল বলে লজ্জিত হয়েছেন, লজ্জাপনোদনের চেষ্টাও করেছেন: "তিনি [রামপ্রসাদ বসু] বেতনভুক্ত চাকর ছিলেন মাত্র, ঢাকাই বস্ত্র-বাণিজ্যনাশের কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না।" চরিত্র-চিত্রণ উপলক্ষে সমসাময়িক সামাজিক জীবনকে ঘটনার সহায়তায় ফুটিয়ে তোলার কৌশল শুধুমাত্র শিল্পীরই আয়ত্তাধীন। রাজনারায়ণের লেখনী

ছিল যথার্থ শিল্পীর। জ্যেষ্ঠতাত মধুসূদন ও খুল্লতাত হরিহর বসুর প্রসঙ্গ-উল্লেখে তিনি অনুরূপ শিল্পীসুলভ পরিচয় দিয়েছেন।

কমলাকান্ত সার্বভৌমের ত্যাগশীলতা ও পরোপকার-বৃত্তিতে তিনি সেকালের মানুষের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। একদল বাস্তুত্যাগীকে (এঁদের রাজনারায়ণ অভিহিত করেছেন 'পিলগ্রিম ফাদার্স' বলে) আশ্রয় দেবার জন্য ইনি নিজের বসতবাটী দান করেছিলেন। কমলাকান্ত এই কারণেই লেখকের অপরিসীম শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছেন। ধর্মরক্ষার জন্য যারা "সকল বস্তুর অপেক্ষা প্রিয়, নিজের বাস্তুভূমি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ধর্মবীর বলিয়া গণ্য হইবেন না ?"— এই-ই ছিল রাজনারায়ণের জিজ্ঞাসা। বৈদ্যনাথ সার্বভৌম ও রামনিধি তর্কবাগীশের বর্ণনায় সেকালের সমাজের অধ্যয়নস্পৃহা ও জ্ঞান-গভীরতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। মূর্খের অহেতুক পাণ্ডিত্যপ্রকাশের হাস্যমধুর দৃষ্টান্ত ষষ্ঠী ন্যায়ালংকারের চরিত্র। ষষ্ঠী ন্যায়ালংকারের কথকতার স্বরূপকে লেখক ইতালীয় প্রবন্ধ Extravaganza-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। গল্পটির 'হনু'-প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যে 'হনুমদ্বাবু'— প্রসঙ্গটিকে স্মরণ করায়।

গ্রাম্য উপাখ্যানের সংযোজিত অথচ পৃথক অংশ হল পৈতৃক বাটী দর্শনে লেখকের ভাবোচ্ছ্বাসের বর্ণনা। গ্রাম পরিত্যাগের দীর্ঘদিন পরে পুনরায় গ্রামে এসে প্রতিটি বৃক্ষ, লতা-কুঞ্জের সঙ্গে তিনি গভীর আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন। ভক্ত, ধার্মিক, কবিপ্রাণ রাজনারায়ণ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে পরমানন্দের আস্বাদ লাভ করতেন। নিসর্গ সৌন্দর্যপ্রীতি ও তার ফলে ভাববিমুগ্ধ অবস্থা— তাঁর এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। গ্রামের তৎকালীন দুর্দশায় তাঁর মন বেদনায় বিগলিত হয়েছিল, অসংখ্য পূর্বকালীন স্মৃতি তাঁর মনকে করেছিল অভিভূত। তাঁর প্রবল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের কথা জানা যায় দুটি উল্লেখে। মোগল ও ইংরেজ কেউ বাংলা দেশের মিত্র নয়; কিন্তু এই অমিত্রেরাও বঙ্গভূমির প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্রাম্য উপাখ্যানের বিবরণ অংশ থেকে তা জানা যায়। মোগল সম্রাট ঔরংজেব বাংলাদেশকে 'জেন্নতল বোলাদ' অর্থাৎ "সকল দেশের স্বর্গভূমি" বলেছিলেন। ইংরেজ কবি বলেছিলেন: "Nature's— chiefest bounties fall to thy productive fields, Bengal"— রাজনারায়ণ এর অনুবাদ করেছিলেন একাবলী ছন্দে—

"প্রধানত বঙ্গ তব ক্ষেত্রপরে
প্রকৃতি দানিছে দান অকাতরে।"

ম্যালেরিয়া-জীর্ণ গ্রামগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের উচ্চতর জীবনাদর্শ এবং মহত্তর সংস্কৃতি যে বিনষ্ট করছে, বিদেশী শাসন ও যুরোপীয় সভ্যতা জাতির জীবনে যে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে তারও মর্মস্পর্শী বেদনা গ্রাম্য উপাখ্যানের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। সাহিত্য যদি রচয়িতার মনোদর্পণ হয় তা হলে রাজনারায়ণের চিত্তকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে গ্রাম্য-উপাখ্যান নামক রচনাটি নিঃসংশয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর কর্মময় দীর্ঘজীবনে সাহিত্যের সেবা করেছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবল অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। চিন্তামূলক মননশীল প্রবন্ধ রচনা ও ইতিহাসকথাকে সরস করে বলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই কাজের ফাঁকে তিনি তাঁর সংবেদনশীল কবি-মনের পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি কয়েকটি গান[১] রচনা করেছিলেন এবং জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষকে সম্বোধন করে ইংরেজী ভাষায় চারটি সুন্দর সনেট রচনা করেন। সংগীতগুলিতে ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ইংরেজী সনেটের গঠন নিখুঁত। অন্ত্যমিলের রীতি বজায় রেখে সুন্দর ভাষায় তিনি সনেট লিখেছেন :

"As Englishman and Hindu both are men
Though different clad. Religion true at end
Will win the fight, such forms need perish then.
But now let us all work, though slow yet sure.
As God Himself does work, to end secure."

এই রচনাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম বলে অভিনন্দিত করা না গেলেও এগুলি তাঁর মনের রসপ্রবণতারই স্বাক্ষর। সনেটগুলি 'আত্মচরিত' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

রাজনারায়ণের অপর একটি সার্থক কর্ম রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ-সম্পাদন। ১৭৯৫ থেকে ১৮০১ শকাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতবছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইনি রামমোহনের সমস্ত রচনা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে জাতির মহোপকার সাধন করেছেন। রাজনারায়ণের ছাত্র ঈশানচন্দ্র বসুর পরিকল্পনানুসারে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তায় তা সুসম্পন্ন করেন। বিজ্ঞাপনে আবেদন জানিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

---

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু অভিনন্দন পত্র রাজনারায়ণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল।[১]

সংকলন-গ্রন্থটির নাম ছিল 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি'। রামমোহনের বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে গিয়ে ভূমিকায় রাজনারায়ণ বলেছেন রামমোহনের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিলুপ্তির হাত থেকে রত্ন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজ করেছেন। 'কুলার্ণবতন্ত্রে'র মূল প্রকাশ করা এবং 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের কয়েকটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ করার প্রতিই তাঁর লক্ষ ছিল। ভূমিকায় রাজনারায়ণের মন্তব্যগুলিও উল্লেখযোগ্য। গদ্যভাষায় গঠনশিল্পের উদ্ভাবন সম্বন্ধে রামমোহনের দানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সাহিত্য-জগতের প্রভূত উপকার করেছেন। তাঁর এই সম্পাদনার কর্মটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ নেই।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য যে যুগে অনাদৃত সে যুগে ইংরেজীতে কৃতবিদ্য এক ব্যক্তি অসংখ্য কাজের মধ্যেও নীরবে সাহিত্যসেবা করে গেছেন— এ কথা ভাবলেও অবাক্ হতে হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দান অবিস্মরণীয়, সে-কথা সেকালেও স্বীকৃত হয়েছিল, একালেও স্বীকারযোগ্য। তাঁর দেহাবসানের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ষষ্ঠবার্ষিক কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল কৃতজ্ঞতার বাণী: "যখন বাংলা সাহিত্য কেবল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই সময় হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ঋণ বঙ্গদেশ কোনদিন পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

যুগ-পরিবেশে রাজনারায়ণের শিল্পীসত্তার বিকাশ হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রচারধর্মী। তবু তাঁর শিল্পবোধ ও রসজ্ঞান এত প্রখর ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তাঁর রচনাগুলি নিছক প্রচারের সীমায় আবদ্ধ থাকে নি। সমকালীন সাহিত্যে সেগুলি সমাদরে স্থান পাবার যোগ্য। বস্তুত এখানে তাঁর কর্মীসত্তার সঙ্গে শিল্পীসত্তার অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

রাজনারায়ণের জীবনকালে উনবিংশ শতাব্দীতে চল্লিশ বছরের উপর তাঁর

---

[১] অনেকে রাজনারায়ণের নিকট রামমোহনের গ্রন্থাবলীর জন্য অগ্রিম অর্থ প্রেরণ করেছিলেন। কেউ ইংরেজী গ্রন্থের আবেদন জানিয়েছিলেন, কেউ সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের, কেউ-বা উভয় ভাষার গ্রন্থাবলীরই দাবি করেছিলেন।

লেখনী সচল ছিল। ইংরেজী রচনা[1] দিয়ে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয় তত্ত্ববোধিনী যুগে (১৮৪৩ সাল থেকে তত্ত্ববোধিনী যুগের সূচনা)। ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রকাশমাধুর্য সমকালীন যে-কোনো উৎকৃষ্ট বিদেশী লেখকের সমতুল্য।

রাজনারায়ণের রচনারীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। তাঁর সমস্ত বাংলা রচনা সাধু গদ্যভাষায় রচিত। রচনারীতিতে সমসাময়িক-কালের চিন্তাধারার ও প্রয়োগরীতির ছাপ স্পষ্ট। কর্মী রাজনারায়ণের প্রাণচঞ্চল আবেগ যেমন তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আছে সাহিত্যিকের পরিশীলিত মনের পরিচয়। রাজনারায়ণ বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন মহর্ষির অনুরোধে ও প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রথম পর্বে (১৮৪৩-১৮৫৫)। তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য[2] রচনা ১৭৬৮ শকে। রচনার নিদর্শনস্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত হল: "কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। কোনস্থানে বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দ কর্ণ-কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যামবর্ণ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর স্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, যাদৃশ আমাদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়।"

এই ভাষা সংস্কৃতানুসারী হলেও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষার অভ্যুদয়লগ্নে রাজনারায়ণের আত্মপ্রকাশ। এক বছর পরে (১৮৪৭) বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ সশ্রদ্ধচিত্তে বিদ্যাসাগরের রচনাশিল্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' পুস্তকে (পৃ. ২৫): "বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থসকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।"

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠী থেকেই বাংলা গদ্য শিল্পের রূপান্তর চলেছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের

---

১. উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ।

২. একমেবাদ্বিতীয়ম্— রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, প্রথম ভাগ (১৭৮৩ শক); তৃতীয়বার সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত, পৃ. ৪-৫। বক্তৃতাটি কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়েছিল।

পর রামমোহনের সাধু গদ্যরীতি বিভিন্ন ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়েছে। বস্তুত রামমোহনের গদ্যরীতি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল হলেও, শব্দের পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না। রামমোহনের স্বল্পকাল পরে বিদ্যাসাগরের সাধুগদ্যরীতি অন্বয়গুণে সুখপাঠ্য হয়েছিল ও একইকালে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত সাধু গদ্যরীতি বহুচর্চিত ও বহু-পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যলেখকগণ উক্ত ভাষার প্রকাশভঙ্গীকে সর্ববিষয়ে ব্যবহারের উপযোগী করেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ধর্মবিষয়ক, জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক রচনার বাহন করেছিলেন বাংলা ভাষাকে। রামমোহন যার সূচনা করে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তা প্রবর্তন করলেন অধিকতর সুষ্ঠুরূপে। ভাষার ক্রমবিকাশ যে ধর্মের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে রাজনারায়ণ তা আলোচনা করে বলেছেন : "...এক একটি ধর্ম্ম ভাষার উন্নতি-সাধনের প্রতি-সামান্য প্রভাব প্রদর্শন করে নাই।"[১] ইংরেজী সাহিত্যে লুথর-প্রবর্তিত খ্রীস্টধর্ম, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম থেকে বৈষ্ণবধর্ম, এবং মুসলমানধর্ম দ্বারা ভাষার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যা-হোক, রাজনারায়ণ বাংলা ভাষার এই সর্ববিধ শক্তিকেই আপন প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সহজেই আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছিলেন। শিল্পবোধ ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে তাঁর প্রতিভা হয়েছিল সর্বব্যাপিনী।

রাজনারায়ণের রচনারীতিতে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অক্ষয়-কুমারের প্রচ্ছন্ন প্রভাব স্বীকার করে নিলেও এর বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এই বিশেষত্বগুলি আলোচনা করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা (তত্ত্ববোধিনী সভায় সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতা) ও অক্ষয়কুমারের একটি গদ্যগ্রন্থ 'ভূগোল' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের ভাষাভঙ্গীতে সংস্কৃতের অনুসরণ সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনার ছ'বছর পূর্বে রচিত দেবেন্দ্রনাথের ভাষা সেই তুলনায় সমাস ও অলংকারের বাহুল্যবর্জিত ; আবার দু বছরের মধ্যেই (১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতায়) তাঁর ভাষায় সাহিত্যিক গুণ ফুটে ওঠে। রাজনারায়ণ বাংলা গদ্য রচনাকালে দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর ভাষারীতিতে অক্ষয়কুমারের ভাষাভঙ্গী

১. 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', পৃ ৬৮

ও বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির অনুসরণ দেখা যায়। তাঁর প্রথম রচনার সরল বাগ্‌ভঙ্গীর সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম যুগের গদ্যরীতির অনুসরণ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে :

"এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীতি হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই— ক্ষমার আর পার নাই।" ('একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', পৃ. ৩) এবং "যদি কদাচিৎ কোন ঘোরান্ধরজনীতে তিনি নৌকারূঢ় থাকেন, যখন প্রবল পবনোত্থিত তরঙ্গ ভয়ানক শৃঙ্গযুক্ত হইয়া উঠে, এবং আকাশে মেঘ-সকল বিদ্যুৎকে বিদ্যোতন করত ভীষণ শব্দ করে, তখনও ...আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি কোন মতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।" (পৃ. ৭)

উদ্ধৃত রচনা দুটি মিশ্র ভাষায় লিখিত। এই ভাষায় যতিবিন্যাসের কৌশল বিদ্যাসাগরী রচনারীতির অনুরূপ। শব্দপ্রয়োগে তৎসম শব্দের (অবলোকন, দেদীপ্যমান, প্রতীতি, ঘোরান্ধরজনী, নৌকারূঢ়, পবনোত্থিত, শৃঙ্গযুক্ত, বিদ্যোতন ইত্যাদি) ব্যবহারাধিক্য। ক্রিয়াপদ (হইবেক, হয়েন) প্রয়োগে প্রাচীন সাধুভাষার রীতির অনুসরণ। ১৭৯০ শক পর্যন্ত রাজনারায়ণ-কর্তৃক লিখিত প্রায় সমস্ত বক্তৃতাদিতে (কলকাতা, এলাহাবাদ, মেদিনীপুর সমাজে প্রদত্ত) এই ভাষা-রীতির ব্যবহার দেখা যায় :

"প্রাতঃকালে শিশিরবিন্দু রূপ মুক্তামালাধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত ঊষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটিমাত্র তারারত্নধারিণী গোধূলির মধুর ম্লান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্তকালের নব পত্র, নবদ্রুম ও নব নব কলিকা জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"[১] ভাষা বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি -আশ্রয়ী। তবে তা প্রাঞ্জল এবং অলংকারের ব্যবহার সুন্দর, সহজ। এই বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি ও স্বকীয় রীতির বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (পৃ. ৮)। নিদর্শন : "যিনি দূর হইতে দিগন্ত-ব্যাপিনী কাদম্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মান নদনদী নির্ঝরের অক্ষয় আকর শৈলেন্দ্র সকল অবনীর মানদণ্ড স্বরূপ সংস্থাপন করিয়াছেন; যিনি প্রসারিত মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছেন অথচ তাহার

১. একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৯২ শক, পৃ. ১০৫-১০৬

সীমা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, যে সকল সীমা সে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না;" বাক্যগুলি সরল অথচ গম্ভীর। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও রচনা গুরুভার হয়ে ওঠে নি। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতাকে ভাষারীতির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলেছেন। রাজনারায়ণের ভাষারীতিতে আগাগোড়া স্পষ্টতার কোনো অভাব ছিল না। একই গ্রন্থ থেকে আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

"আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। আমরা জগৎ-পিতার আশ্রয়ে চিরকালই থাকিব।" সাধু গদ্যে লিখিত হলেও চলিত ভাষার আমেজ এতে আছে। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে লিখিত রাজনারায়ণের দীর্ঘ প্রবন্ধ— "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্তে"র ভাষারীতি সাধু। বাক্-পরিমিতি ও বর্ণনা-সংযমে রচনাটি পরিচ্ছন্ন। ক্রিয়াপদে কথ্য ও লেখ্য ভাষার সংমিশ্রণ যথেষ্ট রয়েছে। নিদর্শনস্বরূপ উক্ত প্রবন্ধের দুটি অংশ উদ্‌ধৃত হল :

"বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অত্যন্ত অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণীকে সর্ব্বদা ঘাঘরা পরাইয়া রাখেন, নব্যতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিরা বাটীতে যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন ও বেরোবার সময় যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেরোন, সেইরূপ অভয়বাবুও করিয়া থাকেন।" (পৃ. ৩০)

"...কিন্তু প্রায়ই ইহা ঘটে যে এতৎদেশীয় স্ত্রীলোকদিকের অথবা সঙ্গীতের অথবা কোন আমোদ প্রমোদের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে রসময়বাবু ব'সে ব'সে ঝিমোন।" (পৃ. ৪৫)

দুটি উদ্‌ধৃতিতেই সাধু গদ্য রীতির সঙ্গে ভাষার সহজ ও সরল ভঙ্গী লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে, যেমন :—'বেরোবার', 'বেরোন', 'ব'সে ব'সে', 'ঝিমোন' ইত্যাদি শব্দগুলি কথ্যভাষার। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সাধুগদ্যে লিখিত এই পুস্তকটিতে সর্বপ্রথম ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই জাতীয় রচনারীতির একমাত্র পথপ্রদর্শক-রূপে তাঁকে আমরা সাধুবাদ জানাই।[১] কিন্তু প্যারীচাঁদের সমসাময়িককালেই রাজনারায়ণও যে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তার প্রমাণ "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" প্রবন্ধটি। পরবর্তী সময়ে লিখিত আরো কয়েকটি প্রবন্ধে (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'সে কাল আর এ কাল', ১২৯০ বঙ্গাব্দে

১. কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। এটি কথ্যভাষার ঢঙে লেখা। অথচ দুই রীতির মিশ্রণ না থাকাতে ব্যাকরণগত শুদ্ধি দেখা যায়।

'সুরভি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গ্রাম্য উপাখ্যান') রাজনারায়ণ অনুরূপ মিশ্র ভাষা প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা রচনা-রীতিতে একমাত্র কথ্যভাষাকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের পূর্বসূরী প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাষারীতি আলালী ভাষায় এসে থামে নি। হুতোমী ভাষার রীতি তিনি গ্রহণ করেন নি কোনোদিন, বঙ্কিমের মতো লিখন-ভঙ্গীতে শিল্প-সৌকর্যও তিনি দান করতে পারেন নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় যখন আলালী ও হুতোমী ভাষার ব্যবহার খুব বেশি, যখন বঙ্কিমী যুগের পরিপক্কতা আসে নি, রাজনারায়ণের তখনকার ভাষা বঙ্কিমের সমকক্ষ না হলেও, ভাষা শিল্পোৎকর্ষের পূর্বাভাষ দেয়। উদাহরণ স্বরূপ 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তক, 'জেঠামো' ও 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন' প্রবন্ধ—এই তিনটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সরস ভঙ্গীতে লেখা 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে বর্ণিত সমাজের এক-একটি চিত্র বর্ণনাগুণে ও প্রকাশ-মাধুর্যে এক-একটি স্থিরচিত্রের রূপ পেয়েছে। ভাষাশিল্পে চিত্রধর্মের নৈপুণ্য পরিস্ফুট। প্রকাশভঙ্গী সরল, সহজ, সরস। মিশ্র ক্রিয়াপদের অজস্র ব্যবহার। এই ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখাবার জন্য দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

"এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে…।"

"তাঁহারা দিব্য করে প্রফুল্লচিত্তে পিড়ি ঠেস দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকিতেন।"

'সে কাল আর এ কাল' পুস্তক থেকে মিশ্র ক্রিয়াপদের উদাহরণস্বরূপ এই-রূপ একাধিক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। রাজনারায়ণ বাংলাসাহিত্যে এই মিশ্রভাষা ব্যবহারের পথ-প্রদর্শকরূপে সাধুবাদ জানিয়েছেন বঙ্কিমকে।

'জেঠামো' প্রবন্ধ সাধুভাষায় লেখা হলেও চলিত ভাষার আমেজে ও স্বচ্ছন্দগতিতে শ্রুতিসুখকর ও ব্যঙ্গাত্মক হয়েছে :

"কোন কোন জেঠা বক্তা নম্রতার ভাণ করিয়া বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে, "যদ্যপিও এই বিষয় বলা আমার ক্ষমতার অতীত তথাপি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ইহা খুড়ামির আকারে জেঠামো।"

বাংলাভাষা রীতিতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের পর রাজনারায়ণ সাহিত্যে উক্ত ভাষার কথ্যরীতির আগমনকে অনেক সহজ করেছিলেন। ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত ছোটে ছোটো বাক্যগুলি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন :

"তাহার পরদিন ভারি ঝড়। সমস্ত নৌকা তীরে বদ্ধ। পাটুলী হইতে পলতা পর্য্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরবেগে ছুটিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদের বোট।"

বাংলাভাষার রচনারীতি সম্পর্কে রাজনারায়ণের বরাবরই চিন্তা ও সংশয় ছিল। তাঁর বক্তব্যে মনের ভাব ফুটে উঠেছে : "পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষারও ভাগ্য সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না।...বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন।"[১] বিষয়ানুসারে ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে, আর শ্লেষাত্মক গদ্য কাব্য, কিম্বা হাস্যকর উপন্যাস কিম্বা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে।"[২] তিনি যে কিরূপ শিল্পজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, ভাষা-প্রয়োগ আর বাক্যবিন্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। হাস্যরসাত্মক লঘু রচনাগুলিতে লঘুভঙ্গীর বাক্‌রীতি ববহার করেছেন। প্রয়োজনবোধে তিনি আবেগবহুল, পল্লবিত ভাষা-রীতি অনুসরণ করেছেন। আবার কোথাও আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে বক্তব্যের বাঁধুনীতে আয়ত্তে রেখেছিলেন। ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব আলোচনার ভাষায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে লালিত্যের সঞ্চার করেছেন। গল্পরসে নিষিক্ত করে তিনি উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। ভাষাপ্রকাশে তাঁর ছিল বিস্ময়কর নমনীয়তা গুণ (flexibility)।

কয়েকটি দৃষ্টান্তে রাজনারায়ণের বিষয়ানুসারী ভাষাভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় :

ঈশ্বরভক্তির প্রকাশ : "হে পরমাত্মন্। কি দুঃখের বিষয়! অমৃতসাগরে বেষ্টিত আছি, অথচ অমৃত পান করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি বিড়ম্বনা! তুমি ভিন্ন কে এই বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত করিবে? তুমি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি করিলে

১. 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', পৃ. ৭১

২. তদেব, পৃ. ২৭

তোমার অমৃত-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইব, নিত্য পূর্ণানন্দ উপভোগে সক্ষম হইব।"[১]

প্রার্থনার ভাষাপ্রকাশে হৃদয়ের গভীর আকুতির প্রকাশ : "হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তিসমুদ্র! হে নিবিড় আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের একমাত্র আধার! তোমার প্রতি আমাদিগের মনকে আকর্ষণ কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর।"[২]

. রাজনারায়ণের রচনারীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য ভাষায় অলংকারপ্রয়োগে পরিমিতিবোধ। প্রায় অলংকারবর্জিতরূপেই তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ গতিশীল হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ছোটো ছোটো উপমা প্রয়োগে ভাষা ভাবের অনুকূল হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"ঝটিকার সময় যেমন গৃহ, শীতের সময় যেমন উষ্ণ পরিচ্ছদ, সেইরূপ দুঃখ-দারিদ্র্যের সময় ঈশ্বর। দরিদ্রতা সর্পের ন্যায় কুৎসিত কিন্তু উহা নিজ মস্তকে একটি অমূল্য মণি ধারণ করে।"

রাজনারায়ণের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতো। তদ্ভব, তৎসম ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দকে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে, অন্য শব্দ ব্যবহারে ভাব তেমন পরিস্ফুট হত না। যেমন, মাজাঘষা, চাঁচাছোলা, ঠকাঠকি, গুজরাণ ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগ বিরল নয়।

রাজনারায়ণের রচনারীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশ্রব্ধতা গুণ (Intimate style)। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় (কমলাকান্তের দপ্তরে) এই গুণের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিম-পূর্বকালেও রাজনারায়ণের রচনায় এর সমধিক বিকাশ ঘটেছিল। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় এর সূচনা। সাহিত্যে প্রকাশিত এই গুণের দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার যেন সম্মুখ-সম্মিলন হয়, রাজনারায়ণের আত্মচরিতে সংযোজিত 'চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ'-বৃত্তান্তটি এইরূপ বিশ্রব্ধ রীতিতে রচিত :

"১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন

১. একমেবাদ্বিতীয়ম্। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৯২ শক, পৃ. ৪

২. তদেব, পৃ. ৯৪

একদিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার 'লোটাস' ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটি বঙ্গদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে।" বর্ণনার এই সূচনায় লেখক যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি যখন গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখছেন এবং তার বর্ণনা করেছেন তখন লেখকের সঙ্গে পাঠকও সেই দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচর করতে পারেন।

রাজনারায়ণের 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'সে কাল আর এ কাল', 'জীবন প্রান্তোপনীতের জীবন' প্রভৃতি প্রত্যেকটি রচনায় তিনি নিজেকে এমন প্রতিফলিত করেছেন যে, পাঠকের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সহজেই গড়ে উঠেছে।

রাজনারায়ণের অনেক রচনায় নাটকীয় সংলাপমাধুর্য ও নাট্যক্রিয়া বর্তমান। কোনো নাটকে সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যক্রিয়া বোঝানো যায়। কিন্তু রাজনারায়ণের কোনো কোনো প্রবন্ধে একই আধারে মিশেছে সংলাপ, ক্রিয়া ও বর্ণনা। ভাষার এই জাদুশক্তি লক্ষ্য করা যায় প্রধানত তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে : "এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন বিষম বিপদ। ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি ? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই ?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল ; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে ?" (পৃ. ১০৭১)

লঘু-বিষয়, স্থূল-রুচি এবং ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক অগ্রগতি একসময় ব্যাহত হয়েছিল। রাজনারায়ণ তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে দেশের গ্রন্থকারদের আবেদন জানিয়েছিলেন গুরুগম্ভীর বিষয় অবলম্বনে স্বাধীন রচনার জন্য। বোধকরি এই কারণেই সমাজ ও যুগের পরিবেশানুযায়ীই তাঁর রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

উত্তরকালের সাহিত্যিকদের জন্য তিনি ভাব ও ভাষা-রূপ ফসল ফলাবার জমি নির্বাচন করে গেছেন, উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার অবসর তাঁর হয় নি। সুস্থ শরীরে আরো কয়েক বছর জীবিত থাকলে তাঁর মনোকর্ষণজাত জমির ফসল হয়তো আমরা পেতাম। বঙ্কিম-পরবর্তীযুগের লেখকগণ ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকবৃন্দ সেই জমিতেই উত্তম ফসল ফলিয়েছেন।

রাজনারায়ণ ও শিক্ষিত সমাজ

রাজনারায়ণের সমগ্র জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বহু বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে— যার দ্বারা তাঁর পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, ধর্মপ্রাণতা, স্বদেশচিন্তা, সর্বোপরি স্নেহ-প্রেমপূর্ণ একটি অখণ্ড মানবিক রূপ প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। অবশিষ্ট থাকে আর-একটি বিশেষণ— রাজনারায়ণ ছিলেন মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ভক্তি, করুণা, বিনয়, নম্রতা, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মানবচরিত্রের সমস্ত গুণাবলী রাজ-নারায়ণের চরিত্রে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। এ সম্ভব হয়েছিল তাঁর একান্ত ঈশ্বরানুগত্যের জন্য।

ঈশ্বরে এরূপ নিবেদিতচিত্ত ব্যক্তি বিরল। ডায়ারিতে তিনি নিজের কথা লিখেছেন : "আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাতে বলি "ভীরুরা যেমন প্রার্থনা করে মা নস্তোকে তনয়ে মা নো আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষ (শ্বেতাশ্বতর, ৪।২২) সেরূপ প্রার্থনা করিব না। আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করিব 'তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।' যদি আগামী বর্ষে দারুণ দরিদ্রতাতে ফেল তাতেও রাজি, যদি তনয় তনয়া কাড়িয়া লও তাতেও রাজি"।"— ১২৯৪ সালের ১ বৈশাখ, বুধবার ১৩ এপ্রিল (১৮৮৭), রবিবারের দিনলিপি। এ-সমস্ত ছাড়া মাঝে মাঝে তাঁর মনে যে-সব ভাবের[১] উদয় হত, তার দ্বারা তাঁর আত্মপরিচয় পূর্ণরূপে পাওয়া

---

১. ১২৯২ সালের ২ আষাঢ়, ১৫ জুন, (১৮৮৫ খ্রী) সোমবার ডায়ারিতে লিখেছেন : "...এই কয়েকদিন আমার মনে এই সকল ভাব উদিত হইতেছে—

১ সুখের পথ সহজ। সাংসারিক দুঃখ বিষাদকে তুচ্ছ করিলেই সুখ আপনা হইতে মনে উদিত হয় যেহেতু আনন্দ আমার স্বাভাবিক লক্ষণ।

২ গতানুশোচনার অভাব, বর্তমানের প্রতি সন্তোষ ও ভবিষ্যতের নিমিত্ত উদ্বেগের অভাব সুখের কারণ।

৩ ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা প্রভূত। "আনন্দ হউক" "আনন্দ হউক" এমত ইচ্ছা খুব করিলে আপনা হইতে আনন্দের উদয় হয়। "আনন্দ হচ্চে" "আনন্দ হচ্চে" বলিলেই আনন্দ না থাকিলেও আপনা হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়। আমি অর্থাৎ আমরা সাংসারিক সুখ-দুঃখের উপরস্থিত এমত মনে করিলেই দুঃখের লাঘব হয় এবং সুখের উদয় হয়।

যায়। তাঁর হৃদয় যে কিরূপ অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ থাকত এবং তিনি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় ছিলেন তা এই থেকেই অনুমিত হয়। ধর্মবিষয়ে কথোপকথন-কালে কেউ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে দোষ ধরলে রাজনারায়ণ তাকে উপহাস করে বলতেন: "...সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা এবং সৃষ্টি সময়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা ঈশ্বরের উচিত ছিল।"[১]

ধর্মের জন্য কষ্ট স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ রাজনারায়ণ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। তিনি জীবনব্যাপী ক্ষুদ্র-তুচ্ছ, ভালো-মন্দ সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে গেছেন মঙ্গলময় ঈশ্বরের আদিষ্ট পরম পবিত্র কর্ম জ্ঞানে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রতি অবহেলা ও কর্তব্যবিমুখতা তিনি কখনো প্রদর্শন করেন নি। তিনি মনে করতেন এইরূপ ধর্মজীবনের ভিত্তিতে মানুষের সংসার-জীবন গঠিত হলে, তা হবে সহজ, সুন্দর, শুভফলদায়ক। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজে কতটা আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছেন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ঈশ্বরো-পাসনার সঙ্গে এই চিন্তাতেও রাজনারায়ণ মগ্ন হতেন। ঈশ্বরসৃষ্ট জগতে কর্মের দ্বারাই কর্মফল প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস। ভারতীয় সাধনারও এই-ই মর্মকথা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। তাই রাজনারায়ণের কাছে গীতার মাহাত্ম্যকথা এত মূল্যবান ছিল; গীতাপাঠ ছিল তাঁর নিত্যকর্মের অন্যতম।[২] গীতার 'কেবলাত্মা' কথাটি শেষ জীবনে তাঁর মুখে সর্বদাই শোনা যেত। যদিচ তিনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু কোনোরকম সংস্কার, বা গোঁড়ামী তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে নি। দেওঘরে থাকাকালীন সন্ধ্যাবেলা কথকতা পাঠ তিনি সাগ্রহে শুনতেন। ধ্রুবচরিত্রমাহাত্ম্য, জড়ভরত উপাখ্যান— এই-সব বিষয়ের মধ্যে যেখানে ঈশ্বরভক্তির প্রসঙ্গ করুণরসাভিষিক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেই-সমস্ত বিষয় তাঁর

---

৪ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা গাঢ় কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান— (এমন কি বৃক্ষ-পত্রের জন্য) হরিতবর্ণ ও বায়ুর হিল্লোলাদি সামান্য পদার্থ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর সুখের একমাত্র কারণ।

৫ ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর।"

১. ১২৯৫ সালের ২০ আষাঢ়: ৩ জুলাই (১৮৮৮ খ্রী), মঙ্গলবারের দিনলিপি (ডায়ারি) থেকে উদ্‌ধৃত।

২. এই প্রসঙ্গে ডায়ারিতে ২৪ আষাঢ়, ৭ জুলাই, রবিবারের (১২৯৬ সাল) রাজনারায়ণ লিখেছেন: "অদ্য প্রাতে ভগবদ্গীতা ও অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি।"

অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রামায়ণ, মহাভারতও তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। রাজনারায়ণ-কর্তৃক রামায়ণের আলোচনা ও মহাভারতের শ্লোকাবলীর ইংরেজী অনুবাদের[১] দ্বারা সেই কথাই প্রমাণিত হয়।

রাজনারায়ণের অন্তর ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত ছিল। বিজয়া দশমীতে আলিঙ্গন, দেওয়ালীর রাত্রিতে আলোকসজ্জা, সভায় মালা, গোলাপজল, আতর দেওয়া—প্রথাগুলি তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। পৌত্তলিকতা দেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্ত সুন্দর প্রথার প্রচলন থাকা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সম্প্রদায়গত ভেদবৈষম্য তাঁর অন্তরকে কোনোদিন সংকীর্ণ করে নি।

দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। স্বাস্থ্যসম্মত দিক চিন্তা করেই তিনি একাদশী পালন করতেন। দিনযাপনের যে-সব নির্দেশ[২] তিনি ব্রাহ্মসমাজকে দিয়েছিলেন— সেই নির্দেশানুযায়ী তিনি নিজের দৈনন্দিন জীবনও পরিচালিত করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল দিনান্তে কোনো ব্যক্তির আত্মসমীক্ষণের দ্বারা আত্মশোধন ও একই সঙ্গে আত্মোন্নতি হয়। আর প্রার্থনার দ্বারা মানুষের ভগবদ্‌ভক্তি ও বিশ্বাস হয় দৃঢ়বদ্ধ।

রাজনারায়ণ সংগীতপ্রিয় ছিলেন। ব্রহ্মসংগীত ও জাতীয় সংগীত তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এই-সব সংগীতের কথা ও সুর মুহূর্তের জন্য তাঁকে নিয়ে যেত এক অপার্থিব জগতে। বিশেষ করে কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত[৩] তাঁর

---

১. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট

২. *Directions For Spending The Day.*

1) Begin the day with God.
2) Be conscientious and diligent in the business of the day.
3) Be moderate and innocent in the recreations of the day.
4) Carefully remark, and wisely improve, all providential dispensations.
5) Guard against the temptations of the day.
6) Govern your thoughts when alone.
7) Guard your tongue well in company.
8) In everything depend on the assisting grace of God. Whatever be the work in hand, whether sacred or civil, whether temple work, domestic work, public work, or closet work, seek divine assistance.
9) Close the day with self-examination and prayer.

—*Brahmo Catechism*, (1890).

৩. রবীন্দ্রনাথ : "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে"; "সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি"; "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : "ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম"

গণেন্দ্রনাথ : "প্রথম নাম ওঁকার"

অত্যন্ত প্রিয় ছিল; গীত ব্যতীত কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে ব্রহ্মনাম শুনতেও তিনি ভালোবাসতেন।

জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথের সৌন্দর্য ছিল তাঁর অতি প্রিয়। এই আলোকময় নিশীথের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিরূপ অবলোকন ক'রে তিনি আনন্দিত হতেন।

প্রাচীন ভারতে ঋষিদের তপোবন ছিল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সার্থক সমন্বয়-ক্ষেত্র। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমন্বিত রাজনারায়ণের দেওঘরের বাসগৃহ ছিল প্রকৃতই প্রাচীন ভারতীয় ঋষির আশ্রমতুল্য। আশ্রমের অধিকর্তা রাজনারায়ণ সত্যই ছিলেন ঋষিতুল্য ব্যক্তি।[১] বাস্তব সংসার তাঁর দ্বারা উপেক্ষিত হয় নি কোনোদিন। পরিবারের মঙ্গলবিধানের জন্য, পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি সঞ্চারের নিমিত্ত তিনি গৃহে পারিবারিক উপাসনা[২] ও সাপ্তাহিক উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন এবং তিনি নিজেও এই উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করতেন। আপন পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আগন্তুক, রবাহূত, অনাহূত প্রভৃতি সংসারের কারো প্রতি তাঁর কর্তব্যের অবহেলা কোনোদিন দেখা যায় নি। পুত্রকন্যাদের মতো গৃহের দাস-দাসীদেরও রোগে, শোকে সব সময় দেখাশুনা করেছেন, তাদের সব প্রয়োজন মিটিয়েছেন,

---

১. ভবানীপুর সাহিত্যসমিতির বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেছিলেন: "আমি যখন দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তখন তাঁহার পক্বকেশ-মণ্ডিত মস্তক এবং শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ-পরিশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া, আমার হৃদয়ে স্বতঃই আর্য-ঋষিগণের মূর্ত্তি জাগরিত হইয়াছিল; তাঁহার অমায়িক মিষ্ট ব্যবহার আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। ইংলণ্ডের স্পেন্সর, মিল প্রভৃতি যে শ্রেণীর লোক, রাজনারায়ণবাবু সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন।"*

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সদস্য রাখালদাস হালদার রাঁচী থেকে একটি পত্রে (২৬ জুন, ১৮৮৭) লিখে জানিয়েছিলেন: "I was looking forward to the enjoyment of the great pleasure of an interview with you—and that of your ashram."—মূল পত্রটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য কলকাতা থেকে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন: "আপনি প্রাচীন ঋষিতুল্য মনুষ্য—আপনাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকি..."

শিশিরকুমার ঘোষ পত্রে রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন: "you are a blessed being, you are happy and make others happy who come in contact with you."—মূল পত্র ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

* প্রমথনাথ সেন, "স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু", 'বাণী', ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ. ৫৭১

২. দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট

তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। পুত্রকন্যাদের বিদ্যাশিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সম্ভবত পিতার শিক্ষাদান গুণেই। চতুর্থা কন্যা লীলাবতী পিতার প্রগতিবাদী মনোভাবের জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভে সমর্থা হয়েছিলেন; এবং পিতার উৎসাহেই সাহিত্য-চর্চায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা কবি লজ্জাবতী বসুর সাহিত্যকর্মের অন্যতম উৎসাহদাতা ও বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন পিতা রাজনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষের দার্শনিক প্রজ্ঞাদৃষ্টি উন্মীলনে এবং কনিষ্ঠ দৌহিত্র বারীণ ঘোষের স্বদেশপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণে মাতামহের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দৌহিত্রী কুমুদিনী মিত্র (কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লীলাবতী মিত্রের কন্যা) মাতামহ রাজনারায়ণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুসারে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। এঁদের সকলকে পরিবৃত করে, সকলের জন্যই যেন তাঁর সাংসারিক জীবন ধারণ। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন পার্থিব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে।

রাজনারায়ণের মতো এমন মানুষের জীবনে শোক-দুঃখের আঘাত বড়ো কম ছিল না। সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা পুত্রাধিক জ্যেষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের মৃত্যু (১৮৯৩ খ্রী), স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সেই অবস্থায় দেওঘরের অনতিদূরে বসবাস; পরে (স্বামীর মৃত্যুর পর) পুত্রকন্যা (বারীন্দ্র ও সরোজিনী) নিয়ে আশ্রয়হীনা অবস্থায় পিতা রাজনারায়ণের নিকট আগমন। তৃতীয় জামাতারও (ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ) মৃত্যু হলে কন্যা (সুকুমারী) একটি পুত্র ও একটি কন্যা নিয়ে আসেন পিতার আশ্রয়ে। এই দৌহিত্রটি (অবিনাশ) তাঁর অতি আদরের ছিল। কিন্তু তাকেও রাজনারায়ণ অকালে হারিয়েছিলেন। তিনি নিজে তখন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী। জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞানী, গুণী হয়েও বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র মুনীন্দ্রও তাই। কনিষ্ঠা কন্যা লজ্জাবতী ছিলেন অবিবাহিত। সংসারের এই নিদারুণ কর্মতরঙ্গের মাঝখানে রাজনারায়ণ অগ্রসর হয়েছেন ধীরভাবে, প্রশান্তচিত্তে। সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত— এ ছিল তাঁর জীবনপথের নীতি।

রাজনারায়ণ স্বভাবত পরিহাস-রসিক সদাহাস্যময় ব্যক্তি ছিলেন।

উচ্চহাস্যের তরঙ্গে তিনি সমস্ত সংকীর্ণতা জয় করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকেও পরাভূত করতে পারতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে রাজনারায়ণ-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি সুপ্রমাণিত। 'কুশদহ' পত্রিকার সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু লিখেছেন: "...মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দর্শন করিলাম। তাঁহার পরিচয় আমি আর কি দিব, তাঁহার কথাবার্ত্তা আমি চুপ করিয়া শুনিতাম, আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব 'হাসি' দেখিতাম, তেমন গালভরা কৌমুদী-সিক্ত মধুর হাস্য বুঝি আর কখনো কোথাও দেখি নাই।"[১] ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: "...সেই প্রাণখোলা মনভোলা হাসি একবার যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না।"[২] শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন: "Indeed, his very laugh was characteristic. It showed the purity of the soul from which it proceeded."[৩] হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতাকালীন শিবনাথ শাস্ত্রীর সহকর্মী নীলমণি চক্রবর্তী একদিনের একটি ঘটনার[৪] উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, মানুষের মনে স্বর্গীয় পবিত্রতা না থাকলে এরূপ প্রাণখুলে কেউ হাসতে পারে না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন: "আপনি কবে— হায় কবে— আমার এই চর্ম্মচক্ষের নির্ব্বাণপ্রায় আলোকে আপনার সেই হাঁসির হাঁ— সেই তুবড়ী বাজির অথবা চর্কিবাজির অথবা ছুঁচাবাজির পূর্বসূচনা স্বরূপ রঙ্মসালের আলোক-ব্যাদান— দর্শন করিয়া আমার নয়নযুগল সার্থক করিব!"[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "সেই খোলা উচ্চ হাসির মধ্যে একটি সুমধুর সরলতা এবং একটা নিরভিমান বিরাট প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত।"

আজ মানুষের সমস্যাকণ্টকিত জীবন দেখে মনে হয়, রাজনারায়ণের মতো যাঁরা প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তাঁরা বোধ হয় অন্য জগতের লোক। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরণ করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি

---

১. 'কুশদহ' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২১, পৃ. ২১

২. "৺রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকল্পে", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৮৪৪ শক, পৃ. ১৬০

৩. Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, 1966, p. 129

৪. Ibid, pp, 129-30

৫. দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।"[১] রাজনারায়ণেরও একাধিক জীবনের পরিচয় রয়েছে এই প্রাণখোলা হাসিতে।

রাজনারায়ণের এইরূপ চারিত্রিক মধুর সংস্পর্শে, প্রাণখোলা হাসিতে, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতায়, অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তদানীন্তনকালের শিক্ষিত সমাজ। মধুলোভী ভৃঙ্গের মতো তাঁকে ঘিরে চারপাশে বহুজনের সমাগম হয়েছিল এক সময়ে। যখন যেমন, যে শ্রেণীর ব্যক্তিপুরুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, সকলেই তাঁর কোনো-না কোনো একটি গুণে এবং মহান ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। তদুপরি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রাজনারায়ণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা।

ধর্মবিষয়ক চিন্তায় এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের গভীরতায় রাজনারায়ণ তাঁর সমসাময়িককালে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, য়ুরোপের ঈশ্বরবাদী ধার্মিক সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সী (১৮১৮-১৯১২)[২] বিশিষ্ট। ইনি একেশ্বরবাদী খ্রীস্টান ধর্মযাজক। ঈশ্বরবিশ্বাসী এই পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগাযোগ ঘটে পত্রের মাধ্যমে। রাজনারায়ণের দৌহিত্রীকে লেখা (সম্ভবত কুমুদিনী মিত্র) ভয়সীর একখানা পত্রে (March 27th, 1907) আছে—"You must be my friend if you are the grand daughter of my beloved friend Babu Rajnarain Bose whom I knew by correspondence 30 years ago and more." আত্মচরিতেও রাজনারায়ণ উল্লেখ করেছেন, ভয়সীর সহায়তায় তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি[৩] বিলাতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনারায়ণের কোনো কোনো ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতার[৪] উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভয়সী মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে যখন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবল মতবিরোধ, তাঁর অবতারবাদ-সমর্থন এবং খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণকে লক্ষ করে ভয়সী সাহেব তীব্র ভাষায় কেশবচন্দ্রের অভিমতাদি বিচার-বিশ্লেষণ

---

১. "বিদ্যাসাগরচরিত", 'চারিত্রপূজা', ১৩৬৫, পৃ. ৪৬

২. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট

৩. *Hindu Theists Brotherly Gift to English Theists.*

৪. *Hints shewing the Feasibility of Constructing A Science of Religion.*

করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি-রূপে রাজনারায়ণ ভয়সীকে অভিনন্দন জানান। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত ভয়সীর একখানা পত্রে তাঁর এই অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন: "The real orthodox Christianity goes straight to the mark and makes Jesus its God. It is a genuine and unravished pollytheism. But the Christianity of Mr. Dall and K. C. Sen is a poor hybrid and essentially idolatrous. Professor Newman's discourse in which he alludes to Keshab Babu. C. Sen. He told me the other day that he suspected K. C. S. of Christian proclivities years ago and always feared he had no depth of sound theism."[১]

রেভারেণ্ড ভয়সীর সঙ্গে রাজনারায়ণের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। ইনি পরম আগ্রহে রাজনারায়ণের কুশল সংবাদ নিতেন। ইংলণ্ডে ঈশ্বরবাদী সংঘ চালাবার বাধাবিপত্তির কথা আলোচনা করতেন; ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন; মূলত রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়েই এই বিদেশী ধর্মযাজক ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছিলেন।

চার্লস ভয়সীর দার্শনিকতত্ত্বে ও অধ্যাত্মচিন্তায় রাজনারায়ণের ছিল প্রগাঢ় আস্থা। রাজনারায়ণ বিশ্বের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "দেবগৃহে দৈনন্দিনলিপি" থেকে এ-বিষয়ে জানা যায়।

রাজনারায়ণের কয়েকদিনের দিনলিপি ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ ১৮০৫ শক) এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

"২৮ ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বত ৫০— অদ্য ভয়সী Voysey সাহেবের "Peterno-ster" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা পাঠ করি। ঐ বক্তৃতার যেখানে ঈশ্বরে আত্মার্পণ যথার্থ প্রার্থনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেইস্থান পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। সকল প্রার্থনা অপেক্ষা "তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক" এই প্রার্থনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যখন আত্মার এইরূপ অবস্থা হয় যে এই প্রার্থনা অহরহ

১. অপ্রকাশিত পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তাহা হইতে স্বতঃই উত্থিত হয় তখন আর কোন প্রার্থনার আবশ্যক করে না। কিন্তু কয়টি লোকের আত্মার অবস্থা এইরূপ? কেবল এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিতে সাধারণ লোককে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাদিগের জন্য, আমাদিগের সকলেরই জন্য, সচরাচর প্রার্থনা যাহাকে বলে তাহা আবশ্যক।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮০৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রকাশিত দিনলিপি:

"২৬ কার্তিক— অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্ম্মণ পাঠ করি। তাহাতে এই উৎকৃষ্ট বাক্য আছে।—

"For some good purpose not always seen by us, evil befalls us which we can not prevent or avert. Nothing in heaven or earth can reconcile us to such afflictions but knowing or believing that a loving hand has sent them that a love greater and a wisdom higher than our own are the secret source of all that worries or distresses us." "যে মন্দ আমরা কোনোমতে এড়াইতে পারি না সে মন্দ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা সকল স্থলে বুঝিতে পারি না। যদ্যপি আমরা ইহা না বিশ্বাস করি যে এক প্রেমময় হস্ত এই সকল দুঃখ প্রেরণ করে এবং আমাদিগের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান এবং আমাদিগের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর প্রেম আমাদিগের দুঃখ ও কষ্টের নিগূঢ় কারণ তাহা হইলে তাহা সহ্য করিতে আমাদিগের কখন মান যাইত না।"

চার্লস ভয়সী ব্যতীত কয়েকজন বিদেশিনী ব্রহ্মবাদিনী রাজনারায়ণের ধর্মপ্রাণতায় এবং ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পত্রাদি মারফত রাজনারায়ণের সঙ্গে এঁদের পরিচয় এবং দীর্ঘকাল সংযোগ রক্ষিত হয়েছিল— এঁরা হলেন মিস ফ্রান্সিস পাওয়ার কব্[১] (১৮২২-১৮৯৪), মিস এলিজাবেথ শার্প[১] ও সি. ডব্লিউ. পার্ক। এঁরা ভারতবর্ষে কখনো আসেন নি। রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না হলেও, উক্ত ব্রহ্মবাদিনীগণ তাঁর কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন তা রাজনারায়ণকে লিখিত পত্রাদি থেকেই বোঝা যায়। ১৮৭১ সালে রাজনারায়ণ যখন কলকাতায় তখন মিস কব্ এই হিন্দু ঈশ্বরবাদীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশত স্বরচিত *Alone to Alone*

১. দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট

বইখানি তাঁর মতামতের আশায় পাঠান। সমাজসেবা ও ধর্মচিন্তার অভিনবত্বে মিস কব আপন দেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্ম-বাদিনী মিস কবের ধর্মপ্রাণতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন রাজনারায়ণ।[১] তারপর রাজনারায়ণ প্রার্থনা জানিয়েছেন, "May God speed that Mission." গ্রন্থখানি পাঠ করে তিনি এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে পত্রে বার বার এরূপ মন্তব্য করে লেখিকাকে উৎসাহিত করেছেন: "I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it।" তা ছাড়া মিস কবের উক্ত বইটিতে সংযোজনের জন্য তিনি নিজে কতকগুলি উপাসনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এগুলি তাঁর নিজস্ব অনুভূতিজাত। প্রত্যুত্তরে মিস কব আনন্দ প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "I thank you heartily, Dear for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for." এই পত্রেই আরো লিখেছেন: "It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use."[২]

---

১. ব্রহ্মবাদিনীকে পত্রে (Calcutta, June, 1871) তিনি জানিয়েছিলেন :—

"The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. ...It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adopted to states of the mind, It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of divine love in hearts becoming cold as mine. It is, indeed, a most valuable manual of devotion of Theists. It has a mission to fulfil."

২. পত্রটি লিখেছিলেন 26, Hereford Square, London S. W. থেকে September 26th, 1871 তারিখে।

কোনো ব্রাহ্ম পত্রিকায় একজন ইংরেজ মহিলার বিষয় পাঠ করে রাজনারায়ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। তিনি মিস এলিজাবেথ শার্প। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে শার্প সম্বন্ধে বলেছেন : "তিনি মিস কবের ন্যায় বিখ্যাতা নহেন, কিন্তু সৌজন্যে ও ভদ্রতায় লক্ষ্মী ও বিদ্যাবত্তায় বাগ্‌দেবী স্বরূপা। তাঁহার নাম মিস্ এলিজাবেথ শার্প।" তিনি ইংরেজীতে যে চারটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন, তার একটিতে পূর্বোক্ত দুই ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ করেছেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। এই কবিতাটি তিনি জ্যেষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণধনের মারফত উপহার স্বরূপ বিদেশে মিস শার্পের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই সূত্রেই উভয়ের আলাপ। রাজনারায়ণ বলেছেন (আত্মচরিতে): "এই সামান্য সূত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপিত হয় ও অনেক পত্র লেখালেখি হয়।" উক্ত চতুর্দশপদী কবিতাটি পেয়ে মিস শার্প পত্রে রাজনারায়ণকে আনন্দের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন : "Mr. Ghose gave me the poem now some weeks past, and it was with surprise and pleasure that I learnt my name was known by one so far away, and a stranger to me, and that it was mentioned in such a manner." রাজনারায়ণ অতঃপর তাঁর *Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj*, *Brahmic Advice, Caution and Help*, *Adi Brahmo Samaj—its views and principles*, *What is Brahmoism* প্রভৃতি বইগুলি উপহার পাঠান। বইগুলি পাঠ করে তিনি রাজনারায়ণের দর্শনচিন্তা, ও ধর্মীয় আদর্শের প্রভূত প্রশংসা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক ও সুবিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত গোল্ডস্টুকারকে পাঠান। বিদুষী মিস শার্পের হিন্দু ব্রহ্মবাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ তাঁকে সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে এবং পারস্য কবির গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ বচনসমূহ উদ্ধার করে তাঁর স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রেরণ করতেন। বিদুষীও তাঁর প্রিয় কবির (এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্) অনুরূপ ভাবের সনেট নির্বাচন করে উপহার পাঠাতেন রাজনারায়ণের কাছে। মিস শার্প কেবলমাত্র রাজনারায়ণের ধর্মভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, বিদেশী ভাষায় তাঁর দক্ষতা দেখেও বিস্মিত হয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের ১৫ মার্চ তারিখে লিখিত একটি পত্রে (আত্মচরিতে মুদ্রিত) লিখেছিলেন: "I am struck by the perfectly correct English in which you

write. You Hindus are indeed proficient in our language." তিনি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভের জন্য রাজনারায়ণের অনুপ্রেরণাতেই নিজের দেশে বসে বাংলাভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পত্রে[১] তিনি রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কেশবচন্দ্র সেনও ইংলণ্ড ভ্রমণকালে এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের ধর্মপ্রাণতা ও দর্শনচিন্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডক্টর জনসনকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যে একটি 'লিটারারি ক্লাব' গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের কলকাতায় এই ক্লাবের মতো দু-একটি সাহিত্য ও গল্পের আসর ক্রমে জমজমাট হয়েছিল আমরা জানি। এইরকম একটি সাহিত্যসভার খবর আমরা পাই কবি ঈশ্বরগুপ্তকে কেন্দ্র করে। ইনি 'সংবাদপ্রভাকর' সম্পাদনা করা ছাড়া অবসরযাপন করতেন সমকক্ষ রসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। তাঁর এই রসালাপ ও সাহিত্য-চর্চাকে ঘিরে বেশ একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তৎকালীন কলকাতায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে বিদ্বজ্জন সমাগম হত। কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতেও মজলিসি আড্ডা জমত। পাইকপাড়ার শিল্পানুরাগী সিংহ-পরিবার বহু গুণিজনের মিলনের সুযোগ দিয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। এই-সব বৈঠকী আড্ডা বিশেষ এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে গড়ে উঠত। কিন্তু রাজনারায়ণের মতো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতের অসংখ্য জনের আগমন সত্যিই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আজকাল কাজের জন্য, দেশহিতের জন্য, দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি; কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা, মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা, এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে।"[২] রাজনারায়ণ এইরকম দশজনের জন্যই দশজনকে ভালোবেসেছিলেন, ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর অপার দাক্ষিণ্য ও বিপুল ঔদার্যের দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছিলেন একটি শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজকে। রাজনারায়ণের ডায়ারির পৃষ্ঠায় কমপক্ষে এইরূপ শতাধিক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। ডায়ারি ব্যতীত

---

১. মিস শার্পের পত্রটিও রাজনারায়ণের আত্মচরিতে মুদ্রিত হয়েছে।

২. 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫৪), পৃ. ৮৩

রাজনারায়ণকে লিখিত বিভিন্নজনের পত্রাবলীও[১] (অপ্রকাশিত) তার নিশ্চিত সাক্ষ্য। প্রত্যক্ষ দেখাশুনা, আলাপ-আলোচনা ছাড়া বহুজনের সঙ্গে লেখনী মারফত নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলতে রাজনারায়ণ কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেন নি এবং প্রত্যেকের দাবিই তিনি সাধ্যমত পূরণ করতেন। কার্যানুরোধে কলকাতা থেকে দূরে মেদিনীপুরে তাঁকে দীর্ঘ পনেরো বছর বাস করতে হয়েছিল। আবার জীবনের শেষ বিশ বছর বাস করেছেন সুদূর দেওঘর অঞ্চলে। কিন্তু ভৌগোলিক ব্যবধান কারো সঙ্গে মনের সংযোগে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। ধর্মোপদেশ দেওয়া, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে তাঁর মতামত নেওয়া, কারো শিক্ষক-নিয়োগের বন্দোবস্ত,[২] কারো গ্রন্থের সমালোচনা, কাকেও বা কোনো গ্রন্থের সমালোচনা, কাঁরো বা কোনো গ্রন্থের প্রয়োজন মেটানো, কারো সঙ্গে বা দুদিনের জন্যে একটু অবসর বিনোদনে গিয়ে কোনো বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কারো জন্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা[৩] ইত্যাদি নানা দাবি তিনি হাসিমুখে পূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া তাঁর গৃহে সমাগত অতিথি,

---

১. ব্রাহ্মসমাজের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে দীননাথ অধ্যেতা কালনা থেকে ১৮১২ শকের ৩১ শ্রাবণ একটি পত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছেন: "পরে এক আপনি মাত্র ভরসাস্থল, কিন্তু আপনি দেশে থাকেন না সুতরাং তবে আমার ন্যায় অনাথজনের আর সুখশান্তির স্থল কোথায়? ... আপনি এ বিষয়ের কি স্থির করিবেন আপনার কি মত হয় তাহা আমি জানিতে চাহি। পূর্ব্ববঙ্গবান্ধবদিগের মধ্যে এক্ষণে আপনিই একমাত্র হিতৈষী আছেন। অতএব আমাকে উপকৃত করিবার জন্য যাহা আপনি করিতে পারেন তাহা করুন।"

২. ১২৯৬ সালের ২৭ পৌষ কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি পত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন: "আমার প্রথম পৌত্র ভায়ায় বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত। প্রথমতঃ উপযুক্ত শিক্ষকের সহবাসে অল্পে ২ শিক্ষা দেওয়াইবার জন্য তেমন একটি শিক্ষক দরকার হইয়াছে। লোকটি চরিত্রবান এবং বয়সে প্রবীণ হয়। এবং যদি ব্রাহ্মভাবাপন্ন হয় তবে আরও ভাল। আপনার সন্ধানে যদি তেমন লোক কেহ থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার সংবাদ দিবেন।"

৩. মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এই মর্মে বরিশাল থেকে রাজনারায়ণকে পত্রে লিখেছিলেন (২০মে, ১৮৯৬): "আমরা ভাল আছি। প্যারীবাবু ও দীনবন্ধুবাবু আজকাল যেরূপ ভগবানের নামে মত্ত তাহা দেখিলে আনন্দ হয়। দীনবন্ধু বাবুর পুত্রের মৃত্যু তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে আমার এইরূপ ধারণা। আপনি ইহাদিগের হইয়া ভগবানকে কিছু বলিবেন। ভগবান আপনার কথা শুনেন।"

—অপ্রকাশিত পত্রগুলি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অভ্যাগত, স্মরণীয়কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তিনি শিষ্টাচারে, আন্তরিক আপ্যায়নে, মধুর আনন্দরসে একবারে ভরিয়ে রাখতেন। বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির তফাত করে কাউকে কোনোদিন দূরে ঠেলে রাখেন নি। এমন একজনও তখন ছিলেন না— যাঁরা বায়ুপরিবর্তনের জন্য বা কার্যোপলক্ষে দেওঘরের সন্নিহিত অঞ্চলে গিয়ে রাজনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, কিংবা একদিন তাঁর গৃহে পদার্পণ করেন নি। এর বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে ডায়ারির প্রতিটি পৃষ্ঠায়।[১] এ-সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকেও দু-একটি তথ্য পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রাজনারায়ণের সঙ্গে এই ঠাকুরবাড়ির ছিল তিন পুরুষের অন্তরঙ্গতা। উনিশ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। সে পরিচয় যে কত গভীর ও অন্তরঙ্গ অন্যত্র তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মহর্ষি রাজনারায়ণের বন্ধুত্বকে বড় মূল্য দিতেন: "আমার অতি সৌভাগ্য যে তোমার সমান আমি একজন বন্ধু লাভ করিয়াছি; যত দিন যাইতেছে ততই তোমার মনের মনোহর সৌন্দর্য্য আমার মনকে আকৃষ্ট করিতেছে…।"[২] ১৭৭৭ শকের ২রা আশ্বিন পত্রে দেবেন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণকে মনের এই কথা জানিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যাকুলভাবে রাজনারায়ণের সঙ্গ কামনা করতেন।

মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের অন্তরের সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলার দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম অগ্রণী। স্বদেশপ্রীতির মন্ত্র ও দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে হয়তো রাজনারায়ণের

---

১. ডায়ারি থেকে কয়েকদিনের দিনলিপি এখানে উদ্‌ধৃত হল।—২ ভাদ্র, ১৭ আগস্ট, সোমবার, ১২৯২ সাল (১৮৮৫ খ্রী): "অদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হইতে আইসেন তাহাতে মহা আনন্দের উদয় হয়। কল্য কি বিষাদের দিন ছিল, অদ্য কি আনন্দ! রবীন্দ্র তাঁহার রচিত কয়েকটি গীত আমাদিগকে শুনাইলেন। ইনি চমৎকার গান করেন।"

৩ ভাদ্র ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার— "অদ্য রবীন্দ্র কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার সহবাসে এই দুই দিন আনন্দে কাটান যায়।"

২. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃ. ২৫৪

কাছেই লাভ করেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা, সারস্বত-সমাজ, বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহযোগে তাঁদের মৈত্রীবন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছিল। রাজনারায়ণের পবিত্র, সুন্দর, বিনম্র চরিত্রের প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিটি পত্রে রাজনারায়ণকে সম্ভাষণ করেছেন 'শ্রদ্ধাস্পদেষু,' 'মহাত্মন্,' 'পুণ্যাত্মপ্রবরেষু' ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক শব্দের দ্বারা। রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-সমন্বিত মনের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। পার্ক স্ট্রীট থেকে একটি পত্রে (২০ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার) তিনি লিখেছিলেন: "আমার Love, affection, regards, admiration towards রাজনারায়ণবাবু= the same as always and will remain as forever— দুঃখ কেবল এই যে, তাঁহার সহিত চক্ষুতে মিলন কখন্ ঘটিবে ঠিক বলিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমি গতবারে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনায় এক্ষণে তিনি কিরূপ আছেন আমাকে আর একটু খুলিয়া লিখিবে। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার···।"[১] আবার রাজনারায়ণকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "আপনি অতি প্রবীণ শ্রদ্ধাস্পদ, বহুদর্শী শাস্ত্রবিদ্, হিন্দুধর্মের সারগ্রাহী, অখিল বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, আপনি অর্থবিষয়ে দ্বিজপতির ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধিশীল, কিন্তু বিদ্যাসম্পদ বিষয়ে মতিশীল; আপনি পাণ্ডিত্য বিষয়ে সুধীবর এবং সদ্গুণ জাল বিস্তারে সু-ধীবর···।"[২] দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে বিলম্ব হলে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন সরস কৌতুকে: "আমি পিপাসাতুর, শুষ্ক কণ্ঠ, এই যাহা লিখিলাম এই ঢের, দুই এক ছত্র না পাইলে কলম আর চলে না, আর কিছু দিন আপনার স্নেহের স্রোত বন্ধ হইলে আমি রাগ করিয়া কলম কালি কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঢালিয়া ঢুলিয়া, ছিঁড়িয়া, খুঁড়িয়া একাকার করিব। অতএব এরূপ ভয়ানক দুর্গতি হইতে আপনি আমাকে কোনরূপে রক্ষা করুন।"[৩] স্বতন্ত্র পত্রে লিখেছেন: "এক শতাব্দী হইল আপনার সাড়া শব্দ নাই। আপনার দর্শন সুদুষ্প্রাপ্য, আপনার হস্তাক্ষর দুষ্প্রাপ্য, আপনার কুশল সংবাদ 'প্রাপ্য, আপনার দেওঘর 'প্য, আপনি নিজে তো এক প্রকার

১. অপ্রকাশিত পত্র ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২. তদেব।

৩. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ. ১৭৬

'j' হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপনি Receding Echo-র ন্যায় আমাদের শ্রবণ পথ ক্রমশঃ এড়াইয়া অবশেষে একটি য-ফলায় ঠেকিয়াছেন।"[১] অধিকন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, দেহের বিশিষ্টতা (দাড়ি, গোঁফ) নিয়েও কত সময় পত্রে কত কৌতুকচিত্র রেখায়িত করেছেন, কত রঙ্গ রসিকতা করেছেন। রাজনারায়ণকে স্মরণ করে তিনি যে কাব্যখানি লিখেছিলেন তার নামকরণই করেছিলেন 'গুম্ফাক্রমণ কাব্য'।[২]

বয়সের সমান্তরাল রেখায় গভীর মিত্রতা জন্মায়, তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল অনেক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজনারায়ণ অপেক্ষা চোদ্দ বৎসরের কনিষ্ঠ। বয়সের এই দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও কিভাবে যে উভয়ের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভায় পঠিত বক্তৃতায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) বলেছিলেন: "পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু, ইঁহারা দুইজনে যখন মুক্তভাবে হাসিতেন, সেই হাসির ভিতর দিয়া আমরা যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতাম এবং যে স্বর্গীয় সরলতার প্রতিচ্ছায়া হৃদয়ে অনুভব করিতাম, তাহার তুলনা সত্যই আজকালকার দিনে দেখিতে পাই না।" বাস্তবিকই রাজনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ— যুগলে মুক্ত হাসির স্রোতে যেমন নিজেরা ভেসেছেন, তেমনি সমসাময়িক সমাজকে আলোড়িত করেছেন। তাঁদের সখ্যতার নিদর্শন স্বরূপ রয়েছে যে পত্রগুলি— তার প্রত্যেকটি অফুরন্ত জ্ঞানরসের অনন্ত ভাণ্ডার। রাজনারায়ণের ধর্মচিন্তায়, দার্শনিক প্রজ্ঞাবোধে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল তা একটি পত্রের অংশ উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে। চিঠিটি লেখা ১৭৯০ শকের ৭ চৈত্র: "আপনি পত্রের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ যখন যেরূপ উদয় হয় তাহা দিবেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব; আপনার উপদেশাদি আমার spiritual hunger and [···] এর পথের অমৃতবারি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।··· give me strong wine যাহা আমার

১. কুমুদিনী মিত্র -সম্পাদিত 'সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭, পৃ. ১২৬

২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্য রচিত হয়।'

strength হইতে পারে ; অর্থাৎ আপনি যাহাতে বলী হইয়াছেন তাহার secret আমাকে বলিয়া দিউন।”[১] তিনি নিজে দার্শনিক হয়েও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সম্মান জানিয়েছেন রাজনারায়ণকে : “…আজকার বাজারে physic-এর কাছে metaphysic নতশির— যেমন আপনার কাছে আমি।”[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথও রাজনারায়ণকে বিদগ্ধসমালোচকরূপে সম্মান জানিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের মতো রসজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের জন্য তিনিও উন্মুখ হয়ে থাকতেন। একটি পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “আগামী ভারতীতে কালীবর বেদান্তবাগীশের বেদান্ত-ব্যাখ্যার উপরে আমি একটু critical কলম চালাইয়াছি ; তাহার প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ করিবেন, ও তৎসম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।” “আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা” নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখার পরও রাজনারায়ণের মন্তব্যের আশা করেছিলেন।[৩] ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির জন্যও রাজনারায়ণের মতামতের প্রত্যাশা করতেন।[৪] ‘দর্শন সংহিতা’[৫] লেখার পর উক্ত বিষয়টি রাজনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি পত্রে অনুরোধ জানান। তাতে একাধারে কৌতুকপ্রিয়তা ও রাজনারায়ণের সাহিত্যরসবোধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের সঙ্গেও রাজনারায়ণের হৃদ্যতা ছিল যথেষ্ট। মহর্ষির সঙ্গে রাজনারায়ণের প্রথম সাক্ষাৎকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মাত্র দু'বছরের শিশু, তিন বছর পরে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জন্ম হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। কাজেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যপাঠ, শিক্ষাদীক্ষা, প্রতিভার বিকাশ— এ-সবেরই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। অতএব তাঁর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের) সাহিত্যচর্চা ও স্বদেশপ্রেমের মূলে রাজনারায়ণের কোনো প্রভাব যে কার্যকর হয় নি তা বোধহয় জোর করে বলা যায় না।

---

১. অপ্রকাশিত পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর অনুলিখন থেকে সংগৃহীত।

২. ‘সুপ্রভাত’, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ. ১২৭

৩. পার্ক স্ট্রীট থেকে দেওঘরে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : “আমি গত শনিবারে একটা বক্তৃতা করিয়াছিলাম [...] পত্রিকা এবং ভারতীতে দেখিবেন। আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা।”

৪. “ভারতীতে আমার দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ দেখিয়াছেন কি ?—তদ্বিষয়ে আপনার কলমের কতিপয় আঁচড় is what I am need of !”— ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯

৫. সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রাজনারায়ণ জ্যোতির জ্যোতি লক্ষ্য করে থাকবেন। একসময় ঠাকুরবাড়ির শিশু ও বালকদের ঘিরে গল্পের আসর জমিয়ে তুলতেন তিনি। অনেক হাসির গল্পে সবসময় তাঁর গল্পের ঝুলি ভর্তি থাকত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর শৈশবে এইরকম গল্পের আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজি ছিল—তিনি ঐরূপ এক একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি কিছুক্ষণ নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, নিজেই উচ্চরবে সকলের আগে হাসিয়া উঠিতেন।" রাজনারায়ণের মতো বিজ্ঞ ও মধুর স্বভাব মানুষটির কথা স্মরণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "রাজনারায়ণবাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ, এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত সরলতার একখানি প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের এমন পার্থক্য ও এত প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমান আমি দেখি নাই। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বড় দাদার সঙ্গে যেমন দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ক করিতেন, আমাদের সঙ্গে তেমনি হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতেন। তাঁহার মত এমন অসাধারণ মানুষ, আমি আর দেখি নাই।"[১]

১৮৬৮ সালের ১১ এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন কলকাতার উপকণ্ঠে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার উদ্যানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার সূত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠতা হয়। "হিন্দুমেলা" ও "সঞ্জীবনীসভা"— এই-সব ব্যাপারে রাজনারায়ণ ছিলেন পরামর্শ ও উৎসাহদাতা। স্বদেশের সর্বপ্রকার হিতসাধনের অন্যতম উৎসাহী কর্মী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু সমস্ত সাহায্য ও সাহচর্য দিয়ে সেই কর্ম পূর্ণ সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন রাজনারায়ণ। শুধু তাই নয়, তাঁর বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টার ইঙ্গিতসূত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ-কল্যাণমূলক কর্মসূচনার প্রেরণাস্বরূপ ছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-স্থাপিত 'কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী' সভার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রাজনারায়ণের মহৎ প্রেরণার বাণীই ঘোষিত হয়েছে। এইভাবে

১. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', ১৩২৬, পৃ. ১৭৩

আদি ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন তিনি রাজনারায়ণের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

রাজনারায়ণ কলকাতায় যতদিন ছিলেন (১৮৬৭-১৮৭৯ খ্রী) নানা কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করেছেন বার বার। কিন্তু ১৮৭৯ সালে রাজনারায়ণের কলকাতা পরিত্যাগের পরও এই যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত বিদ্বজ্জন-সমাগমে তদানীন্তন-কালের খ্যাতিমান সাহিত্যরথীদের সঙ্গে রাজনারায়ণও আহূত হতেন। এই 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার উদ্যোগেই রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বীরত্বব্যঞ্জক নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর ইংরেজী অনুবাদ রাজনারায়ণ 'ন্যাশন্যাল পেপারে' প্রকাশ করেন।[১] রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কালকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমন অনেকের পরিচয় রয়েছে তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে। এই থেকেই আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজনারায়ণের স্থান ছিল কতখানি। উনিশ শতকের বাংলার এই মহামনীষীর জীবন ও শিক্ষার অলক্ষ্য প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল তার উল্লেখ বিভিন্ন রবীন্দ্র-রচনায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য পরবর্তী জীবনে তাঁর একাধিক রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে পিতৃবন্ধু রাজনারায়ণের কথা এবং তাঁর প্রভাবের কথা বার বার স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন : "শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়িতে দেখিতাম। তখনই তাঁহার পক্ককেশ-গোঁফ-দাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন।"[২] আরো বলেছেন—"রাজনারায়ণবাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙাগড়ার যুগে সকল কার্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার মতো বালকের সহিত মেলামেশা কর্তব্য মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।"[৩] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের মধুর সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে রাজনারায়ণের চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত হয়েছে এই উক্তিতে। পশ্চিমদেশে (কানপুর, এলাহাবাদ, ভাগলপুর) প্রচারকার্য সমাপ্ত করে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে কলকাতায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন, সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের সান্নিধ্য লাভের

১. ডায়ারিতে এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রচনাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি।

২. 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩২৪

৩. তদেব।

সুযোগ পান। সতেরো বছর বয়সে ইংলণ্ড গমনের পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাজনারায়ণকে 'সকৌতূহলে লক্ষ্য' করেছেন। যৌবনে রাজনারায়ণের কাছে দেওঘরেও গেছেন কয়েকবার।[১] এখানে প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবাল্যসঞ্চিত কৌতূহল নিবৃত্ত করেছিলেন।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকগোষ্ঠীর একজন ছিলেন রাজনারায়ণ। বোধকরি দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমেই রাজনারায়ণ এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এটা সম্ভবত ১৮৭৩-৭৪ সালের কথা। হিমাচল বক্রোটা শেখর থেকে দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে দুটি পত্র[২] লিখেছিলেন রাজনারায়ণকে। তা থেকে জানা যায় যে, রাজনারায়ণ রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। রাজনারায়ণ কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনারও অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই এখানে উদ্ধৃত হল: "আমার তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮ বছরের সময় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আমি ভারতীতে যাহা লিখিতাম, তাহা পাঠ করিয়া আমার লজ্জা হয়, তাহা এখনও ছাপার অক্ষরে আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে লজ্জিত করে। রাজনারায়ণ বাবু তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যের সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।"[৩] তৎকালে অপরিমিত কবিত্বশক্তির মধ্যে মহৎ কবিত্বের সম্ভাবনা রাজনারায়ণের চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রথম যে পত্রিকায়[৪] প্রকাশিত হয়, তাতে অন্যান্যদের

---

১. রাজনারায়ণের ডায়ারি থেকে এই বিষয় জানা যায়।

২. ১২ আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "রবীন্দ্রের তত্ত্বাবধারণ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাক, ইহাতে আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি।"—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্র ৮৩

"রবীন্দ্রের ইংরাজী পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না, তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবিদিগের এক ফর্দ করিয়া দিয়াছ। তাহা কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে?"—'পত্রাবলী', পত্র ৮২

৩. 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩২৪

৪. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', অগ্রহায়ণ, ১২৮২— রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয়।

সঙ্গে রাজনারায়ণের রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। আবার প্রথম যে সভায়[১] কবিতা পঠিত হয়, সে সভারও উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রাজনারায়ণ।

সাহিত্য ব্যতীত স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষ রাজনারায়ণ বসুর কাছে। মানিকতলার পোড়োবাড়িতে একসময় যে স্বাদেশিকদের সভা বসত দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সমানে যোগ দিয়েছেন। জীবনস্মৃতির উক্তি তার প্রমাণ—"আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল।" কিশোর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম তখন জেগেছিল কিনা বলা যায় না; তবে অধ্যক্ষের স্বদেশপ্রেমোত্তেজক কার্যবিধির মধ্যে সেদিন তিনি যে একটা প্রবল রহস্যের রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন, তাই-ই তাঁর জাতীয়তাবোধের ভিত্তিভূমিকে সংগঠিত ও দৃঢ় করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রাজনারায়ণের সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দস্মৃতি তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত নাটকে, উপন্যাসে চরিত্রের মধ্যেও রাজনারায়ণের ছায়া পড়েছে। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একখানি পত্রে[২] তিনি বলেছেন যে, 'কাব্যের মধ্যে রিয়েল লোকের আভাষমাত্র থাকে।' তারপর বলেছেন যে, তাঁর 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' গল্পে চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রটির মধ্যে রাজনারায়ণবাবুর আভাষ আছে। এটি রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা। কিন্তু অনুমিত হয় রাজনারায়ণ আরও স্পষ্টভাবে ছায়াপাত করেছেন রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রধান উপন্যাস—'গোরা'র পরেশবাবুর চরিত্রে। শান্ত, সংযত চরিত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী পরেশবাবুর হৃদয় ছিল স্নেহ, প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ। পরেশবাবু পরম বিজ্ঞ, কোথাও উগ্রতার ঝাঁজ নেই, দৃষ্টিভঙ্গীতে অসাম্প্রদায়িক উদারতা, চিত্তের মধ্যে প্রসন্ন প্রশান্তি। রাজনারায়ণের স্মৃতি সম্মুখে রেখেই রবীন্দ্রনাথ বোধকরি পরেশবাবুর মতো মহান্ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' গল্পের সঙ্গেও রাজনারায়ণের স্মৃতি জড়িত।[৩]

---

১. ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জে' হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠ করেছিলেন।

২. দ্রষ্টব্য: চিঠিপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৬

৩. দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫৪), পৃ. ১৬৬

১২২২ সালে রাজর্ষি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দেওঘরে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে।

একদা রাজনারায়ণের বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে[১] কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন দুই ব্যক্তির প্রতি। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব, এবং দ্বিতীয় তাঁর 'বয়স্য' রাজনারায়ণ বসু। বয়সের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও 'চিরবালক' রাজনারায়ণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মিশেছেন সমবয়সীর মতো। জীবনে এ ভালোবাসা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারেন নি। রাজনারায়ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই প্রিয়নাথ সেনকে পত্রে লিখেছেন: "তুমি বোধহয় জান রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যু হইয়াছে— তিনি মহদাশয় ব্যক্তি এবং আমাদের পরম-সুহৃৎ ছিলেন।"[২] এই ঘটনার অনধিক বারো বছর পরে জীবনস্মৃতি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ পরিবারের 'পরম-সুহৃৎ' রাজনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন এইভাবে—"এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃ-প্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৩] রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর রচনায় আশা প্রকাশ করেছিলেন যে উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত সমাজের অভিভাবক-স্বরূপ রাজনারায়ণের স্মৃতি বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজনারায়ণ তাঁর সার্বজনীন ব্যক্তিত্ব বিস্তার করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রোত্তর পুরুষের মধ্যেও। এঁরা সকলেই তাঁর অনুজ। শুধু তাই নয় প্রত্যেকেই তাঁর পুত্রতুল্য। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র (গিরীন্দ্রনাথের পুত্র) গণেন্দ্রনাথের চরিত্র ছিল বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা'য় লিখেছেন: "যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল।" বলা বাহুল্য, এই 'আকর্ষণী শক্তি'র জন্য অনেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। স্বদেশের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগ ছিল। হিন্দুমেলার তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। এই সূত্রেই রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। নাট্যাভিনয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল।

---

১. উক্ত ভাষণ ১৩২৪ সালের কার্তিক মাসের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রিকার অংশবিশেষ পরে 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৭২) প্রকাশিত হয়।

২. 'চিঠিপত্র', ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৩

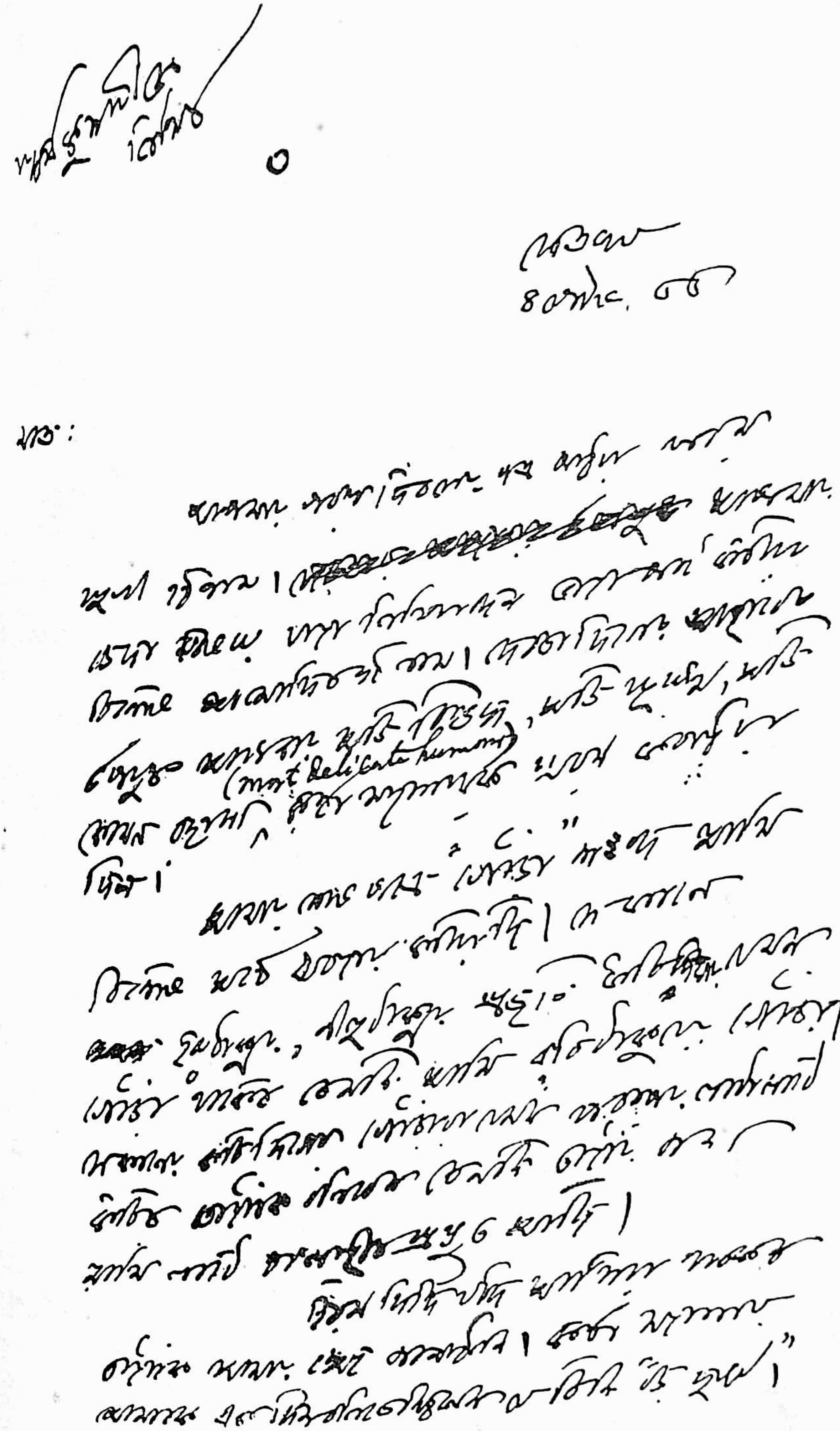
৩. 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫৪), পৃ. ১০১

সংগীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন ; নিজে সংগীত রচনা করতেন। তাঁর রচিত একাধিক জাতীয় সংগীত রাজনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের উত্তর পুরুষের কয়েকজন, সুধীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের অতি বৃদ্ধ বয়সেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা রাজনারায়ণকে পত্রাদি দিয়েছেন। রাজনারায়ণকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি সুধীন্দ্রনাথকে দিয়ে সংগীত রচনা করাতেন। একবার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য তিনি রাজনারায়ণের ফরমায়েশি সংগীত রচনা করে দিতে না পারায় পত্রে[১] দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রাজনারায়ণের প্রতি তাঁর সেই বিনীত শ্রদ্ধার ভাব পত্রে প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে—"অনেক চেষ্টা করিয়া নানা ঝঞ্ঝাটের জন্য গানটি এখনও রচনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য আমিই বিশেষ দুঃখিত। আপনাদের কাজ ঘরের কাজ বলিয়া মনে করি। মনটা সুস্থির থাকিলে নিশ্চয়ই গানটি তৈয়ারি করিয়া পাঠাইতে পারিতাম। আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিবেন।"

তবে এঁদের সকলের মধ্যে রাজনারায়ণকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে ক্ষিতীন্দ্রনাথের। মহর্ষিপুত্র হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ। ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচনা আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। তা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে রাজনারায়ণের পবিত্র সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীর কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-বিনিময় হয়েছে। বৃদ্ধবয়সেও রাজনারায়ণের স্মৃতি অম্লান ছিল তাঁর মানসপটে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বড়োদের সভায় রাজনারায়ণের যাতায়াত, মেলামেশা, হাস্য-পরিহাস দূর থেকে তিনি যেমন দেখেছিলেন, তারই সুনিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর বক্তৃতায় : "আমরা বারাণ্ডায় স্কুলের পাঠ পড়িতাম, আর কালেভদ্রে দেখিতাম যে একটি সবল বৃদ্ধ-যুবক আসিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব, জ্যেঠামহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথন চালাইতেছেন আর মধ্যে মধ্যে সকলের মধ্য হইতে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, দেখিতাম যে তিনি আবার অন্তঃপুরে গিয়া বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের

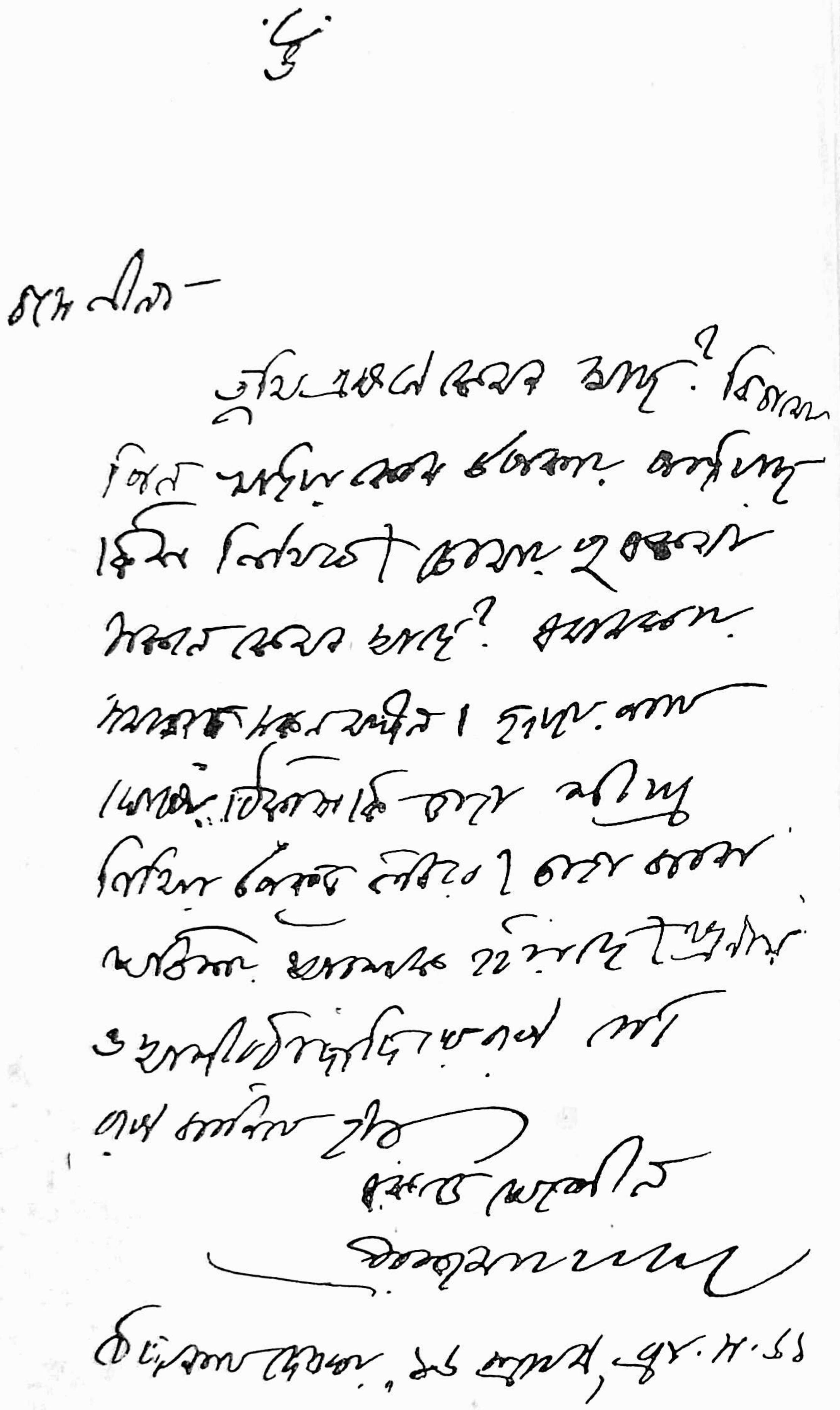
১. জোড়াসাঁকো থেকে লিখিত পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।


দেওঘর
৪ মার্চ. ৮৬

মাত:

(most delicate humour)

স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্রের আংশিক প্রতিলিপি


ওঁ

স্নেহের লীলা —

তুমি এখন কেমন আছ?

কন্যা লীলাবতী মিত্রকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্রের প্রতিলিপি

সঙ্গে আহারে বসিতেন এবং মা পিসি প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন লাভ করিতেন। আমরা দেখিতাম যে আমাদের বাড়ীর কোন মেয়ে বা বধূ, কেহই সেই লম্বিত-পলিত-শ্মশ্রু সদা-হাসিমুখ বৃদ্ধ-যুবকের নিকট লজ্জাবোধ তো দূরের কথা, এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।"[১]

মহর্ষি-পরিবারের অন্তঃপুরিকাদের এই নিঃসংকোচভাবের জন্যই মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গেও তাঁর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সৌদামিনী দেবীকে রাজনারায়ণ অতি স্নেহভরে 'মা' বলে ডাকতেন, স্বর্ণকুমারী দেবীকে পত্রে সম্বোধন করতেন 'মাতঃ' বলে। রাজনারায়ণ দেওঘরে চলে যাবার পর সৌদামিনী দেবী ও তাঁর মধ্যে যে পত্রবিনিময় হত তাতে মাতাপুত্রের সম্পর্কটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজনারায়ণের শারীরিক অবস্থার জন্য এবং তাঁর পরিবারের কুশলবার্তা জানার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হতেন। পিতার জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলে তখনই রাজনারায়ণের কথা স্মরণ করতেন। রাজনারায়ণের কর্ম-সাধনায়ও সৌদামিনী দেবী উৎসাহ ও সাহচর্য দান করতেন। দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম নির্মাণে উৎসাহী রাজনারায়ণকে তিনি সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'সাধনা' পত্রিকার জন্য গ্রাহক জোগাড় করে দিতে হবে,[২] বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথের) 'আর্যামি ও সাহেবিয়ানা'র ইংরেজী অনুবাদ করে ম্যাক্সমূলারকে পাঠাতে হবে,[৩] শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে যেতে হবে, ইত্যাদি নানান্ আবেদন নিয়ে এক-একবার এক-একটি পত্র পৌঁছেছে রাজনারায়ণের কাছে। সময়ে সময়ে পত্রে তাঁকে তাঁর আদর্শের জন্য অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি: "আপনার ভিতরে

---

১. রাজনারায়ণের স্মৃতিসভায় পঠিত বক্তৃতা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক, ১৮৪৪ শক, পৃ. ১৫৯-১৬০

২. পার্ক স্ট্রীট থেকে ৩ পৌষ, বৃহস্পতিবার লেখা—"...আমাকে ছেলেরা ধরিয়াছে আপনাকে লিখিবার জন্য তাদের সাধনা কাগজের কতকগুলি গ্রাহক আপনার করিয়া দিতে হইবে ওখানে আপনার সহিত অনেক লোকের আলাপ হইয়াছে তাদের বলে কহে যদি কাগজ লওয়াতে পারেন।" —'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৬৯

৩. "আমার ভারি ইচ্ছা যে, বড়দাদার ওই বক্তৃতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে ম্যাক্সমূলারকে উপহার পাঠান হয়। কিন্তু ওরূপ বাঙ্গালা অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে আর যে সে লোকেরও কর্ম নহে। আপনি যদি একটু কষ্ট লইয়া চেষ্টা করেন, নিজে বোধ হয় এখন পারিবেন না।"—৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবারের পত্র থেকে।—'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৬৯

যতটা এখনো হিন্দু ভাব আছে, হিন্দু সমাজের মধ্যে ততটা আছে কি না সন্দেহ।"

মহর্ষির চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর স্নেহের সম্পর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সাহিত্যিক জীবনে সর্বপ্রকারে উৎসাহ লাভ করেছিলেন রাজনারায়ণের কাছ থেকে। স্বর্ণকুমারীর রচনায় বিশুদ্ধ কৌতুকরসের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: "দেবতাদিগের আহারের উপযুক্ত আপনার অতি বিশুদ্ধ, অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল রহস্য (most delicate humour) কর্তা মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিল।"[১] স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন দীর্ঘদিন। রাজনারায়ণ ছিলেন 'ভারতী'র তথা স্বর্ণকুমারী দেবীর শুভাকাঙ্ক্ষী। "মাতঃ আমি ভারতীর মঙ্গলের জন্য প্রাতঃ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে[র] দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার এই প্রথম অনুষ্ঠান। যদি আমাদিগের দেশের সেরূপ স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তি (chivalry) থাকিত তাহা হইলে এতদিনে কত গুণবন্ত লোক আপনার সাহায্য জন্য দৌড়িত।"[২] পত্রিকা সম্পাদনা বিষয়ে রাজনারায়ণ নানারকম নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবীকে।[৩] এই বিষয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য তিনি সমর্থ হন নি: "কি করিব আমি 'cripple' হইয়া পড়িয়াছি।" রাজনারায়ণ প্রতি মাসে 'ভারতী' পত্রিকার সমালোচনা করে পত্র দিতেন স্বর্ণকুমারী দেবীকে। ডায়ারিতে তিনি এ-সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহাকাঙ্ক্ষী পুত্র'[৪] রাজনারায়ণ এইভাবে গভীর স্নেহ-প্রীতির বন্ধনে ঠাকুর-পরিবারের তিন পুরুষের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্কসূত্রে জড়িত ছিলেন। সমগ্র ঠাকুর-পরিবারের তিনি ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ, প্রকৃত সাহিত্য-অভিভাবক।

---

১. রাজনারায়ণ বসুর অপ্রকাশিত পত্র। দেওঘর থেকে ব্রাহ্মসম্বত ৫৫, ৪ পৌষে লিখিত।

২. তদেব

৩. পত্রে (দেওঘর, ৪ পৌষ, ৫৫) লিখেছেন: "আমি ভারতীতে লিখিবার উপযুক্ত কতকগুলি নূতন প্রস্তাব করিব ঠাওরাচ্ছি।"

৪. স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত পত্রের শেষে রাজনারায়ণ 'স্নেহাকাঙ্ক্ষী পুত্র' বলে ইতি করতেন।

রাজনারায়ণ তাঁর সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠাবান্ প্রত্যেকের সঙ্গেই সুপরিচিত ছিলেন। শিক্ষিতসমাজে বা অভিজ্ঞ মহলে এই প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস বা পরিশ্রম তাঁকে কোনোদিনই করতে হয় নি। যা পেয়েছেন, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের এককালীন কর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মতের মিল ছিল না। তবুও তাঁদের এই মতান্তর কখনো 'মনান্তরে' পরিণত হয় নি। রাজনারায়ণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল সবসময়ই: "আপনি যাবৎ ইহলোকে বিদ্যমান আছেন, তাবৎ সুখে স্বচ্ছন্দে কালহরণ করেন, ইহাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি"।[১] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রাজনারায়ণের ধর্ম ও সমাজ-সম্পর্কীয় দীর্ঘ বাদানুবাদের কথা আমাদের স্মরণ আছে। কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিপরীত সম্বন্ধ ছিল উভয়ের মধ্যে। কেশবচন্দ্র রাজনারায়ণের প্রতি প্রথমাবধি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পত্রে (কলুটোলা, কলিকাতা ২৮ জুলাই, ১৮৭১) তার প্রকাশ: "বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ…।"[২] উভয়ের ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধসূত্রে কেশবচন্দ্র রাজ-নারায়ণকে সম্বোধন করতেন 'ব্রহ্মপরায়ণ দাদা' বলে। মনে হয় রাজনারায়ণ এরূপ সম্বোধনে কিছু কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। তার উত্তরে কেশবচন্দ্র লিখেছিলেন: "আপনার স্নেহ মমতার জন্য আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। "ব্রহ্মপরায়ণ-দাদা" সম্বোধনটি যদি আপনার মিষ্ট লাগে আমি তৎপ্রয়োগে কেন বিমুখ হইব?"[৩]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রীর সৌভাগ্য হয়েছিল রাজনারায়ণের নিবিড় সান্নিধ্য লাভের। পরবর্তীকালে তিনি রাজনারায়ণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'আত্মচরিতে' লিখেছেন:

---

১. উত্তরপাড়া বালি থেকে ১২৯১ সালের ২৫ ভাদ্র লিখিত পত্র। ১৩০২ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকায় (পৃ. ১৩৮) প্রকাশিত।

২. 'আচার্য কেশবচন্দ্র', মধ্য বিবরণ, ৫ম অংশ, ১৮১৮ শক, পৃ. ৭৩২

৩. কলকাতা থেকে ২১ নভেম্বর, ১৮৮৩ সালে লেখা। দ্রষ্টব্য 'আচার্য কেশবচন্দ্র', মধ্য বিবরণ, ৫ম অংশ, ১৮১৮ শক।

"তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সরল অকৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত।" স্বদেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন রাজনারায়ণের কাছ থেকেই। 'সিংহল-বিজয়' অভিযান সম্বন্ধে লেখার জন্য রাজনারায়ণ শিবনাথ শাস্ত্রীকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তি: "A truer and more sincere patriot than Rajnarain Bose I have never seen."[১]

রাজনারায়ণ যখন মেদিনীপুর স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন, তখন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শিবনাথ গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। দেওঘরে তিনি একাধিকবার গেছেন কেবলমাত্র তাঁর 'বিমল সহবাসে' কিছু সময় অতিবাহিত করার জন্য। উভয়ের সাক্ষাৎকারের বিবরণ রাজনারায়ণের ডায়ারিতে[২] লিপিবদ্ধ আছে। দেওঘরে তিনি রাজনারায়ণের জীবনযাত্রা প্রণালী দেখেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে রাজনারায়ণের পবিত্র স্পর্শে দেওঘর শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পুণ্য তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল। একবার কোনো এক পাণ্ডার সঙ্গে কথোপকথনকালে রাজনারায়ণ বসুকেই পাণ্ডা বলে উল্লেখ করলে উত্তরে শোনেন: 'তিনি তো দ্বিতীয় বৈদ্যনাথ, তিনি মানুষ নন স্বর্গের দেবতা!'

মাইকেল মধুসূদনের জীবনকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসু এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন—"যে দেশে কোন গুণবান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ সৌভাগ্যবান্; কিন্তু যে দেশে গুণবানের সমকালে তাঁহার গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমান থাকেন, সে দেশ আরও অধিক সৌভাগ্যবান।" রাজনারায়ণের জীবন-কথা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে,

---

১. Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, 1966. p. 127

২. ডায়ারির অংশ—

১৯ ফাল্গুন ১২৯৪, ২ মার্চ ১৮৮৭, বুধবার— "শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত আমার অনেক গল্পগাছা হইল। শিবনাথ ধর্ম্মপরায়ণ অথচ বিলক্ষণ সুরসিক ব্যক্তি। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিলাম যে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস নাকি শিবনাথ তাঁহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন—

"তুই রসেভাসে বেশ আছিস্", এতে (অর্থাৎ ধর্ম্মেতে) পরমহংসজীর ভুল হইয়াছিল। লোকে সুরসিক অথচ ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে ইহা তিনি বুঝেন নাই। যখন একথা বলিয়াছিলেন তখন নিজে যে তিনি একজন সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"

তাঁর সমকালীন দেশ ও তিনি যুগপৎ সৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁর জীবিতকালে দেশের মানুষ সভা-সমিতি করে, মাল্যদান করে তাঁকে অভিনন্দিত না করতে পারেন, কিন্তু রাজনারায়ণ আজীবন দেশের ও দশের শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা পেয়েছেন। কবি প্রসন্নময়ী দেবী[১] (১৮৫৭-১৯৩৯) রাজনারায়ণকে সম্বোধন করতেন 'পুত্র' বলে। রাজনারায়ণ তাঁকে সম্বোধন করতেন 'মা' বলে। উভয়ের মধ্যে এই সম্ভাষণেই পত্র-বিনিময় হত। আর এই সম্পর্কসূত্রেই আশুতোষ চৌধুরীকে (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, প্রসন্নময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠ সহোদর) রাজনারায়ণ ডাকতেন 'বড়োমামা' বলে।

কৃষ্ণনগর থেকে দেওঘরে রাজনারায়ণকে লিখিত প্রসন্নময়ী দেবীর দীর্ঘ পত্রগুলির কোনোটিতে[২] ব্যক্তিগত জীবনের কথা, কোনোটিতে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। তা ছাড়া প্রতি পত্রে তিনি পরিবারের প্রত্যেকের সংবাদ নিতে এবং 'শ্রীমতী বউমাকে'[৩] সম্মান জানাতে ভুলতেন না। রাজনারায়ণকে তিনি সম্বোধন করতেন পুত্র বলে, কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন গুরুর মতো: "আমার মানসিক বিষণ্ণতা কখনো২ এত প্রবল হয় যে জীবনের চারিদিকে সমুদায় কেবল অন্ধকার বোধ হয়।...আপনাকে এই সকল লিখিবার অর্থ আপনার নিকট শিক্ষালাভ। আমি শিখিতে বড় ভালবাসি, শিক্ষাই আমার একমাত্র প্রধান কার্য্য।"[৪] সাহিত্যসেবিকা হয়ে তিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিকের কাছে সাহিত্যকর্মের আবেদন জানাতেও ভোলেন নি: "আপনি অবকাশমত দুই-চারি মাসের মধ্যেও যদি কোন একটি প্রবন্ধ "পতাকা"য় লেখেন তবে আমার অতিশয় আহ্লাদ হয়। যে কাগজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে তাহাতে আপনি কখন কিছু লিখিলে কত যে ভাল লাগে বুঝিতে পারিবেন...।"[৫] রাজনারায়ণকে ঘিরে শিক্ষিত-সমাজের এইরকম ভালোলাগার অন্ত ছিল না।

---

১. কবি হিসেবে উনিশ শতকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর লেখা প্রায় চারখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। তা ছাড়া প্রসন্নময়ী দেবী ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, উপন্যাস ইত্যাদিও রচনা করেছিলেন। ইনি সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা।

২. পত্রটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩. রাজনারায়ণের সহধর্মিণীকে প্রসন্নময়ী দেবী উক্ত নামে অভিহিত করতেন।

৪. অপ্রকাশিত পত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৫. তদেব

রাজনারায়ণের সহপাঠীরা সকলেই তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী, প্রগতিবাদী মধুসূদন এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়া অনুরাগী, রক্ষণশীল ভূদেব— উভয়েই রাজনারায়ণকে অকৃত্রিম সুহৃদ মনে করতেন। বাল্যকাল থেকেই রাজনারায়ণের বন্ধুত্বের ভিত্তি প্রেমে, ত্যাগে, বিশ্বাসে, আত্মবিসর্জনে হয়েছিল দৃঢ়বদ্ধ। তাই দুই প্রান্তের দুটি বিপরীতমুখী জীবন নদীকে সম্মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিল রাজনারায়ণের উদার ব্যক্তিত্ব। মধুসূদন তাঁর কাব্য-চর্চার পদে পদে রাজনারায়ণের দিকে চেয়ে থাকতেন। ভূদেব ততটা না হলেও রাজনারায়ণের মনীষা ও ঐতিহ্য-প্রীতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মনোভাব পোষণ করতেন। রাজনারায়ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির উদ্ভাসিত মহিমা দেখে ভূদেব নিজের যজ্ঞোপবীত বন্ধুর কণ্ঠে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই পিতৃভূমি কান্যকুব্জ দর্শনে ভূদেব রাজনারায়ণের সঙ্গী হয়েছিলেন। ধর্মীয় মতবাদে দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এঁদের বন্ধনসূত্র জীবনে কোনোদিন ছিন্ন হয় নি। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রকাশিত হবার পর ভূদেব তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে পত্র[১] দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ-পরিকল্পিত জাতীয় হিন্দুসভা স্থাপনের উদ্‌বোধন সংগীতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের প্রস্তাবটি কিন্তু ভূদেব সমর্থন করেন নি। তবে তিনি হিন্দু জাতীয়সভা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত রাজনারায়ণের ব্যক্তিচরিত্রে, পাণ্ডিত্যে ও চিন্তাধারায় ভূদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন।

আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ব্যতীত বাংলাদেশের কতজন যে কতভাবে একসময় তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই-সব অগণিত শরণাগতদের পত্রগুলি আজ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। কলকাতা থেকে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৯): "Many thanks for your sympathy *in this our loss*, which has left an ever gnawing

---

১. চুঁচুড়া থেকে ১৮৮৯ সালের ৬ জানুয়ারি রাজনারায়ণকে ভূদেব লিখেছিলেন: "A pamplet entitled "Old Hindu's Hope" has come to me by dak, has given me his best & affectionate regards. Can this writer be any other than yourself ?" ...I have read the lectura with exceeding pleasure."—মূল-পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

permanent sore in this heart."[১] প্রকাশচন্দ্র রায় (বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা) বাঁকিপুর থেকে ১৮৯১ সালে (৫ সেপ্টেম্বর) লেখেন : "It is needless to tell you of what value your few words on our life, were to me."[২] প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্র) পত্রে (৩০ শ্রাবণ, ৬১) লিখেছিলেন : "আপনি পত্র না পাইয়া আমার সংবাদ পত্রান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার স্নেহ ও ভালবাসা অতুলনীয়। আমরা আপনার স্নেহের যোগ্য পাত্র নহি।"[৩] রিচার্ডসন-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের প্রস্তাবের উত্তর দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন—"I quite agree with you that there should be a memorial meeting only in honour of Major D. L. R. in the manner of a conversazione tho' we need not call it by that name and that there should as little fuss about it as possible. As you propose, there need be no advertisement, no president and no speechifying, we should content ourselves with having some readings from Shakespeare, a short account of the life of the departed worthy, and some music, and the invitations to the surviving pupils (alas how few they are in number) residing in and about Calcutta and to selected guests likely to take an interest in the proceedings."[৪]

মধুসূদনের লেখা পত্রাবলী যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই 'প্রিয় রাজ'কে 'old boy' রাজনারায়ণকে চেনেন। সাহিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মধুসূদন সর্বদাই রাজনারায়ণকে সঙ্গী করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সহপাঠী রাজনারায়ণের সঙ্গে পাঠ্যজীবন অপেক্ষা মধুসূদনের হৃদ্যতা গভীর হয়েছিল সাহিত্যচর্চাকালে। রাজনারায়ণ-কর্তৃক কাব্য-প্রশংসা শুনে মধুসূদন তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। এবং রাজনারায়ণকে 'one of the

---

১. *Amrita Bazar Patrika*, Puja Annual 1962, p. 88.

২. Ibid.

৩. প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত পত্রটি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪. *Amrita Bazar Patrika*, Puja Annual 1962, p. 87-88.

representative men of the day' বলে অভিনন্দিত করেন। সেই থেকেই মধুসূদন তাঁর সমস্ত রচনা সম্বন্ধে সমালোচক রাজনারায়ণের সূক্ষ্ম রসবিশ্লেষণ আশা করতেন :

"I shall look out for a long letter from you— biographical, historical and critical".[১]

মধুসূদনের প্রতি রাজনারায়ণের প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় বহন করছে তাঁর 'আত্মচরিতে'র কথাগুলি "মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।"[২] মধুসূদন সম্পর্কে রাজনারায়ণের উক্তিটি তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রেমপূর্ণ, স্নেহময় অন্তর, উদারতা ও শিশুসুলভ সরলতা উভয়ের মধ্যে সমান ছিল বলেই এমন গভীর হৃদয়সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মধুসূদনের আত্মশ্লাঘা যেমন ছিল খাঁটি, অকৃত্রিম, তেমনি সর্ববিষয়ে অকৃত্রিমতা রাজনারায়ণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিত আছে উভয়ের বন্ধুত্বের কাহিনী। মধুসূদনের জীবনী-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু উক্ত কর্মে নিযুক্ত হয়ে তাঁর (মধুসূদনের) বন্ধুবর্গের কাছে স্মৃতিমূলক রচনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার উত্তরে রাজনারায়ণ কর্তৃক লিখিত পত্রে[৩] একটি দিনের স্মৃতিকথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। রাজনারায়ণ ঐ পত্রে সবশেষে লিখেছেন : "মধুসূদনের সম্বন্ধে আমার সকল স্মৃতিই মধুময়।" মধুসূদনের মতো প্রতিভাবান কবিকে দিয়ে 'সিংহলবিজয়' নামে একখানি কাব্য রচনার পরিকল্পনা[৪] রাজনারায়ণ প্রস্তুত করে পাঠিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। মধুসূদন রাজনারায়ণের এই নির্দেশ মনোমত বলে জানিয়েছিলেন।[৫]

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানির পরিকল্পনায় রাজনারায়ণের অভিমতের মূল্য দিয়েছিলেন মধুসূদন। নাটকখানি প্রকাশিত হবার পর রাজনারায়ণের

---

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', (১ম সং ১৮৯৩) পৃ. ৩৭৪

২. আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ. ৭৩

৩. দ্রষ্টব্য : যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের পরিশিষ্ট।

৪. পরিকল্পনাটির বিষয় যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে (৫ম সং, ১৯২৫) মুদ্রিত রাজনারায়ণের পত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩১১-৩১৩

৫. দ্র. সপ্তদশ পত্র, যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১ম সং ১৮৯৩) পৃ. ২৬১ ; ঊনবিংশ পত্র, পৃ. ২৬৬ ; ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র, পৃ. ৩৯১

অভিমত প্রত্যাশা করে পত্র লেখেন।[১] ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার পর রাজনারায়ণের অভিমতই কবির কাছে অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল।[২] ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে হয়তো মধুসূদনের মনে কিছু কুণ্ঠা ছিল। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের বৈষ্ণব-বিরোধিতার[৩] কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছিলেন, "you must also tell me what you think of them।" বীরাঙ্গনা কাব্যখানি মধুসূদনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই কাব্যরচনায়ও রাজনারায়ণের বিচারবুদ্ধির উপর কবি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেছেন।[৪] মধুসূদনের সনেট লেখার প্রচেষ্টাটি 'কবি-মাতৃভাষা' নামক কবিতায় দেখা যায়। এই কবিতাটি পরে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'বঙ্গভাষা' নামে পুনর্লিখিত হয়েছে। সনেটের এই প্রথম নিদর্শনটি রাজনারায়ণকে পাঠিয়ে লিখেছিলেন: "I want to introduce the sonnet into our language" তারপর সনেটটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "What say you to this, my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian."[৫] 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' রাজনারায়ণ পছন্দ করেছেন জেনে মধুসূদন কত খুশি![৬] মধুসূদন তাঁর নাট্যসাহিত্যের মূল্যায়ণ সম্বন্ধেও রাজনারায়ণের অভিমতের প্রত্যাশী ছিলেন। রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব ও রসদৃষ্টি মধুসূদনকে যে মুগ্ধ করেছিল এই পত্রগুলিই তার প্রমাণ।

---

১. "I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princes Kissen Kumari. ...But you must judge for yourself."—পঞ্চবিংশ পত্র, পৃ ৩৭৬

২. "I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry."

৩. "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Pooh man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.—১৮৬১ সালের ২৯ আগষ্ট।—ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র।

৪. "...I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords···But you must judge for yourself."—চতুস্ত্রিংশ পত্র, পৃ. ৪১৭

৫. দ্রষ্টব্য পঞ্চবিংশ পত্র, পৃ. ৩৭৬-৭৭

৬. "As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces,..."—সপ্তদশ পত্র, পৃ. ২৬০

মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনা রাজনারায়ণ সমর্থন করেছেন জেনে মধুসূদন লিখেছেন: I am glad you like the opening lines."[১] কোনো-একটি পঙ্‌ক্তি লিখে মিলটনের রচনা-সাদৃশ্যে দেখিয়েছেন এবং তারপর 'stealing and giving odour'—এই ভাবটি প্রকাশে "কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা"—এই পঙ্‌ক্তিটি সুষ্ঠুতর কিনা তাও রাজনারায়ণের কাছে জানতে চেয়েছেন। একটি পত্রে লিখেছেন: "···is not the word "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?"[২] "আইলা তারাকুন্তলা শশীসহ হাসি"—এই পঙ্‌ক্তিটির পরিবর্তে "আইলা সুচারুতারা শশীসহ হাসি"—এরূপ প্রয়োগে শিল্পগত উৎকর্ষ ঘটে কিনা তাও রাজনারায়ণের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মেঘনাদবধ সম্পূর্ণ হলে মধুসূদন লিখলেন; "···I am impatient for your verdict— you know you give very useful hints— yet I shall wait till you read the whole poem."[৩] মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে সকলেই যে একসময় রাজনারায়ণের ভাষার[৪] প্রতিধ্বনি করেছিলেন, য়ুরোপযাত্রার প্রাক্‌কালে সে কথা তিনি প্রিয়বন্ধুকে (রাজনারায়ণকে) জানিয়ে যান। রাজনারায়ণকে লিখিত পত্রাদিতে ছন্দব্যবহারের কৌশল নিয়েও কত আলোচনা দেখা যায়।[৫] রাজনারায়ণ খুব বড় ছান্দসিক ছিলেন তা নয়, তবু তাঁর মন্তব্যের মূল্য মধুসূদনের কাছে কম ছিল না। ট্যাসোর Ottava Rima ব্যবহার

---

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩) অষ্টাদশ পত্র, পৃ. ২৬৩

২. তদেব, দ্বাবিংশ পত্র, পৃ. ৩৯০

৩. তদেব, অষ্টাবিংশ পত্র, পৃ. ৩৮১

৪. "First poem in the language."

৫. ১৮৬০ সালের ১ জুলাই মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছেন: "You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accents and quantity, is an "apostate", that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family Priest !" —ঊনবিংশ পত্র, পৃ. ২৬৫

একই সালের ১৭ই জুলাই একটি পত্রে লিখেছেন: "I have made up my mind to write (Deo volente !) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you.

করবার ইচ্ছাও তিনি রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন: "perhaps I shall write your সিংহলবিজয় in that measure."

রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্র থেকে আরো জানা যায় যে, তৎকালীন খ্যাতনামা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজনারায়ণের অভিমত-প্রত্যাশী ছিলেন। মধুসূদন বলেছেন: "He (রঙ্গলাল) is proud of your approbation." তৎকালীন কবিকুল রাজনারায়ণের approbation ছাড়া যেন নিজেদের প্রতিভার পরিমাপ করতে সাহসী হতেন না। মধুসূদনের কবিহৃদয়ের সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগাযোগ খুব আন্তরিক ছিল বলেই এইভাবে মধুসূদন তাঁর সাহিত্যজীবনকে রাজনারায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে রাজনারায়ণের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরো পরিস্ফুট হয়েছে শেষ দুখানি পত্রে। একটিতে লিখেছেন: "But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I···must bid adieu to the Muse." শেষ পত্রে (১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত) 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক কবিতাটি লিখে শেষ আবেদন জানালেন, "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।" মধু শব্দটিতে যে শ্লেষ ব্যঞ্জনা তার কারুণ্য বড় অপূর্ব। মধুসূদনের আর একটি মিনতি "Remember your friend and take care of his fame." যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পত্রে রাজনারায়ণ এই আবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন।[১] মধুসূদনের জীবনী রচনাকাজে যথাসাধ্য সাহায্য করে বন্ধুকৃত্য করার শ্লাঘাও তিনি বোধ করেছেন। মধুসূদনের কৃতিত্বে ও তাঁর যশোপ্রকাশে রাজনারায়ণের দান নিতান্ত কম নয়।

সাহিত্য-অভিভাবকরূপে রাজনারায়ণ তাঁর সমকালে প্রভূত সম্মান পেয়ে এসেছেন। একসময় 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস'-লেখক জি. এস. লিওনার্ড[২]

No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it. But of all that hereafter."—বিংশ পত্র, পৃ. ২৬৯

১. এই পত্রটিসহ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত ও রাজনারায়ণকে লিখিত মাইকেল মধুসূদনের যাবতীয় পত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১ম সং, ১৮৯৩) থেকে সংগৃহীত।

২. জি. এস. লিওনার্ড কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারি। রাজনারায়ণকে পত্রগুলি লিখেছিলেন ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে। কিন্তু এই সময় তিনি উক্ত স্থলাভিষিক্ত ছিলেন না।

উপাদানের জন্য রাজনারায়ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; অন্যতম প্রেরণাদাতাও ছিলেন রাজনারায়ণ। লিওনার্ডকে একখানি পত্র লিখে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার পত্রিকা পাঠাবার পর লিওনার্ড উৎসাহিত হয়ে রাজনারায়ণকে উত্তরে লিখেছিলেন, "They will be of material help to me in my endeavour to become acquainted with the history and teachings of the Brahmo Samaj, a subject which inspires me with a deep interest···" (I. I. 1877.—Asiatic Society's Rooms, Calcutta).

রাজনারায়ণ গ্রন্থ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে উপকরণ সংগ্রহ করে লিওনার্ডকে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ১৮ জুলাই তারিখে লেখা একখানি পত্রে তিনি সশ্রদ্ধভাবে তা স্বীকার করেছেন। তার পূর্বে রাজনারায়ণ যেমন ব্রাহ্মসমাজের একখানি প্রামাণিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, তেমনি অনুভব করেছিলেন যে, সেই ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হোক। আদর্শ হিন্দুধর্মের নিকর্ষ রূপে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হোক। তাই তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের লেখা এক পাণ্ডুলিপি লিও-নার্ডকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ বৎসর ৭ আগস্ট তারিখে সেই পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে লিওনার্ড লিখেছিলেন, "Allow me to return you your ms. I have read it with attention and enjoyed it with much pleasure & I must confess that from whatever stand point your subject is received, you have made out a strong case for the superiority of the Hindu religion over any other religion."

ঐ পত্রেই তিনি রাজনারায়ণের সঙ্গে একমত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা প্রকাশ করেছিলেন।[১] এতে বোঝা যায় যে ইতিহাস রচনায় রাজনারায়ণের প্রেরণা ও নির্দেশনা লিওনার্ড মান্য করে নিয়েছিলেন। *Calcutta Review*-তে প্রকাশের পূর্বে লিওনার্ড রাজনারায়ণের কাছে

---

১. "In my opinion a very brilliant future is let before the Samaj. As soon as suitable Education has gained a footing, the old conservative Hindus have died out, we may confidently look to its universal adoption." —Leonard's letter dated 7th Aug. 1877.

পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ প্রশংসা করেছিলেন, সংশোধনও করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের একখানি পত্রে লিওনার্ড লিখেছিলেন, যে সংশোধনীগুলি তিনি সানন্দে গ্রহণ করছেন।[১] লিওনার্ডের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস গ্রন্থের রামমোহন প্রসঙ্গটি (P. I) লেখার পর রাজনারায়ণের কাছে মহর্ষির অভিমতের জন্য প্রেরিত হয়। ১২ অক্টোবরের চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথের সমর্থনের আনন্দ জানিয়ে লিওনার্ড লিখেছিলেন, "Before sending the ms. back to Mr. Smith the printer of the Calcutta Review, I will insert all the corrections made by you under Debendra Babu's instruction."

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ রচনার সময়েও লেখক যে পদে পদে রাজনারায়ণের নির্দেশ-উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন লিওনার্ড-লিখিত পত্রগুলিতে তা বোঝা যায়। ঐ পুস্তকের মুদ্রণ-পরিপাট্য সম্বন্ধেও তিনি রাজনারায়ণের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।[২]

লিওনার্ড ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনার সময় রাজ-নারায়ণের প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। রচনার পাণ্ডুলিপিতে রাজনারায়ণ সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছিলেন।[৩] এই পাণ্ডুলিপিতে রাজনারায়ণের অসাধারণ কৃতিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য রাজনারায়ণ বোধ করি বিনয়বশত প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা আত্মপ্রশংসায় তিনি ছিলেন কুণ্ঠিত। উত্তরে লিওনার্ড লিখলেন :

---

১. "I quite agree with all your corrections and must congratulate you in the felicity of your diction. I am glad you think it well written as it then stands a chance of seeing it in book form."—লিওনার্ডের অপ্রকাশিত মূল পত্রগুলি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২. লিওনার্ড পত্রে লিখেছেন : "I hope my numerous letters and applications to you for assistance are not intrusive. I know you have many claims upon your time, and that I have no claim upon you except the claim which one sympathetic "soul" has for another."

৩. "Your additions to chap. II, will be duly made when I receive proofs. I have all your letters on the subject in my box separate so that there is no fear of my forgetting it." (6th April 1878).—লিওনার্ডের এই অপ্রকাশিত মূল পত্র ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

I have also something to say to you, you must not allow your modesty to make you forget the fact that you have been a powerful bulwark and defence of the Adi Samaj, and consequently no body has a greater right than you to adorn the pages of a History of reformation which you have for so many years ably assisted."

রামমোহনের জীবনীরচনার জন্য মিস কোলেট্‌ও একসময় রাজনারায়ণের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। লিওনার্ড-প্রদত্ত রামমোহন-প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের উল্লেখ মিস কোলেট বর্জন করেছিলেন। কারণ রাজনারায়ণ ঐ প্রসঙ্গকে প্রামাণিক মনে করেন নি।[১]

কোলেটের চিঠি থেকে জানা যায় যে রামমোহনের ভ্রাতৃবধূর সতীদাহ-প্রসঙ্গ রাজনারায়ণ বাবুর পিতার মুখ থেকে শোনা কাহিনী নয়। রাজনারায়ণের কাছ থেকে জানবার পর কোলেট এই প্রসঙ্গের সঙ্গে রাজনারায়ণকে আর যুক্ত করেন নি। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন যে সতীদাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বেদনা যে রামমোহনের মনে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবে রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতায় তার উল্লেখ আছে। মিস. কোলেট সেই উল্লেখটুকু বর্জন করেন নি।[২] তাঁর গ্রন্থখানিকে নির্ভুল ইতিহাসসম্মত করবার চেষ্টায় রাজনারায়ণ যে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোলেট লিখেছিলেন— "...accept my warm thanks for your kind letter of July 21. and all your replies to my quiries for which I am greatly obliged."— পত্রটির রচনাকাল ১৮৯৯ সালের ২১ আগস্ট।

সমসাময়িক প্রজ্ঞাবান পণ্ডিতদের সঙ্গে রাজনারায়ণের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

---

১. 135, Avenell Road, Highbury, London. N. থেকে মিস. কোলেট রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, "From what you say, I decide to drop the story of Narottama Thakur, for which there seems no sufficient evidence."

২. ঐ একই পত্রে মিস. কোলেট লিখেছিলেন, "But although you did not hear of it from, your father, I venture still to think that your speech at the Maghotsab of 1879 sufficiently implies a belief in Rammohon's presence at that ceremony."

রাজনারায়ণের পাণ্ডিত্য ও রসবুদ্ধিতে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তেরও আস্থা ছিল প্রগাঢ়। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে; ইনি 'Veteran in criticism as in letters'. তাঁর *Ancient India* গ্রন্থের জন্য রাজনারায়ণ তাঁকে অভিনন্দন জানালে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন: "I have ever entertained feelings of esteem and sincere respect for you." রাজনারায়ণের ধর্মপ্রচার এবং সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রভূত প্রশংসায় রমেশচন্দ্র ছিলেন পঞ্চমুখ। হিন্দুধর্মশাস্ত্র সংকলন করবার সময়ে তিনি রাজনারায়ণের সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি অংশ রচনার সময়ে রাজনারায়ণের মূল্যবান উপদেশ অনুসরণ করতেন। রাজনারায়ণের পরামর্শানুযায়ী তিনি হিন্দুশাস্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ ভাগে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১] *Ancient India* নামে গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং রাজনারায়ণের অভিমত নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে রাজনারায়ণের কৌতূহল ছিল অদম্য। তাই রাজনারায়ণ 'প্রতিষ্ঠান', 'কুশস্থলী' প্রভৃতি স্থানগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে যে পত্র দেন, রমেশচন্দ্র বিনীতভাবে তার উত্তর দিয়েছিলেন।[২] পুরাবৃত্ত-সম্বন্ধীয় এই চর্চায় রাজনারায়ণের উৎসাহ ও অবদান সেকালের সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু উক্ত গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য রাজনারায়ণের গৃহে নিয়মিত আসতেন।[৩] তা ছাড়া

১. রমেশচন্দ্র 'দক্ষসংহিতা' থেকে পুরুষদের নিত্যকর্ম এবং ব্যাসদেবের রচনা থেকে নারীদের নিত্যকর্ম অনুবাদ করে দিয়েছিলেন রাজনারায়ণের নির্দেশক্রমেই। ১৮৯৫ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে হুগলী থেকে লেখা পত্র।

২. মেদিনীপুর থেকে ১৮৯২ সালের ১৪ মে তারিখে লিখিত পত্র। —রমেশচন্দ্র দত্তের অপ্রকাশিত মূল পত্রগুলি ৺বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩. ১ অগ্রহায়ণ, ১৬ নবেম্বর, বুধবার— "...সন্ধ্যার একটু পরে হেড মাষ্টার, যোগীন ও আমি আমরা এই তিনজনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী কিরূপ লেখা হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করি।"

২ অগ্রহায়ণ, ১৭ নবেম্বর, বৃহস্পতিবার— "...বৈকালে হেডমাষ্টার আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত মাইকেলের জীবনী লেখার সম্বন্ধে গৌরদাস বসাক যে পত্র লিখিয়াছেন সে বিষয়ে কথা হয়।" —'ডায়ারি'র অংশ

জে. এইচ. উইলসন,[১] জোন্সসাহেব,[২] সিদ্ধেশ্বর ঘোষ,[৩] সীতানাথ দত্ত[৪] প্রভৃতি আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনারায়ণের নিকট উপস্থিত হতেন বিভিন্ন আর্জি নিয়ে। রাজনারায়ণ নিজের যোগ্যতানুসারে চিরদিন সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করেছেন।

রাজনারায়ণের জীবন-পরিক্রমায় দেখা যায় তাঁকে ঘিরে শুধু বাংলাদেশ কেন, বাংলার বাইরেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির প্রবল কৌতূহল ছিল একান্ত আবেদন ছিল তাঁর কাছে। শিক্ষিতসমাজের এক বিরাট অংশের অভিনন্দনের দ্বারা তাঁর দুর্লভ ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছে। অথচ আমরা জানি ব্রাহ্মসমাজের তিনি নেতা ছিলেন না, প্রধান ধর্মপ্রচারক-রূপেও তাঁর সুবিস্তৃত খ্যাতি ছিল না, রাজনীতিবিদ হিসেবে রাষ্ট্রীয় জীবনে

---

৫ অগ্রহায়ণ, ২০ নবেম্বর, রবিবার— "...বৈকালে গালিচার উপর বসিয়া হেডমাষ্টার মাইকেল মধুসূদন দত্তের চিঠিপত্র দেখেন। তাঁহার জীবনী রচনা জন্য দেখেন।"

৮ অগ্রহায়ণ, ২৩ নবেম্বর, বুধবার— "...সন্ধ্যার পর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর copy right সম্বন্ধে বাবু গৌরদাস বসাকের পত্র লইয়া যোগীন, হেডমাষ্টার ও আমি আমাদিগের মধ্যে তর্ক হয়।" —'ডায়ারি'র অংশ

১. ২৪ আষাঢ় ১২৯২ সাল, ৭ জুলাই, (১৮৪৫ খ্রী) মঙ্গলবার: অদ্য প্রাতে উইলসন সাহেব আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি হিন্দু পৌরাণিক দেবত্ব বিষয়ে লিখিতেছেন। আমার সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন। ইনি দেখিলাম এ বিষয়ে পাগল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, এই বিষয় লইয়া মত্ত আছেন।"

২. ৫ চৈত্র ১২৯২ সাল ১৭ মার্চ, (১৮৮৫ খ্রী) মঙ্গলবার: "অদ্য জোন্স সাহেবকে মহাভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক পত্র লিখি। তাহাতে এই সকল কথা থাকে "In estimating the merits of this Grand poem of the Hindu's, we should fear in [···]"

৩. ২৫ ফাল্গুন ১২৯২ সাল, ৭ মার্চ, (১৮৮৫ খ্রী) শনিবার: "অদ্য সিদ্ধেশ্বর ঘোষ F. T. S. আমার অতিথি হয়েন F. T. S. অর্থ "Fellow of the Theosophical Society" সমস্ত দিন ও রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সুখে ইঁহার সহবাসে কাটান যায়।··· ইনি Adam Arnold's 'Light of Asia'—বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করিতেছেন। আমার নিকট সংশোধনার্থ অর্পণ করিবার মানসে আসিয়াছেন।"

২৮ ফাল্গুন ১২৯২ সাল, ১০ মার্চ, (১৮৮৫ খ্রী), মঙ্গলবার: "অদ্য বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষের বাঙ্গলা 'Light of Asia'-এর অনুবাদ সংশোধনে ব্যস্ত থাকি।"

৪. ৫ কার্তিক ১২৯৫ সাল, ২০ অক্টোবর, (১৮৮৫ খ্রী), শনিবার: "...বৈকালে সীতানাথ দত্ত আমা দ্বারা উপনিষদের গুটিকতক শ্লোক অনুবাদ করিয়া লয়েন। সন্ধ্যার পর মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথন করি।" —'ডায়ারি'র অংশ

তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয় নি, তবু ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম, তাঁর কর্মমহিমা অমূল্য। জাতির জীবন থেকে সমস্ত তামসিকতা ও বলবীর্যহীনতার গ্লানি মোচন করে স্বাধীন, সার্থক, সুন্দর, সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের প্রথম এবং প্রধান পদপ্রদর্শকরূপে তাঁর নাম ভারতের ইতিহাসে চিরমুদ্রিত হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

গ্যেটে বলেছেন, "talent is nurtured in a crowd, and genius in solitude"— বলা যায় রাজনারায়ণ talented-ও ছিলেন, genius-ও ছিলেন। জনগণের কোলাহলের মাঝখানে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও সফলতার বাণী ঘোষিত হয়েছিল। আবার তিনি নির্জনে, একান্তে পরমশ্রেয়ের ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছেন, সত্য ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ করে আনন্দবিহ্বল হয়েছেন, জাতিকে শুনিয়েছেন তার মর্মকথা। রাজনারায়ণের সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি আমরা প্রতিকৃতিতে দেখেছি। তাঁর শেষজীবনের শুধুমাত্র মুখমণ্ডলের একটি চিত্র আছে, যে চিত্রটি কোনো ঐতিহাসিকের মতে বিশেষ ভাবপ্রকাশক। গভীর ভাবমগ্ন ভ্রূদ্বয় এবং স্থিরদৃষ্টি নিশ্চয় মানুষের অপূর্ণতা ও দুর্বলতার কথা ভাবছে। ঐ দৃষ্টি বস্তুর অন্তর ভেদ করে, ভণ্ডের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু ঐ দৃষ্টির মধ্যেই এমন একটি পলক আছে, নাসাবিবরটি এমন উন্নত যে মনে হয় এই কঠোর বিচারকের হৃদয়ভরা অনন্ত রসসাগর। ইনি যেন কারো প্রতিই কঠোর হতে পারেন না, এবং সকলের জন্যই যেন তাঁর করুণা। তাঁর প্রশস্ত ললাট ক্ষুদ্রতার ও নীচতার শত্রু এবং সত্যের মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর কুঞ্চিত কেশ এবং শ্মশ্রুর ঐশ্বর্য মুখখানিকে ঐশ্বরিক মহিমায় উদ্ভাসিত করেছে; তিনি যেন নশ্বর মানবদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ইনি বৈদ্যনাথের সেই সুপ্রবীণ ব্যক্তি রাজনারায়ণ— যিনি সার্থক জীবন পিছনে ফেলে এসে অনন্তের ঐশ্বর্যের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।[১]

ছন্দে গাঁথা ভক্ত অনুরাগীর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি[২] শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে রাজনারায়ণের সম্পর্কসূত্রের আর একটি তোরণদ্বার উন্মোচন করেছে।—

"প্রাচীন-নবীন যুগ সঙ্গমের জলে
স্নান করি' উঠি মুক্ত সৈকত শেখরে,

---

১. Jadunath Sarkar, "Rajnarain Bose (1826-1899), The Grand father of Nationalism in India", *The Modern Review*, April 1909, p. 312

২. নবকৃষ্ণ ঘোষ রচিত। 'দর্শক', ৪ ভাদ্র ১৩২১

যে বিপ্লব দেখেছিলে সমাজের স্তরে,
সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে,
আঁকিয়া সে স্মৃতি-চিত্র যতনে বিরলে,
বিমল রহস্য রাগে স্বরঞ্জিত করে',
উদার অন্তরে, ভক্তি অনুরাগভরে,
অর্পিয়াছ মাতৃভাষা চরণ-কমলে।

আলোক-আলেখ্য তব আত্ম-বিবরণ,
একাল ও সেকালের দর্পণ উজ্জ্বল,
ইতিহ অভাব বঙ্গে করিয়া পূরণ,—
হে মনস্বী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মাত্মা, সরল,—
তোমার জীবন-কথা রাখিবে স্মরণ,
স্বদেশ-প্রেমিক তুমি সুহৃদ-বৎসল।"

—

১

পৃষ্ঠা ৫২। পাদটীকা ৩

কলেজের প্রশ্নপত্র ও উত্তর

প্রশ্ন :

"Macbeth] Two truths are told.
As happy prologues to the swelling act
of the imperial theme.—...
This supernatural soliciting
Cannot be ill ; cannot be good.— If ill,
Why hath it given me earnest of success,
Commencing in a truth ? I am Thane of Cawdor.
If good, why do I yield to that suggestion
Whose horrid image doth unfix my hair
And make my seated heart knock at my ribs,
Against the use of nature ? Present fears
Are less than horrible imaginings.
My thought, whose murder yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man,
That function is smother'd in surmise,
And nothing is but what is not.

1. "Two truths are told as happy prologues to the swelling act of the imperial theme".

What were the two truths, and what was the imperial theme ?

2. "I am Thane of Cawdor".

What does Macbeth intend to do to prove this assertion ?"

উত্তর :

"1. Macbeth, Thane of Glamis and General of Duncan King of Scotland in his way to the capital, after his successful repression of a rebellion of some Scottish Thanes, aided

by the Norwegians, is greeted, on his way through a blasted heath, with the titles of Glamis, Cawdor and King, by three witches who wished to gratify their malicious disposition by enticing him to his own destruction by ambiguous prophecies. Immediately after he is hailed with the title of Thane of Cawdor by some messengers from the King. Dumb with astonishment as the devils speaking true, he breaks forth into the above exclamation fraught with the most venement pathos :

"Two truths are told
As happy prologues to the swelling act
Of the imperial theme".

These two truths are his being Thane of Glamis and Thane of Cawdor ; and these truths are happy prologues to the act of the imperial theme, i.e. to the act of his accession to the Throne of Scotland, which act is more important than the two happy prologues, and which will be performed with imperial magnificence.

2. Macbeth intends to prove by this assertion that this supernatural soliciting cannot be ill ; for if ill, by then has it commenced in a truth (i. e. his elevation to the Thaneship of Cawdor) and given him pledge of the future consummation of the ardently desired, event i. e. the performance or the "swelling act of the imperial theme".

—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1843-44,*

২

পৃষ্ঠা ৫৩। পাদটীকা ২

প্রশ্ন :

"II. What do you know respecting the philosophy of Plato ? How did it differ from the system of Epicurus ?

উত্তর :

II. The Philosophy of Plato differed from that of Epicurus in these respects ;—Epicurus denied the existence of a deity, and accounted for the creation of the world, by

adopting the atomic theory of Leucippus and Democritus. He said, that the whole universe is created by the minds of the people, he said, that there are gods who inhabit the higher regions of the air, who enjoy perpetual leisure and tranquility, not concerning themselves with the affairs of the world ; but the last was not his real opinion. On the other side, Plato, acknowledged the existence of a supreme deity, possessed of infinite benevolence and power. He said that the deity was composed of three essences, 1st. A selfexistent being whose essence was pure goodness, 2nd. The creating intelligence which produced this universe, 3rd. The soul of the world. Epicurus said, that the soul died with the body, and that it was the product of matter and motion. Plato taught, that the soul is a particle of the Divinity, and that if it remained pure and uncontaminated by vice, it was, after death, absorbed into the essence of God— a doctrine exactly coinciding with that of the Vedant. Epicurus allowed a moderate indulgence of the passions, Plato said, that if we can extinguish our affections, passion, and inclinations our soul can have an entire communion with God even in this world. This is the opinion too of the Vedant ; Plato did not know the method by which we can abstract ourselves from external consciousness, which the Vedantists know, and which they term yoga. A beautiful exposition of the Epicurean philosophy is given in the work of Lucretius, on nature. a work which sanctions the conclusions of Atheism Plato's philosophy did hold a long dominion on the minds of men, who were captivated by the fascinating harmony, and the copiousness of his style that swells, as Longinus says, into mighty torrent."

—*General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency for 1842-43*

৩

পৃষ্ঠা ৫৫ । পাদটীকা ২

এ-সম্পর্কে ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন :

"Scholarship Examination Questions
Senior Scholarships 1843
Literature

He thought also, there was found in the mind of man an affection naturally bred and fortified, and furthered by discourse and doctrine, which did pervert the true proceeding towards active and operative knowledge.

This was a false estimation, that it should be as a diminution to the mind of man to be much conversant in experiences and particulars, subject to sense, and bound in matter, and which are laborious to search, ignoble to meditate, harsh to deliver, iliberal to practise, infinite as is supposed to in number, and no ways accommodated to the glory of arts.

This opinion or state of mind received much credit and strength by the school of Plato, who thinking that particulars rather revived the notions, or excited the faculties of the mind, than merely informed and having mingled his philosophy with superstition, which never favoureth the sense, extolleth too much the understanding of man in the inword light thereof ; and again Aristotle's school, which giveth the due to the sense in assertion, denieth it in practice much more than that of Plato.

For we see the schoolmen, Aristotle's successors, which were utterly ignorant of history, rested only upon agitation of wit ; whereas Plato giveth good example of enquiry by induction and view of particulars : though in such a wandering manner as if of no force or fruit. So that he saw well that the supposition of the sufficiency of man's mind hath lost the means thereof.

1. State in your own words the doctrine of Plato which is here alluded to.

2. What is the scope of the whole passage ?

উত্তর :

1. The doctrine of Plato here alluded to, was this, that when Nature was not created and the germs of the universe lay in chaotic confusion, the Supreme Being had in his mind the pattern of the present system of things in the form of ideas of a general nature, and that he did create this universe by impressing these ideas upon matter, which was at first without form and void. He maintained that the human soul, which is an emanation from the Divine essence or in the beautiful language of the Persian poet, Jellal-ood-deen Roomee, "a rose from its native garden untimely torn," was, in its pre-existent state, conversant with those ideas, and did reveal in the appreciation of their beauty ; that it has lost them by being confined in this "fleshly nook", that it should attempt to reign them by contemplation ; and the cold particulars of physical nature should not merely endow the mind with a knowledge of themselves, but that they should contribute to the revival, and excite its faculties to the attainment of those ideas which it possessed when it was in its pre-existent state, a portion of the Supreme Spirit.

2. In the above passage, extracted from the Filum Labarynthi of Lord Bacon, that illustrious philosopher persuades men to the duty of physical nature, and refutes the false opinion that prevailed before his time, that it is a matter or degradation to the human mind to exercise its powers upon material objects, which occupation was considered by the proud Peripatetics of the middle ages, to be ignoble and illiberal. It should be observed, to the honour of Lord Bacon, that though he depreciates Aristotle in the above passage, and various others of his Great Instauration and called him the tyrannical Ottoman who kills his brothers that he himself may be the sole sovereign, yet in the dedication of his work named "Colours of Good and Evil" to Lord Mountjoy, he bestows such praise upon

Aristotle as almost compensate all his depreciations of that gigantic intellect. Lord Bacon is the founder of modern science. He it was, who freed philosophy from the cloister of monks, and the jargon of the middle ages. Though he himself did make few actual discoveries in physical science, yet to him we owe a Newton, a Boyle and a Laplace. He has been well compared by Thomson the poet of the Seasons, to Moses, as the Person who out of the gloom of the dark ages, conducted men to the land of true science and true Philosophy."

—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44.*

৫

পৃষ্ঠা ৬১ । পাদটীকা ৩

প্রশ্ন :

"V State your opinion on the following objections to Smith's theory :

1. Sympathy being a Capricions principle and cannot be regarded as the standard of our moral judgments, which are, on the whole, pretty regular.

উত্তর :

1. Though sympathy is a capricious principle, yet it is not so capricious as its opponents think for instance, every man on the face of the globe, however depraved his moral principles may be, admires a beneficent action, and disapproves of theft, robbery, and murder. Even the perpetrators of these crimes acknowledge that they are in the wrong, but have been led into the commission of them by want, necessity, or passion I grant that sympathy is capricious, but then where it is capricious, it is guided and corrected by reason.

Smith, in his review of the rational system, at the latter part of his work, grants that sympathy is capricious and that all solid and just judgements concerning right and wrong, are made by reason. Some nations follow customs

which, judged according to the pure and elevated standard or European morality, are morally culpable, but which the nations themselves consider as innocent. The custom of infanticide prevailed in ancient Greece and Rome. The rites of infant sacrifice and Suttee prevailed until very lately in Hindoosthan. In the island of Formosa, promiscuous sexual intercourse is considered no crime and in some parts of Africa, the people throw their old parents from trees. All these have originated in mistaken, misguided, and 'rude sympathy'; yet we can venture to assert that, when those nations, will gain the same stock of information and civilization, as the Europeans possess, their elevated reason will correct these products of misguided sympathy and will abolish them altogether. I doubt not that if the Suttee rite had prevailed up to this time, the youths who are educated in the institutions, where western learning and literature are cultivated and taught, would not have sympathized with the perpetrators of the rite, and would have disapproved of it."

—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44.*

৬

পৃষ্ঠা ৭৭। পাদটীকা ১

উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ

রাজনারায়ণ-কৃত অনুবাদের নির্বাচিত শ্লোকাবলী—

"কঠোপনিষদ্

প্রথমবল্লী।

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ।

তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥ ১॥

1. Vajussruvasa, desirous of future fruition, performed the sacrifice viswujit at which he distributed all his property. He had a son named Nuchiketa.

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

2. When his worn-out cows were being brought by the father to be given as fees to the attending priests, young Nuchiketa, touched by true filial affection, reflected thus within himself."

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ ১৭৬৮ শক

"মুণ্ডকোপনিষদ্

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

1. Brahma, the Executive Agent of the universe and the preserver of the world, came into existence before all the gods. He revealed divine knowledge, the source of all knowledge to his eldest son Uthurva.

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং।

স ভারদ্বাজায় সত্য বহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং ॥ ২ ॥

2. That best of all knowledge which Brahma revealed to Uthurva, Uthurva communicated to Ungir, who communicated it again to Sutyavaha of the race of Bhuroddwaj, and he again to Ungira."

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৭৬৮ শক

"তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ

শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

5. "To the latter belong the Rig Ved, the Yujur Ved, the Sama Ved and the Uthurva Ved, and their initiatory branches, viz : pronuncication, ritual, Grammar, glossary, prosody, and astronomy. The former is that by which the undecaying is known".

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্নন্যোভিচাবশীতি ॥ ১ ॥

1. Two birds, co-habitants and comrades, rest on the same tree. The one among them tastes the fruits thereof ; the other, fasting, only witness.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ৩ ॥

3. God can be gained neither by the Vedas nor by reminiscence, nor by audition. He who desires Him, obtains Him. To him alone does He display himself."

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৭৬৮ শক

"তলবকারোপনিষদ্

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শোত্রং ক উ দেবোযুনক্তি ॥ ১ ॥

1. The pupil questions ; "Say, by whom regulated does transmitted mind fall upon objects, by whom regulated does first—formed life operate united with the body, by whom regulated do the vocal powers exert, and what splendid Agent has made the eye and the ear apply themselves to action ?"

শোত্রস্য শোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাসমাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ২ ॥

2. The preceptor answers : "He is the ear of ear, the mind of mind, the speech of speech, the life of life, the eye of eye. Freed from these organic powers, the wise, after departing from this world, become immortal."

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আশ্বিন ১৭৬৮ শক

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

ওঁব্রহ্মবাদিনোবদন্তি ॥ কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন কচ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদোব্যবস্থাং ॥ ১ ॥

1. Say, knowers of God, who is the cause Supreme ? From whom have we proceeded ? Through whom do you live ? In whom are we placed ? And by whom directed do we follow the law of happiness and misery ?

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যংপন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥ ৮ ॥

8. I have known Him who is above all darkness,

perfect, Splendid and Great. Knowing Him, they obtain immortality. There is no other path for gaining the station Supreme.

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্ববাৎ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোহি প্রবদন্তি নিত্যং॥ ২১॥

21. I have known Him who is without disease ? Ancient, All—Pervading, and All—Inhabiting because omnipresent. Him theologists assert to be unborn ; Him theologists assert to be Eternal.

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

বীরান্মা নোরুদ্রভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃসদমিৎ ত্বাহবামহে॥ ২২॥

22. "Destory neither my children nor my grand-children, nor my longevity, nor my kine, nor my horses, nor my men for I constantly offer thee oblations, keeping myself pure and temperate."

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ ১৭৬৮ শক

৭

পৃষ্ঠা ৮৯। পাদটীকা ১

"... নমস্তে সতে, সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়"—মহানির্বাণ-তন্ত্রের সেই স্তবটিকে রামমোহন রায় তাঁহার ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতিতে কিছুমাত্র বদল না করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। বেদের মধ্যে অনেক খোঁজ করিয়া ভাল ব্রহ্মস্তোত্র না পাইয়া অবশেষে মহানির্বাণ-তন্ত্রের এই স্তবটি পাইয়া, তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] ইহার অদ্বৈতবাদ-ঘেঁষা কথাগুলি সংশোধন করিয়া ইহাকে ব্রহ্মোপাসনায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহাতে কোন সংশোধন করেন নাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঐ স্তবের শ্লোকগুলিতে 'বিশ্বরূপাত্মকায়'র জায়গায় 'জগৎকারণায়', 'নির্গুণায়'র জায়গায় 'শাশ্বতায়' ইত্যাদি অনেক জায়গায় বদল করেন। মহানির্বাণ-তন্ত্রের উক্ত শ্লোকটি এবং তার পরিবর্তিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থে (পৃ. ৯৯-১০১)। উক্ত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ রাজনারায়ণ-কৃত। অনুবাদটি আমরা পাই মহর্ষির আত্মজীবনীতে। এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ-কৃত কিনা জোর করে বলা যায় না। তবে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ কালে (১৮৯৮) রাজনারায়ণ জীবিত ছিলেন। সেই অনুসারে আমাদের অনুমান একেবারে

ভিত্তিহীন হয় না। উক্ত অনুবাদটি হল এই: "তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য, ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়-স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল, ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ, হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।" (পৃ. ৫১)

৮

পৃষ্ঠা ৮৯। পাদটীকা ২

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালীন প্রার্থনাতে সংস্কৃতে প্রার্থনার বিধি ছিল। রাজনারায়ণই প্রথম উক্ত সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করেন। সংস্কৃতে প্রার্থনা মন্ত্রটি হল এই— অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা মৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি। "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

৯

পৃষ্ঠা ৯৪। পাদটীকা ১

প্রতিজ্ঞাপত্র

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে মুদ্রিত (পৃ. ৩২৩) এই পত্রটি প্রামাণ্যবোধে এখানে উদ্‌ধৃত হল :

"১। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর রূপে প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতি দিবস সূর্য্যোদয় পরে, মধ্যাহ্ন-কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া, পবিত্র মনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনা পূর্ব্বক, ন্যূন সংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। প্রতি বুধবারে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে, এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে, দৈনিক উপাসনান্তে সূর্য্যাস্ত পরে অর্ধরাত্রি মধ্যে, রোগ বা বিপদ-গ্রস্ত না হইলে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব, এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার যাহাতে হয়, এমত সকল কর্ম্ম করিব না।

৮। কুকর্ম্ম সকল হইতে নিরস্ত থাকিব।

৯। যদি মোহদ্বারা কোন কুকর্ম্ম দৈবাৎ করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া, পুনর্ব্বার সে কর্ম্ম করিব না।

১০। কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।

১১। আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমেশ্বর, এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথম রচিত হয়েছিল।

এইটি একাধিকবার সংশোধিত হয়। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে "ব্রহ্ম-ধর্ম-গ্রহণ" শীর্ষকে যে প্রতিজ্ঞাসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে—তা সম্ভবত ১৮৫০ সালে রচিত হয়েছিল।

১০

পৃষ্ঠা ১০৭। পাদটীকা ১

মেদিনীপুর সেচবিভাগের কর্তা ক্যাপ্টেন বিডেল সাহেবের লিখিত প্রশংসা-পত্র—

"It is a common saying that natives of this country will do nothing to help themselves and that they must be assisted by the Government or by the European community. An

example has just occurred ot Midnapore to show that this is not always the case and when kindly advised and shown how they can benefit their race, they are not slow even in that slowest of all operations the subscribing funds to attain the object when they feel certain it is for a particular good.

These observations arise naturally when one sees as at Midnapore large building erected in the school compound for the manly games of Fives and Rackets and learns that it has been raised by subscriptions the parents, guardians and friends of the boys, but it is so and when asked whether they required the aid of Government to complete the building, it is refreshing to learn that the reply was a respectful nagative.

Great credit is due to the Head Master, Babu Raj Narain Bose, and it is a certain proof of the esteem in which his character is held that he has been able to raise the necessary subscriptions "Ce ›nest que la premier par qui conte." Another subscription has been set on foot among the friends of the boys to supply backs to the forms and stools for the feet of the pupils, who will no longer be placed like notes of interrogation on the forms with legs dangling, a position that weakens and deforms the frame of a growing stripling who has thus to combat with physical weakness in pursuing his mentally wearying studies. This is good progress and, as I maintain, shows that the natives are not unwilling to help themselves when put on the way of doing so".

—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯৬১), পৃ ৪৫-৪৬

১১

পৃষ্ঠা ১০৯। পাদটীকা ১

Inspector's Reports

"From the Report of Mr. Pratt, Inspector of School South Bengal, For The Quarter Ending July 1856.

I am greatly disappointed at the very slow progress made in the District of Midnapore, where we certainly

ought to have achieved results equal to those obtained in in Bancoorah....

It is obvious that, by the present rules for grants-in-aid, nothing can be done in places where the people will not themselves move—especially those classes who possess influence in the country. In almost every case where grant-in-aid schools have been established in this Division, it has been through the influence on one or two particular individuals only and by no means in consequence of the general desire of the people for improved Education. Of course we come to many places where there are no persons who are in advance and liberality, and there our efforts generally fall entirely. This is especially the case in Districts like those of Bancoorah, Midnapore and Moorshedabad."

—General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1856-57

১২

পৃষ্ঠা ১০৯ । পাদটীকা ৩

Inspector's Reports

"Midnapore School—The number of students on the rolls of this school on the 30th of April last was 270, against 238 of the preceding year. The amount of schooling fees realized during 1861-62 was Rs. 3,363—I, against Rs. 2, 964-15-6 of 1860-61. Most of the classes in this school are now so overgrown, that the Local Committee are of opinion, that unless each large class is divided into sections, it is quite impossible for the teachers to do justice to their charge. Ten boys were sent up to Calcutta as candidates for the Entrance Examination. Of these two were prevented from attending on account of illness, of the eight who attended the Examination, four were successful. One of these, a student of the 2nd class of the school passed in the Ist Division. The Annual Examinations were conducted by the members of the Local Committee, and their reports shew that the students have made a fair progress. Two additional rooms

have been erected during the year for the accomodation of the students. The furniture and apparatus of the school was originally of inferior quality and is now worn-out. As the school has a handsome surplus yearly, I strongly reccommend that an entire new supply be obtained from Calcutta.

H. Woodrow."

—*General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, For 1858-59,*

১৩

পৃষ্ঠা ১২৩। পাদটীকা ১

ব্রাহ্মসমাজ

"...পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পুনরায় আহূত হইয়া মেদিনীপুরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকদিন ধর্ম্মোপদেশ ও উপাসনাদিতে যাপন করিয়া সেখানকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিকালে মেদিনীপুর সমাজের নূতন নিয়মাবলী প্রণীত হইয়া সমাজ পুনর্গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যতকাল জীবিত থাকিবেন ততকাল তাঁহাকেই আচার্য্যস্বরূপ গণ্য করা হইবে এবং যাঁহাদের উপর উপাসনার ভার থাকিবে তাঁহারা উপাচার্য্য নামে উক্ত হইবেন, সভ্যেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুরের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রতিশোধ কি দেওয়া সম্ভব? একজন প্রকৃত সাধু ও ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তির প্রতি সহর শুদ্ধ লোক কিরূপ অনুরক্ত হইতে পারে তাহা যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মেদিনীপুরে গিয়া দেখিয়া আসুন।"

—'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা', ১৬ আষাঢ় ১৮০৩ শক

প্রদেশীয় ব্রহ্মসমাজের উৎসব (মেদিনীপুর)

"মেদিনীপুর হইতে এই পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত। এই সমাজকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্থাপন করেন। তিনি এ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে, আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ন বসু মহাশয় ইহার উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি মেদিনীপুরের মঙ্গল সাধনে তাঁহার জীবনের সমগ্র ভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন। এমন কি

মেদিনীপুরের জন্য তিনি সাংসারিক উন্নতির আশা একেবারে নষ্ট করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জীবনের প্রধান সামগ্রী। তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন মেদিনীপুর বড় মধুময় স্থান ছিল। তাঁহার এই স্থান পরিত্যাগের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ বসু মহাশয় এই সমাজের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হয়েন। এবং তিনিই এক্ষণে এই সমাজে সম্পাদক।”

—'তত্ত্বকৌমুদী', চৈত্র ১৮০২ শক, পৃ ২৩৭-২৩৮

জানা যায় যে, ২৪শে মাঘ থেকে ৩রা ফাল্গুন পর্যন্ত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান চলে। ৩রা ফাল্গুনের বিবরণটি হল এই—

“...৩রা ফাল্গুন রবিবার—গোপোৎসব—আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই উৎসবের স্থাপয়িতা। প্রতি বৎসর সুস্নিগ্ধ বসন্তকালে এই উৎসব হইয়া থাকে। এখননকার প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।...”

—'তত্ত্বকৌমুদী', চৈত্র ১৮০২ শক, পৃ ২৩৯

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ

“অনেক দিন পূর্ব্বে আপনার তত্ত্বকৌমুদীতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া সাতিশয় সুখ অনুভব করিয়াছি।...

এই ব্রাহ্ম সমাজটি আমাদিগের পরম ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার এই [স্থান] পরিত্যাগের পর সমাজটি নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। হায়। এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাঠ করিয়া কত শত বিদেশীয় লোকের হৃদয়ে পবিত্র ব্রহ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইল কিন্তু (এটি কম পরিতাপের বিষয় নয়) অত্রত্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ইহাঁর মধ্যে কয়েকজন সভ্য এবং সম্পাদক মহাশয় মিলিত হইয়া এই সমাজের অন্তর্ভূত একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোক আজকাল সভা স্থাপনের বড় পক্ষপাতী।...

মেদিনীপুর সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, কারণ এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনিয়া আমি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয়বস্তু করিয়াছি। আমার মতে আমাদিগের স্ব স্ব জীবনকে এপ্রকারে গঠিত করা বিধেয় যে লোকে তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃ মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ভাব আজ কোথায়। রাজনারায়ণ বাবুর

শরীর যে প্রকার ভগ্ন, তাহাতে তিনি সেই প্রকার নব উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া এই সমাজের উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন সে আশা আমরা মনে স্থান দিতে পারি না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন যে প্রকার ব্রহ্মাগ্নি চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া দিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি এই মৃতপ্রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি উদাসীন থাকিবেন না।...

২৬ বৈশাখ। ৫	মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন বন্ধু।"

—'তত্ত্বকৌমুদী', জ্যৈষ্ঠ ১৮০৩ শক, পৃ ২৮৫

১৪

পৃষ্ঠা ১২৫। পাদটীকা ২

" "মেদিনী"র অকাল মৃত্যুতে অনেকে শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন; কেহ বাচনিক কেহ কেহ বা পত্র দ্বারা তাঁহাদের উদার হৃদয়ের সমবেদনা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। "মেদিনী"র তিরোভাবে আমাদের নিজের যে মনঃপীড়া জন্মিয়াছে তাহা আর কি জানাইব? তবে আমাদের বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, গতায়ু মেদিনীর জন্য যে সদাশয় মহাত্মাগণ তৎপ্রতি সমবেদনা ও তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা উপহার স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া "মেদিনী" স্বয়ং সকলের দ্বারস্থ হইতে পারিল না। অতএব আমরা মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি সদয় হইয়া আপনি সাধারণীতে একটু স্থান প্রদান করিলে আমরা মেদিনীকে কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যে মহাপুরুষের আন্তরিক ইচ্ছা সফল করিবার জন্য আমরা দুশ্চর সম্পাদকতা ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, মেদিনীপুরবাসী না হইয়াও যিনি মেদিনীপুরকে স্বীয় জন্মভূমির ন্যায় স্নেহ করেন; যাঁহার সম্পর্কে মেদিনীপুরের নাম চিরস্মরণীয় হইবে এবং যাঁহার অনুপমা-মানস-কন্যা "ধর্মতত্ত্বদীপিকা" এই মেদিনীপুরেই সঞ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আমরা সেই মহাত্মা পূজ্যপাদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমাদের মুমূর্ষ লেখনী ধারণ করিলাম। আমাদের সামর্থ্য অপ্রচুর হইলেও আশা করি যোগীবর বসুজা মহোদয় আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত আবেগ প্রতীতি করিয়া আমাদের এই অযোগ্য কৃতজ্ঞতা উপহার গ্রহণ করিবেন।

রাজনারায়ণ বাবু আমাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও "মেদিনী"র প্রতি সম সুখ-

দুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহার সুদীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।... তিনি লিখিয়াছেন যে, "তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় বিষাদিত হইলাম। আমার একজন পরম প্রিয় অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয়, "মেদিনী"র ঐরূপ অবস্থাতে আমার সেইরূপ ক্লেশ হইতেছে। আমি মনের কথা বলিতেছি যে যদি আমার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনি তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিতাম। যাহা হউক আমি যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইলাম তাহা গ্রহণ করিবে।"

রাজনারায়ণ বাবু কেবলমাত্র মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করেন নাই, তিনি অযাচিত হইয়াও 'মেদিনীর' সাহায্যার্থ ৫ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। আবার তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দান করায় আমাদের ঋণভার গুরুতর রূপে বৃদ্ধি হইল। মেদিনীপুর-বাসীগণ দেখুন, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদের কেমন হিতৈষী; মেদিনীপুরকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন বলিয়াই তিনি 'মেদিনীর' অকল্যাণে এরূপ ব্যথিত ও তাহার সাহায্যার্থ এত উদ্যত।

অধিকন্তু তিনি নিজে এরূপ অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; যাহাতে মেদিনী ঋণজাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সচ্ছন্দে স্নেহপর পাঠকগণের সমীপস্থ হইতে পারে তদর্থে তিনি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মেদিনীপুর ও অন্যান্য নগরের যে সমস্ত সমৃদ্ধিশালী দানশীল ব্যক্তিগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলে আমরা বর্তমান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, এরূপ অনেকগুলি মহাত্মার নামও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজ-নারায়ণ বাবুর এরূপ সহানুভূতি ও আন্তরিক যত্নের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম।"

—'সাধারণী' পত্রিকা, পৌষ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ১০৫-১০৬

১৫

পৃষ্ঠা ১৪৩। পাদটীকা ১

ব্রাহ্মবিবাহ

"৯ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম বিধানানুসারে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমলতা—বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। বরের নাম শ্রীমান দীননাথ দত্ত—বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি বৎসর। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ১৫০ বরযাত্র ও কন্যাযাত্র উপস্থিত ছিলেন।

দীননাথ দত্তের বাসভূমি মজিলপুর। বিবাহের পর বর কন্যা তথায় গমন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে উদীচ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তথায়ও উপাসনা কালে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল। এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দু সমাজের বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই।"

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ ১৭৮৯ শক, পৃ ১০

১৬

পৃষ্ঠা ১৪৩। পাদটীকা ২

মেরী কার্পেণ্টার

১৮৬৪ সালে মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় আসেন ; ভারতে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিস্তার ক'রে, স্কুল স্থাপন ক'রে ইনি ভারতহিতৈষী ও নারীকল্যাণব্রতীরূপে খ্যাতি লাভ করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে ইনি 'নর্মাল স্কুল' ও নর্মাল পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। উক্ত স্কুলেই ভাবীকালের মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। স্ত্রীশিক্ষানুরাগী কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টার একসময় বোম্বাই মাদ্রাজ, এবং পূর্ববাংলা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতের উক্ত' তিনটি অঞ্চলেই স্ত্রীশিক্ষা ইতিপূর্বে প্রসারলাভ করে নি। কাজেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, পূর্ববাংলা প্রভৃতি স্থানে মেরী কার্পেণ্টারের প্রচেষ্টাতেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়।

এতদ্‌ব্যতীত এদেশে মেরী কার্পেণ্টারের আরো কতকগুলি উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় আসার পরই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে গ্রেটব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিজ্ঞান সভার আদর্শে তিনি একটি সমাজবিজ্ঞান অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি এই সভা স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে তাঁরই আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সভায়। ভারতের বড়োলাট, ছোটোলাট, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী ও দেশীবিদেশী ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করেছিলেন। বিলেতের "National Association for the Cultivation of Social Science in Great Britain"-এর শাখা স্বরূপ কলকাতায় সমাজবিজ্ঞান সভা স্থাপিত হল। এই সভার প্রথম সভাপতি ডব্‌লিউ. এস্. সীটনকার এবং সম্পাদক হলেন এইচ. বিভার্লি. সি. এস. এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। সভা তিনজন অনারারি মেম্বার নিয়োগ করেন ১৮৭০ সালে। মেরী কার্পেণ্টার তাঁদের অন্যতম। অপর দুজন হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও জে. বি. ফিয়ার।

১৭

পৃষ্ঠা ১৮১। পাদটীকা ২

ব্রাহ্মসমাজ

"...বিগত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর ও পাত্রের বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। ইহারা উভয়েই অবিবাহিত। এই বিবাহটি আমাদের নূতন উপাসনালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রকাশ্য উপাসনালয়ে এই প্রথম বিবাহের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি ঈশ্বর কৃপায় সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে যত লোক উপস্থিত ছিলেন সকলেই উক্ত ঘটনার গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা অন্তরে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে পাত্র আদি সমাজের অবলম্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে অসম্মত ছিলেন। কৃষ্ণকুমার বাবুকে রাজনারায়ণ বসু যদিও পূর্ব্বাবধি সুপাত্র মনে করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহে যদিও তাঁহার আন্তরিক সম্মতি ছিল তথাপি বর যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করেন তাহাতে তিনি যোগ দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। এই মতভেদ নিবন্ধন একসময়ে উক্ত বিবাহ দুর্ঘট বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে রাজনারায়ণ বাবু যখন এই বিবাহে কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন তখন আর বাধা দেওয়া ব্রাহ্ম পিতার পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তখন তিনি কন্যাকে তাঁহার কুটুম্ব ও আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। উমেশ বাবু এই বিবাহে অভিভাবকের কার্য্য করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু উপস্থিত ছিলেন না।..."

—'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকা, ১৬ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক, পৃ. ৪৪-৪৫

১৮

পৃষ্ঠা ১৯২। পাদটীকা ১

ব্যক্তিনাম

ডায়রিতে রাজনারায়ণ-প্রদত্ত পরিচয়সহ উদ্ধৃত :

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক

২৯ আষাঢ়, ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ১২ জুলাই ১৮৮৪ খ্রী, শনিবার—"অদ্য বঙ্গবাসী-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আমার এখানে [উপস্থিত] হয়েন। "বঙ্গবাসী" এখানকার সকল সস্তা কাগজের মধ্যে প্রধান। গ্রাহক ১২৫০০। [...] তুলনা করিলে ইহা কি ? লোকটি অতি কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায়, আহারশীল, সম্বাদভিজ্ঞ এবং সুরসিক।"

১৯ আশ্বিন ১২৯৩ বঙ্গাব্দ : ৪ অক্টোবর, ১৮৮৬ খ্রী, সোমবার—"... সন্ধ্যার সময় বিখ্যাত বঙ্গবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু কলিকাতা হইতে দেওঘরে পোঁছেন। ইনি জলবায়ু পরিবর্তন জন্য এখানে আসিয়াছেন। শিশির বাবুর বাসায় তাঁহার বাসা করিয়া দেওয়া গেল।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৯ শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ২৩ জুলাই ১৮৮৪ খ্রী, বুধবার—"অদ্য প্রাতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি ও দ্বিজেন্দ্রবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় দেখা করি। বুধবারে যেমন ব্রহ্মসঙ্গীত হয় অদ্য সেইরূপ হইয়াছিল। ভূদেব প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি অদ্বৈতবাদী হিন্দু। সকল বস্তু [...] ভূদেব ঘোর pantheist কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা যেমন সকল বস্তু (প্রামাণ্য) বলিয়া মানে ইনি সে রূপ মানেন না। ইনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না। এই জন্যই ঈশ্বর এখন মানেন। সকলই যখন ঈশ্বর তখন মনুষ্য ঈশ্বর। মনুষ্য বিশেষরূপে ঈশ্বর যেহেতু তাহার জীবন আছে। বড় লোককে ঈশ্বরবোধে পূজা করা কর্ত্তব্য এই তাঁহার মত। কেশববাবুকে তাঁহার শিষ্যেরা যে পূজা করিত তিনি তাহার বিশেষ অনুমোদন করিলেন।"

২০ পৌষ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ : ৩ জানুয়ারি, ১৮৮৮ খ্রী, মঙ্গলবার—"অদ্য আমার প্রাচীন বন্ধু কলেজে সমাধ্যায়ী বিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, কাশী হইতে কলিকাতা যাইবার কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন তাহাতে মহা আনন্দ উপস্থিত হয়।"

শিশিরকুমার ঘোষ

৯ ভাদ্র ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ২৪ আগস্ট ১৮৮৪ খ্রী, রবিবার—"অদ্য প্রাতে শিশির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তাঁহার সহিত অনেক বিষয় কথাবার্ত্তা হয়। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং এক্কা বাহাদুর। ইনি একদিকে আর ভারতবর্ষীয় এবং ভারতসভা অন্যদিকে। ইনি প্রায় তিন বৎসর হইল চৈতন্য-মতাবলম্বী হইয়াছেন। চৈতন্যের বিষয় বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।"

১৫ ভাদ্র ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ৩০ আগস্ট ১৮৮৪ খ্রী, শনিবার— "…শিশিরবাবু অতি বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোক বোধ হয়… ।"

২৭ ভাদ্র ১২৯২ বঙ্গাব্দ : ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খ্রী, শুক্রবার—"অদ্য বিখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষ কলিকাতা হইতে আইসেন। ইনি "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক। আসিয়াই আমাকে প্রণাম করিতে আইসেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র

১৯ আশ্বিন ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ৪ অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রী, শনিবার—"অদ্য প্রাতে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইনি ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ও আমার কলেজের সমাধ্যায়ী।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৫ কার্তিক ১২৯১ বঙ্গাব্দ : ৩০ অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রী, বৃহস্পতিবার—"অদ্য "সাধারণী" ও "নবজীবনে"র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার অতিথি হয়েন।"

চিরঞ্জীব শর্ম্মা

৫ কার্তিক ১২৯২ বঙ্গাব্দ : ১৯ নবেম্বর ১৮৮৫ খ্রী, বৃহস্পতিবার—"…আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মজুমদারী দলের প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অমৃতলাল বসুর সহিত সাক্ষাৎ করি। অদ্য সন্ধ্যার পর ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ওখানে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গাওনা হয়।…"

৮ কার্তিক ১২৯২ বঙ্গাব্দ : ২২ নবেম্বর ১৮৮৫ খ্রী, রবিবার—"অদ্য প্রাতঃকালে আমার এখানে ব্রহ্মোপাসনা হয়। প্রচারক অমৃতলাল বসু উপাসনা করেন ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গান করেন।"

৬ ফাল্গুন ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ খ্রী, সোমবার— "… "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কৃত্রিম নাম।"

১৭ শ্রাবণ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ : ৩১ জুলাই ১৮৮৮ খ্রী, মঙ্গলবার—"অদ্য প্রাতে ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার ওখানে অনেকক্ষণ যাপন করি। তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। মানুষটি প্রগাঢ় বিদ্বান ও গম্ভীর স্বভাব কিন্তু সুরসিক। তিনি মত বিষয়ে একজন ঘোর হিন্দু।"

৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ : ১৫ মে ১৮৮৮ খ্রী, মঙ্গলবার— "…অদ্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সঙ্গীত রত্নাবলী পাঠ করি। ইহাতে তাঁহার ও অন্যান্য

ব্রাহ্ম রচিত সঙ্গীত আছে। সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীত রচনাশক্তি বিলক্ষণ আছে। উহা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা।"

উমেশচন্দ্র দত্ত

২২ কার্তিক ১২৯২ বঙ্গাব্দ : ৬ নবেম্বর ১৮৮৫ খ্রী, শুক্রবার—"অদ্য সিটি কলেজের প্রিন্সিপেল উমেশচন্দ্র দত্ত ও ··· প্রধান ব্রাহ্ম তিনকড়িবাবু প্রভৃতি আমার এখানে অতিথি হয়েন। ইহারা সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম।"

গগনচন্দ্র হোম

৭ আশ্বিন ১২৯৩ বঙ্গাব্দ : ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খ্রী, বুধবার—"অদ্য প্রাতে গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি মৈমনসিংহে এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন হিন্দু ও মুসলমানের কুটুম্বিতা বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা অতীব কৌতূহলজনক বোধ হইল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ চৈত্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ : ১৪ মার্চ ১৮৮৭ খ্রী, সোমবার—"অদ্য প্রাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার দীর্ঘকেশ ও দেবতার ন্যায় চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তিনি আমার নিকট তাঁহার নিজের রচিত দুই একটি গান গাইলেন। তাহাতে একেবারে মোহিত হইলাম।"

রামতনু লাহিড়ী

৩ চৈত্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ : ১৬ মার্চ ১৮৮৭ খ্রী, বুধবার—"···রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সেইরূপ বাল-স্বভাব আছেন।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ : ৩ জুন ১৮৮৭ খ্রী, শুক্রবার—"অদ্য বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার সহিত প্রাতে ও বৈকালে সাক্ষাৎ করেন।··· যদ্যপি যদ্যপি বিজয়কৃষ্ণের কোন কোন মতের সহিত আমার ঐক্য নাই তাঁহার সহবাসে কৃতার্থ হইলাম। তিনি বিদায় হইবার সময় মন অত্যন্ত উদ্বেলিত হইল। বলিলাম একদিন মাত্র অবস্থিতি অপেক্ষা বরং আপনার না আসা ভাল ছিল। তাঁহার নিকট মাদাম গাঁইও (Madame Guyon) পাঠ করি।

বিপিনবিহারী গুপ্ত

৩ আষাঢ় ১২৯৪ বঙ্গাব্দ : ১৬ জুন ১৮৮৭ খ্রী, বৃহস্পতিবার— "···রাত্রিতে

বিপিনবিহারী গুপ্ত এম. এ. আমার নিকট বিদায় লইতে আইসেন। তিনি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া বক্সারে ওকালতি করিবেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ: ২৩ নবেম্বর ১৮৮৭ খ্রী, বুধবার— "...আমি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। ইনি এক্ষণে ভবানীপুর-বাসী। বৈকালে গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি আমার মেদিনীপুরের বন্ধু।"

১৪ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ: ৩০ নবেম্বর ১৮৮৭ খ্রী, বুধবার—"অদ্য বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রাতে বেড়াই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার সহিত কথা হয়।"

১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ: ১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খ্রী, বৃহস্পতিবার— "অদ্য প্রাতে দুর্গাপ্রসাদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে 'Marteneun's "Types of Ethical Theory" এবং "Modern Philosophers by Psychoss" দেখাইতেছেন। তাঁহার একটি বিস্তীর্ণ পুস্তকাগার আছে।"

২১ মাঘ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ: ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ খ্রী, শুক্রবার—"অদ্য প্রাতে দুর্গাপ্রসাদবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনার জীবনের দীর্ঘ কাহিনী বলেন। অদ্য ফুরাইল না। আর একদিন বলিবেন।"

গৌরদাস বসাক

২৪ ফাল্গুন ১২৯৫ বঙ্গাব্দ: ৬ মার্চ ১৮৮৯ খ্রী, মঙ্গলবার—"অদ্য রাত্রিতে গৌরদাস বসাক দেওঘরে আসিয়া আমার অতিথি হয়েন। গৌরদাসবাবু আমার কলেজের সমাধ্যায়ী। তাঁহাকে অনেকদিন পরে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।"

মতিলাল ঘোষ

৫ চৈত্র ১২৯৫ বঙ্গাব্দ: ১৭ মার্চ ১৮৮৯ খ্রী, শনিবার— "অদ্য প্রাতে মতিলাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। ইনি শিশিরবাবুর উপযুক্ত ভ্রাতা।"

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

১১ মাঘ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ: ২৩ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রী, বুধবার— "...অদ্য

"অক্ষয়চরিত" প্রণেতা নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস আমার এখানে অতিথি হয়েন। তিনি অদ্যই দুইপ্রহর চারিটার সময় পশ্চিম যাত্রা করেন।"

মদনমোহন মালব্য

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ: ৭ জুন ১৮৮৯ খ্রী, শুক্রবার—"অদ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কংগ্রেস (Congress) বক্তা। উভয় ইংরাজী ও হিন্দীতে বেশ বক্তৃতা করিতে পারেন। সকল স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থা বড় মন্দ। ইনি ভাগলপুর হইতে এইখানে আইসেন। ইনি "হিন্দুস্থান" নামক হিন্দি পত্রিকার সম্পাদক। "হিন্দুস্থান" রাজা রামপাল সিংহের কাগজ। ইনি আমার "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" ও "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" খুব অনুমোদন করেন। ইনি বলিলেন যে রাজনৈতিক প্রচারক অপেক্ষা ধর্ম্ম-প্রচারক হইতে তাঁহার অধিক বাসনা কিন্তু তিনি রাজনৈতিক প্রচারক হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি অদ্য রাত্রিতে গয়া যাত্রা করেন। এখানেও বক্তৃতা করিতেন কিন্তু শিশিরবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার উদ্যোগ সফল হইয়া উঠিল না। শিশিরবাবু হেডপাণ্ডাকে বলিলে মন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বক্তৃতা হইতে পারিত।"

১৯

পৃষ্ঠা ২৩৬। পাদটীকা ১

ডেভিড হিউম

স্কটিশ দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক ডেভিড হিউমের জন্ম এডিনবরায় ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে। আইন-বিষয়ে অধ্যয়নের পর ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল জেম্স সিনক্লেয়ারের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যের সেক্রেটারি পদে তিনি অভিষিক্ত ছিলেন। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরায় আইন-পুস্তক-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে ব্রিটিশের রাজদৌত্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সংশয়বাদ (scepticism) প্রকারান্তরে হিউমিজম্ নামে প্রচলিত।

রচিত গ্রন্থ:

A Treatise of Human Nature (1739), *Essays Moral and*

Political (1741-42), *An Enquiry Concerning Human Understanding* (orig. title *Philosophical Essays Concerning Human Understanding* (1748), *Political Discourses* (1752), *Four Disertations* (1757), *History of England during Reigns of James I and Charles I* (1754), *Dialogues on Natural Religion* (1779).

২০

পৃষ্ঠা ২৩৬ । পাদটীকা ২

উইলিয়ম ইলারী চ্যানিং

চ্যানিং ছিলেন আমেরিকার ধর্মযাজক। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে নিউপোর্টে তাঁর জন্ম। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা হয়েছিলেন। তৎকালে তাঁকে 'Apostle of Unitarianism' বলা হত। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের সংগঠক নিযুক্ত হন। বক্তৃতা এবং রচনার দ্বারা তিনি তৎকালের চিন্তাশীল সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ধর্মাদর্শ ও সামাজিক কল্যাণের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী বিদ্বজ্জনসমাজে আদৃত হয়েছিল। *Negro Slavery* (1835) এবং *Self Culture* (1838) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অন্যতম দানরূপে স্বীকৃত।

২১

পৃষ্ঠা ২৩৯ । পাদটীকা ১

লালা হাজারীলাল

..."রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেহই ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রেণীতে গণ্য করে না। তাঁহাদিগকে যদি প্রচারক বলা না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য সর্ব্বপ্রথমে কে আত্মজীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে, এই জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রধান প্রচারকের বিষয় যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা পাঠকদিগকে অবগত করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিতে সমর্থ হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রথম প্রচারকের নাম লালা হাজারিলাল। ইনি হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন্ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন তাহা নিরূপণ করা কঠিন। লালা সাহেব প্রথমে বর্দ্ধমানের রাজসরকারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রতিজ্ঞা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বহু সংখ্যক লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি প্রতিদিন ৩০।৪০ খানা প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া বাহির হইতেন এবং তাহা স্বাক্ষর করাইয়া প্রত্যাগমন করিতেন। ১৭৬৫ শকে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সহায়তা করেন। বাবু শিবচন্দ্র দেব যখন মেদিনীপুরে ছিলেন তখন তথাকার ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও তিনি প্রচারের জন্য গমন করিতেন। প্রচারার্থ তিনি কাশী, কানপুর, আগ্রা, লাহোর, পেশোয়ার, করাচী, বোম্বাই, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে গমন করিতেন সেইখানেই ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল ব্যক্তির সহিত অতি নৈপুণ্যের সহিত তর্ক করিতেন এবং তর্কবলে পরাস্ত করিয়া বহু সংখ্যক লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। জড় পদার্থ ও ঈশ্বর উভয়ই নিত্য, না জড় ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, ইহাই সেকালের প্রধান তর্কের বিষয় ছিল এবং লালা সাহেব এতদ্বিষয়ে সুন্দর যুক্তি প্রদান করিয়া বিপক্ষের পরাজয় করিতেন।

তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বহুবিধ ইংরেজী দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। লর্ড মনবড যিনি ডারউইনের পূর্ব্বে মানুষ বানর হইতে উৎপন্ন এই মত প্রথম বাহির করেন, লালা সাহেব সেই মনবডের অনুবর্ত্তী ছিলেন। লর্ড মনবড বলেন যে কাঁচা উদ্ভিদ পাক করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। লালা সাহেব এই মতানুসারে কাঁচা লাউ ও বেগুন ইত্যাদি আহার করিতেন, অবশেষে তজ্জন্য অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন।

তিনি একটি অঙ্গুরীয় পরিতেন, তাহার উপর পারস্য অক্ষরে "হম নথাহদ মান্দ" অর্থ "এমন দিন না রবে" খোদিত ছিল। সম্পদের সময় এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া তিনি উল্লসিত এবং বিপদে পড়িলেও ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন হইতেন না।

লালাসাহেব পরম উৎসাহী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য খাটিয়া খাটিয়া এবং ভ্রান্ত মতের দ্বারা বিপথে চালিত হওয়াতে দুর্ব্বল শরীর হইয়া অবশেষে ১৭৭৫ শকের ১২ই পৌষ রাত্রি ৪ ঘটিকার সময়

পরলোক গমন করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারক একজন হিন্দুস্থানী ছিলেন ইহা একটি বিশেষ ঘটনা বটে।”

—'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকা, ১৬ চৈত্র, ১৮০৩ শক, পৃ. ২৩০

“...লালা হাজারীলালই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী প্রচারক ছিলেন।...হাজারীলাল ইন্দোরের অধিবাসী এবং জাতিতে লালা অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন। ইনি নিরামিষভোজী ছিলেন। শস্য ও তরকারী প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় আহার করিলে অধিক বল সঞ্চয় হয় এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইনি জীবনের শেষাংশে কাঁচা বেগুন ও কাঁচা লাউ খাইতেন।

পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইবার কিছু পরে ইনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে পাপস্রোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্যের সোপানে পদনিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে একুশজন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতর ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাকেই প্রচারকপদে বরিত করিয়া দেশবিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রেরণ করেন। ইনি কলিকাতায় ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী নির্ব্বিচারে সকলের নিকট যাইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন এবং সকলকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। “অল্পকালের মধ্যে তখন যে অত লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যত্নে।” তিনি লোকের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেই কাহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। স্বাক্ষর করিবার পর প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীকে একটী করিয়া “ওঁ” খোদিত স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। হাজারীলাল যে কয়-জনকে ব্রাহ্ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া আনিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের প্রতিজনের হিসাবে তিনি একটী করিয়া মোহর বা ষোল টাকা পুরস্কার পাইতেন। ব্রাহ্মসমাজে মাসিক উপাসনার শেষে এই অঙ্গুরী ও পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হইত। একবার এক মাসিক সভার পর হাজারীলাল দেবেন্দ্রনাথের হস্তে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র সমূহ দিবার জন্য পশ্চাতের বেঞ্চি হইতে এত ব্যস্ততার সহিত বেঞ্চি টপকাইয়া বেদীর সম্মুখে আসিতেছিলেন যে সমাগত ভদ্রলোকদিগের গায়ে পা লাগিল কি না সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পুরস্কারাদি বিতরণের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন

যে তাঁহাকে ব্রাহ্ম করা হউক। দেবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোকটী তাঁহাকে বলিলেন যে "ব্রাহ্ম হইলে তিনিও সমাগত ভদ্রলোকদিগকে পদাঘাত করিবার সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।" বলা-বাহুল্য এই প্রণালীতে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বৃদ্ধির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে যে কোন উপকার হয় নাই তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস কলিকাতার জনসাধারণে্য এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮৩৭ শক, পৃ. ১৬৭-১৬৮

"Lala Hazarilal was a man of original ideas and of peculiar habits. He threw himself into the work of the Samaj with great enthusiasm, and went of daily enlisting new members. His efforts for the propagation of the new faith were so successful that the number of those who signed the covenant of the Church rose to 767 in 1847, in which year he accompanied Devendra Nath to Benares, whither the latter went to supervise the education of the four students,··· and to make personal investigations into the teachings of the Vedas by holding conference with Vedic scholars.

After the conferences were over, Hazarilal took leave of Devendra Nath and started on a pedestrian journey to no one knew where. After this, he never communicated with his friends in Calcutta, devoted some 2 or 3 years to a wandering life, visiting Cawnpore, Agra, Lahore, Peshawar, Karachee and Bombay finally settling down in Indore, his birth-place, and dying there in 1851. Wherever he went he preached the new doctrines and gained sympathisers."

—Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*. Vol. 1. p. 94-95

"যখন আমার চারিদিকে কেবল এই প্রকার বাধা, সেই অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন, এবং আমার প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন, 'লোকভয় আবার ভয়! "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়"[১], তাঁহাকে ভয় কর। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়; তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িব না।' ইনি কে? ইনি লালা হাজারীলাল। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাহসে বাঙ্গালী হইতে পশ্চিম দেশবাসী হিন্দুস্থানীরা যে বড়, এই সংকট সময়ে আমি তাহার পরিচয় পাইলাম। আমার সঙ্গে একমনা ও একহৃদয় হইয়া আমার সপক্ষে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।

যখন আমার পিতামহ বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হাজারী-লালকে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহার জীবনের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পক্ষে বিপরীত ঘটিল, সে কলিকাতায় আসিয়া নগরের পাপস্রোতে ভাসিয়া গেল। তাহাকে কে বা দেখে, কে বা তার সংবাদ লয়—অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাহার জীবন পাপময়, কলঙ্কময় হইল। এই দুরবস্থায় ঈশ্বরপ্রসাদে সে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, এবং সে সেই বলে পাপস্রোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিল।

সেই হাজারীলাল আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হন। আপনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুটিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, তখন তিনি আবার পুণ্য-পথে অন্যকে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতার ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী সকলের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃষ্ট মঙ্গল পথ দেখাইতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে তখন যে অত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যত্নে। তিনিই আমাকে এই সংকট সময়ে বলিলেন, 'লোকভয় আবার কি ভয়? ঈশ্বর বড় না লোক বড়?' আমি তাঁহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল।"

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', পৃ. ৭৭-৭৯

[১] রামমোহন রায় রচিত, ও তাঁহার গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত ব্রহ্মসঙ্গীতের ১৩-সংখ্যক গানের প্রথম পঙ্ক্তি।

হাজারীলাল ১৭৭৫ শকের ১২ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর ১৮৫৩) ইন্দোর নগরে দেহত্যাগ করেন।

দ্রষ্টব্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (১৯৬২)। পৃষ্ঠা ৮৯, ৯৬

লালা হাজারীলাল সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সম্পাদিত 'পত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ১১, ৩৪

২২

পৃষ্ঠা ২৪২। পাদটীকা ১

থিওডোর পার্কার

খ্রীষ্টিয়ান ইউনিটারিয়ান যাজক সম্প্রদায়ের অন্যতম থিওডোর পার্কার। জন্ম আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স-এর লেক্সিনটন গ্রামে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে। পিতামহ জন পার্কার (১৭২৯-১৭৭৫)।

তাঁর স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত ধর্মোপদেশ ও রচনাবলী একসময় সমাজে প্রভূত আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। ধর্মোপদেষ্টাগণ এর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকমণ্ডলীর কোনো কোনো সদস্য পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে বোস্টন শহরে 'সমবেত উপাসকমণ্ডলী'র সভায় প্রধান আচার্যের জন্য আহূত হয়েছিলেন ; বলা বাহুল্য এই আহ্বানে তিনি সাড়াও দিয়েছিলেন। দাসত্ব প্রথার বিরোধিতায় তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'হারপারস্ ফেরী' আক্রমণের চক্রান্তে জন ব্রাউনের নেতৃত্বে যে গোপন সমিতি স্থাপিত হয়েছিল— তাতেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

থিওডোর পার্কারের সমগ্র রচনাবলী সুষ্ঠু সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট চোদ্দটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

দ্রষ্টব্য : *Webster's Biographical Dictionary*

২৩

পৃষ্ঠা ২৯০। পাদটীকা ১

মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ

1

To him who has got the sword of peace in
his hand, what can the wicked do ?

2

He who committeth not vice in mind, word, deed and understanding— he it is who truly performeth austerities not he that drieth up his body.

3

One should not do to others what is hurtful to himself.

4

A man should consider that happiness and misery are the same to others as to himself.

5

There is no end to thirst (of wealth) ; contentment is the greatest bliss.

6

One single truth and a thousand *aswamedhas* (the horse sacrifice, the greatest of all Sacrificial observances) were weighed together. One single truth out weighed them all.

7

Sensual desires are not appeased with enjoyment ; like flame on which clarified butter is thrown, they increase the more.

8

There is no religion higher than truth (because every man believes in his religion because he thinks it to be true).

—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ দেওঘরের সাবডিভিসনাল অফিসার এস. এস. জোন্সকে লিখিত পত্রের অংশ।

২৪

পৃষ্ঠা ৩০৬। পাদটীকা ৪

"1) The Hindu National Congress will be held every year at some celebrated place of pilgrimage, such as Benares the first year, at Prayag (Allahabad) the second, and peated again again.

2) With reference to the first meeting of the Congress

to be held at Benares, the inhabitants of that city, in public meeting assembled, will appoint a Reception Committee to raise subscriptions for the proper accomodation and entertainment of delegates to be sent to the Congress. The President of the Reception Committee will open the Congress, which will then proceed to the efection of a President. Each meeting of the Congress will disolve after adopting a President for the next year.

3) Any man, who is the Hindu parentage, professes to be a Hindu in religion, and does not take beef, will, if otherwise qualified for the office, be eligible to post of delegate, whatever his especial religious opinions, his manners, and customs, mode of living and costume may be, and to whatever sect or denomination of Hindus he may belong, polytheistic or monotheistic, orthodox or heterdox, old or new. Hinduism comprehends the faith of the Jain, who believes the greatest deities of the Hindus to be very inferior to his Tirthanker and the regular Chaitanya Vaishnavas, who recognize no distinctions of caste at one pole. and that of the most orthodox Saktas and Vaishnavas at the other. Mahomedan and European friends will have access to the Congress as visitors, seperate seats being reserved from them.

4) The proceedings of the Congress will be held in English. Any delegate will be allowed to speak in the vernacular of his province, provided any of his friends undertake to interpret his speech to the audience.

5) The Secretary of the Reception Committee will publish an advertisement in the public prints, inviting returns of delegates, as is the case with the Indian National Congress.

6) All Hindu religious Associations, theosophical societies included, as well as Hindu political Associations of India, wherever located, as well as the Hindu inhabitants of important places in India, will send delegates to the Congress.

7) Kulsis filled with water, with cocoanuts and mango

branches placed over them, as well as plantain trees will be place at the gate of the house in which the Congress will be held. Immediately before the commencement of the proceedings, resin (dhuna) all odorous sticks (dhupa) will be burnt in the room in which the Congress will be held as well as the Conch-shell blown.

8) The proceedings, as benefits the Hindu Nation, which is the most religious nation in the world, will commence with a prayer, offered to paramatma by a Shastri of the greatest renown, in Sanskrit and English suited to all sects and classes of Hindus, the members standing while the prayer is offered, the Shastri wounding up with the words : "May the great spirit, glorified by me just now, defend our Sanatani or Eternal Religion." Garlands will be thrown round the necks of the members by the Secretary in the order in which they have chanced to sit, before the prayer is offered.

9) Vedic yagna will be performed in the outer compound of the house in which the Congress will sit.

10) All matters, relating to the welfare of Hindus, will be taken up by the Congress, excluding those about social reform except such as relate to education, temperance, and sanitation, the work of social reform being left to the social reformers and the social reform associations of the country. All the matters mentioned above, could be classed under the following heads :—

(a) Physical ; (b) Intellectual ; (c) Moral ; (d) Religious— such as only appertain to all sects and classes of Hindus ; (e) Political ; (f) Agricultural ; (g) Industrial.

The subjects of cow-slaughter and the religious endowment case, taken up by captain Hearsey, should be first considered at the first meeting of the Congress.

11) The National Anthem will be sung at the conclusion of the proceedings, both in Sanskrit and English, all the members standing while it is sung."

—*The Indian Mirror*, Sunday, February 12, 1888

২৫

পৃষ্ঠা ৩৬৭। পাদটীকা ১

ব্রহ্মসংগীত

রাগিণী মূলতান।— তাল একতালা

সকলি তাঁহারি কৃপায়,
ভাল মন্দ ভাব কেবল নিজ মূঢ়তায়।
দুঃখ-বেশ সুখ ধরে,
জীব না চিনিতে পারে,
সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়॥*

—

রাগিণী পরজ।— তাল চৌতাল

তোমারি মহিমা অপার, নাথ বলা নাহি যায়,
তুমি অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার।
সকল দেব সমস্বরে, সদা যশ ঘোষণা করে,
তবুও না পারে করিতে অন্ত তাহার॥

* এই গীতের প্রথমাংশ একটি বন্ধুর বিরচিত।

—

রাগিণী বাগেশ্রী।— তাল আড়াঠেকা।

জেনেছি নাথ তুমিই পশিছ অন্তরে আমার,
আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা।
হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সখা।
কৃতার্থ করিয়ে অধীনে॥

—

রাগিণী বেহাগ।— কাওয়ালি।

কি মধুর বেণু রব লাগিছে শ্রবণে
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে।
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহ্বান,
ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥

—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা। ২য় ভাগ।
১৭৯৩ শক, পৃ. ১১৬-১১৭

২৬

পৃষ্ঠা ৩৮০। পাদটীকা ১

দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ২৩

২৭

পৃষ্ঠা ৩৮১। পাদটীকা ২

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পারিবারিক উপাসনার প্রার্থনা

"হে পরম পিতা পরম মাতা পরমেশ্বর! আমরা পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুরঃসর তোমার পূজা করিতেছি। তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি আমাদের গৃহ-দেবতা; তোমাকে ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকে জানি না, তুমি আমাদিগের প্রতি করুণা কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পরিবার মধ্যে যেন কখন বিরোধ ও কলহ উপস্থিত না হয়; যদি আমরা সম্পদে উত্থিত হই, তবে সেই সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই! যদি আমরা বিপদে পতিত হই, সে বিপদের মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অটল ভাবে অবস্থিতি করি। তোমার ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর, তোমার নিকটে আমাদের আর অন্য প্রার্থনা নাই। ওঁ শান্তি শান্তি।"

—'রাজনারায়ণ বসু।' তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের অসম্পূর্ণ চিত্র। তাঁহার এক কন্যা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১৯

২৮

পৃষ্ঠা ৩৮৪। পাদটীকা ২

চার্লস ভয়সী

ব্রহ্মবাদী চার্লস ভয়সী ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডে সেন্ট এডমণ্ডস্ হলে শিক্ষার সূত্রপাত। শিক্ষান্তে সেন্ট মার্কের হোয়াইট চ্যাপেলে ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পর এখান থেকে চলে যান ১৮৬৩ সালে এবং বাস করতে থাকেন ট্যাডকাস্টারের (Tadcaster) নিকট হিলাফে (Healaugh); এখানে ধর্মপ্রচার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মানবাত্মার শাস্তি চিরন্তন নয়— এ কথাই তিনি প্রচার করেছিলেন। প্রচলিত খ্রীস্টধর্মের বহু যুক্তিহীন অংশের অসারতা প্রদর্শন করবার জন্য কোনো কোনো মহলে তাঁকে নিন্দনীয় হতে হয়েছে। ১৮৭১ সালের পর তিনি লণ্ডনে খ্রীস্টীয় অদ্বৈতবাদী

থিষ্টিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাজকপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় তিনি 'দি গিল্টি অফ্ পেইন, ডেথ অ্যাণ্ড সিন' এবং 'অন্ থিজ্ম' রচনা করেন। ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্য ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কারারুদ্ধ হন। ১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

—*Coincise Dictionary of National Biography,*
Vol 2, 1909-1950. p. 448

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ইংলণ্ড-অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে 'আত্মচরিতে' ভয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন: "আমি লণ্ডনে থাকিবার সময় মধ্যে মধ্যে ইঁহার উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। তিনি যেমন সময়ে অসময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ও যীশুর দোষ কীর্ত্তন করিতেন, তাহা আমার ভালো লাগিত না; কিন্তু যে ভাবে উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সত্য সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত।"

রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপে গিয়েছিলেন (১৮৯০ খ্রী) তখন ব্রাইটনে চার্লস ভয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তিনি তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র দু'দিনের দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে ঐ অংশ উদ্ধৃত করা গেল:

"সোমবার···National Liberal Club-এ সিন্ধি বন্ধু আধ্বানির নিমন্ত্রণ উপলক্ষে dinner খেতে গেলুম। সেখানে Voysey-র সঙ্গে দেখা। তাকে বেশ লাগল, সে বাবামশায়ের প্রতি খুব ভক্তি প্রকাশ করলে। তার নিজের ইতিহাস অনেক শোনা গেল। Christianity ত্যাগ করার দরুন ঘরে বাইরে তাকে অনেক উপদ্রব সইতে হয়েছে। বললে সব চেয়ে কষ্ট যখন নিজের ঘরের মধ্যে sympathy-র অভাব দেখা যায়।"

আর একদিনের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "রবিবার। Voyseyর Churchএ গিয়েছিলুম। বেশ লাগল।"

২৯

পৃষ্ঠা ৩৮৬। পাদটীকা ১

মিস ফ্রান্সিস পাওয়ার কব ও মিস এলিজাবেথ শার্প

আইরিশ মহিলা, কব, ১৮২২ সালের ডাবলিনের নিকটবর্তী নিউব্রিজে এঁর জন্ম। বিদ্যামন্দিরে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র দু'বছর; পরে গৃহপরিবেশেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

খুব গোঁড়া, রক্ষণশীল পরিবারভুক্ত ছিলেন ইনি; প্রোটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী ধর্মপ্রচারক ছিলেন এঁরা। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই মিস কব ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত, উদার মনের মানুষ। সাময়িকভাবে নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন; পরে দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বৈতবাদই সমর্থন করেন। অল্পসময়ের ব্যবধানে পিতামাতার মৃত্যু হলে ইনি ধর্মজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইটালী-ভ্রমণে গিয়েছিলেন দু'বছরের জন্য। এই সময় তিনি লণ্ডন ডেইলি নিউজের ইটালীয়ান সংবাদ-প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই ইংরেজ সমাজসেবিকা মানব-প্রীতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিস্টলে দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্কুলে যোগ দেন মিস মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে; সমাজের অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনের নিমিত্ত স্থাপিত আশ্রমের কাজেও যুক্ত ছিলেন। মিস কব ছিলেন সমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার অধিকারের আন্দোলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা; প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের অন্যতম সমর্থকরূপে তিনি ছিলেন অগ্রণী। শারীরজ্ঞানলাভার্থ দেহব্যবচ্ছেদের ইনি একসময় প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি *The Echo* পত্রিকার কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। আমেরিকার প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় সংস্কার উচ্ছেদের অন্যতম সমর্থক থিওডোর পার্কারের রচনাবলী ইনি সম্পাদনা করেন। এঁর ত্রিশটির ওপর রচনা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে; তার মধ্যে সামাজিক সমস্যামূলক রচনাই অধিক। আত্ম-জীবনী লেখেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৯০৪ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল : *The Theory of Intuitive Morals* (1855), *Friendless Girls* (1861), *Broken Lights* (1864), *Studies of Ethical and Social Subjects* (1865), *Dawning Lights* (1868), *The Final Cause of Women* (1869), *Doomed to Be Saved* (1874), *The Scientific Spirit of Age* (1888).

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কেশবচন্দ্রের সঙ্গেও এই-সমস্ত ব্রহ্মবাদিনীদের ধর্মবিষয়ে পত্রবিনিময় হত। লণ্ডনে থাকাকালীন এঁদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক নানান আলাপ-আলোচনা করেছেন। 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' (মধ্য বিবরণ, তৃতীয়

অংশ) গ্রন্থ থেকে মিস কব ও কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত বিষয় জানা যায় : "ব্রহ্মবাদিনী মিস কব শরীরের স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন ; তিনি এই সময় সুস্থ শরীরে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। ২৫শে এপ্রিল সোমবার সায়ঙ্কালে কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতান্ত রসাবহ হইবে তাহাতে আর সংশয় কি ? কেশবচন্দ্রের জীবন-পরিবর্ত্তন, ভগবান তাঁহার জীবনে কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনীর নিকটে বর্ণন করিলেন, তাঁহার বর্ণিত কাহিনী সাশ্রুনয়নে আর্দ্রহৃদয়ে ব্রহ্মবাদিনী মহিলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে মিস কব তাঁহার নিকটে তাঁহার জীবনপরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আশ্চর্য্য এই, ভগবান্ দুই জনেরই হৃদয় একই প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিয়াপ্রকাশের পক্ষে কখন ব্যবধান হইতে পারে না ; সহস্র ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি দুই হৃদয়কে একইভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন।"

কেশবচন্দ্র লিখেছেন : "পাপীদিগকে পরিবর্ত্তিত করিবার ঈশ্বরের পন্থা কেমন নিগূঢ় ও বিস্ময়কর। পূর্ব্ব ও পশ্চিম অবশ্য মিলিত হইবে।" বিগত শতকের পাশ্চাত্য লেখিকা, দর্শনবেত্তা মিস ফ্রান্সিস পাওয়ার কব সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : "I am highly delighted with the conversation we have about our spiritual experiences. I give a sketch of the history of my conversion and point out the workings of God's providence, and as I narrate the incidents I see her eyes filled with tears and her whole countenance impressed with devotional sympathy. She tells me how she has been brought to the Lord in the same way and how in different and remote places we have been moved by the same spirit. How wonderful and mysterious are God's ways of converting sinners. The East and the West must unite."

মিস কব -আয়োজিত এক চায়ের অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ

হয়েছিল এলিজাবেথ শার্পের। তাঁর রচনার স্মরণীয় একটি পঙ্‌ক্তি "To me salvation comes from the Eastern Shore." এই কবিতাটি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত হয়েছিল এবং এদেশবাসীর গভীর অনুরাগ বৃদ্ধি করেছিল।

—

রাজনারায়ণ বসু -রচিত গ্রন্থ

বাংলা

একমেবাদ্বিতীয়ং / ব্রাহ্মসমাজের / বক্তৃতা / শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক বিরচিত। / কলিকাতা / ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / ১৭৮৩ শক।

পৃ [২] + বিজ্ঞাপন [২] + ১২৪

সূচী ॥ ঈশ্বরোপাসনা ও চরিত্র সংশোধনের কর্ত্তব্যতা: ৬টি বক্তৃতা; সংসারের অনিত্যতা: ৩টি বক্তৃতা; তিতিক্ষা ও সন্তোষ: ৩টি বক্তৃতা; পবিত্রসুখের মহৎ মহৎ কারণ; জীবাত্মার খেদ ও আশা; মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা: ২টি বক্তৃতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও লক্ষণ: ২টি বক্তৃতা; ব্রহ্মস্তোত্র

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।/ রাজনারায়ণ বসুর/বক্তৃতা ।/ দ্বিতীয় ভাগ ।/ কলিকাতা/ বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক / মুদ্রিত। / ১৭৯২ শক।

পৃ [২] + বিজ্ঞাপন [২] + ১১৪ + ব্রহ্মসঙ্গীত ১১৫-১১৮

সূচী ॥ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ। ২৪ আশ্বিন ১৭৮৭; মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ। ১৭ কার্ত্তিক ১৭৮৭, ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা। কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক; আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ। ১৯ আশ্বিন, ১৭৯০ শক। আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ। ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৭৯০ শক; আদি ব্রাহ্মসমাজ। ২৬ আশ্বিন ১৭৮৭ শক; আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ। ১১ মাঘ, ১৭৯০ শক; মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ। কার্ত্তিক, ১৭৮৭ শক; মেদিনীপুর সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। ২৬ মাঘ, ১৭৮১ শক; মেদিনীপুর অষ্টাদশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। ২৬ মাঘ, ১৭৮৫ শক; মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা। ফাল্গুন ১৭৮১; ১৭৮২; ১৭৮৩; ১৭৮৪; ১৭৮৪; ১৭৮৬; ১৭৮৭ শক; মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা। ১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক; ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন। "বাল্মীকির অক্ষয়কীর্ত্তি" এই শিরস্ক যুক্ত বক্তৃতার উপসংহার অংশ; মেদিনীপুর। ভাদ্র ১৭৮৮ শক; আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ। পৌষ ১৭৮৯ শক; কলিকাতা। ২১ আশ্বিন রবিবার ১৭৮৯ শক; ব্রহ্মসঙ্গীত।

ব্রহ্মসাধন। ১৮৬৫। পৃ ২৬

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা / শ্রীরাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক / প্রণীত। / কলিকাতা। / মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং, ৫৮।৫ / গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। / শকাব্দাঃ ১৭৮৮। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬।

পৃ [২] + পুস্তকোৎসর্গ [২] + বিজ্ঞাপন=।৵০

প্রথম ভাগ / ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক

টাইটেল ২ + ১১০ + পরিশিষ্ট ।৵০

সূচী ॥ প্রত্যয় ও প্রত্যয়ের নিয়ম ; আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন ; ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির ক্ষীণতা ; ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির আবশ্যকতা ; ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয় ক্রমে স্ফুরিত হয় ; ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ ; ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ; ঈশ্বরোপাসনা ; পরকাল ; ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব ; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ ; ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদান ; সত্যধর্ম্ম মত কি এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ; পরিশিষ্ট ॥ অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগ / ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যান

পৃ [২] + ৯৬ + গ্রন্থনির্যাস ৵০ + নূতন সঙ্কলিত শব্দের ইংরাজি অর্থ ৶০

সূচী ॥ ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ ; জগৎকার্য্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা ; ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ; ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ; ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন ; ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক ; ধর্ম্মরক্ষার উপায় ; পরকাল ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারিত্ব

সংস্করণ

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা। / প্রথম ভাগ। / ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক / প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা ১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন্ যন্ত্রে / শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ব্রাহ্মাব্দ ৫৭।

পৃ ২ + পুস্তকোৎসর্গ [২] + বিজ্ঞাপন ৵০ + নির্ঘণ্টপত্র [২]+ উপক্রমণিকা গ্রন্থাভাস ৮২ + পরিশিষ্ট ।০

আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ১৮৬৭। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা / কাহাকে বলে? / শ্রীরাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক / প্রণীত ও প্রকাশিত। / কলিকাতা। / জি., পি., রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে / শ্রীগোপালচন্দ্র বসুর দ্বারা মুদ্রিত। / ২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। / ১৭৯৪ শক।

পৃ [২] + ১১

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / কলিকাতা। / জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১৭৯৪ শক

পৃ অনুক্রমণিকা ।৹ + ৬০ + পরিশিষ্ট 1-28

সেকাল আর একাল। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু / প্রণীত। / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক / মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৯৬।

পৃ [২] + বিজ্ঞাপন ৵৹ + ৮২

সংস্করণ

সে কাল আর এ কাল / [১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত] / রাজনারায়ণ বসু / সম্পাদক / ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীসজনীকান্ত দাস / বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ / ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড / কলিকাতা-৬

আখ্যাপত্রের পিছনে

প্রকাশক / শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত / বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ / প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ··· আশ্বিন ১৩৫৮ / দ্বিতীয় সংস্করণ··· কার্ত্তিক ১৩৬৩···

পৃ. ।৵ + ভূমিকা ৵৹ + ৯৬

মাঘোৎসব-উপহার। / The Essential Religion / by / Rajnarain Bose / সারধর্ম্ম। / শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / ও / শ্রীগগনচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ২নং বেনেটোলা লেন, সখা যন্ত্রে, শ্রীললিত/ মোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ মূল্য ⁄১৹ আনা মাত্র। [১৮৮৬]

আখ্যাপত্র

The Essential Religion / by / Rajnarain Bose / সারধর্ম্ম / শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / শ্রীগগনচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। /

পৃ [২] + প্রকাশকের ভূমিকা [৵] + 10 + ১-২২

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ / ও / আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে / কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত। / চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

পৃ. ২ + বিজ্ঞাপন।০ + ৪২

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী / কলেজের ইতিবৃত্ত। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা / অভিব্যক্ত। / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্র / শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / শক ১৭৯৭।

পৃ [২] + বিজ্ঞাপন [২] + ১৮-৫৭

"হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক এই বক্তৃতা প্রথম কলেজ সম্মিলনে অভিব্যক্ত হয়। ঐ সম্মিলন খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৫ সালের ১ জানুয়ারী দিবসে হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তিকা একটি যন্ত্রস্থিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল বলিয়া তাহার যেরূপ পত্রাঙ্ক হওয়া উচিত তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইয়াছে। "সে কাল আর একাল" এবং "হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত" এই দুই পুস্তিকা প্রকাশ করণে আমার প্রধান অভিপ্রায় এই যে, লোকে সে কালের আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বৃত্তান্ত এবং প্রত্যেক প্রধান নগর, প্রত্যেক প্রধান গ্রাম, প্রত্যেক প্রধান বংশ, প্রত্যেক প্রধান বিদ্যালয়, প্রত্যেক প্রধান কার্য্যালয় ও এতদ্দেশে সঙ্গীত শিল্পাদি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ের পুরাবৃত্ত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবে তাহা হইলে বঙ্গ ভাষার কতদূর সমৃদ্ধি সাধন ও আমাদিগের সম্বাদ ভাণ্ডারের কতদূর বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু"

সংস্করণ

বহুদিন পরে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক 'বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যাদি সহ সম্পাদিত' হয়ে পৌষ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

পৃ. সম্পাদকীয় [৪] + ১২ + মূল বই ২৩

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য / বিষয়ক বক্তৃতা। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত। / নানান্ দেশে নানান্ ভাষা / "বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?" / নিধিরাম গুপ্ত। / বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা কর্ত্তৃক / প্রকাশিত।/

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ / নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে / মুদ্রিত। / সম্বৎ ১৯৩৫।

রাজনারায়ণ বসু লিখিত 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ : ১৩ই বৈশাখ ১৮০০ শক

পৃ. ৵০ + ৭৬

সংস্করণ

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা / ['তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ সহ] / রাজনারায়ণ বসু / গ্রন্থন / পরিবেষক / দে বুক স্টোর। ১০ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলকাতা ১২

আখ্যাপত্রের পিছনে

প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ / গ্রন্থন সংস্করণ : জুলাই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ…

পৃ [২] + [৪] + ৭৯, ৮০-৮৩*

* গ্রন্থ ও গ্রন্থকার : স্বপন মজুমদার -লিখিত

•

বিবিধ প্রবন্ধ। / প্রথম খণ্ড। / "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা", "সেকাল আর একাল" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা / শ্রীরাজনারায়ণ বসু বিরচিত। / "A people… India."/ Max Muller's……page 350 / সিংহ এণ্ড বেনার্জি ফ্রেণ্ড্‌স্ কর্ত্তৃক / ওরিয়েণ্ট্যাল্ পব্‌লিশিং এষ্ট্যাব্‌লিশ্‌মেণ্ট হইতে / প্রকাশিত। / প্রথম সংস্করণ। / কলিকাতা। / ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে / শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত / সন ১২৮৯ সাল।

পৃ [২] + ভূমিকা ৵০ + বিজ্ঞাপন ৵০ + সূচী ৵০ + ১৬৩ + পরিশিষ্ট ১৬৪-১৬৮ + অশুদ্ধ সংশোধন ২ + অনুষ্ঠান পত্র ২

সূচী ॥ স্বদেশীয় ভাষানুশীলন ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন ; আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত ; আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার ; শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব ; বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি ; জাতিভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন ; আশ্চর্য্য স্বপ্ন ; জেঠামো ; চিকিৎসা ; সমাজ-সংস্কার, ঐ (দ্বিতীয় প্রস্তাব) ; ঐ (তৃতীয় প্রস্তাব) ; মিসর দেশ ; হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত ; পরিশিষ্ট ১।২।৩

তাম্বুলোপহার। ১৮৮৬।

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা। / মহাহিন্দুসমিতি নামক একটি / মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব।/ স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।/ তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥ / দ্বিতীয় সংস্করণ।/শ্রীমুনীন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রকাশিত।/কলিকাতা/ ১০০।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।/ ১২৯৯।

পৃ. [২] + ॥০ + ৩০ + পরিশিষ্ট* ৩১—৪২ + শুদ্ধিপত্র [২] + Notice English "OLD HINDU'S HOPE. [২]

*১. National Anthem : God Save our Empress Queen : বাংলা অনুবাদ। "শ্রীমন্ রাজা, সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট মহোদয় কর্ত্তৃক কৃত" : "রাণীরে তার হে"…

* "দুই এক স্থানে রাজার অনুবাদ আমি অল্প পরিবর্ত্তিত করিয়াছি"—লেখক

২. জাতীয় সঙ্গীত :

বন্দে মাতরং ; মিলে সবে ভারত সন্তান ;• আর ঘুমাও না, দেখ চক্ষু মেলি

গ্রাম্য উপাখ্যান। / ৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / Sweet… ! loveliest village of the plain… And his best riches, ignorance of wealth. / Goldsmith / ১৯১৪ সাল। / মূল্য ১৲ টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনে

কুন্তলীন প্রেস, / ৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; / শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও / রায় এম্, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স / ৭৫।১।১ নং হ্যারিসন রোড হইতে / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পৃ. [২]+বিজ্ঞাপন [২]+প্রতিকৃতি এবং বিবরণ+কবিতা। নবকৃষ্ট ঘোষ + ভূমিকা ২৬০ + ১১৬

সূচী॥ বিজ্ঞাপন ; "Rajnaraian Bose (1898)" by Jadunath Sarkar, Modern Review 1906 : প্রতিকৃতির পিছনে উদ্ধৃত ; রবীন্দ্রনাথ লিখিত রাজনারায়ণ-পরিচয়/জীবনস্মৃতি ; কবিতা। নবকৃষ্ট ঘোষ ; ভূমিকা ; গ্রাম্য উপাখ্যান ; চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত / তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত / কলিকাতা / ১৩১৫ / মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১।৵০, কাগজের মলাট ১৵০
পৃ. ।৵০ + ২২০

সংস্করণ

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত ।/ তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত।/ দ্বিতীয় সংস্করণ।/ কলিকাতা।/ ১৩১৯।/ মূল্য কাপড় বাঁধা ১।৵০, কাগজের মলাট ১৵০।
পৃ. [২] + অরবিন্দ ঘোষ রচিত কবিতা [২] + ২২০
সূচী ॥ জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত; শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা; কর্মজীবন

রাজনারায়ণ বসুর / **আত্মচরিত** / তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত / গ্রন্থকার-পরিচিতি / শ্রীহরিহর শেঠ / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি / ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা ১২

আখ্যাপত্রের পিছনে

…প্রথম সংস্করণ … ১৩১৫ …/ দ্বিতীয় সংস্করণ … ১৩১৯ …/ তৃতীয় সংস্করণ … ১৩৫৯ … / চতুর্থ সংস্করণ—বাং ১৩৬৮, ইং ১৯৬১ / … শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত…
পৃ. [৮] + ১৬৬

ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত / রাজনারায়ণ বসু / সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ / ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট / কলিকাতা ৬
পৃ. [৬] + ৪৪

আখ্যাপত্রের পিছনে

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা : প্রথম ভাগ / তৃতীয় সংস্করণ (১৮৭১) হইতে সংকলিত / জুলাই ১৯৫৭...
সূচী ॥ ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ; ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত

A DEFENCE OF BRAHMOISM AND THE BRAHMO SAMAJ :/ being a Lecture delivered at the Midnapore Samaj Hall on the 21 June 1863 / 1863

pp [2], 22

আখ্যাপত্রের পিছনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিত ৭ আশ্বিন ১৭৮১ শক তারিখের পত্রাংশ উদ্ধৃত। দ্র. পত্রাবলী। ৫৩ সংখ্যক পত্র

BRAHMIC QUESTIONS OF THE DAY—ANSWERED, 1869

BRAHMIC ADVICE, / CAUTION AND HELP. 1869. p 10.

Contents : Sorrow for sin and desire for salvation ; Inspiration and Man's Alleged Divinity ; Respect towards religious teachers ; True Chararter of Brahmo Dharma.

THE ADI BRAHMO SAMAJ, ITS VIEWS AND PRINCIPLES. 1870

A / LECTURE / IN / REPLY TO THE QUERY / "WHAT IS BRAHMOISM ?" / "If I were...Love" / (The / Present Lecture) / "Mankind...flowers" / (Anonymous) / "Nationa-lity...man" / F. W. Newman. / "We should...Violence." / Anonymous. / CALCUTTA : / VALMIKI PRESS. / PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI. / 1871

THEISTIC TOLERATION AND DIFFUSION OF THEISM. 1872

THE ADI BRAHMO SAMAJ AS A CHURCH / BY / RAJ-NARAIN BOSE / CALCUTTA / PRINTED AND PUBLISHED BY K K. CHAKRAVARTI, / VALMIKI PRESS / 1873. pp 24.

HINTS SHEWING THE FEASIBILITY OF CONSTRUCTING / A/SCIENCE OF RELIGION/By/RAJNARAIN BOSE/PRESIDENT, Adi Brahmo Samaj / "God is invisible··· / *Mandukya Upanishad*/"There is in man a third faculty···/*Maxmuller's introduction to the Science of Religion* /"The mind has a tendency···"/ Calcutta Review, No. V, vol III / "When religion will become a Science···" / *Newman's Theism* / HARINABHI, BENGAL. / PRINTED AND PUBLISHED By T. N. CHUCKERBURTY, / AT THE EAST INDIA PRESS / 1878

pp [2] + [2] + Preface [2] + 16 + Note & Errata [2]

THE HINDU THIEST'S BROTHERLY HINTS TO ENGLISH THEISTS. 1881

BRAHMO CATECHISM. / By / BABU RAJ NARAIN BOSE / TRANSLATED INTO ENGLISH / by / BABU ESHAN CHUNDER BOSE / ALLAHABAD / PRINTED AT SUKH SAMBAD PRESS. / 1890 / PRICE··· 1 Anna.

pp [2] + 18

Contents : The Brahmo Catechism ; Principles of Brahmoism ; Morning Prayer ; Evening Prayer ; Congregational Prayer ; Directions for Spending the Day.

OLD HINDU'S HOPE / OR / A PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT / OF / A HINDU NATIONAL CONGRESS / CALCUTTA / PRINTED & PUBLISHED BY G. C. BOSE & CO , BOSE PRESS, / 33, Bechoo Chatterjee's Street. / 1888

pp. [2] + [2] + 58

Preface by the author (OLD HINDU) ; Maha Hindu or the Great Hindu Union ; Specimen of speech ; Appendix ; What makes a Hindu ; (Indian Mirror, 3rd February 1887); (Indian Mirror, 23rd February, 1817) ; A Proposal for a Great Hindu Union—The necessity of a Hindu National Union (Indian Mirror, 12th February 1887) ; Indian Mirror

16th January 1888) ; Provisional Hindu National Congress (Indian Mirror, 3rd February 1888) ; The Necessity of Establishing the National Hindu Union on a Religious basis—why Mahommedans Cannot be taken into it concluding exhortatory address to all Hindus (Indian Mirror, 23rd January, 1887) ; National Songs : (1) God Save our Empress Queen ; (2) I worship thee, O Mother ; (3) Let all the songs of India United ; (4) Ye Sons os Ind ! her glory sing ; (5) Sleep no more ; Open your eyes

'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র (১২৯৯) ইংরেজী অনুবাদ।

THE/RELIGION OF LOVE/INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES. / *Based Chiefly on The Hindu Stastras.* / By / RAJNARAYAN BOSE / *President of the Adi Brahmo Samaj.* / "We are thine..." /-*Rigveda* / "He who...". /-*Upanishad* / "Stationed...work" /-*Bhagavat-gita or the Song Celestial* / "*To him...myself*" /-*Ibid* / "*Thou. O God...the sea*" /-*Mahimnastava.* / 1894.

Calcutta: / Printed and Published by K. C. Datta, B. M. Press. 211, Cornwallis Street.

pp. [2] + 58 Errata [2]

সম্পাদিত গ্রন্থ

রাজা রামমোহন রায়- / প্রণীত গ্রন্থাবলি। / শ্রীযুক্তরাজনারায়ণ বসু / ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ / কর্ত্তৃক / সংগৃহীত ও পুনঃ প্রকাশিত / কলিকাতা। / আদি-ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে মুদ্রিত। / ১৭৯৫ শক

পৃ. [২], বিজ্ঞাপন [২], ৭৮৮ গ্রন্থসূচী, গ্রন্থাবলী সূচী, প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপন ৮১৪

"প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপন॥ ১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসে আমরা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই, ১৮০২ শকের জ্যৈষ্ঠে তাহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাগ সমাপন করিলাম।... ১৮০২ শক ২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮০ খৃঃ অব্দ ৩ জুন।"

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা

আলোচনা

১৮০৬-১৮০৭ শক। পৃ ২৭৪। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার

১৮০৭ শক (১৮৮৬ খ্রী)। পৃ ১০৯। তাম্বুলোপহার।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব

১২৮২॥ অগ্রহায়ণ। পৃ ২৪ । অমৃতাঙ্কুর (উপন্যাস)। অসমাপ্ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৭৮২ শক। ফাল্গুন। পৃ ১৪৩ । ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত

১৭৮৭ শক। ভাদ্র। পৃ ৯০ । আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার

১৭৮৯ শক। ভাদ্র। পৃ ১০২ । হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ

। পৌষ। পৃ ১৭২ । রামের জন্মবৃত্তান্ত

১৭৯৪ শক। ফাল্গুন। পৃ ১৮১-৮৩। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহার স্থূলমর্ম”

১৭৯৫ শক। বৈশাখ। পৃ ১২ । প্রকৃত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মধর্ম

১৭৯৮ শক। কার্তিক। পৃ ১২৬ । স্বদেশীয় ভাষানুশীলন

১৮০১ শক। চৈত্র । পৃ ২২৯ । জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি

১৮০২ শক। বৈশাখ। পৃ ৮ । জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি

জ্যৈষ্ঠ। পৃ ৩৩ । হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন

শ্রাবণ। পৃ ৭৩ } মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা :

ভাদ্র। পৃ ৯৩ } রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প

কার্তিক। পৃ ১৩৪ }

১৮০৫ শক। শ্রাবণ। পৃ ৭৭ } দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

ভাদ্র। পৃ ৮৮ । নূতন ধর্মমত

অগ্রহায়ণ। পৃ ১৫৯ }

পৌষ। পৃ ১৭৫ }

চৈত্র। পৃ ২৩৩ } দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

১৮০৬ শক। পৌষ। পৃ ১৮৭ }

মাঘ। পৃ ২০৫ }

১৮০৭ শক। বৈশাখ। পৃ ১৮ । ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর প্রার্থনা

১৮০৮ শক। জ্যৈষ্ঠ। পৃ ৪০ । দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

১৮০৯ শক। জ্যৈষ্ঠ। পৃ ৩০ । ব্রাহ্মধর্ম্মের আপদবিপদ

আষাঢ়। পৃ ৫২ । দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

আশ্বিন। পৃ ১০৮ । ঋষিজীবন

১৮১০ শক। চৈত্র। পৃ ২৩০ । দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব

১৮১১ শক। অগ্রহায়ণ। পৃ ১৪৮ । কোজাগর পূর্ণিমার দিনে দেবগৃহে ব্রহ্মোপাসনা।/ উপদেশ ও প্রার্থনা

১৮১৩ শক। ভাদ্র। পৃ ৯১ । গীতামাহাত্ম্য ('হিন্দুরঞ্জিকা' হইতে উদ্ধৃত)

১৮১৫ শক। আশ্বিন। পৃ ১১৫-১৬
কার্তিক। পৃ ১৩৩-৩৫
পৌষ। পৃ ১৭০-৭২
পৃ ২৩৪-৩৬
} History of the Primitive Aryans of Central Asia and the Earliest Indo-Aryans. (Incomplete)

১৮১৬ শক। কার্তিক। পৃ ১০১ । গোলাপ পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার্চ্চনা

অগ্রহায়ণ। পৃ ১১৭ । ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোক্তি

১৮১৭ শক। শ্রাবণ। পৃ ৫৫ । পৌরাণিক ভূগোল

পৃ ৫৮ । আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত

পৃ ৮৯ । আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত

১৮৪২ শক। মাঘ। পৃ ২৮৩-৮৪। History of the Primitive Aryans of Central Asia and the Earliest Indo-Aryans based chiefly on the Puranas especially the Vishnu Puranas.* । অসমাপ্ত

* "ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে আমার নিকট এই ইংরাজী প্রবন্ধ রাখিয়াছিলেন। তারপর তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং নানা কারণে আমিও উহা প্রকাশ করিতে পারি নাই।...তিনি কিভাবে পুরাণ হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের উপকারে আসিতে পারে...।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

দাসী

১৮৯৫ খ্রী। মে । পৃ ২৩৩। পিতৃভূমি দর্শন। আত্মচরিত

জুন । পৃ ২৮৯। আমার পশ্চিম ভ্রমণ। আত্মচরিত

নভেম্বর, ডিসেম্বর। পৃ ৫৯১, ৬৪৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

নব্যভারত

১২৯৩। বৈশাখ। পৃ ২১। নববর্ষ উপলক্ষে বন্ধুদিগকে তাম্বুলোপহার

১২৯৪। চৈত্র । পৃ ৬৫৪। জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য (অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীর সমালোচনা)

প্রবাসী

১৩৩৪। কার্তিক। পৃ ৬০। সেকালের কথা

পৌষ । পৃ ৩০৪। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

মাঘ । পৃ ৪৬১। দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি

ভারতী ও বালক

১২৯৩ বঙ্গাব্দ। অগ্রহায়ণ। পৃ ৪৮২-৮৫। সমালোচনা। Star in the East (পূর্ব্বাকাশে শুকতারা)

১২৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৪৩। জীবন প্রান্তোপনীতের জীবন

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর রচনাবলীর তালিকা দেওয়া গেল। সমসাময়িক নানা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কিছু রচনার কথা প্রসঙ্গক্রমে জানা যায়— কিন্তু কোনো কোনো পত্রিকা যেমন আলোচনা, নবজীবন, সমদর্শী or *Liberal*, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, ভারতী ও বালক, *Indian Messenger*, *Brahmo Public Opinion*, *Theistic Quarterly Review*. *Calcutta Review*, *The Englishman*, *Theosophist*, *The Times London*, *Indian Field*, *National Paper* প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য এবং অনেক সংখ্যা কীটদষ্ট এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেখবার সুযোগ হয় নি।

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮২৬ : জন্ম ॥ ৭ সেপ্টেম্বর : ২৩ ভাদ্র, ১৭৪৮ শক, চাপড়া ষষ্ঠী। চব্বিশ পরগনা জেলার মাগুরা পরগনার বোড়াল গ্রামে।

১৮৩৩ : শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় আগমন— বৌবাজারে শম্ভু-মাস্টারের স্কুলে ('স্কুল সোসাইটিজ স্কুল') ভর্তি।

১৮৩৪-৩৫ (আনুমানিক) : শম্ভুমাস্টারের স্কুল থেকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৪০ : হেয়ার স্কুল থেকে হিন্দু কলেজে প্রবেশ।

১৮৪১-৪২ : হিন্দু কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সরকারি বৃত্তি লাভ করে উত্তীর্ণ হন।

১৮৪২-৪৩ : হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) বার্ষিক পরীক্ষায় সিনিয়র বিভাগের সর্বোচ্চ বৃত্তি লাভ।

১৮৪৩ : প্রথম বিবাহ কলকাতা শেয়ালদহে। স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবী।

১৮৪৪ : হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত।

: অক্টোবর মাসে রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে গৌড় ও রাজমহল ভ্রমণ।

১৮৪৫ : স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু। ডিসেম্বর মাসে পিতার মৃত্যু। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৪৬ : সালের প্রথমভাগে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মে যোগদান। তাঁরই প্রচেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য উপনিষদের অনুবাদকর্মে নিযুক্ত, ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান।

: সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ, তদীয় পত্নী ও তিন পুত্র (দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ)-সহ গঙ্গায় নৌকাযোগে ভ্রমণ।

: ১৭৬৮ শকের ২৯ শ্রাবণ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে বাংলায় প্রথম লিখিত বক্তৃতা পাঠ।

১৮৪৭ : এপ্রিলে হাটখোলার দত্ত-পরিবারে দ্বিতীয়বার বিবাহ ; স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী।

১৮৪৮ : ডেভিড হেয়ার স্মরণার্থ সভায় বক্তৃতা।

১৮৪৬-৫০ : ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা প্রদান।

১৮৪৯ : ১২ মে, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ; সেপ্টেম্বর মাসে স্টীমারযোগে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসাম প্রদেশ গমন।

১৮৪৫-৫০ : বেদের মতবাদ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে মতভেদ, দেবেন্দ্রনাথকে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনায় সহায়তা দান।

১৮৪৯-৫০ : 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ (তাৎপর্য ছাড়া) প্রকাশ।

১৮৫০ : ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় আর্চবিশপ ফেনেলনের প্রার্থনার বাংলা অনুবাদসহ পাঠ।

১৮৫১ : মেদিনীপুর গমন ; মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ। মেদিনীপুর 'বেলীহল পাবলিক লাইব্রেরি'র সম্পাদক ও অন্যতম কর্মকর্তা নিযুক্ত।

১৮৪৬-৫২ : তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে গ্রন্থসভার (Paper Committee) সভ্যশ্রেণীভুক্ত।

১৮৫২-৫৩ : জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার জন্ম।

: মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত করে গৃহ নির্মাণ করানো।

: মেদিনীপুরে 'ধর্মালোচনা সভা', 'সঙ্গত সভা', 'বিতর্ক সভা', 'সাহিত্য উৎসাহিনী সভা' স্থাপন।

: মেদিনীপুরে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে উপাসনার প্রবর্তন।

: মেদিনীপুর গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

১৮৫৭ : পিতৃব্যপুত্র দুর্গানারায়ণের ও সহোদর ভাই মদনমোহনের বিধবা বিবাহ দেন। ফলে বাঙালী সমাজে তীব্র আন্দোলন।

১৮৬০ : দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন -সহ রাজমহল ভ্রমণ।

১৮৬১ : 'সুরাপান নিবারণী সভা' ও 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন।

: কলকাতা হেয়ার স্কুলে ও হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রত্যাখ্যান।

১৮৬৪।৬৫ : ব্রাহ্মধর্মের বিধানানুসারে প্রথমা কন্যা স্বর্ণলতার বিবাহ। জামাতা শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ। জীবনে প্রথম ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান। প্রধান আচার্য রূপে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ; অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পৌরোহিত্য করেন ; মেদিনীপুর বিবাহসভায় দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

১৮৬৬ : এপ্রিল মাসে ব্রাহ্মবিধানানুসারে দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতার বিবাহ। জামাতা মজিলপুরের দীননাথ দত্ত।

: অসুস্থ অবস্থায় মেদিনীপুর পরিত্যাগ ও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৭ : ভাগলপুর গমন ; সেখানে অবস্থানকালে ১৮৬৯ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস অবধি এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার।

১৮৬৮ : ব্রাহ্মবিবাহ আইনবদ্ধ করতে কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের দৃঢ় প্রতিবাদ।

১৮৬৮-৭০ : কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর প্রগতিশীল দলের সঙ্গে রক্ষণশীল দলের প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ।

১৮৬৯ : অক্টোবর মাস নাগাদ কলকাতায় আগমন।

: সমাজের বিপথগামী হীন ব্যবসায়লিপ্ত নারীদের লক্ষ্য করে পত্র লেখেন Hindoo Female Modesty শীর্ষকে *National Paper*-এ।

১৮৭০ : কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে গমন করলে প্রগতিশীল দলের ভক্তি-বিরোধী আন্দোলন মন্দীভূত হয়।

১৮৭১ : কলকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজে সভাপতির আসন গ্রহণ ; রাজ-নারায়ণের সভাপতিত্বে হিন্দুমেলার অধিবেশন।

১৮৭২ : 'জাতীয় সভা'র অধিবেশনে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতা পাঠ।

১৮৭১-৭৩ : স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

১৮৭৪ : 'জাতীয়-সভা'র সহকারী সভাপতিরূপে বৃত।

১৮৭৫ : 'জাতীয় সভা'য় পৌরোহিত্য।

১৮৭৭ : সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষ।

১৮৭৮ : উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজকে হিন্দুধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপক্ষরূপে বিচার।

নির্দেশিকা

৩১

—